আচার্য্যের উপদেশ।

হিমালয়ের গাত্রোত্থান।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ১৪ই আষাঢ়, ১৮০২ শক।

চারি সহস্র বৎসরের পর আবার হিমালয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল। যে গম্ভীর হিমালয় পর্ব্বত, বহু শতাব্দী গত হইল, জাগ্রৎ জীবন্তভাবে ব্রহ্ম নাম গান করিয়াছিল, ব্রহ্মধ্যানে মগ্ন হইয়াছিল ব্রহ্মসাধন করিয়াছিল, প্রাচীন আর্য্যদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা এবং যোগতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিল এবং সমস্ত ভারতবর্ষে ব্রহ্মের যশ ঘোষণা করিয়াছিল, কালক্রমে সেই পর্ব্বত নিস্তেজ, এবং নির্জীব হইয়া ঘোর নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িল। প্রাচীন কালে সমুদায় ভারত এই হিমালয়ের পদতলে বসিয়া ব্রহ্মবিদ্যা এবং যোগ ধর্ম্ম শিক্ষা করিত এবং হিমালয় হইতে বিনিঃসৃত গঙ্গাতে স্নান করিয়া ভারতবাসীগণ সেই গঙ্গার তটে বসিয়া হরির আরাধনা এবং জপ তপ করিতেন। এই পর্ব্বতের নিকট আর্য্যগণ যেমন ব্রহ্মস্বরূপ নির্ণয় করিতে শিখিয়াছিলেন এমন আর কোন্ জাতি পারিয়াছিল? হিমালয় যেমন প্রাচীন আর্য্য যোগী ঋষিদিগকে উচ্চ ব্রহ্মতত্ত্ব এবং যোগ ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছে, এমন আর কে শিক্ষা দিয়াছে? দেখিতে হিমালয় কেবল কঠিন প্রস্তর রাশি কিন্তু বাস্তবিক উহা ভারতের বৃহৎ ঘনীভূত যোগ ধর্ম্ম। হিমালয় অভেদ্য, কে উহাকে ভেদ করিতে পারে? হিমালয় অটল অচল, কে উহাকে আন্দোলিত করিতে পারে? এই অভেদ্য হিমাচল গুরু হইয়া আমাদিগের প্রাচীন আর্য্যদিগকে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছে। প্রমাণ বেদ বেদান্ত। ভারতের যোগধর্ম্ম হিমালয়

সম্ভূত। অভ্রভেদী হিমালয় হিন্দুস্থানের মস্তক। সেই উচ্চ মস্তকের ভিতর হইতে যোগতত্ত্ব, ধ্যানতত্ত্ব এবং নানা প্রকার জ্ঞানতত্ত্ব বাহির হইয়াছে। যখন সমুদয় যোগধর্ম্ম বাহির হইয়া গেল তখন হইতে ঐ পর্ব্বত ক্রমশঃ নিস্তেজ এবং নিরুদ্যম, নিষ্ক্রিয় ও অকর্ম্মণ্য হইয়া নিদ্রায় অচেতন হইল। অনেক বৎসর যোগ শিক্ষা দিবার পর হিমালয়ের বুঝি আর কিছু শিখাইবার ছিল না, গঙ্গা যমুনাকে প্রেরণ করিয়া হিমালয়ের আর বুঝি কোন নদী উৎপাদন করিবার শক্তি রহিল না তাই বুঝি হিমালয় নিদ্রিত? কিম্বা ভারতবাসীর নিকট আর তাদৃশ আদর পাইল না বলিয়া গিরি শ্রেষ্ঠ হিমালয় অবসন্ন হইল? যে কারণেই হউক ঐ যে প্রকাণ্ড পর্ব্বত যাহার উপর কত যোগী ঋষি, কত সন্ন্যাসী তপস্বী হরির আরাধনা করিতেন, সেই হিমালয় এখন ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। আর কে সেখানে যোগ তপস্যার উপদেশ শুনিতে যায়? মনুষ্য নিদ্রায় অচেতন হইলে যেমন সে কথা কয় না, প্রশ্নের উত্তর দেয় না, চলে না বলে না সেইরূপ এই প্রকাণ্ড পর্ব্বত রাজি এমনই নিদ্রায় অচেতন যে সহস্র বৎসর ইহাতে জীবনের কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। যেন ইহার মুখে একটী কথা ছিল না, নিতান্ত স্পন্দহীন নীরব। সেই পাহাড় রহিয়াছে, সেই বৃহৎ আকৃতি; সেই উচ্চতা, সেই অটলতা, কিন্তু সমুদায় যেন নির্জীব। ডাকিলে কোন উত্তর দেয় না। যেন মৃত দেহ কেবল পড়িয়া আছে। এই দীর্ঘকাল মধ্যে কত দুর্ঘটনা ঘটিল, ধর্ম্ম বিলোপ হইল, অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইল, দুঃখের আগুন জ্বলিল, কিন্তু পাহাড় মৃত পাহাড়ের ন্যায় উদাসীন। সৌভাগ্যচ্যুত গৌরবভ্রষ্ট হিন্দুস্থান কত কাঁদিল, হিমালয় ভ্রূক্ষেপও করিল না, কর্ণপাতও করিল না। কাল নিদ্রায় নিস্তব্ধ, হিমালয় কি কাহারও কথা শুনিতে পায়? শিক্ষা গুরুর এই নির্জীব অবস্থা দেখিয়া লোকেরাও পূর্ব্ব প্রাপ্ত উপদেশ বিস্মৃত হইয়া বিভিন্ন প্রণালীতে ধর্ম্ম সাধন করিতে আরম্ভ করিল। পর্ব্বত এবং প্রকৃতির সঙ্গে যে ধর্ম্মের নিগূঢ় সম্পর্ক আছে ইহা তাহারা আর মানিল না। গভীর যোগ, ব্রহ্ম ধ্যান প্রভৃতি উচ্চ বৈদিক ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইল। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য মধ্যে ব্রহ্ম দর্শনের অভ্যাস আর রহিল না। আধ্যাত্মিক সাধনের পরিবর্ত্তে ক্রমে অসার কর্ম্ম কাণ্ড

আসিয়া পড়িল এবং অনাদ্যনন্ত ভূমা ব্রহ্মকে অর্চ্চনা না করিয়া ক্ষুদ্র দেব দেবীর আরাধনাতে সকলে প্রবর্ত্তিত হইল। যেখানে ভূমার আদর নাই সেখানে হিমাচলের আদর কিরূপে হইবে এই সাধারণের পতন ও কাল নিদ্রা মধ্যে নববিধানের আন্দোলন আসিয়া হিমালয়কে জাগাইল। নববিধানের সিংহরব ঐ পর্ব্বতের নিদ্রা ভাঙ্গিল, এবং সহসা গাত্রোত্থান করিয়া হিমালয় সমস্ত ভারতবর্ষকে ডাকিতে লাগিল এবং ব্রহ্ম ধ্বনিতে ভারতবাসীদিগকে কাঁপাইতে লাগিল। আমি হিমালয়ের গাত্রোত্থান দেখিয়াছি, সুতরাং তাহা সকলকে বলিতে বাধ্য হইলাম। যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহা কিরূপে অস্বীকার করিব? ঐ দেখ আবার ভারতবর্ষকে যোগ শিক্ষা দিবার জন্য হিমালয় শিখর হইতে যোগধর্ম্ম নব বেশ পরিধান করিয়া নিম্ন ভূমিতে আসিতেছেন। এতদিন চারিদিকে কেবল কাল নিদ্রারই লক্ষণ দেখা যাইত। ভারতবাসীদিগের নিকট অনাদৃত হওয়াতে এতবড় পাহাড় অপমানে প্রাণত্যাগ করিল, আবার তাহার মরণে ভারতের জীবন স্রোত সমুদায় ক্রমে শুখাইয়া যাইল। যাহাহউক এতদিনের পর ভারতের দুঃখের নিশি অবসান হইয়াছে। আবার নিদ্রিত পর্ব্বত সকল জাগিয়া উঠিয়াছে, আবার অচেতন প্রকৃতি চৈতন্যময় হইয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, আবার গিরি নদ নদী সমুদায় ব্রহ্মনাম ঘোষণা করিতেছে, ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে। এই সুসংবাদ শুনিয়া এখন সমস্ত আর্য্যজাতির মনে আশার সঞ্চার হউক, এবং সমস্ত ভারতবর্ষে নব উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত হউক! ঐ দেখ প্রকাণ্ড বীর হিমালয় আবার সুপ্তোত্থিত মস্তক উত্তোলন করিয়াছে এবং হস্ত সঞ্চালন করিতেছে এবং জ্বলন্ত চক্ষু ঘুরাইতেছে। কি আশ্চর্য্য প্রতাপ! কি স্বর্গীয় তেজ! এ ঘটনাটী কেবল ঈশ্বরের আজ্ঞাতে ঘটিল। দীর্ঘ নিদ্রার পর বীর গাত্রোত্থান করিলে যেমন শত্রুদিগের ভয় হয়, তেমনই হিমালয়ের পুনরুত্থানের সংবাদ শুনিয়া ধর্ম্মবিরোধী যোগ ধ্যান বিরোধী অসুরদল ভয়ে কাঁপিতেছে। নাস্তিক, অধার্ম্মিক, পাষণ্ড দুশ্চরিত্র দুর্জ্জন দিগের কাঁপিবার সময় আসিয়াছে। এবার পর্ব্বত শিখর হইতে যোগের মহা প্লাবন আসিতেছে, সমস্ত দেশ ডুবিবার উপক্রম হইতেছে। নাস্তিকতা অবিশ্বাস, সন্দেহ, পাপ জঞ্জাল সমস্ত এবার ধৌত

হইয়া যাইবে। ব্রহ্মযোগতত্ত্ব যাহা এক সময় ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিল সেই যোগের পুনরুদ্ধারের সময় আসিয়াছে। যে প্রাকৃতিক ধর্ম্ম গিরিকে রসনাসংযুক্ত করে এবং নদীকে অমৃত ভাষিণী করে ও সমস্ত জড় রাজ্যকে ঈশ্বর মহিমার বক্তা করে সেই সজীব ধর্ম্ম আবার আগত প্রায়। যে উচ্চ পর্ব্বতীয় ধর্ম্মে নীচ বাসনা সকল বিনষ্ট হয় সেই দেব ধর্ম্ম পুনরুত্থিত হইল। নীচ ভূমিতে যে সকল নীচ কামনার উৎপত্তি হয় ভারতবর্ষ অনেক শতাব্দী সে সমস্ত নীচ কামনার অনলে দগ্ধ হইয়াছে। ভারত আর্য্য যোগী ঋষিদিগের গৌরব এবং দেবত্ব ভুলিয়া গিয়া নীচ পশু জীবন ধারণ করিয়াছিল। এখন ভারতবাসীদিগকে আবার সেই উচ্চ যোগ পর্ব্বতের শিখরে আরোহণ করিয়া নীচ অপবিত্র বিষয় কামনা সকল নির্ব্বাণ করিতে হইবে। বহুকাল পরে আবার আর্য্য সন্তানেরা উচ্চ স্থানে বসিয়া উচ্চ যোগ সাধনে নিযুক্ত হইবেন। কতকাল কুসংস্কার পাশে বদ্ধ হইয়া বিষয় যন্ত্রণায় ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিরি শিখরোপরি নববিধানরূপ চন্দ্রের উদয় দেখিয়া কৃতার্থ হইবেন। নববিধানের অভ্যুদয়ে চারিদিক মধুময় হইল। সকল বস্তু জাগিয়া উঠিল। এ সকল গল্পের কথা নহে, প্রত্যক্ষ ব্যাপার। বৃহৎ গিরি উত্থান উপনিষদ্ শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ কর এবং বিশ্বাস কর। না দেখিলে কি বিশ্বাস করিবে? তবে বিশ্বাস চক্ষু খুলিয়া দেখ। স্বচক্ষে না দেখিলে আমরা কি এ সমাচার ঘোষণা করিতাম? ইহা সত্য না হইলে কে বলিত? ভূগোলে বাল্যকালে হিন্দুস্থানের উত্তর বিভাগে যে একটি প্রকাণ্ড জড় হিমালয়ের কথা পাঠ করিয়াছিলাম আমি সে পর্ব্বতের গাত্রোত্থান বলিতেছি না; কিন্তু যে হিমালয় গুরু হইয়া প্রাচীন আর্য্যগণকে যোগ এবং ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছে আমি সেই ভারতের গুরু, সেই প্রাচীন আচার্য্যের নিদ্রাভঙ্গের কথা বলিতেছি। আগে যেমন সেই হিমালয় কথা বলিয়া উপদেশ দিত এখনও আবার সেই পর্ব্বত জীবন্ত ভাবে কথা কহিতেছে এবং নবীন বংশীয় ভারতবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে;—"হে ভারতের নব্য সম্প্রদায়, প্রাচীন কালে যেমন তোমাদের ভক্তিভাজন পূর্ব্ব পুরুষগণ আমার কাছে বসিয়া পরব্রহ্মের সহিত যোগ সাধন করিতেন তোমরাও তাঁহাদিগের ন্যায় যোগী ও

তপস্বী হও। তোমরা আর ক্ষুদ্র পরিমিত দেবতার অর্চ্চনা করিয়া হীন হইয়া থাকিও না। আর্য্য স্থানের প্রাচীন মহত্ত্ব স্মরণ কর। বেদ উপনিষদের উচ্চ তত্ত্ব আবার ধারণ কর। পতিত যোগ মুকুট তুলিয়া পুনরায় মস্তকে ধারণ কর। আধুনিক সভ্যতা ও বিষয় বিলাসে মুগ্ধ হইও না। অসার ধন মানের লালসায় অধ্যাত্ম যোগ বিনাশ করিও না। বাহ্যিক জড় জগৎ ছাড়িয়া হৃদয়রাজ্য মধ্যে গভীর ধ্যানে ভূমানন্দ উপভোগ কর। বিজাতীয় জড়বাদ ও জড়াসক্তি পরিহার করিয়া স্বজাতীয় আধ্যাত্মিকতার গৌরব রক্ষা কর। আমি প্রধান হিমাচল তোমাদের বহুকালের গুরু ও বন্ধু, আমাকে অবজ্ঞা করিও না। আমি পরব্রহ্ম রূপ পরমরত্ন যেমন তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগকে দিয়াছিলাম তেমনি আবার তোমাদিগকে দিব। ভারতের মস্তক আমি, আমার মস্তকের মণি ব্রহ্মযোগ, সাবধান তাঁহাকে অবহেলা করিও না।" আমাদের পুরাতন বন্ধু হিমালয় জাগিয়া উঠিয়া এইরূপে আমাদিগকে ভৎ সনা করিতেছে ও উপদেশ দিতেছে। সংসার মোহ কোলাহল ভেদ করিয়া উহা উচ্চৈস্বরে বলিতেছে; "যোগ, যোগ, যোগ।" তোমরা কি দেখিবে না? তোমরা কি শুনিবে না? একটা প্রকাণ্ড পাঁহাড় ধড় মড় করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে. তোমরা কি জাগিবে না? একটা কেন? সহস্র সহস্র গিরি, অসংখ্য পর্ব্বত শ্রেণী তেজের সহিত চীৎকার করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে এবং নূতন ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রচার করিতেছে। প্রকাণ্ড লেখনী ধারণ পূর্ব্বক মহর্ষি হিমালয় নূতন ঋক্ যজু সাম অথর্ব্ব বেদাদি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং কত আশ্চর্য্য নিগূঢ় যোগতত্ত্ব লিপিবদ্ধ কবিতেছে। কঠ তলবকার বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদ সকল আবার নূতন আকারে রচিত হইতেছে; বেদান্ত শাস্ত্রের নূতন সংস্কার হইতেছে। ঘোর কলির অন্ধকার মধ্যে আবার যেন সত্যযুগের প্রকাশ। পুরাণের রাজ্য মধ্যে আবার বেদের জয়। নিম্ন ভূমির কোটি কোটি নীচ দেবতার নাম পরাজয় করিয়া হিমগিরির উপরে ব্রহ্ম নাম ধ্বনি উত্থিত হইল। এই যে যুগান্তর হইল, এই যে হিমালয়ের গাত্রোত্থান অথবা ভাবান্তর হইল ইহা কেবল নূতন বিধানের জন্য। নূতন বিধান স্বর্গ হইতে যেমন পৃথিবীতে

অবতীর্ণ হইলেন সেই সময় হরিদ্বারে বলপূর্ব্বক আঘাত করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন ;—"জাগ হিমালয়। দুঃখ রজনীর অবসান হইয়াছে, জাগ্রৎ হও মহাদেবের আদেশ পালন করিয়া ভারতকে উদ্ধার কর।" দ্বিপ্রহরা রজনীর অভেদ্য অন্ধকার ও অচৈতন্যের মধ্যে নববিধানের সিংহরব শুনিয়া এত বড় পাহাড় ব্যস্ত হইয়া জাগিয়া উঠিল এবং নববস্ত্র পরিধান করিয়া নববিধান মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মহেশের নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিল। সমস্ত হিমাচল বিশ্বেশ্বরের পবিত্র কৈলাসপুরী হইয়া বিশ্বেশ্বর ভক্তদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। বড় বড় দেবদারু সকল দেব দেব মহাদেবের। এমনি নিস্তব্ধ ও গম্ভীর, এমন প্রকৃতির শোভা দেখিলেই ইচ্ছা হয় ঐখানে বসিয়া বিরলে বিভুর পদ পূজা করি। বড় বড় দেবদারু সকল দলে দলে দেবদেবের মহিমা ঘোষণা করিতেছে এবং বায়ুর সঞ্চালনে মহা ঝঙ্কার করিয়া মহাদেবকে ডাকিতেছে। ইচ্ছা হয় উহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া সেই প্রাণেশ্বরকে ডাকি। হিন্দুস্থানের উত্তর সীমার পর্ব্বতোপরি ব্রহ্মধ্বনি হইল, ঐ ধ্বনি দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রতিধ্বনিত হইল। সেই প্রতিধ্বনি শুনিয়া সমস্ত প্রকৃতি জাগিয়া উঠিল, চন্দ্র সূর্য্য নদ নদী, অগ্নি বায়ু, পশু পক্ষী, সমস্ত প্রকৃতি সমস্বরে ব্রহ্মনাম গান করিতে লাগিল। এই মহোৎসবে সকলে ত্বরায় যোগ দেও। পাহাড়ী নিনাদে জাগ্রত হও এবং পাহাড়ী উৎসাহে উৎসাহিত হও। সামান্য হীন বঙ্গদেশী উদ্যমে চলিবে না। যেখান হইতে ব্রহ্ম প্রত্যাদেশ আসিতেছে যেখান হইতে ব্রহ্ম বিধানের নিশ্বাস প্রবলরূপে বহিতেছে সেই পাহাড়ের ন্যায় বিশ্বাসী ও যোগী হও। এবার এই ভাবে বৃহৎ পাহাড়া যোগ ধর্ম্ম সাধনে ব্রতী হও। এবার আমাদের সমুদায় সাধন প্রণালী, বল উদ্যম ধ্যান সঙ্গীত, আশা বিশ্বাস, যোগ সমাধি প্রকাণ্ড পাহাড়ী ভাব ধারণ করুক এবং হিমালয়ের ন্যায় অটল ও উচ্চ হইয়া পৃথিবীকে জয় করুক। হে ব্রাহ্ম, তোমার দ্বারের নিকট স্বয়ং হিমালয় আসিয়াছেন, মহাদেবের প্রিয় আবাস স্থান, কৈলাসপুর উহাকে অবহেলা করিও না। হিমালয় তোমাদের হৃদয়ের অনুরাগের বস্তু হউক! তোমাদের প্রত্যেকের প্রিয় হউক আর্য্যকুলের মুকুট স্বরূপ ঋষিদিগের ন্যায় তোমরা প্রাচীন বৃদ্ধ হিমালয়কে শ্রদ্ধা ভক্তি কর এবং অপরের সহিত গুরু-

বলিয়া বন্ধু বলিয়া ভাল বাস। হিমালয়ের পথে চলিলে তোমরা মহাদেবকে পাইবে এবং যত মহর্ষি দেবর্ষি যোগর্ষি এই দেশকে প্রাচীন কালে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে ও সমাধির অবস্থায় জ্যোতির্ম্ময় চিদাত্মারূপে দেখিবে। হে হিমালয়, তুমি কথা ক'ও, যেমন তুমি চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের সঙ্গে কথা কহিয়াছ, আমাদের সঙ্গে সেইরূপে জীবন্ত ভাবে কথা ক'ও। তুমি আমাদের মুনি ঋষিদের বাসস্থান, তুমি এ দেশীয় ভক্তদিগের সাধনের স্থান, আমরা তোমাকে আদর করিব, তোমার প্রশংসা করিব, এবং তোমার নিকট যোগধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া কৃতার্থ হইব। তোমার কথা সমস্ত ভারতবর্ষ গ্রহণ করিবে। কেননা তুমি আমাদের সকলেরই। তুমি কেবল পাঞ্জাব এবং উত্তর ভারতের নহ। তুমি জাতি বিশেষের অথবা সম্প্রদায় বিশেষের নহ, তুমি আমাদের সকলের সম্পত্তি এবং আর্য্যজাতির গৌরব। তুমি সমস্ত ভারতবর্ষের শিরোভূষণ। তুমি সমস্ত পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ। সমস্ত আর্য্য বংশীয় হিন্দু বংশীয়দের মস্তকের উপর, সকলের হৃদয়ের উপর তোমার অধিকার। সকলে তোমার পদতলে বসিয়া যোগ ধর্ম্ম শিক্ষা করুক এবং যোগানন্দ সম্ভোগ করুক!

১১০৬

আচার্য্যের উপদেশ।

এক কি তেত্রিশ কোটি?

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ২১ আষাঢ়, ১৮০২ শক।

ব্রহ্মমন্দিরের বেদী হইতে হিন্দুস্থানের প্রাচীন বিবাদ অদ্য মীমাংসা করিতে হইবে। এই দেশে বহুকাল হইতে একটি প্রকাণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে। সেই সংগ্রামের একদিকে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম, অপরদিকে পৌত্তলিকতা, একদিকে একমেবাদ্বিতীয়ং, অন্যদিকে বহু দেব দেবী। এই দুইয়ের মধ্যে যদি সন্ধি স্থাপিত না হয় তবে অকল্যাণ ও অনিষ্টের সীমা পরিসীমা থাকিবে না। যত দিন এই সংগ্রাম চলিবে তত দিন রাজ্যের কল্যাণ নাই, সামাজিক কুশল নাই, পারিবারিক মঙ্গল নাই। ঈশ্বর এক কি তেত্রিশ কোটি? হিন্দুধর্ম্মরূপ বৃক্ষের মূলদেশে যদি নিরীক্ষণ করি তাহা হইলে দেখি এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর বসিয়া আছেন। কিন্তু বৃক্ষের শাখা গণনা করিয়া দেখি সেখানে তেত্রিশ কোটি দেবতা। বাস্তবিক হিন্দু ধর্ম্মের মূলেতে যদিও একেশ্বরবাদ নিহিত ইহার পৌত্তলিক শাখা প্রশাখা অসংখ্য। এক দিকে একমেবাদ্বিতীয়ম্, আর এক দিকে দুই নহে, পাঁচ নহে, কিন্তু তেত্রিশ কোটি দেবতা! কিরূপে এদেশে পরস্পর বিরুদ্ধ মত প্রচারিত হইল তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য কি অসম্ভব? এই বিরুদ্ধ মতদ্বয়ের মধ্যে কি কোন প্রকারে সন্ধি হয় না? অদ্য এই গুরুতর বিষয়ের মীমাংসাতে আমরা প্রবৃত্ত হই। আর্য্যসমাজের আদিতে এক ঈশ্বর পূজা প্রবর্ত্তিত ছিল, কালক্রমে যবন পুরাণাদি রচিত হইল তখন লক্ষ, লক্ষ, কোটি কোটি অথবা অসংখ্য দেব দেবীর অর্চনা আরম্ভ হইল।

আদিতে ব্রহ্মপূজা অন্তে মূর্ত্তিপূজা। এক বীজ হইতে কোটি কোটি শাখা উৎপন্ন হইল। এক কিরূপে তেত্রিশ কোটি হইল? তেত্রিশ কোটি কিরূপে একের মধ্যে ছিল? এ অদ্ভুত তত্ত্বরহস্য শুনিতে অত্যন্ত আনন্দ হয়। কিন্তু এ অপূর্ব্ব কথা কে বলিবে? নব বিধান। যেখানে নববিধানের বিজয় নিশান উড়িতেছে সেখানেই এই দুই বিরুদ্ধ মতের সন্ধি ও সম্মিলন দেখিতেছি। আর কেহ এ প্রশ্নের উত্তর দিল না, দিতে পারিল না। কেবল নব বিধানই ইহার উত্তর দিতে পারেন ও দিবেন। ভারতবর্ষ নব-বিধানের নিকট এই সুসমাচার শ্রবণ করিবেন। ব্রহ্মজ্ঞানাভিমানী অনেকে তেত্রিশ কোটি শব্দ শুনিবামাত্র রাগে প্রজ্বলিত হন এবং উহা সম্পূর্ণ অসত্য বলিয়া উহার মূল তত্ত্ব পর্য্যন্ত বিনাশ ও পরিহাস করিয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মপূজা স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের চেষ্টা সফল হইতে পারে না। হিন্দুদিগের এই যে তেত্রিশ কোটি দেব দেবী ইহা অসার খোসার ন্যায় কেবল বাহ্যিক আচ্ছাদন মাত্র, উহার ভিতরে ব্রহ্মস্বরূপের খণ্ড খণ্ড যে সকল ভাবরূপ শস্য নিহিত রহিয়াছে সেই সমস্ত সুকৌশলে বাহির করিয়া লইতে হইবে, তবে এই দেশ হইতে তেত্রিশ কোটি উপ-ধর্ম্ম নির্ব্বাসিত হইবে। সে সমস্ত শস্য বাহির করিয়া লওয়া হয় নাই বলিয়াই ব্রাহ্মসমাজ এখনও পৌত্তলিকতা পরাজয় করিতে সক্ষম হন নাই। নববিধান এই নূতন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যে ভারতভূমিতে চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ব্রহ্মের নিশান উড়িয়াছে সেই নিগূঢ় ভূমিতে ঘটনাসূত্রে ক্রমে ক্রমে কোটি কোটি দেবদেবীর মন্দির স্থাপিত হইল। এ সকল ঘটনার মধ্যে কি হে ব্রাহ্ম, তুমি কোন আশ্চর্য্য সত্য উপলব্ধি করিতেছ না? যোগবিহীন চক্ষে এ সকল কেবল অসার পৌত্তলিকতা এবং কুসংস্কার মনে হয়; কিন্তু যখন যোগচক্ষু প্রস্ফুটিত হয় তখন যোগপ্রভাবে ঐ তেত্রিশ কোটির মধ্যে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ তেত্রিশ কোটির প্রত্যেকের ভিতর একটি একটি সত্য আছে যাহা প্রতি ব্রাহ্মের অবলম্বনীয়। দেবদেবীর মূর্ত্তি-পূজা আমাদের পক্ষে অসত্য ও পাপ এবং সম্পূর্ণরূপে পরিহার্য্য। কিন্তু মূর্ত্তি পরিহার করিতে গিয়া উহাতে যে ভাব মূর্ত্তিমান্ ছিল তাহা যেন আমরা

ছাড়ি না। হিন্দুস্থানে যে অসংখ্য অগণ্য দেবতা প্রতিষ্ঠিত তৎসমুদায় ব্রহ্ম-স্বরূপের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ও বিভক্ত প্রতিভা মাত্র। দেব দেবীর ভিতর হইতে যদি আমরা নিগূঢ় ভাবার্থ গ্রহণ না করি, তাহা হইলে আমাদেরই ভ্রান্তি, অনিষ্ট ও অকল্যাণ। এক ব্রহ্মেরই ভিতরে তেত্রিশ কোটি বিভিন্ন ভাব বিরাজ করিতেছে। হে ব্রাহ্ম, যখন তুমি আলোক দেখ তুমি আলোককে এক বর্ণ মনে কর; কিন্তু পদার্থবিজ্ঞান সেই আলোকের এক একটি শুভ্র কিরণের মধ্যে সাতটি চমৎকার বিভিন্ন বর্ণ দেখাইয়া দেয়। সাদার ভিতরে লাল, নীল প্রভৃতি বর্ণ থাকে কে জানে? শুভ্র সূর্য্য কিরণের মধ্যে যে সাত প্রকার বিচিত্র বর্ণ আছে তাহা কি অজ্ঞান চক্ষু দেখিতে পায় না মূঢ় মন কল্পনা করিতে পারে? যখন বিজ্ঞানবিৎ এক খণ্ড কাচের মধ্য শুভ্র সূর্য্য কিরণকে প্রবিষ্ট করিয়া বিভাগ করিয়া ফেলেন তখন তিনি উহার ভিতর সাত প্রকার বিভিন্ন বর্ণ দেখিয়া বিস্ময় ও ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া ঈশ্বরের স্তব স্তুতি করেন;—"হে ঈশ্বর তুমি ধন্য, তোমার দুরবগাহ জ্ঞান কৌশল ধন্য। তুমিই কেবল উজ্জ্বল শুভ্র জ্যোতির মধ্যে বিভিন্ন বর্ণ লুকাইয়া রাখিতে পার।" যেমন একটি শুভ্র বর্ণের মধ্যে লাল নীল প্রভৃতি সাতটি বিচিত্রবর্ণ লুক্কায়িত থাকে, সেইরূপ এক ব্রহ্মের মধ্যে তেত্রিশ কোটি ভাব লুক্কায়িত রহিয়াছে। হে হিন্দু, তোমার মহাদেব, তোমার বিষ্ণু, তোমার সরস্বতী, তোমার লক্ষ্মী, তোমার গণেশ কার্ত্তিক, তোমার দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী, সমস্ত আমার ব্রহ্মের মধ্যে গুণরূপে শক্তিরূপে অবস্থিতি করিতেছে। অযোধ্যা, বৃন্দাবন, পুরী, গয়া, কাশী, সর্ব্বত্র আমার ব্রহ্মের মন্দির। তোমার দেবালয়ে আমার ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত। তোমার তেত্রিশকোটি দেবতার তেত্রিশকোটি রঙ্গ একত্র করিলে ব্রহ্মস্বরূপ নিষ্পন্ন হয়। ব্রহ্মস্বরূপ ভক্তিকাচে পড়িলে কোটি কোটি বিচিত্র বর্ণে বিভক্ত হয়। আবার ঐ সমুদায় বর্ণ সংযুক্ত করিয়া যোগনয়নে দেখিলে এক অখণ্ড ব্রহ্ম দৃষ্ট হইবে। যদি ব্রাহ্ম বিজ্ঞানবিৎ হও তবে হে ব্রাহ্ম, তুমি বুঝিবে তোমার ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ এই হিন্দু-স্থানে মূর্ত্তিরূপে পূজিত হইতেছে। এ সকল পৌত্তলিক মূর্ত্তি তোমার পূজনীয় নহে; কিন্তু ইহাদের মধ্যে নিহিত গুণনিচয় তোমার ব্রহ্মেরই

সুতরাং অবশ্য আরাধ্য। ব্রহ্মগুণের অবজ্ঞা পাপ। অতএব তুমি সারগ্রাহী গুণগ্রাহী হইয়া সমুদায় হিন্দু দেবতার যথার্থ ভাব চরিত্রের বিভিন্ন গুণ গ্রহণ কর। ব্রহ্মকে আদর করিলে ব্রহ্মগুণের আদর করিতে হইবে। যত দেবদেবী, যত সাধু সাধ্বী যত অবতার সকলের মধ্যে হইতে ব্রহ্ম গ্রহণ কর। কোন দেব দেবীর মূর্ত্তি এ দেশে প্রকাশিত হইত না, কোন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইত না, যদি তাহার মধ্যে ব্রহ্মের কোন একটি গুণ না থাকিত। অযোধ্যাতে রামের মন্দির হইত না, বৃন্দাবনে কৃষ্ণের মূর্ত্তি হইত না, উৎকলে জগন্নাথের মন্দির হইত না, গয়াতে বুদ্ধদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইত না, যদি এ সকল ব্যাপারেব মধ্যে বিচিত্র গুণনিধি ব্রহ্মের এক একটি বিশেষ গুণ না থাকিত। ভক্ত হিন্দু যখন দেখিলেন তাঁহার হৃদয় ও তাঁহার দেশে বত্রিশ কোটি দেব দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল তখনও তাঁহার হৃদয়ের তৃপ্তি হইল না, তিনি বলিলেন, " এখনও আমার সমুদায় সাধ মিটে নাই। আমি ঈশ্বরের আরও এক কোটিরূপ দেখিতে চাই। " সমুদয় তেত্রিশ কোটি ভাবের সাধন না হইলে হিন্দুর বক্ষে কোন মতেই পূর্ণ শান্তি হয় না। হিন্দুর মন অতিশয় প্রেমিক ও ভক্ত এই জন্য অল্পেতে তাহার ধর্ম্মক্ষুধা মিটিল না। নূতন নূতন ব্রহ্মরূপ ও ব্রহ্মলীলা দর্শন করিব এই মানসে ক্রমাগত সাধন ভজন করিল সুতরাং তাহার আর অন্ত হইল না। ক্রমে তেত্রিশ কোটি হইয়া পড়িল। মনে করিও না যে উহা একটি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা। তেত্রিশ কোটির অর্থ অসংখ্য। এক নহে, তেত্রিশ কোটি নহে, অসংখ্য ও গণনাতীত। কি অসংখ্য? ঈশ্বর অসংখ্য? না। ঈশ্বর এক। ঈশ্বর কি কখন অনেক হইতে পারেন? তবে তাঁহার লীলা কার্য্য বিচিত্র। অনন্ত আকাশরূপ ব্রহ্মমন্দিরে স্বর্ণাক্ষরে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" লেখা রহিয়াছে। মূল এক, শাখা পত্র অনেক। এক ঈশ্বরেতে অসংখ্য ভাব। এক নিরাকার ঈশ্বর, কিন্তু তাঁহার কার্য্যরীতি ও ভাবের প্রকাশ অসংখ্য। হরি এক, হরিলীলা বিচিত্র। হিন্দুস্থান অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে ভুলিয়া গিয়া তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন একটি একটি রূপ পূজা করিয়া স্বতন্ত্র মূর্ত্তিতে স্থাপন করিয়া পূজা অর্চ্চনা করিল। এই ভ্রমে মহা অনিষ্টের উৎপত্তি হইল।

যাই বিভিন্ন গুণ বিভিন্ন রূপ ধারণ করিল অমনি ব্রাহ্ম হিন্দুস্থান পৌত্তলিক হিন্দুস্থান হইল। এই পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করিবার জন্য এবং আদি সনাতন ব্রহ্মরূপকে সাকার গঠন হইতে প্রমুক্ত করিবার জন্য নববিধান স্বর্গ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু নববিধান কি "মার মার" শব্দ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন? না। তিনি বলিলেন;—"দেব ভাবে দেব ভাবে বিবাদ হইতে পারে না। ঈশ্বর কি আপনার সঙ্গে আপনি বিবাদ করিতে পারেন? আপনার সঙ্গে আপনি সংগ্রাম করিতে পারেন?" নববিধানাশ্রিত ব্রাহ্ম যোগনয়নে দেখিলেন ব্রহ্মধারে সেই খণ্ড খণ্ড সমুদয় জ্যোতির সামঞ্জস্য রহিয়াছে। এক ব্রহ্মে তেত্রিশ কোটি দেবভাব একীভূত হইয়া রহিয়াছে। হে সাধক তুমি যদি তেত্রিশ কোটি দিন এই পৃথিবীতে জীবিত থাকিতে পার তাহা হইলে তুমি তোমার প্রতিদিনের জীবনে ঈশ্বরের এক এক নূতন রূপ দেখিতে পাইবে। যে দিন জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বর সাধন করিবে সেই দিন তুমি অনেক নূতন সত্য শিক্ষা করিতে পারিবে এবং বিবিধ বিজ্ঞানশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিবে। আবার যে দিন তুমি ঈশ্বরের লক্ষ্মী ভাবের আরাধনা ও পূজা করিবে, সে দিন দেখিবে জগজ্জননী সত্য সত্যই তোমার সংসারের লক্ষ্মী হইয়া সকল বিষয়ে সুব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন, ধন ধান্য দিয়া পরিবারের সকলের অভাব মোচন করিতেছেন এবং আশ্চর্য্য সুকৌশলে কল্যাণ সাধন করিতেছেন। যে দিন তুমি ঈশ্বরকে শক্তিরূপে পূজা করিবে, সেই দিন তোমার দুর্ব্বল মনে বলের সঞ্চার হইবে; যতই সেই আদ্যাশক্তিকে অন্তরে বাহিরে দেখিবে ততই তোমার অন্তরে বল শক্তি উদ্যম ও তেজ প্রস্ফুটিত হইবে। আবার যে দিন তুমি ঈশ্বরকে অনন্ত করুণারূপে দেখিবে, সে দিন তুমি বুঝিতে পারিবে ঈশ্বর অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুরূপে জগৎ পালন করিতেছেন এবং পতিত জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য সময়ে সময়ে নূতন নূতন ধর্ম্মবিধান প্রেরণ করিতেছেন। যতই তাঁহার অনন্ত করুণা ভাবিবে ততই তুমি ভক্তিরসে বিগলিত হইবে এবং প্রেমার্দ্র হৃদয়ে নরনারীর সেবাতে নিযুক্ত হইবে। কোন দিন ব্রহ্মের নির্ব্বাণরূপ দর্শন করিয়া মনের সমস্ত চিন্তা জ্বালা ও বাসনানল নিবাইবে এবং সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া সাম্য অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। কখন আনন্দ স্বরূপের অর্চ্চনা করিয়া তোমার চিত্ত

দুঃখ শোক বিস্মৃত হইয়া অপার হর্ষসাগরে ডুবিবে। তুমি সুখী মাতার ক্রোড়ে সুখী পুত্র হইয়া বসিবে। এইরূপে দশ দিনে দশ প্রকার, সহস্র দিনে সহস্র প্রকার ভাবে ব্রহ্মারাধনা করিবে, এবং প্রত্যহ নূতন নূতন ব্রহ্ম-রূপ দর্শন করিবে। কখন পিতা কখন মাতা, কখন রাজা কখন বিচারক, কখন চিত্তহারী কখন মনোমোহন, কখন অসুর সংহারক, কখন পাষণ্ডদলন, এইরূপ বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তোমাদের হরি তোমাদের নিকট প্রকাশিত হইবেন এবং এই বিচিত্র সাধনের নবীনত্ব কখন শেষ হইবে না। এইরূপে তোমরা এক নিরাকার ব্রহ্মের মধ্যে অসংখ্য নিরাকার মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা একেতে তেত্রিশ কোটি এবং তেত্রিশ কোটিতে এক অনুভব করেন! এক ব্রহ্মেতে তেত্রিশ কোটি, এবং তেত্রিশ কোটির মধ্যে এক ব্রহ্মকে না দেখিলে, ব্রাহ্মগণ, তোমরা প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম আস্বাদন করিতে পারিবে না। যদি এক ব্রহ্মেতে তোমরা অসংখ্য মূর্ত্তি না দেখিতে পাও তাহা হইলে তোমরা জীবন্ত ঈশ্বরকে দেখিতে পাও নাই। সুতরাং তোমাদের দৈনিক প্রার্থনা শুষ্ক নীরস এবং পুরাতন হইবে। যাহাদের প্রতিদিনের প্রার্থনা একই প্রকার হয় এবং নূতনত্ব ও বিচিত্রতা বিহীন তাহারা এক প্রকার পৌত্তলিক। কেন না তাহারা এক নির্জীব পাথরের ন্যায় দেবতার উপাসক। মৃত দেবতা নড়ে না, একই ভাবে পড়িয়া থাকে তাহাতে জীবন নাই সুতরাং ভাবেরও পরিবর্ত্তন নাই। যে মৃত দেবতার পূজা করে সেও মৃত ব্যক্তির ন্যায় নির্জীব হইয়া যায়। মূর্ত্তি পূজা ছবি পূজা মানুষকে পুতুলের ন্যায় ছবির ন্যায় নির্জীব করিবেই করিবে। যদি যথার্থ ঈশ্বরের উপাসক হও তাহা হইলে তোমাদের উপাসনা নিত্য নূতন এবং চির সরস হইবে। আমাদের ঈশ্বর শুষ্ক মৃত পাথরের ন্যায় নহেন। হে ব্রাহ্ম, তোমার ঈশ্বর নিত্য নূতন। যেখানে জীবন সেখানেই পরিবর্ত্তন ও নবীনতা। যিনি জীবন্ত ঈশ্বর তিনিই, কেবল চির নবীন, তাঁহারই সাধন সদা সরস। তুমি আজি পুণ্যময় হরির পূজা কর, কাল যোগেশ্বরের পূজা কর, তাহার পর দিন ভক্তবৎসলের পূজা কর, এক এক দিন ঈশ্বরের এক এক রূপের সাধন কর। এইরূপে যদি তুমি ঈশ্বরের নিত্য নূতনরূপ

সাধন কর, তাহা হইলে তোমার প্রতিদিনের প্রার্থনা পুস্তকে লিখিত হইলে দেখিতে পাইবে ৩৬৫ দিনে তুমি ৩৬৫ প্রকার প্রার্থনা করিয়াছ। এবং যদি তুমি তেত্রিশ কোটি দিন বাঁচিয়া থাকিতে পার তাহা হইলে তুমি ঈশ্বরের তেত্রিশ কোটি রূপ দেখিয়া কোটি কোটি ভাবরসে প্লাবিত হইবে। ব্রাহ্ম, তেত্রিশ কোটি দিন অপেক্ষাও তোমার আয়ু অধিক, অসংখ্য দিন তোমার জীবন, সুতরাং ইহকাল পরকালে তুমি ঈশ্বরের অসংখ্যরূপ দেখিতে পাইবে, এবং অসখ্য জাতীয় ভাবকুসুম লইয়া তুমি অসংখ্যরূপধারী ঈশ্বরের পূজা করিতে পারিবে। ঈশ্বর এক; কিন্তু তিনি বিচিত্র লীলারসময় ও অসংখ্যরূপধারী, সুতরাং হে ব্রাহ্ম, তোমার ভাব এক প্রকার হইতে পারে না। যখন তোমার ঈশ্বর জীবন্ত এবং অনন্ত প্রাণ ও অসংখ্য ভাবের আধার তখন তোমার পূজা অর্চ্চনার ভাবও অসংখ্য এবং জীবন্ত হইবে। তোমার দেবতা এক; কিন্তু তাঁহার দেবভাব তেত্রিশ কোটি। পূজা করিবে কেবল এক জনের, দুইজন কি ততোধিক কল্পনাও করিতে পারিবে না; কিন্তু সেই এক দেবতার যত বিচিত্র ভাব আছে সমুদায় সাধন করিতে হইবে; নিত্য নূতন ভাবে নবীনের অর্চ্চনা করিবে। যে অনেক দেবতা মানে সে তো পৌত্তলিক যে তেত্রিশ কোটি দেবভাব না মানিয়া একখানি মৃত পুরাতন কল্পনার আরাধনা করে সে ব্যক্তিও পৌত্তলিক। হে ব্রাহ্ম তুমি অপৌত্তলিক হও। তোমার ব্রহ্ম অনন্ত ভাবপ্রস্রবণ। তাঁহা হইতে অবিশ্রান্ত নব নব দেব ভাবের স্রোত বাহির হইতেছে, তুমি সেই স্রোতে প্রাণকে শীতল ও সুখী কর। তোমার দেবতা অশেষ রত্নখনি, তাঁহার ভিতর হইতে বিচিত্র বর্ণের বহুমূল্য ভাব রত্ন প্রতিদিন সঞ্চয় কর। প্রত্যহ নূতন সুরে নূতন ভাবে নূতনের গুণ গান কর এবং তাঁহার বিচিত্র লীলা রঙ্গে মত্ত হইয়া নৃত্য কর। তোমার ঈশ্বরের অসংখ্যভাব; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তুমি তাঁহার দশটি ভাবও ভালরূপে সাধন করিলে না। আলস্য, নির্জীবতা, শুষ্কতা পরিত্যাগ করিয়া নিত্য নূতন অনুরাগের সহিত ব্রহ্মের এক একটি বিভিন্ন রূপ নদীতে স্নান কর এবং জীবনেশ্বরের বিভিন্ন স্বর্গলোকের বিচিত্র স্বর্গীয় শোভা দর্শন করিয়া অপার আনন্দ সম্ভোগ কর।

আচার্য্যের উপদেশ।

বাগ্‌দেবী।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ২৮ আষাঢ়, ১৮০২ শক।

আমার অন্তরে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে আমার শত্রুদিগকে আমি পরিণামে দেবপ্রসাদে পরাজয় করিব। যাহারা সত্যবিরোধী, যাহারা ঈশ্বরবিধানবিরোধী তাহারা কখনই জয় লাভ করিতে পারিবে না আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস। আমার আক্রমণকারী শ্রেণীর মধ্যে প্রধান শত্রুদল তাহারা যাহারা এক প্রকার পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া দুষ্টবুদ্ধি সহকারে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আর এক প্রকার পৌত্তলিকতা আনয়ন করিতেছে। সামান্য মূর্ত্তি উপাসকদিগের অপেক্ষা তাহাদিগের অবস্থা আরও শোচনীয় যাহারা মুখে আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেয়; কিন্তু চলে না, বলে না, নড়ে না, জীবনের লক্ষণ দেখায় না এমন এক কল্পিত দেবছায়া পূজা করে। হে জ্ঞানাভিমানী ব্রাহ্ম, তুমি কি সেই অসার ঘৃণিত পদার্থকে ব্রহ্ম বলিতেছ যে পদার্থ সহস্র প্রার্থনার একটি উত্তরও দিতে পারে না, যে পদার্থ কথা বলিতে নিতান্ত অক্ষম? এমন অসৎ অসার কল্পিত বস্তুকে ব্রহ্ম নাম দিও না। যে বস্তুর কথা কহিবার শক্তি নাই, যাহা ভক্তের প্রার্থনার উত্তর দিতে পারে না তাহা কখনও ব্রহ্ম হইতে পারে না। ব্রহ্ম যিনি তিনি বাক্যস্বরূপ তাঁহার নাম বেদ। যে বাক্য নহে, যে কথা কহে না সেতো কল্পিত অসুর। সেই অসুর পৃথিবীর সর্ব্বনাশ করিবার জন্য মনুষ্যকল্পনা হইতে প্রসূত হইয়াছে। যে ঈশ্বর উপদেশ দেয় না, যে ঈশ্বর পাপের প্রতিবাদ করে না, যে ঈশ্বর পাপের

দণ্ড দেয় না, সে ঈশ্বর অসৎ এবং ভয়ানক অকল্যাণের হেতু। যদি তুমি এক প্রস্তর খণ্ডকে দেবতা বলিয়া স্বীকার কর, এবং ঐ পাথরের সমক্ষে মিথ্যা বল, প্রবঞ্চনা কর, নরহত্যা কর, ঐ পাথর তোমাকে ভর্ৎসনা করিবে না। পাথর কি কথা কহিতে পারে? না কখন কথা কহিয়াছে? সুতরাং পাথরকে তুমি ভয় করিবে কেন? উহার সমক্ষে তুমি স্বেচ্ছাচারী হইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার। দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুযোগ হইবে বলিয়া বুঝি তুমি বাক্যহীন পাথরের ন্যায় এমন এক ব্রহ্ম কল্পনা করিয়াছ যে তোমাকে কিছুমাত্র শাসন করিতে পারিবে না। তুমি তোমার শাণিত কুবুদ্ধির অস্ত্রে বাক্যস্বরূপ ব্রহ্মের রসনাটি কাটিয়াছ, কাটিয়া বলিতেছ তোমার ব্রহ্ম কথা কহেন না। কি আশ্চর্য্য! কি ভয়ানক চতুরতা! তুমি আপনি আপনার দেবতার রসনা কাটিলে, এখন বলিতেছ, ঈশ্বর কথা কহেন না! তোমার ভয়ানক মত কেবল স্বেচ্ছাচারী শাসন বিমুখ ব্যক্তি-দিগের নিকট আদরণীয় হইতে পারে কিন্তু উহা কখনই ঈশ্বরের রাজ্যে জয় লাভ করিতে পারিবে না। যাহারা মনে করে ঈশ্বর কথা কহেন না তাহারা যথার্থ ঈশ্বরকে অস্বীকার করে, তাহারা অহঙ্কারী অবিশ্বাসী দলভুক্ত। ঈশ্বরের রাজ্যে অবিশ্বাস নিশ্চয়ই চূর্ণ হইবে। সত্যের জয়, বিশ্বাসের জয় হইবেই হইবে। তোমরা কি মনে কর যে বাগ্‌দেবতা তোমা-দের মনোনীত হইলেন না বলিয়া তোমরা তাঁহার রসনা ছেদন করিয়া অঙ্গ-হীন দেবতার পূজা জগতে স্থাপন করিবে? এরূপ আশাকে মনে তিলার্দ্ধ স্থান দিও না। সত্য দেবতা তোমাদের দর্প চূর্ণ করিয়া আপনার নিশান নিখাত করিবেন। যদি অবিশ্বাস ও নাস্তিকতা পরিহার করিয়া সত্যধর্ম্ম সাধন করিতে চাও তবে ঈশ্বরকে বাক্যস্বরূপ বলিয়া গ্রহণ কর। যথার্থ ঈশ্বর বাগ্‌দেবতা। হিন্দুস্থানে ঈশ্বরের যে ভাব সরস্বতী নামে প্রসিদ্ধ, ব্রাহ্মগণ, তোমরা সে ভাব অবহেলা করিতে পার না। তোমরা কে? জগজ্জননী জ্ঞানদেবী সরস্বতীর সন্তান। তোমরা তাঁহারই উপাসক। তিনি চিন্ময়ী চৈতন্যরূপিণী বাগ্‌দেবী। তিনি বাক্যস্বরূপ। কেমন বাক্য? নিত্য বাক্য, অশেষ অবিনশ্বর বাক্য। সত্য বাক্য, অভ্রান্ত বেদবাক্য। বাক্যই তিনি। বাক্য সেতু স্বরূপ। একদিকে ঈশ্বর, অপরদিকে পৃথিবী,

মধ্যে ঈশ্বরবাণী সেতুস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। সেতু বন্ধ হউক, ঈশ্বর আর মনুষ্যের যোগ থাকিবে না। ঈশ্বরের বাক্য বন্ধ হইলে পৃথিবীর লোক-দিগের সঙ্গে এক প্রকার সম্পর্ক ঘুচিল। ঈশ্বরের বাক্যেতেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, এবং সেই বাক্যেতেই ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি। যদি ব্রহ্মবাণী না থাকে তবে পাপী সহস্রবার প্রার্থনা ও ক্রন্দন করিলেও স্বর্গ হইতে কোন উত্তর পাইবে না। কলিকাতা এবং হাবড়ার মধ্যে যদি সেতু না থাকে তথাকার লোক দিগের সঙ্গে আমাদের কোন সংশ্রব রহিল না এবং আমাদের পক্ষে তাঁহাদের থাকা না থাকা সমান। সেইরূপ যদি ঈশ্বর গুরু হইয়া সদুপদেশ না দেন, কথা না কহেন, দুঃখীর প্রার্থনার উত্তর না দেন, অনন্তকাল মৌনীর ন্যায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন তাহা হইলে দুঃখী পৃথিবীর পক্ষে ঈশ্বর থাকা না থাকা সমান। যদি ব্রহ্মবাক্য রূপ সেতুরযোগ না থাকে তবে ঈশ্বরের সদ্‌গুরু ও পরিত্রাতা হওয়া অসম্ভব। কেন না তিনি উপদেশ বাক্য না বলিলে কিরূপে শিক্ষা দিবেন, কিরূপে শাসন ও সংশোধন করিবেন? বাক্য ঈশ্বরের বাহন, বাক্য আরোহণ করিয়া ঈশ্বর এই দুঃখী জগতে অবতীর্ণ হয়েন। বাক্যই ব্রহ্মপক্ষীর পক্ষ। ইহার সাহায্যে স্বর্গ হইতে ব্রহ্মপক্ষী নামিয়া আসেন। বাক্য পক্ষ কাটিয়া দেও, ঈশ্বরের অবতরণ অসম্ভব। এতকাল হিন্দুস্থানে সরস্বতীর যে আদর হইয়াছে ইহার কি কোন অর্থ নাই? সরস্বতী মূর্ত্তির অর্থ কি? সরস্বতী বিদ্যার প্রতিমূর্ত্তি। তিনি স্বয়ং বিদ্যা স্বরূপা। ঈশ্বর অনন্ত জ্ঞানের আকর। বিমল জ্ঞান জ্যোতি অতিশয় শুভ্র; উহার অভাবই অজ্ঞান অন্ধকার। জ্ঞান আলোকের ন্যায় উজ্জ্বল, অজ্ঞান অন্ধকারের ন্যায় কাল। যাঁহারা প্রাচীন কালে ঈশ্বরের জ্ঞানরূপ অনুভব করিয়াছিলেন তাঁহারা জ্ঞান জ্যোতি বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন ও ধ্যান ধারণ করিতেন। এই জন্যই কালক্রমে পৌত্তলিকেরা সরস্বতীর মূর্ত্তি নির্ম্মল শুভ্র বর্ণে চিত্রিত করিল। জ্ঞান শুভ্র জ্যোতি স্বরূপ। ঐ জ্ঞানকে ঘন কর, আরো ঘন কর, ক্রমে খুব ঘনীভূত কর। অবশেষে একটা সাদা মূর্ত্তি কল্পনাতে নিষ্পন্ন হইল। হিন্দুস্থান উহাকে সরস্বতী নাম দিল এবং ঐ ঘন শুভ্র প্রতিমাকে প্রণাম করিল। আমরা ব্রাহ্ম হইয়া যোগবলে জড় প্রতিমাকে উড়াইয়া দিলাম. কিন্তু উহার মধ্যে নিরাকার বিধাতে

দেখিয়া বলিলাম ;—"হে নিরাকারা বাগ্দেবী সরস্বতী, তোমাকে প্রণাম করি।" ব্রাহ্মের সরস্বতী বাহিরের ক্ষুদ্র প্রতিমা নহে, কিন্তু সেই অপূর্ব্ব শুভ্র জ্ঞান জ্যোতি যাহা অনন্ত আকাশে বিস্তৃত রহিয়াছে। অনন্ত আকাশ ব্যাপিনী সরস্বতী। পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে, উত্তর হইতে দক্ষিণে, যোগ চক্ষে যে দিকে তাকাও সেই দিকে এই ত্রিভুবন ব্যাপিনী ত্রিভুবনেশ্বরীকে দেখিতে পাইবে। এই অনন্ত সরস্বতী বাগ্দেবী ব্রাহ্মদিগের পূজনীয় স্তবনীয় দেবতা। ইহাঁর অর্চ্চনা না করিলে জীবের মূঢ়তা এবং অবিদ্যার অন্ধকার বিদূরিত হয় না। ইহাঁর শরণাপন্ন হইয়া জীব অজ্ঞান তিমির হইতে মুক্তি লাভ করে। ইনিই জ্ঞান দান করেন, ইনিই সদুপদেশ দিয়া ভ্রম ও অসত্য বিনাশ করেন। ইনি যেমন বিদ্যাদায়িনী জ্ঞানদেবী তেমনি সুমধুর বীণাধারিণী সঙ্গীতের দেবী। সদ্‌গুরু হইয়া ইনি সত্য শিক্ষা দেন, ইহার স্বরও অতি সুমিষ্ট। ইঁহার প্রত্যেক কথা সার সত্য গর্ভ এবং মধুর ও কোমল, সুললিত সঙ্গীত অপেক্ষাও সুমধুর, ইহাঁর কণ্ঠ কোমল কণ্ঠ। যেমন ইহাঁর নির্ম্মল বিমল জ্ঞানের প্রভা দেখিলে মন আলোকিত হয় তেমনি ইহাঁর কোমল কণ্ঠের সুস্বর শুনিলে প্রাণ বিমোহিত হয়। ইনি জ্ঞানের ঈশ্বর, সুরেরও ঈশ্বর। ইনি সর্ব্বদা জ্ঞানের কথা বলেন এবং ইহাঁর প্রত্যেক কথা অমৃতের ন্যায়। ইনি বাগ্দেবী সুরেশ্বরী। ইনি অনন্ত ব্রহ্মের একটি স্বরূপ। ইনি জগজ্জননীর প্রকৃতির এক অংশ। কেহ কেহ ভ্রমাচ্ছন্ন হইয়া সরস্বতীকে সাকার মূর্ত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া আমরা কি মূল সরস্বতী ব্রহ্ম প্রকৃতিকে অস্বীকার করিব? শাখার দোষ বলিয়া মূল পরিত্যাগ করিব কেন? নদী বিষাক্ত হইয়াছে বলিয়া যে হিমালয় হইতে নদী বিনিঃসৃত হইতেছে আমরা সেই হিমালয়কে অগ্রাহ্য করিতে পারি না। যখন এ দেশে মূর্ত্তি সরস্বতী সৃষ্ট হয় নাই তখনও অনন্ত ব্রহ্মের মধ্যে নিরাকারা সরস্বতী বাস করিতেছিলেন। নিরাকাদিনী সরস্বতী সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন। ব্রহ্মের হৃদয়-বাসিনী বাগ্দেবী সরস্বতীর মুখ হইতে সর্ব্ব প্রথমে সৃষ্টির আজ্ঞা বাহির হইল তৎক্ষণাৎ উহা হইতে বিশ্ব সৃষ্ট হইল। তখন অবধি আজ পর্য্যন্ত তিনি অনন্তকাল বিশ্রান্ত বাক্য বলিয়া আসিতেছেন। তাঁহার বাক্যের বিরাম নাই।

কি দিবসে, কি রজনীতে তিনি অনবরত বাক্য বলিতেছেন। সরস্বতীর জিহ্বার বিশ্রাম নাই, এবং তাঁহার বীণাও অবিশ্রান্ত বাজিতেছে। বীণাপণির সাধকগণ, যখনই তোমরা কাণ পাতিবে তখনই তোমরা সরস্বতীর বাক্য এবং সঙ্গীত শুনিতে পাইবে। যদি জ্ঞান চাও, যদি নূতন নূতন সত্য শিখিতে চাও, সরস্বতীর বাক্য শ্রবণ কর। যদি প্রাণের মধ্যে গভীর আরাম চাও তবে তাঁহার শান্তিপ্রদ সুললিত সঙ্গীত শ্রবণ কর। সরস্বতীর জিহ্বা হইতে যে সকল বাক্য নিসৃত হইতেছে তাহা জ্ঞান এবং শান্তি উভয়ই দান করে। হে ব্রাহ্ম, তুমি কদাপি মনে করিও না যে তোমার ব্রহ্মের জিহ্বা নাই। তাঁহার এক অনন্ত আকাশব্যাপী জিহ্বা আছে। সেই জিহ্বা দ্বারা ঈশ্বর অনন্ত আকাশে অনন্ত কাল অসংখ্য ভাষায় অসংখ্য কথা বলিতেছেন, এবং জীবের হিতের নিমিত্ত যোগ ভক্তি প্রভৃতি বিচিত্রতত্ব প্রকাশ করিতেছেন। ব্রাহ্ম, যখন তুমি স্বীকার কর যে তোমার ঈশ্বরের শুনিবার শক্তি অর্থাৎ কান আছে তুমি কিরূপে বলিবে যে তাঁহার কথা বলিবার শক্তি অর্থাৎ মুখ নাই? যিনি তোমার শত শত প্রার্থনা শুনিতে পারেন তাঁহার কি প্রার্থনার উত্তর দিবার ক্ষমতা নাই? কি ভয়ানক অসঙ্গত কথা! যাঁহার কান আছে নিশ্চয়ই তাঁহার জিহ্বাও আছে। কেহ কেহ বলেন ইহাতে সাকার দোষ পড়ে। কখনই না। যদি ব্রহ্ম কান বিনা শ্রবণ করেন তিনি কি জিহ্বা বিনা, মুখ বিনা কথা কহিতে পারেন না? যদি তুমি বিশ্বাস কর যে তোমার ঈশ্বর শ্রবণহীন হইয়াও তোমার সুদীর্ঘ প্রার্থনা সকল শ্রবণ করেন, তবে ইহা কেন বিশ্বাস কর না যে জিহ্বাবিহীন হইয়াও তিনি তোমার প্রার্থনার উত্তর দিতে পারেন? শুনিতে পারেন বলিয়া তিনি সাকার হইলেন না, তবে বলিতে পারেন বলিয়া কেন সাকার হইবেন? যদি ঈশ্বরের উত্তর দিবার ক্ষমতা না থাকে তবে তাঁহার প্রার্থনাদি শুনিবার প্রয়োজন কি? শুনিবার যন্ত্র শ্রবণেন্দ্রিয় নাই অথচ ঈশ্বর আমাদের সকল কথা শুনিতেছেন সেইরূপ তাঁহার বাক্য বলিবার যন্ত্র নাই অথচ অনবরত বাক্য বলিতেছেন। তাঁহার বক্তৃতা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হইয়াছে, কবে শেষ হইবে কেহ জানে না। ব্রহ্ম-

বাণীর শেষ নাই। মানুষ অর্দ্ধ ঘণ্টা কি পাঁচ ঘণ্টা বক্তৃতা করে এবং তাহার পর অবসন্ন হইয়া পড়ে; কিন্তু ঈশ্বর অনন্তকাল অবিশ্রান্ত বক্তৃতা করিতেছেন, এবং কত কোটি ভাষায় কোটিভাবে বক্তৃতা করেন তাহার সংখ্যা নাই। তিনি প্রত্যেক জাতির সঙ্গে সেই জাতীয় ভাষায় কথা কহিতেছেন। তিনি জ্ঞানী মূর্খ, ধনী দীন, পাপী সাধু সকলের সঙ্গে প্রতি জনের উপযোগী বিভিন্ন ভাষায় কথা কহিতেছেন। তিনি সকল ভাষা জানেন। তাঁহার অজানিত কোন বিদ্যা কিম্বা কোন ভাষা নাই। আমাদের ব্রহ্মের মুখ হইতে অসংখ্য বেদ বেদান্ত, অসংখ্য পুরাণ কোরাণ নিয়ত বাহির হইতেছে। আমাদের ঈশ্বরের ধর্ম্মশাস্ত্র কত কে জানে? খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ের এক বাইবেল্, মুসলমানদিগের এক কোরাণ; কিন্তু আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র কত তাহার সংখ্যা নাই। কেননা আমাদের ঈশ্বর অবিরত কথা কহিতেছেন, তাঁহার কথার বিরাম নাই, সুতরাং আমাদের বেদ বেদান্তেরও অন্ত নাই। প্রতি বর্ষে প্রতি মাসে প্রতি পক্ষে প্রতি দিনে প্রতি ঘণ্টায় প্রতি মিনিটে সেই সদ্গুরু উপদেশ আদেশ ও প্রত্যাদেশ বিধান করিতেছেন এবং প্রত্যেক জীবের জন্য বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচার করিতেছেন। তিনি অহর্নিশি তোমাকে তোমার মত, আমাকে আমার উপযোগী, অপর একজনকে তাহার প্রয়োজনীয় কথা বলিতেছেন। মনে করিয়া দেখ কত কোটি কথা ও কত প্রকার কথা তাঁহার বলিতে হয়। ঠিক মানুষ যেমন বক্তৃতা করে তেমনি আমাদিগের জননী বাগ্‌দেবী সরস্বতী অনন্ত আকাশরূপ বেদীর উপরে বসিয়া সুমিষ্ট ভাষায় কত উপদেশ দিতেছেন। তাঁহার ন্যায় এমন সুবক্তা, এমন উৎকৃষ্ট আচার্য্য, এমন সদ্গুরু আর কেহ নাই। তাঁহার বেদীর চারিদিকে বসিয়া কোটি কোটি শিষ্য তাঁহার বক্তৃতা শুনিতেছে। ইহা কল্পনা নহে, ইহা কবিত্বের কথা নহে; কিন্তু সত্য সত্যই অগণ্য যোগী ঋষি, অগণ্য সাধু ভক্ত, অগণ্য বৈরাগী সন্ন্যাসী সেই অনন্ত আচার্য্যের সুমধুর উপদেশ শুনিতেছেন। অনন্ত আকাশ সিংহাসনে বসিয়া এক প্রকাণ্ড প্রবক্তা, এক বৃহৎ গুরু বক্তৃতা করিয়া বলিতেছেন;— "চোর চুরী করিস্ না, স্বেচ্ছাচারী স্বেচ্ছাচার করিস্না। সংসারী সংসারে ডুবিস্ না, অবিশ্বাসী অবিশ্বাস করিস্ না। ব্রাহ্ম, যোগ সাধন কর, প্রেমিক

একেবারে ভক্তিরসে প্রাণকে নিমগ্ন কর।” এইরূপে ব্রহ্ম নানা ভাষাতে নানা প্রকার বিধি নিষেধ পূর্ণ উপদেশ দিতেছেন। ব্রহ্মের উপদেশ কখন থামে না, তাঁহার বক্তৃতা অবিরাম হইতেছে, কেবল বিবেক কর্ণ পাতিলেই শুনা যায়। কি মধ্যাহ্নকালে কি নিশীথে যখন ইচ্ছা কর তখনই তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে পাইবে। তুমি অবসন্ন হইতে পার; আর শুনিতে পার না বলিয়া কাণ বন্ধ করিতে পার; কিন্তু ব্রহ্মের বাক্য সমীরণ ক্রমাগত চলিতেছে। শ্রোতাদিগের ক্লান্তি হয়; কিন্তু বক্তার শ্রান্তি হয় না। শ্রোতা থাকুক আর না থাকুক বাক্যস্বরূপ ব্রহ্ম, বাগ্দেবী সরস্বতী অবিশ্রান্ত বক্তৃতা করিতেছেন। কেননা বক্তৃতা করাই তাঁহার স্বভাব। বাক্যস্বরূপ কিরূপে বাক্যবিহীন হইয়া থাকিবেন? এমন নিত্য বাগীশ্বরী মধুর ভাষিণী সরস্বতী আর কি কোথাও দেখিয়াছ? ব্রহ্মমুখ হইতে জীবন্ত জ্ঞান স্রোত বিনিঃসৃত হইয়া জীবের অজ্ঞান জঞ্জাল দূর করিতেছে। সরস্বতীর নির্ম্মলমুখ হইতে সত্যজ্যোতি বিকীর্ণ হইয়া সাধকদিগের মনের অন্ধকার বিনাশ করিতেছে। কি তেজস্বী বক্তা! অনেক মানুষের বক্তৃতা শুনিলাম, কিন্তু ব্রহ্মের বক্তৃতার ন্যায় এমন জীবন্ত জ্বলন্ত বক্তৃতা আর কোথাও শুনিনাই। জ্ঞানস্বরূপা সরস্বতী ক্রমাগত বিচিত্র জ্ঞানতত্ত্ব প্রসব করিতেছেন। মনুষ্য মনে যত সত্য যত ভাবের বিমল কিরণ প্রকাশিত হয়, তৎসমুদায় সরস্বতীর জ্যোতি। ব্রহ্ম ছাড়া সকলই অজ্ঞান এবং অবিদ্যা, সরস্বতী ছাড়া সকলই দুষ্টবুদ্ধি এবং দুর্ম্মতি। স্বয়ং ব্রহ্ম অনন্ত সরস্বতী হইয়া মনুষ্যের মনে দিব্য জ্ঞানালোক জ্বালিয়া দেন এবং মধুর সঙ্গীতচ্ছলে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দেন। জীবকে মোহজাল এবং অবিদ্যার অন্ধকার হইতে উদ্ধার করিবার জন্য স্বয়ং ঈশ্বর জ্ঞানরূপে, বিদ্যারূপে, বাগ্দেবী সরস্বতীরূপে তাহার অন্তরে অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে সকল বিষয়ে সৎপরামর্শ দান করেন। তিনি স্বয়ং সত্য রূপে সুবুদ্ধি ও সুমতি রূপে মানব হৃদয়ে অবতীর্ণ হন। সত্য কেবল দেবদত্ত নহে, সত্যই দেবস্বরূপ এবং আরাধ্য বস্তু। তোমাদের মনের সুনীতি সুমতি কে তাহা জান? তাহারাই স্বয়ং সরস্বতী এবং তোমাদের বরণীয়। যত কিছু শুভ জ্ঞান ও শুভ ভাব তোমাদের অন্তরে আসিতেছে সে সমুদায় বাগ্দেবীর মুখের কথা। জল

স্রোতের ন্যায় দিন রাত্রি উহা মনুষ্য মনে কল কল রবে ধাবিত হইতেছে, উহার শেষ নাই। ব্রহ্ম কথকের কথা আর শেষ হয় না। দশ বৎসর পঞ্চাশ বৎসর যত বৎসর ইচ্ছা কর তাঁহার কথকতা অন্তরে শুনিতে পার। তাঁহার মুখে নিত্য ভাগবত নিত্য মহাভারত শুন, তিনি আহ্লাদের সহিত শুনাইবেন। তিনি নূতন নূতন ঋক্, যজু, সাম অথর্ব্ব, নূতন বেদ বেদান্ত এবং নূতন পুরাণ তন্ত্রাদি শুনাইবেন। ইংরাজী সংস্কৃত যে কোন ভাষায় উপদেশ শুনিতে ইচ্ছা কর সেই ভাষায় তিনি উপদেশ দিবেন। পর্ব্বত শিখরে নদীতটে গৃহে কাননে যেখানে ইচ্ছা সেইখানে শিক্ষা দিবেন। প্রেমতত্ত্ব জ্ঞানতত্ত্ব যোগতত্ত্ব নীতিতত্ত্ব যাহা চাও তাহাই তিনি শিক্ষা দিবেন। তাঁহার মুখে যে উপদেশ শুনিবে তাহাতে বিন্দুমাত্র ভ্রান্তির আশঙ্কা করিবে না। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বোত্তম জ্ঞান, অভ্রান্ত পরা বিদ্যা তাঁহারই নিকটে পাইবে। সে জ্ঞান কঠোর নহে, অতিশয় সুমিষ্ট। বাগীশ্বরী একটিও কর্কশ কথা বলেন না, বলিতে পারেন না। কোমল নারী-কণ্ঠ হইতে কর্কশ রূঢ় কথা কিরূপে বাহির হইবে? চিত্তহারী চৈতন্য-স্বরূপ হরির কথা পাঁচ মিনিট শ্রবণ করিলে প্রাণ মন বিমোহিত হয়। যখন হরির কথা শুনি তখন মনে হয় ঠিক যেন হরি সপ্তস্বর সংযোগ করিয়া বীণা বাজাইতেছেন। হরির গলা এমনি মিষ্ট। যিনি ভাল তাঁহার সকলি মিষ্ট, কথাগুলি পর্য্যন্ত যেন মধুমাখা। যখন বিবেক এবং ভক্তি কর্ণে ব্রহ্মবাণী শুনি তখন বলি,—"হে ঈশ্বর, তুমি কি গান করিতেছ না বক্তৃতা করিতেছ?" বাস্তবিক সুরেশ্বরীর সকল কথা সঙ্গীতের ন্যায় সুস্বর ও সুমধুর। তাঁহার সমুদয় বেদ, সামবেদ সুললিত ছন্দে বিরচিত এবং সুমিষ্ট সুর তান, সুকোমল রাগ রাগিণীতে সংযুক্ত। হে ব্রাহ্মগণ তোমরা এই বাগ্দেবীর পূজা অর্চ্চনা কর এবং ইহাঁর কথামৃত পান করিয়া প্রাণকে শীতল কর। ব্রহ্মের তেত্রিশ কোটি রূপের মধ্যে এই এক সরস্বতী রূপ, অর্থাৎ বিদ্যারূপ, তোমরা আদর ও যত্নের সহিত সাধন কর। তোমরা তোমাদিগের প্রাণ মন্দিরে জ্ঞানাসনে বসাইয়া এই অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম, এই অনন্ত চিন্ময়ী সরস্বতীর পূজা কর। নিয়ত তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া জ্ঞান ও সুবুদ্ধি সঞ্চয় কর।

আচার্য্যের উপদেশ।

লক্ষ্মীশ্রী।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ৪ ঠা শ্রাবণ, ১৮০২ শক।

তোমরা কি কখনও কাচের টাকা ব্যবহার করিয়াছ? তোমরা এই পৃথিবীতে এত দিন আছ কখন কি কাচের অন্ন খাইয়াছ? যদি কাচের টাকা দেখিতে, যদি কাচের অন্ন খাইতে তাহা হইলে এই পৃথিবীতে ধন ধান্যের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে পাইতে। এক প্রকার টাকা আছে যাহা স্বচ্ছ নহে, তাহাতে দেশের রাজা কিম্বা রাণীর মুখ অঙ্কিত থাকে। আর এক প্রকার টাকা আছে যাহাতে বিশ্বমাতা ভুবনেশ্বরী যিনি, তাঁহার মুখ লেখা আছে। পূর্ব্বোক্ত টাকা হস্তে স্পর্শ করিলে হস্ত বিষাক্ত হয়, মনে হয় যেন কি দুষ্কর্ম্ম করিলাম। আর শেষোক্ত টাকা হাতে করিলে শরীর শুদ্ধ হয়। ঈশ্বর প্রদত্ত ধন পবিত্র ধন, সেই ধন স্পর্শমাত্র শরীর মনে পুণ্যের সঞ্চার হয়। এক প্রকার অন্ন আছে যাহা রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র জ্ঞানী মূর্খ সকলেই খায়, সেই অন্ন খাইলে শরীর সবল হয়; কিন্তু শরীরের বলের সঙ্গে সঙ্গে বিলাস ও সুখস্পৃহা বৃদ্ধি হয়। সংসারী ব্যক্তিরা কেবল উদর পূরণের জন্য ও ভোগস্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্য সেই অন্ন আহার করে। আর এক প্রকার অন্ন আছে যাহা হাতে করিবা মাত্র শরীর পবিত্র হয় এবং যাহার মধ্যে স্বয়ং লক্ষ্মীর আবির্ভাব অনুভূত হয়। সেই অন্নে লক্ষ্মী নাম অঙ্কিত থাকে এবং তাহার মধ্যে লক্ষ্মীশ্রী দেখা যায়। যখনই ভক্তির সহিত সেই অন্ন মুখে দেওয়া যায় তখনই আঃ বলিয়া শরীর মন জুড়াই। সেই অন্ন আহার করিলে দেহ মধ্যে ব্রহ্মতেজ উৎপন্ন

হয় এবং এরূপ স্বর্গীয় উৎসাহে মন উদ্দীপ্ত হয় যে বোধ হয় যেন স্বর্গের আগুন শরীর মনের মধ্যে জ্বলিতেছে। একটি চাল খাইলেই সমস্ত রক্ত পবিত্র হয় এবং সেই রক্ত এমনই উষ্ণ হইয়া উঠে যে ইচ্ছা হয় এখনই সৎকার্য্য করি, সমস্ত দিন প্রাণপণে পরিশ্রম করি এবং ব্রহ্মের আজ্ঞা পালন করি। হে ব্রহ্মসাধকগণ, যদি তোমরা এই রূপ কাচের ন্যায় স্বচ্ছ টাকা এবং কাচের ন্যায় স্বচ্ছ অন্ন ব্যবহার কর তাহা হইলে অতি সহজে তোমরা ব্রহ্ম ধামে যাইতে পারিবে। যদি অন্য প্রকার টাকা এবং অন্ন ব্যবহার কর তাহা হইলে তোমাদের অধোগতি হইবে। সংসারের দ্রব্যাদি ব্যবহার করিবার সময় নিরীক্ষণ করিয়া দেখিবে উহা স্বচ্ছ কি না এবং উহার ভিতর লক্ষ্মী মূর্ত্তি দেখা যায় কি না। যদি দেখা যায় উহা ব্যবহার করিবে। যে বস্তুতে ঈশ্বরকে দেখা যায় না তদ্‌ব্যবহারে মহা অনিষ্ট। কেহ কেহ মনে করেন টাকা স্পর্শ করা কিম্বা স্ত্রীর মুখ দর্শন করা পাপ, সংসার নরক এবং শ্মশান বৈকুণ্ঠ। এই মতানুসারে যেখানে গৃহস্থেরা সুখে বাস করে, যেখানে কুবেরের ধন সম্পত্তি, যেখানে রাজার রাজভাণ্ডার সেখানেই অসুরের বাসস্থান, অতএব জনসমাজ পরিত্যাগ করিয়া নির্জন গহন বনে গমন করিয়া ধর্ম্মসাধন করা, সমস্ত দিন উপবাস ও শরীরকে নির্যাতন করিয়া কঠোর তপস্যা করা আবশ্যক। যোগী ঋষি অথবা তপস্বী হইতে হইলে শরীরকে জীর্ণ শীর্ণ করিতে হইবে। এই সন্ন্যাস ধর্ম্মে শরীর পতনই মন্ত্রের সাধন। এই ভ্রান্তমত ছেদন করিবার জন্য বর্ত্তমান সময়ে নববিধানের অভ্যুদয়। নববিধান এইরূপ বিশ্বাস করেন যে ধন ধান্য এবং সংসারের সমুদয় বস্তুর মধ্যে ঈশ্বরের সিংহাসন বিরাজিত। সংসারশ্রীতে ইনি লক্ষ্মীশ্রী দেখেন। নববিধানের লোক হইয়া তোমরা কোন মতেই ধন ধান্যকে ঘৃণা করিতে পার না, সাংসারিক সুখ সম্পদকে অপবিত্র মনে করিতে পার না। ধন ধান্য সকল লক্ষ্মীর হস্তের দান। যেমন ব্রহ্মমন্দিরে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মমন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পরাৎপর ব্রহ্মের পূজা করিতেছ, তেমনি সংসারে প্রবেশ করিয়া ধনধান্যদায়িনী সংসারের কর্ত্রী গৃহদেবী শ্রীশ্রীলক্ষ্মীর পূজা করিবে। যে দেবতা এই ব্রহ্মমন্দিরে তোমাদিগের পূজা গ্রহণ

করেন, ইনিই তোমাদের প্রতি জনের গৃহে গৃহলক্ষ্মী হইয়া বাস করিতেছেন। যিনি আমাদিগকে আহার করাইবার জন্য পৃথিবীকে উর্ব্বরা এবং প্রচুর শস্যশালিনী করিলেন এবং নানাবিধ সুখ ঐশ্বর্য্যে সুসজ্জিত করিলেন তিনি কি আমাদিগের জন্য উপবাস বিধি প্রচার করিতে পারেন? উপবাসের ধর্ম্ম বাস্তবিক উপহাসের ধর্ম্ম। যিনি অন্ন সৃজন করিলেন তাঁহার কি ইচ্ছা নহে যে আমরা সেই অন্ন আহার করি? যিনি অন্নদা অন্নপূর্ণা তিনি কি অন্নকে বিষ নয়নে দেখিতে পারেন? তোমরা কি মনে কর যেখানে লোকালয় নাই, যেখানে শ্মশান, যেখানে ভীষণ মৃত্যু মনুষ্যের হাড় লইয়া ঘোর অন্ধকারের সহিত ক্রীড়া করিতেছে, যেখানে কেবল শোক এবং ভয়, সেখানেই কেবল যোগেশ্বর মহাদেব বাস করেন? তিনি কি সংসারকে ঘৃণা করেন? মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব শ্মশানবাসী এবং শ্মশান মধ্যে সাধকদিগকে বৈরাগ্য শিক্ষা দেন ইহা সত্য; কিন্তু তিনি কেবল শ্মশানবাসী নহেন, তিনি আবার পরিবার মধ্যে গৃহদেবতা হইয়া সন্তান পালন ও সংসার নির্ব্বাহ করেন। দ্বিমূর্ত্তি ঈশ্বরের এক দিকে ঘোর সন্ন্যাসীর মুখ, অপর দিকে ঘোর সংসারীর মুখ। তিনি এক ভাবে বৈরাগী উদাসীন সন্ন্যাসীদিগকে সঙ্গে লইয়া শ্মশান মসানে, বন উপবনে, পাহাড় উপত্যকায় এবং নদ নদী তটে বেড়াইতেছেন। আর এক ভাবে লক্ষ্মীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া লোকেশ্বরী হইয়া লোকালয়ে বাস করিতেছেন। আমাদের প্রাণের হরি যেমন নির্ব্বিপ্ত সন্ন্যাসী তেমনি ব্যস্ত সংসারী। যিনি জীবকে বৈরাগ্য শিক্ষা দেন তিনিই তাহাকে গৃহধর্ম্ম শিক্ষা দেন। তিনি সামান্য সংসারী নহেন। এক একবার জাগ্রৎ হইয়া সংসারে আসেন ও আবশ্যক মত দুই একটি কার্য্য করেন এমত নহে। তিনি ঘোর সংসারী, সমুদায় সৃষ্টি তিনি রক্ষা করিতেছেন। কোটি কোটি জীব তাঁহার সংসারে, নিয়ত তাহাদিগকে তিনি পালন করিতেছেন। তিনি যেমন সংসারে ডুবিয়া আছেন এমন আর কেহই ডুবিতে পারে নাই। হে ক্ষীণ বিশ্বাসী, হয়ত তুমি মনে কর মহেশ্বর কেবল কৈলাস শিখরে অথবা শ্মশানে একাকী বাস করেন, লোকালয় তাঁহার অগম্য। তিনি ভূগোল পাঠ করেন নাই, পৃথিবীতে অন্যান্য স্থান যে আছে তাহা

তিনি জানেন না, যেখানে যোগী সন্ন্যাসীরা তাঁহাকে আরাধনা করে কেবল সেই স্থানই তিনি জানেন এবং সেখানেই থাকেন! বিরলে বসিয়া যুগ যুগান্তরে এক আধখানি বেদ বেদান্ত বাইবেল কোরাণ ভাগবৎ পুরাণ লেখেন এতৎব্যতীত তিনি আর কিছুই জানেন না আর কিছু করেন না! সংসারের কোন শাস্ত্র তিনি পড়েন নাই, সুতরাং বিষয় কর্ম্ম কিছুই জানেন না! অল্প বিশ্বাসী মনুষ্য, তোমার ভ্রান্ত বুদ্ধি কিরূপে ইহা কল্পনা করিল যে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর সংসার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ? তুমি মনে কর ঈশ্বর বাণিজ্য ব্যবসায় বুঝেন না, টাকা কড়ির হিসাব রাখিতে পারেন না অথবা দেশে দুর্ভিক্ষ হইলে কিরূপে প্রতিবিধান করিতে হয় তাহা তিনি জানেন না। তুমি ইহাও সিদ্ধান্ত করিয়াছ যে জল কষ্ট কি অন্ন কষ্টে কোন দেশ জর্জ্জরিত হইয়া যদি তাঁহার নিকট আসিয়া প্রতিবিধানের উপায় জিজ্ঞাসা করে তাহা হইলে ব্রহ্ম সরল অন্তরে তাহাকে এই উত্তর দিবেন;—"আমি বেদ বেদান্ত প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র জানি কিন্তু রাজ্যপালন সম্বন্ধীয় নিগূঢ় তত্ত্ব আমি কিছুই বুঝি না। কিসে জলকষ্ট বা দুর্ভিক্ষ নিবারণ হয় তাহা আমি জানি না। এ সকল সাংসারিক বিষয়ে আমি সৎপরামর্শ দিতে পারি না।" অনেকের এরূপ প্রতীতি হইয়াছে যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে সুশিক্ষিত মনে যে সকল সন্দেহ উত্থিত হয় তাহা সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের পুস্তক পাঠ না করিলে মীমাংসিত হয় না এবং জগদীশ্বর যিনি কেবল বিশ্বাস ও ভক্তি বুঝিতে পারেন তিনি এ সকল বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান দিতে পারেন না। হে বিভ্রান্ত বিষয়ী মানব, তুমি মনে কর যদি ঈশ্বরকে সংসারের কোন ভার দেওয়া যায় নিশ্চয়ই তিনি বিপদ ঘটাইবেন। তোমার কল্পিত ঈশ্বর সংসার চালাইতে অক্ষম, তাঁহাকে যদি বাজারের ভার দাও তিনি হয়ত কাষ্ঠ আনিতে গিয়া লবণ আনিবেন না অথবা তণ্ডুল ক্রয় করিতে গিয়া ঘৃত ও তৈল আনিতে ভুলিবেন। কিম্বা হয়তো অল্প মূল্যের সামগ্রী অনেক মূল্যে ক্রয় করিয়া ঠকিয়া আসিবেন, অথবা বাজারে ভাল সামগ্রী বাছিয়া কিনিতে পারিবেন না। বাস্তবিক অল্প বিশ্বাসী মানুষ মনে করে ঈশ্বর জীবকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে পারেন, পরিত্রাণ করিতে পারেন; কিন্তু তিনি সংসারের বিষয় কিছুই বুঝেন না; সাংসারিক বিষয়ে মনুষ্যেরই জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা অধিক।

এইরূপ ভ্রমান্ধ হইয়া কত অবিশ্বাসী মানুষ আপন ভাণ্ডারের চাবি ও সংসারের ভার আপনার হস্তে রাখে। দেব হস্তে কেবল আত্মার ভার অর্পণ করে। তাহাদিগের মতে ঈশ্বর কেবল নিমতলার শ্মশান ঘাটে কতক গুলি বৈরাগী ও সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গে থাকেন, আর কোন স্থানে তাঁহার গতি নাই। কল্পিত সন্ন্যাসী শ্মশানবাসী দেবতার উপাসকেরা এইরূপে ধর্ম্মকে উপহাসের বিষয় করে। কিন্তু ঈশ্বরের যথার্থ ধর্ম্ম, নব বিধানের ধর্ম্ম অন্য প্রকার। ধর্ম্ম কেবল শবসাধন ও ভস্ম লেপন নহে. গৈরিক ও কমণ্ডলু ইহার সার নহে। ইহার সাধন ক্ষেত্র শ্মশানেবদ্ধ নহে। কিন্তু সংসারের প্রত্যেক ব্যাপারে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। সংসারের প্রত্যেক পদার্থ মধ্যে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান। বিশ্বাস চক্ষে দেখিলে সংসারের যাবতীয় বস্তু কাচের ন্যায় স্বচ্ছ হইয়া স্পষ্টরূপে লক্ষ্মীকে প্রকাশিত করে। যেমন কাচের আচ্ছাদনে সুন্দর মূর্ত্তি সকল ঢাকা থাকে সেই রূপ প্রত্যেক পদার্থরূপ স্বচ্ছ কাচের মধ্যে জগজ্জননী লক্ষ্মী বাস করিতেছেন। কি অন্ন বস্ত্রে, কি শয্যা পর্য্যঙ্কে, কি তৈজসাদিতে, সংসারের সকল দ্রব্যে মা লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন। শরীরের রক্তের মধ্যে, সুস্থতা বলের মধ্যে, সুখ সম্পদের মধ্যে লক্ষ্মী নৃত্য করিতেছেন। গৃহ স্বামীর ধন মান বিভবের মধ্যে, গৃহ কর্ত্রীর সৌন্দর্য্য অলঙ্কারের মধ্যে, দাস দাসী অশ্ব রথ মধ্যে স্বয়ং লক্ষ্মী আপনার শ্রী প্রকাশ করেন। স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডপতি ঈশ্বর লক্ষ্মী রূপে প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে বাস করিতেছেন এবং দিবা নিশি সংসারের ক্ষুদ্রতম কার্য্য পর্য্যন্ত স্বহস্তে নির্ব্বাহ করিতেছেন এবং তাবৎ প্রয়োজনীয় বস্তু বিধান করিতেছেন। জগজ্জননী নিজে তাঁহার সন্তানের গৃহে পরিচারিকা হইয়া সেবা করিতেছেন। ভক্ত তাঁহার সংসারের যে কোন বস্তুর উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন সেই বস্তুর মধ্যেই লক্ষ্মীর সিংহাসন দেখিতে পান। সুতরাং সকল বস্তুকেই তিনি পবিত্র মনে করেন। লক্ষ্মী যদি এক মুষ্টি অন্ন দেন তাহা তিনি আদরের সহিত গ্রহণ করিবেন এবং কোটি টাকা অশ্ব গজ যদি দেন, তাহাও আদরের সহিত লক্ষ্মীর দান বলিয়া গ্রহণ করিবেন। লক্ষ্মীর ভক্তসন্তান লক্ষ্মীর দেওয়া গাড়ীর উপরে চড়িয়া দেখিলেন স্বয়ং লক্ষ্মী স্বহস্তে সেই গাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং স্বয়ং সারথির কর্ম্ম

করিতেছেন। ভক্ত তখনি গলবস্ত্র হইয়া বলিলেন "মা লক্ষ্মী তোমাকে প্রণাম।" এই বলিয়া সেই রথে চড়িয়া লক্ষ্মীর বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। লক্ষ্মীর গাড়ীতে চড়িলে নিশ্চয়ই লক্ষ্মীর বাড়ীতে যাইবে। কিন্তু যদি এক খানি বিলাসের গাড়ী নিজে নির্ম্মাণ করিয়া সেই লক্ষ্মীছাড়া নিরীশ্বর গাড়ীতে আরোহণ কর তাহা হইলে নিশ্চিৎ নরকের দিকে গতি হইবে। লক্ষ্মীদত্ত লক্ষ্মী নামাঙ্কিত হাজার টাকার শাল গায়ে দাও, তাহার প্রত্যেক পশমের ভিতর হইতে পবিত্রতা তোমার অঙ্গে প্রবেশ করিবে। আর যদি লক্ষ্মী-বিহীন ঈশ্বরবিহীন সাল ব্যবহার কর তাহাতে মন অহঙ্কৃত ইন্দ্রিয়াসক্ত এবং অপবিত্র হইবে। কেহ সাল পরিয়া যমালয়ে যায়। কেহ রাজর্ষিদের ন্যায় ঐ গাত্রাবরণ পরিধান করিয়া উহার মধ্যে লক্ষ্মীর আবির্ভাব অনুভব করেন। হে সাধক, তোমার কি বাড়ী প্রস্তুত করিতে হইবে? তুমি লক্ষ্মীর হাতে ভার দাও। পৃথিবীতে অনেক গৃহ নির্ম্মাতা আছে; কিন্তু সাবধান তুমি কদাপি মানুষের নির্ম্মিত বাড়ীতে বাস করিবে না। লক্ষ্মীর বাড়ীতে যাইবে, লক্ষ্মীর সংসারে থাকিবে। সেই বাড়ীর প্রত্যেক ইটের মধ্যে লক্ষ্মীর নাম অঙ্কিত দেখিবে। কেন না স্বয়ং লক্ষ্মীর হস্তে উহা নির্ম্মিত। তিনি কি বাটী নির্ম্মাণ করিতে জানেন? হাঁ, আমি বলিতেছি জানেন, খুব ভাল জানেন, আমাদের সকলের অপেক্ষা ভাল জানেন। কি প্রণালীতে গৃহ গঠন করা বিধেয়, কত টাকা লাগিবে, দালান যারণ্ডা কিরূপ হইবে, ভক্তের সমস্ত অভাব কিরূপে মোচন হইবে তৎসমুদায় ভক্তবৎসলা লক্ষ্মী যেমন জানেন এমন আর কে জানে? অতএব তাঁহাকে অনভিজ্ঞ মনে করিয়া নাস্তিক অহঙ্কারীর ন্যায় আপন হস্তে গৃহগঠনের ভার লইবে না, কিন্তু জননী লক্ষ্মীর উপর সে ভার ন্যস্ত করিবে। তিনি উপযুক্ত রূপে তোমার গৃহ নির্ম্মাণ করিবেন, সাজাইয়া দিবেন, রক্ষা করিবেন ও উহাকে ধর্ম্মের আলয় করিয়া দিবেন। লক্ষ্মী আহার দেন, লক্ষ্মী বাড়ী দেন, লক্ষ্মী সকল অভাব মোচন করেন। লক্ষ্মী তোমার অন্ন ব্যঞ্জন রাঁধিয়া দেন, লক্ষ্মী তোমার ঘর পরিষ্কার করেন, লক্ষ্মী তোমার ভাণ্ডার রক্ষা করেন, লক্ষ্মী তোমার শস্যক্ষেত্রে শস্য এবং তোমার বাগানে ফুল ফল উৎপাদন করেন, লক্ষ্মী তোমার জমিদারীর সুব্যবস্থা করেন। যিনি ব্রহ্মমন্দিরের দেবতা

তিনিই তোমার বাড়ীর লক্ষ্মী। গুরু হইয়া এখানে তোমাকে যোগ ভক্তি শিখাইলেন, বাটীতে গিয়া জননী রূপে তোমার সংসার পালন করিবেন। তাঁহাকে সমস্ত ভার দেও, তিনি যাহা করিবেন সকলই তোমার পক্ষে কল্যাণপ্রদ হইবে। ধনোপার্জ্জন, স্বাস্থ্য সাধন, বাণিজ্য ব্যবসায়, গৃহরক্ষা, সন্তান পালন প্রভৃতি সমুদায় কর্ম্মের ভার সেই সুদক্ষ গৃহদেবতার হস্তে অর্পণ কর, কুশল ও শান্তি পাইবে। লক্ষ্মী যে বিধি করেন তাহাই মঙ্গল বিধি। যাহা কিছু লক্ষ্মী দেন তাহাই তোমার কল্যাণের হেতু। করুণাময় ঈশ্বর, মঙ্গলময় বিধাতা কখনও আমাদের অমঙ্গলের জন্য সংসার স্থাপন করেন নাই। অন্ন, বস্ত্র, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু বান্ধব তিনি যাহা কিছু আমাদিগকে দিতেছেন সকলই আমাদের মঙ্গলের জন্য। কিসে আমার মঙ্গল, কিসে অমঙ্গল, সংসারের কোন্ কার্য্য করিলে আমার ভাল হইবে কোন্ কার্য্যে অনিষ্ট হইবে ইহা আমি জানি না, তিনি জানেন। সুতরাং তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া সমস্ত সংসার তাঁহার চরণ তলে রাখিতে হইবে। তিনি যোগি সন্ন্যাসীর ন্যায় নির্লিপ্ত এবং নির্ব্বিকার, সৃষ্ট কোন বস্তুর প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র আসক্তি নাই, তিনি সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী; কিন্তু সন্তানদের মঙ্গলের জন্য তিনি ঘোর সংসারীর ন্যায় গৃহদেবতা মা লক্ষ্মী হইয়া তাহাদিগকে আদর করিয়া পালন করেন এবং নানাপ্রকার সুন্দর ও সুমিষ্ট বস্তু সকল বিতরণ করেন। মা যেমন সুন্দররূপে সংসার নির্ব্বাহ করেন তেমন আর কেহই পারে না। মা যেমন সংসারী এমন আর কে আছে? তবে কেন হে ভক্ত, তুমি জগজ্জননীকে সংসারী বলিয়া গৃহ-লক্ষ্মী বলিয়া পূজা করিবে না, এবং সকল বিষয়ে কেন তাঁহার সদুপদেশ লইবে না? আত্মীয় বন্ধু এবং পরিবার প্রতিপালন করিবার জন্য যদি তোমার অর্থোপার্জ্জন করা আবশ্যক হয় ভক্তির সহিত লক্ষ্মীর পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া তাঁহার সৎপরামর্শ গ্রহণ করিবে। তোমার বিদ্যা বুদ্ধি তিনি সকলই জানেন এবং কিরূপে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলে তোমার ধর্ম্ম অর্থ দুই সঞ্চয় হইবে ইহা তিনি বুঝাইয়া দিবেন। কিরূপে আয় ব্যয় বিবরণ রাখিতে পার তাহাও স্বয়ং লক্ষ্মী শিখাইয়া দিবেন। তিনি বড় বড় সাহেব এবং পণ্ডিত শাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিতদিগের অপেক্ষাও ভাল হিসাব রাখিতে পারেন।

তোমার সংসারে যদি দ্রব্যাদি ভাল করিয়া সাজাইতে চাও লক্ষ্মীকে বলিও, তিনি তাহাও করিয়া দিবেন। লক্ষ্মীর সংসারে কোন প্রকার গোলমাল এবং বিশৃঙ্খলা থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মগণ, তোমাদিগের হিন্দু ভ্রাতা বিশ্বাস করেন যাঁহার সংসারে সুব্যবস্থা আছে তাঁহার সংসার লক্ষ্মীর সংসার এবং যে সংসারের সমস্ত বিশৃঙ্খল এবং শোভাহীন সে সংসার লক্ষ্মী-বিহীন। ব্রাহ্ম, তুমি সাকার লক্ষ্মী মান না এবং কোন কালে মানিবে না। মূর্ত্তি পূজা তোমার ধর্ম্মে নিষিদ্ধ। কিন্তু ঈশ্বরের ধন ধান্যদায়িনী কল্যাণ বিধায়িনী সন্তানপালনী শক্তি তুমি অস্বীকার করিতে পার না। সেই নিরা-কারা শক্তিই লক্ষ্মী। তুমি তাঁহার অপমান করিও না। লক্ষ্মীকে হিন্দু এত-দূর আদর করেন যে তাঁহাকে ঠাকুর ঘরে বদ্ধ না রাখিয়া প্রতি ঘরে তাঁহার পদচিহ্ন স্থাপন করেন। তিনি আলেপন দ্বারা প্রতি ঘরে লক্ষ্মী পদচিহ্ন চিত্রিত করেন এবং মনে করেন যে সংসারের দেবী সর্ব্ব ঘরে বেড়াইতেছেন। তোমরা বিশ্বাস কর যে সর্ব্বব্যাপী নিরাকার ব্রহ্ম লক্ষ্মীরূপে অর্থাৎ সাংসারিক শ্রীরূপে সকল ঘরে সকল বস্তুর মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। লক্ষ্মীর অর্থ শ্রী। হে ব্রাহ্ম হে ব্রাহ্মিকা তোমরা আপন আপন সংসার লক্ষ্মীর সংসার করিয়া লক্ষ্মীমান ও লক্ষ্মীমতী শ্রীমান্ ও শ্রীমতী হও। ব্রহ্মের লক্ষ্মীরূপ সাধন কর। পাপাসুর নাশিনী বিশ্বজননী মহাদেবী উভয় পার্শ্বে সরস্বতী ও লক্ষ্মীরূপ ধারণ করিয়া ভক্ত সংসারে অবতীর্ণ হন এবং ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। সরস্বতীরূপে তিনি তোমা-দিগকে জ্ঞান এবং বিদ্যা, লক্ষ্মীরূপে তিনি তোমাদিগকে সংসারের শ্রী সৌভাগ্য দান করিবেন। সাকার ভাব বিসর্জ্জন দিয়া নিরাকার ভাবে তোমরা ঈশ্বরের এই দুই প্রকৃতি গ্রহণ কর ও যত্নপূর্ব্বক সাধন কর। জগজ্জননী স্বয়ং লক্ষ্মী এবং সরস্বতী হইয়া তাঁহার প্রত্যেক সন্তানের হৃদয়ে বাস করিতেছেন। তিনি মা হইয়া বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিয়া সন্তানের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। অন্তরের অন্তরে সেই নিরাকারা সরস্বতী এবং লক্ষ্মীর পূজা করিয়া দিব্যজ্ঞান ও পরাবিদ্যা এবং নিত্য কল্যাণ ও শ্রী অর্জ্জন কর। সংসারের ভিতরে জগজ্জননী মা লক্ষ্মীর শ্রীচরণে শরণাগত হইয়া সপরিবারে শুদ্ধ এবং সুখী হও।

আচার্য্যের উপদেশ।

উদাসীন ব্রহ্ম।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ১১ই শ্রাবণ, ১৮০২ শক।

মনুষ্যপ্রকৃতি মহাদেবকে ব্যাঘ্রচর্ম্মে কেন আবৃত করে এবং তাঁহার জন্য সহরের বাহিরে, পর্ব্বতশৃঙ্গে, কৈলাসশিখরে কেন মন্দির নির্ম্মাণ করে? যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর তাঁহার বেশ কেন বৈরাগ্যবেশ হইল? মনুষ্য বিলক্ষণ জানে যে সর্ব্বারাধ্য ভগবান্ সমস্ত বিশ্ব সংসার পালন করিতেছেন, তিনি দয়াময়। তথাপি সে তাঁহাকে উদাসীনের বেশে সজ্জিত করে। ইহার কারণ কি? অবশ্যই মনুষ্য প্রকৃতিতে ইহার সদুত্তর পাওয়া যাইবে, কেন না প্রকৃতি হইতেই ঐ বৈরাগ্যবেশ উৎপন্ন হইয়াছে। যখনই নিরপেক্ষ হইয়া মানুষ আপনার স্বভাব আপনার প্রকৃতিকে জিজ্ঞাসা করে মহাদেব কেমন, সে ভিতর হইতে তখনই উত্তর পায়, তিনি নির্লিপ্ত বৈরাগী। বৈরাগী ফকির যিনি নহেন তিনি ঈশ্বর হইতে পারেন না। এই লক্ষণাক্রান্ত না হইলে মহাদেব পূজা পাইতে পারেন না। যদি পূর্ব্বতন যোগী ঋষিরা ব্রহ্মকে এই লক্ষণাক্রান্ত মনে না করিতেন, যদি তাঁহারা ব্রহ্মকে নির্গুণ এবং নির্লিপ্ত না ভাবিতেন তাহা হইলে ভারতবর্ষে ব্রহ্ম কদাপি পরম দেবতারূপে পূজিত এবং আরাধিত হইতেন না। এই মূল লক্ষণবিহীন হইলে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব থাকে না। যদি ব্রহ্মের এই বিশেষ লক্ষণ পরিহার করিয়া কেবল তেত্রিশ কোটি দেব দেবী ভাব তাহা হইলে নিশ্চয়ই ভ্রান্ত এবং পৌত্তলিক হইবে। তেত্রিশ কোটি দেব দেবী ব্রহ্মের তেত্রিশ কোটি রূপ গুণ; কিন্তু স্বয়ং তিনি এক জন নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার উদাসীন। লক্ষ্মী,

সরস্বতী, জগদ্ধাত্রী, আদ্যাশক্তি প্রভৃতি তাঁহার অসংখ্য মূর্ত্তি ভাবিতে পার; কিন্তু এ সমুদয় বিভিন্ন মূর্ত্তির মধ্যে তিনি নিজে এক নির্ব্বিকার ফকির হইয়া বসিয়া আছেন। ইতিপূর্ব্বে তোমরা দ্বিমূর্ত্তির কথা শুনিয়াছ। ব্রহ্মের এক মূর্ত্তি উদাসীনের মূর্ত্তি, আর এক মূর্ত্তি সংসারীর মূর্ত্তি। তাঁহার এক হস্তে তিনি বৈরাগ্য-চিহ্ন ধারণ করিয়া সমস্ত বৈরাগীদিগকে শাসন করিতেছেন, আর এক হস্তে সংসারীদিগকে ধন ধান্য লক্ষ্মীশ্রী বিতরণ করিতেছেন। তাঁহার এক মুখ হইতে "উদাসীন হও, উদাসীন হও" এই আদেশ এই উপদেশ বিনির্গত হইতেছে; আর এক মুখ হইতে "সংসার পালন কর, সংসার পালন কর" এই কথা বিনিঃসৃত হইতেছে। এক মুখ হইতে যোগতত্ত্ব, আর এক মুখ হইতে সংসারতত্ত্ব বিবৃত হইতেছে। এই দুই রূপ একত্র কর, ব্রহ্ম কি বুঝিতে পারিবে। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মের এই বিচিত্র-রূপ অস্বীকার করেন না। তিনি ব্রহ্মের একত্ব মানিয়াও তন্মধ্যে অসংখ্য মূর্ত্তি দর্শনে পুলকিত হন। ব্যক্তি এক অথচ অনেক ভাব, ব্রহ্মজ্ঞানের এই গূঢ় তত্ত্ব অতীব আশ্চর্য্য ও মধুর। সেই এক নির্ব্বিকার নির্লিপ্ত ঈশ্বর নিত্যকাল লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতি অসংখ্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু তিনি মানুষ নহেন এবং কদাচ মানুষ হইতে পারেন না। পুরুষ তিনি, কিন্তু মানুষ নহেন। তিনি এক জন নিত্য সনাতন নির্ব্বিকার স্বাধীন পুরুষ; কিন্তু তাঁহাতে মানব চরিত্রের কোন দোষ গুণ আরোপ করা যায় না। তাঁহার কোন বিকার কিম্বা পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। তাঁহার জন্ম মৃত্যু নাই। তাঁহাকে কদাপি মনুষ্য ভাবিও না। মানুষের অধর্ম্ম তাঁহাতে নাই, মানুষের ধর্ম্মও তাঁহাতে নাই। মানুষের ন্যায় তাঁহার জীবনে কখন প্রেম কখন অপ্রেম, কখন পরিশ্রম কখন বিশ্রাম হয় এরূপ কদাপি মনে করিও না। তিনি এক সময় উৎসাহী হইয়া মানুষকে গাড়ী ঘোড়া ক্রয় করিয়া দিলেন, প্রচুর পরিমাণে সংসার মধ্যে ধন ধান্য আনিয়া দিলেন, আবার কিয়ৎকাল পরে নিদ্রায় অভিভূত হইলেন, কখন ঈশ্বরকে মনুষ্যের ন্যায় এরূপ পরিবর্ত্তনশীল মনে করিও না। মানুষের রূপ, মানুষের গুণ, মানুষের প্রকৃতি কদাপি ঈশ্বরেতে আরোপ করিও না। ঈশ্বরের যে কোটি কোটি রূপের কথা শুনিয়াছ সে সমস্ত নিরাকার রূপ।

এ স্থলে কিঞ্চিৎ কঠিন সত্য শিখিতে হইবে। ঈশ্বরকে এক জন ব্যক্তি অথবা পুরুষ বলিয়া মানিলেই মানুষ সহজে তাঁহাকে আপনার স্বভাব-বিশিষ্ট মনে করে। অনেক দুর্ব্বল বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের লক্ষ্মী অথবা সরস্বতী মূর্ত্তি ভাবিতে গিয়া তাঁহাতে মানব প্রকৃতি আরোপ করিয়াছে এবং তাঁহাকে দেশ কাল এবং ভাবে সীমাবদ্ধ করিয়াছে। যাহারা ব্রহ্ম স্বরূপ জানে না তাহারাই মনে করে ঈশ্বর মানুষের ন্যায় কখন তুষ্ট, কখন রুষ্ট, কখন হাসেন, কখন কাঁদেন, কখন অলস হইয়া বসিয়া থাকেন, কখন প্রেমোন্মত্ত হইয়া উৎসাহও উদ্যম সহকারে সন্তানদিগকে পালন করেন। কখন তিনি মানুষের বিপদ দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন, কখন বা আপনার স্বরূপ ভাবিয়া আনন্দিত হন, কখন লক্ষ্মীর বেশ পরিধান করিয়া ধন ধান্য বিতরণ করেন, কখন সরস্বতী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বীণা বাজাইতে বাজাইতে জ্ঞানী ভক্তদিগের প্রাণ হরণ করেন; কখন যোগেশ্বর হইয়া নির্জ্জনে যোগীদিগকে ডাকিয়া যোগতত্ত্ব শিক্ষা দেন। ঈশ্বর যে এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাব ও রূপ ধারণ করেন ইহা কেবল কল্পনা ও ভ্রান্তি। মানুষ আপনাকে যেমন দেখে আপনার ঈশ্বরকেও তদ্রূপ মনে করে। আপনার জীবনে কখন রাগ, কখন প্রেম, কখন কর্ম্মে ব্যস্ততা, কখন বিশ্রাম ও শান্তি, সুতরাং সে মনে করে ব্রহ্মও ঐরূপ। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। যিনি লক্ষ্মী তিনি নিত্য লক্ষ্মী, যিনি সরস্বতী তিনি চিরকাল সরস্বতী, যিনি শক্তিমান তিনি চিরশক্তিমান, যিনি যোগেশ্বর তিনি অনন্তকাল যোগেশ্বর। যদি স্বীকার কর তিনি কেবল পর্ব্বত অথবা শ্মশানবাসী নহেন, কিন্তু তিনি সংসার মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাহা হইলে মানিতে হইবে যে তিনি নিত্যকাল সংসারের দেবতা, এবং সৃষ্টি অবধি চিরকাল জীবপালন করিতেছেন। তাঁহাতে পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। তিনি নির্ব্বিকার ও অপরিবর্ত্তনীয়। তিনি সহস্ররূপ ধরিবেন কিরূপে? তিনি দুইরূপও ধরিতে পারেন না। নিত্য বস্তুতে রূপান্তর সম্ভবে না। সদাকাল ব্রহ্মের একই রূপ। নিত্য সনাতন ব্রহ্ম এক স্বরূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সেই এক স্বরূপের মধ্যে তেত্রিশ কোটিরূপ, অর্থাৎ এক সময়েই তাঁহার মধ্যে লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতি সমস্ত প্রকৃতি

মূর্ত্তিমতী রহিয়াছে। এক সময়ে তিনি সরস্বতীমূর্ত্তি ধারণ করেন, আর এক সময়ে তিনি লক্ষ্মীমূর্ত্তি ধারণ করেন এরূপ নহে; কিন্তু যিনি সরস্বতী তিনিই লক্ষ্মী। তিনি একই সময়ে সমস্ত দেবমূর্ত্তি অথবা প্রকৃতি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার প্রেম তাঁহার জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র নহে। তাঁহার দয়া এবং ন্যায় একত্র কার্য্য করে। তাঁহার নির্জন অধিবাস এবং সংসার কোলাহল মধ্যে প্রজাপালন এক সময়েই হয়। তাঁহার কোটি স্বরূপ একত্র বাঁধা রহিয়াছে। এক বাগানে এক সময়ে তেত্রিশ কোটি ফুল ফুটিয়াছে। যাহারা মনে করে ঋতু ক্রমান্বয়ে অর্থাৎ সময় বিশেষে ঈশ্বরেতে বিভিন্ন ভাবকুসুম প্রস্ফুটিত হয় তাহাদের ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই। তাহারা ভ্রান্ত যাহারা বলে, মানুষের দুষ্ট ব্যবহারে হরি রাগিয়াছিলেন, আবার স্তব স্তুতিতে তিনি তুষ্ট হইলেন। তাহারা ঈশ্বরকে মনুষ্যের ন্যায় অপূর্ণ জ্ঞান করে। তিনিই ব্রহ্মজ্ঞানী যিনি বলেন ঈশ্বরেতে বিকার নাই, তিনি নিত্য এবং অপরিবর্ত্তনীয়। যেমন নদী ক্রমাগত চলিতেছে, সূর্য্য ক্রমাগত কিরণ বর্ষণ করিতেছে, তুমি দেখ আর না দেখ, সেইরূপ তুমি ধন এবং জ্ঞান গ্রহণ কর বা না কর ঈশ্বর চিরকাল লক্ষ্মী এবং সরস্বতী হইয়া কল্যাণ ও সুবুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন। এক ব্রহ্ম বিভিন্ন অবস্থাতে পড়িয়া বিচিত্ররূপ ধারণ করিতেছেন ইহা সত্য কথা নহে; কিন্তু এক ব্রহ্মেতে অনন্তকাল অসংখ্য রূপ ও গুণ বিরাজ করিতেছে। এক ব্রহ্ম মূর্ত্তিতে অসংখ্য মূর্ত্তি মিলিত হইয়া রহিয়াছে। সাধকেরাই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আপন আপন প্রকৃতি অনুসারে ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ দর্শন করে। তোমার দিকে এক মুখ, আর এক জনের দিকে আর এক মুখ, আমার দিকে এক মুখ; আমার দিকে আবার ভিন্ন অবস্থাতে ভিন্ন মুখ। আমি পাপ করিলাম, তৎক্ষণাৎ ন্যায়বান্ রাজার রুদ্রমূর্ত্তি দেখিলাম; ভক্ত হইলাম প্রেমময়ী জননীর মুখ প্রকাশিত হইল; আমি যোগ সাধন আরম্ভ করিলাম যোগেশ্বর মূর্ত্তি দেখিলাম; সাংসারিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম, তখনি গৃহদেবীর সাক্ষাৎ দর্শন পাইলাম। আমার দেখা ভিন্ন হইল বটে, কিন্তু যিনি দেখা দিলেন তিনি এক সময়েই রাজা, জননী, যোগেশ্বর ও লক্ষ্মী। পাত্রভেদে অবস্থাভেদে ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাঁহারই

স্বরূপ এক ও অপরিবর্ত্তিত থাকে। আমাতে পরিবর্ত্তন হয়, তাঁহাতে নহে। আমরা পাঁচ জনে পাঁচ ভাব দেখিতেছি বলিয়া তিনি পাঁচ হইলেন না। তিনি একই রহিলেন, ভিন্ন হৃদয়ে তাঁহার জ্যোতির প্রতিভা বিভিন্ন হইল। হে সৌন্দর্য্যের উপাসক, তুমি মনে করিও না তোমার দেবতার সৌন্দর্য্য ব্যতীত শক্তি জ্ঞান পুণ্য প্রভৃতি আর অন্য কোন স্বরূপ নাই। ঈশ্বর অসংখ্য স্বরূপের আধার, আবার তাঁহার প্রত্যেক স্বরূপ অনন্তকাল স্থায়ী ও নিত্য। তুমি কেবল এখন সৌন্দর্য্য দেখিতেছ, তোমার কাছে কেবল ঐ গুণের প্রকাশ অপর গুণের অপ্রকাশ। সাধকেরা আপনাদিগের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতানুসারে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ সাধন ও দর্শন করে; কিন্তু তিনি একই আছেন। মনে কর একটি পাত্রে জল এবং তৈল উভয়ই আছে। তুমি যদি এক খণ্ড বস্ত্র আগে জলে ভিজাইয়া সেই পাত্রে স্থাপন কর তাহা হইলে সেই বস্ত্রখণ্ড তৈল পরিত্যাগ করিয়া কেবল জল আকর্ষণ করিবে, অথবা যদি ঐ বস্ত্রখণ্ড আগে তৈলাভিষিক্ত করিয়া ঐ পাত্রে রাখ তাহা হইলে ঐ বস্ত্র উক্ত আধার হইতে কেবল তৈল আকর্ষণ করিবে। সেইরূপ ব্রহ্ম আধারে অসংখ্য ভাব রহিয়াছে; কিন্তু তোমার যে যে ভাব প্রবল তুমি কেবল সেই সকল ভাবই গ্রহণ করিবে। আমি যদি জ্ঞানী হইয়া কেবল বুদ্ধি সহকারে ব্রহ্মকে বুঝিতে যাই আমি কেবল তাঁহার জ্ঞানস্বরূপ তাঁহার সরস্বতী রূপ ধারণ করিতে সক্ষম হইব। আমি যদি বল শক্তি সাধন করি এবং দৃঢ় ও পরাক্রমশালী হইবার জন্য চেষ্টা করি সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম শক্তিরূপে আমার আত্মাতে অবতীর্ণ হন। যখন আমি সংসারে ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে যত্ন করি তখন তিনি লক্ষ্মীশ্রীরূপে কাছে আসিয়া দেখা দেন। যখন আমার মনে ভক্তিভাব প্রবল হয় সেই ভাব ব্রহ্মের নানা মূর্ত্তির মধ্যে ভক্তবৎসল মূর্ত্তিকে আকর্ষণ করে। এক দেবতা প্রাণ অথবা শক্তিস্বরূপ, এক দেবতা কেবল প্রেমস্বরূপ, এক দেবতা কেবল জ্ঞানস্বরূপী, এক দেবতা কেবল পুণ্যস্বরূপ, তাহা নহে; কিন্তু একই ব্রহ্ম এই সমুদায় স্বরূপের নিত্য আধার। সাধকেরাই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বদ্ধ। কেহ জ্ঞানী, কেহ প্রেমিক, কেহ শাক্ত, কেহ ভক্ত, কেহ কর্ম্মী, কেহ দ্বৈতবাদী, কেহ অদ্বৈতবাদী, কেহ সুন্দর মূর্ত্তির

উপাসক, কেহ ভীষণের উপাসক। প্রত্যেকে আপন আপন বস্ত্রখণ্ড দ্বারা তদুপযোগী ভাব ব্রহ্ম স্বরূপের মধ্য হইতে আকর্ষণ করিতেছে। কিন্তু ঈশ্বরের অসংখ্য ভাব গ্রহণ করে, তাঁহার সমুদয় গুণ টানিয়া লয় এমন সাধক কে আছে? হে ব্রাহ্ম, তুমি যদি নববিধানের আশ্রয় লইয়া থাক তুমি বিশ্বাস কর তোমার ব্রহ্ম একই আধারে অসংখ্যরূপ ধারণ করেন। সময়েতে তাঁহার রূপের বিকার অথবা পরিবর্ত্তন হয় না। তুমি সময় বিশেষে তাঁহার এক এক ভাবের পক্ষপাতী হও বলিয়া কখনও মনে করিও না যে তাঁহার আর অন্য ভাব নাই। যখন তুমি তাঁহার দয়ার মূর্ত্তি দেখ তখন কদাচ মনে করিও না যে তাঁহার ন্যায়মূর্ত্তির তিরোভাব হইয়াছে। যখন তুমি দেখিতে পাও যে প্রজাবৎসল হরি প্রেমোন্মত্ত হইয়া প্রজাদিগকে পালন করিতেছেন তুমি বিশ্বাস করিও যে সেই সময়েই তিনি আর এক জনের কাছে সংসার হইতে নির্লিপ্ত থাকিয়া নির্গুণ ব্রহ্মরূপ প্রদর্শন করিতেছেন। এক ভাবে তিনি সগুণ অর্থাৎ অসংখ্যগুণবিশিষ্ট। আর একভাবে তিনি নির্গুণ, অর্থাৎ সময়ে তাঁহার গুণের পরিবর্ত্তন বা হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। এক ভাবে তিনি নিষ্ক্রিয় সন্ন্যাসী, আর এক ভাবে তিনি সংসারী কর্ম্মী। মানুষের মনে কখন সংসারাসক্তি, কখন বৈরাগ্য, কখন দয়া, কখন নিষ্ঠুরতা; কিন্তু ঈশ্বর এরূপ বিকারবিহীন; তিনি এ সকল পরিবর্ত্তনের অতীত। তিনি পূর্ণ, তিনি নিত্য। তাঁহার মধ্যে দয়া বৈরাগ্য অনন্তকাল এক সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া বাস করিতেছে। তিনি নিত্য দয়া, কিন্তু মনুষ্যের ন্যায় দয়ালু নহেন, অর্থাৎ আমাদের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার দয়া উত্তেজিত হইল, তিনি ক্রোড়ে আশ্রয় দিলেন, এ সকল নিতান্ত অসঙ্গত কথা। যিনি নিত্য ও পূর্ণপ্রেম তাঁহার হৃদয়ে আবার দয়ার সঞ্চার কিরূপে হইবে? তিনি চিরকাল ভাল বাসিতেছেন, প্রত্যেককে সমভাবে স্নেহ করিতেছেন। তাঁহার জ্ঞানও নির্ব্বিকার। তিনি আমাদিগের অবস্থা জানিলেন ইহা সত্য নহে। অজ্ঞান মনুষ্যেরই জ্ঞান জন্মে। কিন্তু ত্রিকালজ্ঞ ব্রহ্ম সর্ব্বদাই জানিতেছেন। তিনি স্বয়ং জ্ঞান, জ্ঞানী নহেন। সেইরূপ তিনি শান্ত অথচ কর্ম্মী। তিনি কোথাও যান না, কাহাকেও পরিশ্রম সহকারে সেবা করেন না। পা নাই চলিবেন কিরূপে? হাত নাই কর্ম্ম করিবেন কিরূপে? অথচ এই

প্রকাণ্ড বিশ্বরাজ্যের সমস্ত কর্ম্ম এবং অসংখ্য জীব পালন তাঁহারই শক্তিতে ও নিয়মে হইতেছে। ভক্তজীবনে যত লীলা সকলই তাঁহার খেলা। তিনি মানুষের ন্যায় কখন কর্ম্ম করেন না। কিন্তু তাঁহার প্রেম ও বাৎসল্য ভাব বিভিন্ন অবস্থাতে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়। প্রকাশে বিচিত্র কিন্তু স্বরূপেতে তিনি এক। হরিলীলা অসংখ্য কিন্তু হরিস্বভাব নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয়। সংসার মধ্যে হরির প্রেম কত আশ্চর্য্যরূপ দেখাইতেছে, কিন্তু তিনি নিষ্ক্রিয় নিরাকার নির্ব্বিকার ব্রহ্ম সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া রহিয়াছেন। তিনি সংসারে থাকেন অথচ সংসারী নহেন। তিনি সংসারে আসক্তও নহেন এবং সংসারকে ঘৃণাও করেন না। ব্রহ্মের শান্ত বক্ষে চাঞ্চল্য অথবা বিকার জন্মিতে পারে না। সংসারের প্রতি আসক্তি অথবা ঘৃণা, অনুরাগ অথবা বিদ্বেষ তাঁহার পক্ষে উভয়ই অসম্ভব। তিনি স্থির গম্ভীর প্রশান্ত অনন্ত সাগর, প্রবৃত্তির তরঙ্গ তাঁহাতে উত্থিত হয় না। তিনি সর্ব্বত্যাগী ফকির, এমন ফকির আর নাই। তাঁহার ঘর নাই, সংসার নাই। কোন প্রকার মায়াতে তিনি মুগ্ধ হন না। সংসারের মহামায়া ব্রহ্মপ্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। সংসারের সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সকল অবস্থাতে তিনি অবিচলিত। বজ্রধ্বনি বা সাগরের মহা আস্ফালনে তাঁহার শান্তি ভঙ্গ হয় না। রাজ্যবিপ্লব হইল, নদ নদীর মহাপ্লাবনে দেশ ভাসিয়া গেল, আগ্নেয় গিরির অগ্নি উদ্গীরণে সহস্র সহস্র লোক বিকম্পিত হইল, ভগবানের চিত্তস্থৈর্য্যের কিঞ্চিন্মাত্রও বৈলক্ষণ্য হইল না। তিনি কঠোর ফকির নহেন, প্রেমিক উদাসীন। সন্তান পালনের সমুদায় উপায় করিতেছেন কিন্তু নিজে অনাসক্ত। হাজার লোক কাঁদিয়া উঠিলে তাঁহার ক্লেশ হয় না, হাসিয়া উঠিলে তাঁহার উল্লাস হয় না। সৃষ্টির বিচিত্র ঘটনার মধ্যে উদাসীন মহাদেব উচ্চ বৈরাগ্যপর্ব্বতে যোগাসনে স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যদি প্রলয় দশা প্রাপ্ত হয় তথাপি ব্রহ্মাণ্ডপতি স্থির থাকিবেন। তাঁহার লক্ষ লক্ষ সন্তানের যদি মৃত্যু হয় তথাপি তাঁহার মন মানুষের ন্যায় শোকার্ত্ত হইয়া কাঁদিবে না। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে কত রাজ্যের বিনাশ হইল, কত দেশ সমভূমি হইল; কিন্তু সর্ব্বরাজ্যেশ্বর সুস্থির ও শান্তভাবে

বিরাজ করিতেছেন। নির্গুণ নির্ব্বিকার ব্রহ্ম অন্ধ ও বধিরের ন্যায় কিছুই দেখিলেন না শুনিলেন না, যেমন ছিলেন ঠিক তেমনি রহিলেন। ব্রহ্মের বাহ্যিক লীলা দেখিতে কি চমৎকার! কি আশ্চর্য্য বিচিত্রতা ও ব্যস্ততা! কত কার্য্য, কত ঘটনা, কত রূপ, কত গুণ, কত শক্তি! ঘোর সংসার! ব্রহ্মের অন্তর কি গম্ভীর! একটু চাঞ্চল্য নাই, এক রূপ, এক ভাব, এক নিস্তব্ধ অচল পদার্থ। গভীর সমাধি! মনে হয় যেন বহির্ব্বাটীতে কার্য্যের ধুমধাম,* প্রেমের বাজার, সংসার লীলা, অনন্ত ঐশ্বর্য্য, কেবল শক্তি ও প্রেমের অবিশ্রাম উচ্ছ্বাস। কিন্তু অন্তঃপুরে এক মৌনী নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। বাহিরের সমুদায় কার্য্য সুচারু নিয়মে চলিতেছে। মনুষ্য যথারীতি পরিশ্রম করিয়া ধন ধান্য সঞ্চয় করিতেছে। ভক্তেরা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে প্রার্থনা ও সাধন ভজন করিয়া পরমার্থ ও ধর্ম্মায় সঞ্চয় করিতেছেন। ব্রহ্ম নিজে নির্লিপ্ত, অথচ তাঁহার সমস্ত রাজ্য সমস্ত সংসার চলিতেছে, বৃহৎ বৃহৎ ব্যাপার সকল সুসম্পন্ন হইতেছে। তাঁহার নিয়মে সূর্য্য আলোক এবং উত্তাপ দিতেছে, মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে, অগ্নি দহন করিতেছে, সমুদ্র দেশ দেশান্তরে বাণিজ্য বহন করিতেছে। তাঁহার নিয়মে ব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে, কিন্তু তাঁহাকে কেহ স্পর্শ করিতে পারে না। তাঁহার স্নেহের গুণে তাঁহার পালনী শক্তিতে মাতার স্তনের ভিতর দিয়া শিশুকে পোষণ করিবার জন্য দুগ্ধ আসিল, শিশু ঐ দুগ্ধ পান করিল এবং পরিপুষ্ট হইল, কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত রহিলেন। তিনি নিজে আসক্ত হইয়া কিছুই করেন না, কিন্তু অনাসক্ত থাকিয়া সমুদয় করাইয়া দেন। তিনি তাঁহার নিয়ম দ্বারা সমস্ত ভৌতিক রাজ্য পরিচালিত করিতেছেন এবং ধর্ম্মরাজ্যে ভক্তদিগের সমস্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছেন। ক্ষণস্থায়ী ক্ষুদ্র অনুরাগে তিনি উত্তেজিত হন না, তিনি প্রকাণ্ড প্রেম, অনন্ত বাৎসল্য, নিত্যকাল স্থায়ী অনুরাগ। তাঁহার প্রত্যেক গুণ অথবা স্বরূপ অনন্তকাল স্থায়ী এবং অপরিবর্ত্তনীয়। পূর্ব্বে অনেকে এইরূপ বিশ্বাস করিতেন যে ঈশ্বর কখন জাগ্রৎ, কখন নিদ্রিত, কখন দয়ালু, কখন নির্দ্দয়; কালভেদে এবং অবস্থাভেদে মানুষের ন্যায় তাঁহার ভাবের পরিবর্ত্তন হয়। নববিধানের অভ্যুদয়ে এই মানুষ-দেবতার তিরোভাব এবং

অনন্ত চৈতন্য ও অনন্ত প্রেমস্বরূপের আবির্ভাব হইল। উপধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা বলে ঈশ্বর স্তব স্তুতিতে তুষ্ট হইয়া কখন কখন পাপীকে ক্ষমা করেন, কিন্তু নববিধানের মত এই যে ঈশ্বর অনন্ত প্রেমস্বরূপ, তিনি সর্ব্বদা পাপীকে ক্ষমা করিতেছেন, তাহার পুনর্ম্মিলন প্রতীক্ষা করিতেছেন এবং তাহার উদ্ধারের উপায় করিতেছেন। পাপীর প্রতি নির্দ্দয় ও ক্ষমাবিহীন হওয়া তাঁহার পক্ষ অসম্ভব। দেখ সত্যের কি আশ্চর্য্য মহিমা! আমাদের দয়াময় ঈশ্বর চির দয়াময়, আমাদের গৃহলক্ষ্মী চিরলক্ষ্মী। কেহ কেহ বলে লক্ষ্মী চঞ্চলা, কখন্ কাহার প্রতি প্রসন্ন হন তাহার স্থিরতা নাই। প্রকৃত লক্ষ্মীর চাঞ্চল্য নাই, পরিবর্ত্তন নাই। শ্রীরূপে কল্যাণরূপে তিনি চিরদিন সংসার মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার প্রেম কোথাও দুগ্ধরূপে, কোথাও ধান্যরূপে কোথাও ধনরূপে, কোথাও সুখশান্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার কোন গুণ বা রূপ সাময়িক নহে, কিন্তু নিত্য। তিনি জ্ঞান কথা বলেন অনন্তকাল, তিনি কল্যাণ দান করেন অনন্ত কাল, তাঁহার বাক্যের বিশ্রাম নাই, তাঁহার দয়ার বিরাম নাই। তিনি অনন্ত বাগ্দেবী এবং অনন্ত লক্ষ্মী। তাঁহার সমস্ত গুণ সময়ের অতীত ও নিত্য। আমরা সময়ের জীব, আমরা আমাদিগের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ গুণ ধারণ করি। আমাদের কখন এক ভাব, কখন আর এক ভাব। আমাদের স্বভাব চরিত্র সময়ে বিভক্ত। কিন্তু অখণ্ড ঈশ্বর নিত্যকাল এক ভাবে রহিয়াছেন। স্বরস্বতী লক্ষ্মী, জ্ঞান প্রেম, প্রভৃতি প্রত্যেক গুণ অনন্ত ও নিত্য রূপে ভাব, এবং মনের মধ্যে সমুদয় একত্র সংযোগ কর, যে বস্তু নিষ্পন্ন হইবে তাহাই ব্রহ্ম জানিবে। মনুষ্য সময়ে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখে কিন্তু অনন্তকাল সেই সমুদয় মূর্ত্তি ব্রহ্মের মধ্যে সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। এই নিত্য অসংখ্য রূপধারী ব্রহ্মকে দেখিলে ভূমানন্দ লাভ হইবে।

সেবকের নিবেদন।

আদ্যাশক্তি।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ১৮ই শ্রাবণ, ১৮০২ শক।

পরমেশ্বর পৃথিবী সৃজন করিয়া পালন করিতেছেন। সরস্বতীরূপে তিনি সন্তানদিগকে জ্ঞান বিতরণ করেন এবং লক্ষ্মীশ্রী রূপে ঘরে ঘরে তিনি ধন ধান্য বিতরণ করেন। আবার অখণ্ড নির্লিপ্ত উদাসীন ভাবে আপনার মহিমাতে আপনি বাস করিতেছেন। তবে অবতার শব্দ কেন ধর্ম্মের অভিধানে স্থান পাইল? ঈশ্বরকে লক্ষ্মী সরস্বতী ও উদাসীন রূপে পূজা করিয়া কেন মনুষ্য ক্ষান্ত হইল না? লোকে কেন অবতার মানিল? জনসমাজে ঈশ্বরাবতরণ কল্পনার নিগূঢ় কারণ কি? যখনই পৃথিবীর কোন সঙ্কট উপস্থিত হয় তখনই ঈশ্বরের অবতরণ আবশ্যক, এ যুক্তি মানুষকে কে শিখাইল? অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে কি ঈশ্বর পৃথিবীতে ছিলেন না? ঈশ্বর পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুতে, সমুদায় সৃষ্টি মধ্যে বিরাজ করিতেছিলেন; কিন্তু বাহিরে ঈশ্বরের বিচিত্র প্রকাশ দেখিয়া মনুষ্যের চিত্ত সন্তুষ্ট হইল না। মনুষ্যের মন ঈশ্বরকে আপনার মধ্যে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইল। মনুষ্য আপনার হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বরের অবতরণ প্রার্থনা করিল। স্বর্গের ঈশ্বর কেবল স্বর্গের ঈশ্বর নহেন, তিনি পৃথিবীরও ঈশ্বর। তিনি কেবল চন্দ্র সূর্য্যের ঈশ্বর নহেন, তিনি পৃথিবীর নদ নদী এবং বৃক্ষ লতাদিরও ঈশ্বর। স্বর্গের ব্রহ্মকে মনুষ্য পার্থিব সমস্ত বস্তুতে অবতীর্ণ দেখিল, কিন্তু তাহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া তাঁহাকে মনুষ্যের আকার মধ্যে দেখিতে ইচ্ছা করিল। অবতীর্ণ হইবার

যথার্থ অর্থ মনুষ্যসমাজে মানবদেহে অবতীর্ণ হওয়া। ঈশ্বর চন্দ্র সূর্য্য অথবা বৃক্ষেতে রহিলেন তাহাতে পাপীর কি? পুষ্পের লাবণ্যে, উষার সৌন্দর্য্যে হরি বর্ত্তমান, এ সংবাদ অধর্ম্মে উত্তপ্ত যে মন তাহার পক্ষে কি আদরণীয় হইতে পারে? যত ক্ষণ না ঈশ্বর মনুষ্যের হৃদয়ে অবতীর্ণ হন, তত ক্ষণ তাহার পক্ষে ঈশ্বর থাকা না থাকা প্রায় সমান। আমার আপনার অন্তরে যদি তাঁহাকে দেখিতে না পাই তাহা হইলে তাঁহাকে এক দূরস্থ অপরিচিত অনিশ্চিত পদার্থ বলিয়া স্বীকার করাতে কি লাভ? পর্ব্বতে সমুদ্রে পাথরে মাটীতে সকল স্থানে হরি আছেন, কেবল মানুষের ভিতরে কি হরি নাই? ঈশ্বর আপনার সৃষ্ট এই সুবিশাল বিশ্ব মধ্যে রহিলেন তাহাতে আমার প্রাণের তৃপ্তি হয় না। আমার মন মনুষ্যপ্রকৃতির ভিতরে ঈশ্বরকে দেখিতে চায়। আমার মন জিজ্ঞাসা করে মনুষ্যের মধ্যে কি ঈশ্বর নাই? যখন আমি আমার হস্ত দিয়া বক্ষের মধ্যে ঈশ্বরের আবির্ভাব স্পর্শ করি, যখন আমি দেখি মনুষ্যপ্রকৃতির ভিতরে ব্রহ্ম আসিয়া বাস করিতেছেন তখন আমার সকল সন্তাপ দূর হয় এবং হৃদয় পবিত্র ও সুখী হয়। সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর সকল স্থানকে আপনার বাসস্থানরূপে মনোনীত করিলেন, কেবল মনুষ্যকে কি তিনি হেয় জ্ঞান ও পরিত্যাগ করিলেন? বৃক্ষ লতা ও ক্ষুদ্রতম তৃণ মধ্যেও স্বীয় মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন, কেবল মনুষ্যকে কি তিনি বলিলেন—অস্পৃশ্য মানব দূর হও? যদি মনুষ্যসমাজে হরি না থাকেন, যদি ইতিহাসের ঘটনা মধ্যে তিনি না থাকেন তবে হরিলীলা-ভাগবত অসম্ভব। কে বলে মনুষ্যের দেহমন্দিরে ঈশ্বর নাই? যখনই বিশ্বাসনয়ন খুলিয়া জনসমাজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে তখনই দেখিতে পাইবে হরি নর নারীর দেহ মনের মধ্যে শক্তিরূপে বাস করিতেছেন। সেই হরির শক্তি মনুষ্যের রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। এক মহাশক্তি, এক প্রকাণ্ড তেজ মনুষ্যের দেহ মন ও আত্মার ভিতরে কার্য্য করিতেছে। এই শক্তি কে জান? সেই আদ্যাশক্তি ভগবতী। যিনি এই ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছেন তিনি এখন কোথায়? তিনি কি সৃষ্টি কার্য্য সমাধা করিয়া নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন? না, যে শক্তি এই সমুদায় সৃজন করিল তাহা এখনও জীবিত রহিয়াছে। আমাদের যত গুলি শক্তি আছে

সকল শক্তির মূলে তিনি। বন উপবনে, গিরিপর্ব্বতে, বিশ্বমন্দিরে আমরা হরি পূজা করিলাম, কিন্তু চির কাল পরের বাড়ীতে ব্রহ্ম পূজা করিয়া হৃদয় তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। মনুষ্যের মন এই বলিয়া আক্ষেপ করে;—"হায়! চিরদিন পরের বাড়ীতে ঈশ্বরের পূজা করিতে হইল, কবে নিজের হৃদয়ে, নিজের বাড়ীতে তাঁহার পূজা করিব?" সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম, সর্ব্বশক্তিমতী বিশ্বজননী আমাদিগের প্রতিজনের দেহ মনের মধ্যে শক্তিরূপে অধিবাস করিতেছেন। ঈশ্বর আপনি আমাদের প্রতি জনের মনের মধ্যে তাঁহার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। তবে কেন আমরা তাঁহাকে ভিতরে উপলব্ধি করিব না? যে শক্তি আকাশের চন্দ্র সূর্য্যকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে সেই শক্তিই আমাদের বাহুতে বাহুবল, চক্ষে দৃষ্টিশক্তি, কর্ণে শ্রবণশক্তি। তুমি অবিশ্বাসী হইয়া মনে কর এ সমুদয় তোমার শক্তি, তুমি মনে কর তোমার বলে তুমি ধন ধান্য উপার্জ্জন করিরা তদ্দ্বারা নিজ বলে নিজ চেষ্টায় আপনার পুষ্টি সাধন কর। এরূপ নাস্তিক কল্পনা পরিহার কর। তুমি কি এক মিনিট আপনাকে রক্ষা করিতে পার? তোমার নিজের একটীও মূল শক্তি নাই। যে সৃজনী শক্তি তোমাকে সৃজন করিল তাহাই তোমার জীবনসংরক্ষিণী শক্তি। সেই আদ্যাশক্তি, সেই অনন্তকালের মহাশক্তি ভিন্ন তুমি এক মুহূর্ত্তকাল বাঁচিতে পার না। যে শক্তিতে তুমি বাঁচিয়া আছ, তুমি চলিতেছ, বলিতেছ, চিন্তা করিতেছ, ধর্ম্মসাধন করিতেছ সে শক্তি সামান্য শক্তি নহে। ইহার ভিতরে স্বর্গীয় শক্তি আছে। ইহা অদ্যকার শক্তি নহে, অনন্তকালের শক্তি, অনন্তকালের ঘনীভূত শক্তি। এই ঘনীভূত শক্তি কালরূপে কেন বর্ণিত হইল? শক্তিমূর্ত্তি কেন কালী মূর্ত্তি হইল? হে মানব, তুমি যদি তোমার ভিতর দিয়া গভীর অনন্ত দেবশক্তি দর্শন কর তাহা হইলে দেখিবে প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ প্রকৃতিশক্তি আদ্যাশক্তি। অনন্তশক্তি জলরাশির ন্যায় গভীর ও ঘোর বর্ণ। অল্প জল কাচের ন্যায় স্বচ্ছ। যতই জল অধিক হয় ততই ঘোলা হয়, খুব গভীর হইলে ক্রমে সবুজ, ঘোর সবুজ, নীল, ঘোর নীল শেষে প্রায় কালি হইয়া যায়। যে জল স্বচ্ছ ছিল, সেই জলই শেষে গভীরতা বশতঃ কৃষ্ণবর্ণ হইল। তদ্রূপ ক্ষুদ্র জীবশক্তি স্বতন্ত্র অনু-

স্তব করিলে উহাতে কোন রং কল্পনা হয় না, কিন্তু যদি উহার নিম্নে গভীর রূপে দেখি তাহা হইলে দেখিব শক্তির পর শক্তি, ঘোরতর ঘনতর শক্তি, দৈব শক্তি, ব্রহ্ম শক্তি। শেষে একেবারে অতলস্পর্শ অনন্ত শক্তিসমুদ্রের ভয়ানক কালবর্ণ আমাদিগকে বিস্ময়াপন্ন ও কম্পিত করে। দেখ কেমন ব্রহ্মের কালীমূর্ত্তি নিষ্পন্ন হইল। যে সৃজনী শক্তি হইতে এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইল, সেই শক্তিই আমাদিগের জননী, তিনিই জীব-প্রসবিনী জগন্মাতা। তিনি স্বয়ং সৃষ্ট সন্তানদিগের অন্তরে মূলাধার ও মূলশক্তি রূপে নিয়ত অধিবাস করিতেছেন। এই মনুষ্য দেহে হরি সর্ব্বদা বর্ত্তমান। প্রত্যেক মানুষের হৃদয় মনের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি নিহিত ও অন্তর্ভূত। কেমন হে ভাবুক ব্রাহ্ম, এখন তোমার নিজের গৃহে ব্রহ্ম দর্শনের স্পৃহা চরিতার্থ হইল তো? তোমার ঈশ্বর ঐ দূরস্থ চন্দ্র সূর্য্যে ছিলেন, এখন তোমার নিজের দেহ মনের মধ্যে তাঁহার অবতরণ ও অন্তর্নিবেশ হইল। তিনি শক্তিরূপে তোমার শারীরিক ও মানসিক তাবৎ শক্তি মধ্যে বাস করিতেছেন। অতএব ব্রহ্মকে আর দূর ভাবিও না। অপরের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিয়া কে কোথায় সুখী হইয়াছে? ছাড় পরকে, ভাব আপনাকে। তোমার অত্যন্ত নিকটস্থ আত্মীয়, আপনার সহোদরের ভিতরেও ঈশ্বরকে দেখিতে বলিতেছি না, একেবারে তোমার দেহ মনের মধ্যে সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে দেখিতে বলিতেছি। তোমার নিজের জীবনের মধ্যে তোমার হরিকে দেখাইয়া দিতেছি। যেমন তুমি তোমার বক্ষের দ্বার খুলিবে তৎক্ষণাৎ অনন্ত কালী মূর্ত্তি অন্তরে প্রকাশিত হইবে। সেই কালীমূর্ত্তি মৃত্তিকা নির্ম্মিত অথবা কোন ধাতু নির্ম্মিত কালী নহে; কিন্তু নিরাকারা চিন্ময়ী শক্তিরূপিণী কালী। সেই শক্তিরূপিণী কালী কি পদার্থ? কেবল মাত্র শক্তি। কি শক্তি? সৃষ্ট পরিমিত জড়শক্তি নহে; কিন্তু আদ্যা প্রথমা শক্তি, চিৎস্বরূপা। তাঁহার মন্দির কোথায়? কোথায় গেলে তাঁহাকে দেখা যায়? তাঁহার কোন স্বতন্ত্র মন্দির নাই। জীবদেহই প্রকৃত কালীমন্দির, সমস্ত বিশ্বরাজ্যই কালীঘাট। যেখানে যত শক্তি আছে সেই শক্তির সঙ্গে সংযুক্ত যে মূলশক্তি তিনিই আকার প্রকার নাম বিহীন কালী, শাস্ত্রে যিনি ব্রহ্মরূপে উক্ত হইয়াছেন। তাঁহাকে আপনার প্রাণ-

মন্দিরে দেখ; আপনার প্রত্যেক বলে কালীমূর্ত্তি ধ্যান কর। তোমার চক্ষে তোমার বক্ষে, তোমার শোণিতে তোমার নিশ্বাসে, কালীরূপ দর্শন কর। তোমার দৃষ্টিশক্তি শ্রবণশক্তি স্মরণশক্তি ধীশক্তিতে, তোমার ভুজবল বুদ্ধিবলে, কালীশক্তি উপলব্ধি কর। সেই সর্ব্বারাধ্যা কালীশক্তি তোমার হৃদয় মন আত্মা সমস্ত অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! স্বয়ং ঈশ্বর তোমার শরীর মনের মধ্যে শক্তিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অধিষ্ঠান করিতেছেন। যদি শক্তিমূর্ত্তি কালীমূর্ত্তির পূজা করিবে প্রজ্ঞাবলে হৃদয় কবাট উন্মুক্ত কর এবং আপনার জীবনী শক্তি মধ্যে তাঁহাকে দর্শন কর। সেই শক্তির অন্তর্ধানে তোমার শরীরের নিপাত। মহাশক্তির তিরোভাবে জীবের নিশ্চিত প্রলয়। সেই শক্তি ভিন্ন কিছুই জন্মে না, কিছুই স্থিতি করিতে পারে না। ঐ যে প্রকাণ্ড সমুদ্রের ন্যায় মহাকালী নিত্যকাল বাস করিতেছেন, ঐ সমুদ্রের বিন্দুমাত্র আমাদের সমস্ত শক্তির আধার। আমার দর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, চিন্তাশক্তি প্রভৃতি সমস্ত শক্তি ঐ কণা মাত্র শক্তিকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। ব্রহ্মতেজ মনুষ্যের শরীর মনকে তেজ দিতেছে। অনন্ত ঘোরতরা কালী শক্তি বিবিধ শক্তি নিয়ত বিধান করিতেছে। সেই মহাশক্তি মহা কালীর হস্তে অহঙ্কারী মানুষের মুণ্ড ঘুরিতেছে। সেই ভয়ঙ্করা বিশ্বজননীর কাছে ভ্রুকুটি করিও না। হে মানব, শক্তির কাছে তোমার তেজ খাটিবে না। সেই দর্পহারিণীর নিকটে তোমার সমুদায় অহঙ্কার চূর্ণ হইবে, কেন না তোমার সমস্ত শক্তি তাঁহার আশ্রিত বলিয়া তোমাকে অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার পদানত হইবে। যে মা আমাদিগকে জন্ম দিলেন, যে জননী আমাদিগকে পৃথিবীতে আনিলেন, তাঁহার মুখের পানে আমরা তাকাইতে পারি না। তাঁহার শক্তির প্রভাবে আমরা কম্পিতকলেবর হই। কি ভয়ানক শক্তি! সমুদ্র পর্ব্বত বায়ু বৃষ্টি অগ্নি চন্দ্র সূর্য্য সকলে যাঁহার কাছে জোড় হাত করিয়া স্তব করিতেছে, যাঁহার ইঙ্গিতে সৃষ্টি, ইঙ্গিতে প্রলয়, তাঁহার মুখের দিকে কে তাকাইতে পারে? আমি কোন্ শক্তির কথা বলিতেছি জান? যে ভয়ঙ্করা সৃজনী শক্তি ঘোর অন্ধকারের ভিতর হইতে ব্রহ্মাণ্ডের কেশ ধরিয়া তাহাকে টানিয়া

বাহির করিল। যখন কিছুই ছিল না তখন সেই শক্তি গম্ভীর স্বরে বলিল,—"আয় সূর্য্য আয়, আয় চন্দ্র আয়, আয় পৃথিবী গ্রহ তারা নক্ষত্র সকলে সারি গাঁথিয়া আয়।" অদ্যাপি সেই শক্তি আকাশমার্গে কোটি কোটি পৃথিবীকে অঙ্গুলীতে ঘুরাইতেছে। সেই মহাশক্তি মহাকালীর বিচিত্র ক্রীড়া মহাসমুদ্রের আস্ফালনে ও ভীষণ বজ্রধ্বনিতে উপলব্ধি করিয়া আমরা ভীত হই। যখন এই শক্তি ভৌতিক রাজ্য হইতে উর্দ্ধে আরোহণ করিয়া ধর্ম্মশক্তিরূপে অধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় তখন ইহার মূর্ত্তি আরো ভয়ঙ্কর হয়। ইহা সমরসজ্জায় সজ্জিত হইয়া রণক্ষেত্রে মহাবিক্রম প্রকাশ করিয়া অসুর বধ করে। বিশ্বসৃজনী শক্তিই অসুর সংহারিণী শক্তি। সেই একই শক্তি বিচিত্র ও বহুধা হইয়া জড় জগতে ও ধর্ম্মজগতে কার্য্য করিতেছে। জ্ঞানশক্তি প্রেমশক্তি পুণ্যশক্তি সকলই সেই আদ্যা শক্তি। তিনি অজ্ঞান অপ্রেম অধর্ম্ম কিছুতেই সহ্য করিতে পারেন না। যখনই সেই শক্তিদেবী মানুষের মনে কোন প্রকার অন্ধকার দেখিতে পান তখনই গম্ভীর শব্দে হুঙ্কার করিয়া বলেন;—"আবার অন্ধকার! এক অন্ধকার বিনাশ করিয়া জগৎ সৃজন করিলাম, আবার এই সৃষ্ট জগতের মধ্যে অবিদ্যা অন্ধকার আসিল!" এইরূপ হুঙ্কার করিয়া সেই মহাশক্তি কালী অজ্ঞান ও পাপের অন্ধকারকে জয় করিয়া তাহার ভিতর হইতে নূতন ধর্ম্ম জগৎ উদ্ভাবন করেন। শক্তি একই। যে শক্তি সাধুদিগকে সুখ শান্তি বিতরণ করেন, সেই শক্তিই পাপী অধার্ম্মিকদিগকে দলন করেন। যিনি জননী হইয়া সন্তানদিগকে বক্ষের মধ্যে রাখিয়া পালন ও পোষণ করেন তিনিই তাঁহার পদতলে মহাসুরকে ফেলিয়া তীক্ষ্ণ অস্ত্রে তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করেন। কখন জগদ্ধাত্রী হইয়া সকলকে সন্তানবৎ রক্ষা করেন, কখন করালবদনা শাণিত অসিধারিণী হইয়া ঘোর রণে দানব দলন করেন। সর্ব্বশক্তিময়ী মা জগজ্জননী মহাশক্তিরূপ খড়্গ দ্বারা মানবহৃদয় মধ্যে সর্ব্বদা অসত্য ও অধর্ম্মকে সংহার করিতেছেন। যদি আমাদের মনের মধ্যে কুবাসনা ও দুষ্প্রবৃত্তি থাকে তবে নিশ্চয়ই সে সকল অসুরের উপরে কালীর ভীষণ অস্ত্র চালিত হইবে। যে এই শক্তিকে ঘাঁটায় সে নিশ্চয়ই মরিবে। তুমি কি মনে কর যিনি ঘোরান্ধ-

কারের ভিতর হইতে প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড বাহির করিলেন তিনি তোমার পাপান্ধকার বিনাশ করিয়া আশ্চর্য্য জ্যোতির্ম্ময় ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিতে পারেন না? শক্তির নিকটে কোন প্রকার পাপাসুর তিষ্ঠিতে পারে না। বিশ্বাসী মনুষ্যের বক্ষের ভিতরে সেই মহাকালী জাগিয়া উঠিয়া সকল শত্রু বিনাশ করেন। যখনই হৃদয়নগরে কোন সাংঘাতিক ব্যাধি প্রবল হয় এবং জীবকে মৃত্যুগ্রাসে ফেলিবার জন্য উপক্রম করে তখনই মহাকালী রক্ষাকালীরূপে উদিত হইয়া ব্যাধি ও মৃত্যুকে জয় করেন। রক্ষাকালীর অভ্যুদয়ে আত্মার রোগ শোক ভয় পলায়ন করে। যে অঞ্চলে মহাশক্তির পূজা হয় সে প্রদেশে পাপাসুর জীবিত থাকিতে পারে না। তিনি তাহার রক্ত বাহির করিবেনই করিবেন। শক্তিদেবী বলিদানের প্রয়াসী নহেন, ছাগাদি রক্তপিপাসু নহেন। তিনি নরবলি চাহেন না, পাপবলি চাহেন। জীবরক্তে তাঁহার তুষ্টি হয় না, কিন্তু পাপাসুরের রক্তে তাঁহার মহোল্লাস ও নৃত্য। যদি মহাকালীর নৃত্য দেখিতে চাও তাহা হইলে তাঁহাকে অসি দ্বারা মনের সমস্ত দানব ও অসুরের মস্তক ছেদন করিতে দেও, তিনি ঐ সকল ছিন্ন মস্তক লইয়া, বিকটাকার কাটা মুণ্ড হস্তে লইয়া ভয়ঙ্করা রিপুসংহারিণী মূর্ত্তি ধরিয়া নৃত্য করিবেন। তুমি কি মনে কর কালী নির্দ্দয়-হৃদয়? শক্তিও যিনি লক্ষ্মীও তিনি। কালী কমলা একই। অন্ধকার ও অধর্ম্ম সংহার করিবার বিক্রম দেখাইবার সময় তিনি ভয়ানক শক্তিরূপ ধরেন কিন্তু তাঁহার হৃদয় প্রেমময়ী জননীর কোমল হৃদয়। তাঁহার সকল শক্তি জীবের হিতের জন্য। মা হইয়া কি আপন সন্তানের রক্ত গ্রহণ করিতে পারেন? দয়াময়ী কি নিরপরাধী ছাগ মহিষাদির শোণিতপাতে আমোদ করিতে পারেন? তিনি কেবল পাপাসুরের রক্ত চান। ভক্ত হৃদয়ে তিনি কত পাপাসুর সংহার করিতেছেন, কত লাল রক্ত নদীর ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে! স্থির হইলেই মনের মধ্যে শুনিতে পাইবে মা কালীর হুঙ্কার ও দুর্ম্মতিদলন। তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য ভিতরে বসিয়া অসুরদিগকে দলন করিতেছেন এবং অসুররক্তে আপনার উৎসব সমাধা করিতেছেন। আমরা শক্তি পূজা করিয়া শাক্ত হইব। ভক্তবৎসলের পূজা করিয়া ভক্ত হইব। আমরা শক্তিকে ভক্তি করিব, কেন না তিনি

আমাদের জননী। তিনি রক্ষাকালী, সকলকে রক্ষা করেন; তিনি মোক্ষ-দায়িনী, পাপ সংহার করেন। তিনি যে কাল, সে কুৎসিত কাল নহে। সে ভাল কাল। সে অনন্তের রূপ। সেই অনন্ত শক্তিকে যত পূজা করিবে ততই নিস্তেজ দুর্ব্বল ভীরু নিরাশ নিরুদ্যম মন তেজস্বী হইয়া উঠিবে এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহে ও পাপদমনে সক্ষম হইবে। যতই মহাশক্তি সাধন করিবে ততই মৃত্যুকে জয় করিবে এবং অন্তরে ও বাহিরে পুণ্যরাজ্য স্থাপন করিয়া প্রকৃত শাক্তের কত বিক্রম তাহা দেখাইতে পারিবে।

সেবকের নিবেদন।

ব্রহ্মের আকাশ রূপ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ২৫ শে শ্রাবণ, ১৮০২ শক।

অনেক ব্রহ্মজ্ঞানীর মনে প্রচ্ছন্ন পৌত্তলিকতা আছে। অনেক পৌত্ত-লিকের মনও সময়ে সময়ে গভীর ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ করে। ব্রাহ্ম হইয়াও অনেকে মনের ভিতরে বুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মের নানা প্রকার রূপ সিদ্ধান্ত করে এবং কল্পনা সহকারে নানা প্রকার দেবমূর্ত্তি গঠনকরে। আবার অনেক পৌত্তলিক সাকার দেবতার উপাসক হইয়াও সময়ে সময়ে বাহ্যিক উপকরণ পরিহার করিয়া যোগ ধ্যানে ব্রহ্মপদার্থের নিকট উপনীত হয়। অতএব ব্রাহ্ম হইয়াছ বলিয়া তোমরা অহঙ্কার করিও না, অথবা কাহাকেও পৌত্তলিক বলিয়া অবজ্ঞা করিও না। ব্রাহ্ম, তুমি পরীক্ষা করিয়া দেখ তোমার মনের চিন্তিত ব্রহ্মরূপ যথার্থই নিরাকার কি না এবং তোমার মন সহজে নিরাকার অনন্ত পুরুষকে ধরিতে পারে কি না। কেবল মুখে অথবা বাহ্যিক অনুষ্ঠানে আপনাকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিলে হইবে না। কিন্তু প্রত্যেক ব্রাহ্ম আপন হৃদয়ে পরীক্ষার প্রদীপ লইয়া গিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখুন সেখানে যথার্থ ব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন কি না। হে ব্রাহ্ম, তোমার রসনা ও হস্ত পৌত্তলিক নহে বলিয়া তোমার মন যে অপৌত্ত-লিক ইহা মানিতে পারি না। তুমি বাহিরের পুতুল না মানিতে পার, কিন্তু তুমি যে তোমার হৃদয়ের পুতুল পূজা কর না তাহা কে বলিল? সে সকল আন্তরিক পুতুল বিনাশ করাও ব্রাহ্মের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য। তুমি মুখে নিরাকার মানিতেছ, কিন্তু তুমি যে সত্য সত্যই প্রতিদিন

নিরাকার পরব্রহ্মের ধ্যান ধারণা কর তাহার প্রমাণ কি? অতএব আপনাকে কঠোর পরীক্ষায় পরীক্ষিত কর। ধ্যানের সময় ঠিক নিরাকার ব্রহ্মকে দেখিতে পাও কি না পরীক্ষা করিয়া দেখ। উদ্বোধনের সময় হইতে উপাসনার শেষ পর্য্যন্ত যথার্থ নিরাকার ব্রহ্মকে কি অমিশ্রিত ভাবে ধারণ করিয়া থাকিতে পার? বিশেষ বিশেষ গুণ যথা লক্ষ্মী সরস্বতী অথবা উদাসীন মহাদেব ভাবিতে ভাবিতে কি কোন সাকার মূর্ত্তি মনে উদিত হয়, না কেবল ব্রহ্মের অনন্ত প্রেম, অনন্ত জ্ঞান এবং অনন্ত বৈরাগ্য অনুভব কর? কালী ভাবিতে ভাবিতে কি এক প্রকাণ্ড কাল পাথর ভাব, না ঈশ্বরের ঘনীভূত অনন্ত শক্তি দেখিতে পাও? অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মের কোন রূপ কোন গুণ অন্তবিশিষ্ট হইতে পারে না। তিনি অনন্ত লক্ষ্মী, অনন্ত সরস্বতী, অনন্ত মহাদেব, অনন্ত কালী। বুদ্ধিতে অনন্ত স্বীকার করিতে পার বটে, কিন্তু উপাসনা ধ্যান প্রার্থনার সময় অনন্তকে উপলব্ধি করিতে পার কি না? অনন্ত লক্ষ্মীকে কিরূপে তুমি পরিমিত ও ক্ষুদ্র ভাবিবে? ব্রহ্মের প্রত্যেক স্বরূপের সঙ্গে অনন্তের সংযোগ। যদি অনন্তকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মের লক্ষ্মী কিম্বা অন্যরূপ ভাব, তাহা হইলে তোমাদিগের মন পৌত্তলিক হইবে। লক্ষ্মীদেবীকে যদি পরিমিত অথচ অতি উৎকৃষ্ট কল্পনা কর তাহা হইলে নারীর মধ্যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নারী এই পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত হইবে। কিন্তু অনন্ত সংযোগ না করিলে ব্রহ্মস্বরূপ নিষ্পন্ন হইবে না। অতএব ঈশ্বরের কোন স্বরূপকে অন্তবিশিষ্ট মনে করিও না। ব্রহ্ম যিনি তিনি অনন্ত আকাশস্বরূপ। প্রাচীন উপনিষদে উক্ত হইয়াছে ঈশ্বর আকাশস্বরূপ। এই কথাটী সেবকের মনে অনেক দিন হইতে লাগিয়াছে। ঈশ্বরের কোটি কোটি রূপের মধ্যে আকাশ একটি প্রধান রূপ। তাঁহার লক্ষ্মী সরস্বতী কালী প্রভৃতি যত রূপ দেখ না কেন প্রত্যেকটি আকাশস্বরূপ। যখন তাঁহাকে লক্ষ্মী ভাবিবে তাঁহাকে আকাশ লক্ষ্মী ভাবিও, সাকার লক্ষ্মী ভাবিও না। ঈশ্বরকে আকাশস্বরূপ ভাবিলেই তাঁহার কোন আকার অথবা হস্ত পদ চিন্তা করা অসম্ভব। যদি ব্রহ্মের এই আকাশস্বরূপ দৃঢ়রূপে ধারণ না কর তবে যোগ ধ্যানের সময় যতই কেন কল্পিত মূর্ত্তি বিদায় করিবার চেষ্টা কর না, বারম্বার সেই সকল

কল্পিত মূর্ত্তি আসিয়া তোমার দুর্ব্বল মনকে আক্রমণ করিবে। তুমি অত্যন্ত সতর্ক হইয়া নিরাকার ব্রহ্মপূজা আরম্ভ করিলে, কিন্তু অর্দ্ধেক পথে যাইতে না যাইতে দেখিবে তোমার নিরাকার দেবতা যেন সাকার হইয়া যাইতেছেন, তিনি যেন কখন ভীষণ প্রকাণ্ড চক্ষু, কখন মনোহর সহাস্য বদন দেখাইতেছেন, কখন মঙ্গলহস্ত বিস্তার করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, কখন রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পাপাত্মাদিগকে প্রহার করিতেছেন। সাধক, তুমি অনেক সাবধানতার সহিত ব্রহ্মের নিরাকারত্ব রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলে, কিন্তু তোমার পুরাতন অভ্যাসবশতঃ তোমার মন গোপনে নানাবিধ পরিমিত দেব দেবী গঠন করে। তুমি নিজের বুদ্ধি বলে তোমার মনের জঞ্জাল দুর করিতে যত চেষ্টা কর না কেন তোমার ভিতরের পৌত্তলিকতা নির্ম্মাণের কল সহজে বন্ধ হইবে না। তুমি বাহিরের কুমরটুলীর সমুদয় দরজা বন্ধ করিলে কিন্তু তোমার মনের কুমরটুলীতে পুতুল নির্ম্মিত হইতে লাগিল। হস্ত পুতুল গঠনে ক্ষান্ত হইল, কিন্তু তোমার মন নানা মূর্ত্তি গঠন করিতে লাগিল। যখন যে প্রকার পুতুলের প্রয়োজন তোমার মন তখনই সেই প্রকার পুতুল নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। এই জন্য বলিতেছি, ব্রাহ্মগণ, খুব সাবধান হও। যে সকল ব্রাহ্ম আপনাদিগকে পরীক্ষিত ও সিদ্ধ মনে করেন তাঁহাদেরও মনের ভিতরে দুই একটি কল্পনার পুতুল দেখা দেয়। এই জন্য মানুষ সর্ব্বদা আপনাকে ঈশ্বরের অনন্ত ভাবের টানের মধ্যে ছাড়িয়া দিবে। ঈশ্বর চিন্তা করিলেই মন স্বভাবতঃ অনন্তের দিকে আকৃষ্ট হয়। এক অনন্ত মহাপুরুষ ক্ষুদ্র মানুষকে উর্দ্ধে আকাশের দিকে টানিতেছেন। যে ভূমা পূজা করে তাহার নিশ্চয়ই উর্দ্ধে গতি। যে অনন্ত ভূমার আকর্ষণে আপনাকে না ফেলিয়া নিজ বুদ্ধির উপর নির্ভর করে সে বাল্য সংস্কার বশতঃ নীচ ভূমিতে পতিত হয়। ব্রহ্মপুরাণ লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী, মহাদেব প্রভৃতি ব্রহ্মের বিবিধ রূপ প্রকাশ করিল, এখন হে ব্রহ্মসাধক, তুমি ব্রহ্মোপনিষদের সাহায্যে এই লক্ষ্মী, সরস্বতী, মহাদেব, কালী রূপ চারি মুক্তা মুখে লইয়া অনন্ত আকাশের দিকে উড়িয়া যাও। জ্ঞান শ্রী বৈরাগ্য শক্তি রূপ চারি মুক্তা চারিদিকে ছড়াইয়া দেও, দেখিবে অনন্ত আকাশে অনন্ত মুক্তামালা! অনন্ত আকাশ ব্রহ্মের বিচিত্র

স্বরূপের অনন্ত মুক্তামালা। মানসপক্ষী যখন উপনিষৎরূপ পক্ষ সহকারে ঊর্দ্ধে উড়িতে থাকে তখন সে অনন্ত আকাশে ব্রহ্মের বিরাট মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হয়। সেই আশ্চর্য্য অনন্ত ভূমা বিরাট মূর্ত্তি দেখিলে আর পুতুলের ধর্ম্ম সেই পক্ষীকে টানিতে পারে না। যিনি ঈশ্বরের আকাশ রূপ দেখিতে পান পৃথিবীর পরিমিত ধর্ম্ম তাঁহাকে নিম্ন দিকে টানিতে পারে না। উপ-নিষদের পাখী অনন্তের ক্রোড়ে আশ্রিত। আকাশ তাহার আবাস। ব্রহ্মের আকাশ রূপ ভাবিলে মনের মধ্যে সাকার হাত পা আসিতে পারে না। চেষ্টা করিয়া দেখ, আকাশ চিন্তায় কখন পরিমিত রূপ কল্পনা করিতে পারিবে না। যত দেহ বা আকার ভাবিবে, বড়ই হউক আর ছোটই হউক, প্রকাণ্ড আকাশ তাহা গ্রাস করিয়া ফেলিবে। অনন্ত আকাশ ভাবিলে চক্ষু কর্ণ হস্ত পদ কিছুই ভাবা যায় না। যদি আকাশস্বরূপ ব্রহ্মের চক্ষু ভাব সেই চক্ষুই বিস্তীর্ণ অনন্ত আকাশ হইয়া যাইবে। নিরাকার চক্ষু অনন্ত অনাদি চক্ষু। আকাশ চক্ষু, আকাশ হস্ত ভাবিলে সাকার লক্ষণ অবলম্বনের কোন দোষ স্পর্শে না। কেবল উপমা বুঝায়। অসীম আকাশ-স্বরূপ এ কথা বলিলে মূর্ত্তি পূজার দোষ পড়ে না। আকাশ নিরাধার। আকাশের রূপ রস শব্দ গন্ধ নাই। আকাশ অচল অটল অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন। এই জন্য বেদান্তে ভগবানের এক নাম আকাশ, অর্থাৎ তিনি কোন সাকার বস্তুর ন্যায় নহেন। তিনি "নেতি নেতি।" যাহা কিছু দেখি-তেছি শুনিতেছি ইহার কিছুই তিনি নহেন, তিনি শূন্য আকাশ। আকাশরূপ ভূমা প্রকাণ্ড বিরাট মূর্ত্তি মহাদেব আমাদের উপাস্য দেবতা। যদি তাঁহার এই মূর্ত্তি চিন্তা কর মনে কোন প্রকার দ্বিধা অথবা চিত্তবিভ্রম জন্মিবে না। বাস্তবিক ঈশ্বর যে ঠিক আকাশের ন্যায় শূন্য তাহা নহে। তিনি পরম বস্তু পরম সত্য। নিরুপম যিনি তাঁহার তুলনা কোথায়? কোন বস্তুর সঙ্গে তাঁহার তুলনা হয় না, আকাশের সঙ্গেও তাঁহার সাদৃশ্য নাই। পরন্তু সেই উপাধিহীন আকারবিহীনবস্তুর যদি কোন উদাহরণ আবশ্যক হয় তবে ব্রহ্মকে আকাশস্বরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে তিনি বস্তুতঃ আকাশ নহেন। সাধনার সময় ব্রহ্মকে আকাশস্বরূপ ভাবিলে সাকার মূর্ত্তি কল্পনা অসম্ভব হয়। আকাশ

আপন স্বভাববলে সাধককে সকল প্রকার পৌত্তলিকতার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া ঊর্দ্ধে টানিয়া লইয়া যাইবে। ঈশ্বরকে অনন্ত আকাশস্বরূপ ভাবিলে কোন প্রকার পরিমিত দেবতা কল্পনা করা অসম্ভব। এই জন্য যোগীদের মধ্যে আকাশ নামের এত গৌরব ও আদর। ইহা ভাবিয়া তাঁহারা ব্রহ্মকে আর সকল বস্তু হইতে স্বতন্ত্র করিতে পারেন। আর দেখ এই অসীম আকাশকে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। যখন ছাদের উপরে উঠিয়া অসংখ্যগ্রহনক্ষত্রখচিত আকাশের ভিতরে সেই গম্ভীর বিরাট মূর্ত্তি ঈশ্বরকে দেখি তখন শরীর মন বিস্ময়াপন্ন ও স্তম্ভিত হয়। অসীম ব্রহ্মবিস্তৃতি মধ্যে ক্ষুদ্র জীবাত্মা একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। যদি ব্রহ্মকে অনন্ত আকাশ রূপে ভাব তাহা হইলে সাকার কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া সার সত্য গ্রহণ করিতে পারিবে। হে ব্রাহ্ম, এই সাধন প্রণালী অবলম্বন কর। উপযুক্ত রূপে আকাশ সাধন করিলে কোন প্রকার মূর্ত্তিভ্রান্তির ভয় থাকিবে না। ব্রহ্মকে আকাশরূপ জানিয়া সংসারে বিচিত্র হরিলীলা দেখ, কোন ভয় নাই। উদাসীন ব্রহ্ম আকাশস্বরূপ, এই সত্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া প্রেমময়ীর অনন্ত করুণা ভোগ কর। হরি অনন্ত আকাশে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। আকাশ বিষ্ণুপদ, উহা সর্ব্বব্যাপী হরির আবাস স্থান। ক্ষুদ্র কি বৃহৎ কোন আকারে তিনি বদ্ধ হয়েন না। মূর্ত্তি গঠন কর, তিনি উহা ভেদ করিয়া আকাশে চলিয়া যাইবেন। প্রাচীর নির্ম্মাণ কর, উহা উল্লঙ্ঘন করিয়া ভূমা মহাদেব মহাকাশে বিলীন হইবেন। আমরা ঈশ্বরের কোমল প্রেমের জন্য তাঁহাকে মা বলি বটে; কিন্তু যাঁহাকে আমরা মা বলিতেছি তিনি অসীম আকাশে পরিব্যাপ্ত। আমাদের মা কি ক্ষুদ্র মা? মাকে আমার পর্ণকুটীরে সংসারের কার্য্য করিতে স্বচক্ষে দেখিলাম; কিন্তু তিনি কি কেবল আমার পর্ণকুটীরে বদ্ধ? পুরাণে লক্ষ্মী সরস্বতী মহাদেব কালী পাইলাম বলিয়া কি ঈশ্বর পরিমিত? ইহাঁরাই তো বেদান্ত শাস্ত্রে চিদাকাশ ব্রহ্মরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। আমি ছোট বলিয়া কি আমার দেবতাও ছোট? সাড়ে তিন হাত মানুষ কিন্তু দেবতা আধ হাত! কনিষ্ঠ অঙ্গুলী পরিমাণ! কি আশ্চর্য্য! যিনি বৃহৎভূমা তিনি ক্ষুদ্র মনুষ্য অপেক্ষা ছোট হইলেন! সর্ব্বব্যাপী অনন্ত আকাশ-

ব্যাপী ব্রহ্মকে কে ভাবিতে পারে? এই অনন্ত চিদাকাশে, হে ব্রাহ্ম, তুমি সাঁতার দাও, ডুব সাঁতার দাও, চিত সাঁতার দাও। ইহার মধ্যে অবিশ্রান্ত বিচরণ কর, খেলা কর। এই আকাশ মূর্ত্তি, এই বিরাট মূর্ত্তি ধ্যান কর, চিন্তা কর, পূজা কর। দেখ প্রকাণ্ড আকাশরূপ ব্রহ্ম মস্তকের উপরে। যত ক্ষণ না ঐ চিদাকাশের গুরুত্ব অনুভব করিবে তত ক্ষণ হৃদয়ের লঘুতা ক্ষুদ্রতা অসারতা ও নীচতা যাইবে না। এবং হৃদয় লঘু থাকিলেই জানিবে ব্রহ্মপূজা পূর্ণ হয় নাই। ব্রহ্মের গুরুত্ব অনুভূত না হইলে উপাসনার পূর্ণতা হয় না। গম্ভীর বিরাট মূর্ত্তি না দেখিলে হৃদয়ের লঘুত্ব যায় না। প্রকৃত বিশ্বাসী দেখিতে পান এবং সর্ব্বদা অনুভব করেন এক প্রকাণ্ড অনন্ত ব্রহ্ম চারিদিক্ হইতে তাঁহাকে চাপিয়া আছেন। যে আকাশকে শূন্য মনে করে, যে আকাশের মধ্যে সেই গম্ভীর বিরাট ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না সে নাস্তিক প্রায়। তুমি যখনই বলিবে, "আছ ঈশ্বর" তৎক্ষণাৎ এক আকাশব্যাপী অনন্ত সত্ত্বার গুরু ভারে তোমার বুক আক্রান্ত হইবে এবং সমুদায় মনের উপর ভার পড়িবে। ভারের অর্থ কি? ব্রহ্মের বিরাট মূর্ত্তির গুরুত্ব। সেই বিরাট মূর্ত্তি বিশ্বম্ভর মূর্ত্তির সত্তা অনুভূত না হইলে উপাসনা সাধন সকলই লঘু ও অসার বোধ হয়। যদি অনন্ত আকাশে অনন্ত পুরুষকে দেখিতে পাও হৃদয় আপনাপনি গুরুভারে অবনত হইবে। প্রকৃত ব্রহ্মের তুলনায় কোন বস্তুকে ভার বলিয়া বোধ হইবে না, সহস্র মন লৌহ কিম্বা পাথর ওজনে এক ছটাকও হইবে না। ব্রহ্মের গুরুত্বের নিকট কি লৌহ প্রস্তরের গুরুত্ব আছে? তিনি সার বস্তু আর এ সকল অসার ছায়াবৎ। ব্রহ্ম পদার্থের গুরুত্ব যাঁহারা বুঝিয়াছেন তাঁহারা জানেন তাহার কি ভয়ানক ভার। সেই গুরুত্বের অণুমাত্র হৃদয়ে অনুভূত হইলেই হৃদয়ের প্রেম আপনাআপনি উথলিয়া উঠে। তুমি সোলা জলে ভাসাও, জল সোলাকে গ্রাহ্যও করে না, জল সোলার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না; কিন্তু জলে লৌহ কিম্বা পাথর ফেল, আপনাপনি জলের উচ্ছ্বাস হইবে। তেমনি যখন পরম বস্তু ব্রহ্ম মানব হৃদয়ে আপনার গুরুতর সত্তা লইয়া প্রবেশ করেন তখন গুরুভার বশতঃ আপনা হইতে প্রেমভক্তি উচ্ছ্বসিত হয়। যখন একটি গুরুতর পদার্থ পাইলাম, ক্রমশঃ তাহা গভীরতর গাঢ়তর অনুরাগের সহিত ধারণ করিতে চেষ্টা

করিলাম। তাহা ধারণ করিতে করিতে হৃদয়ের ভিতর হইতে গভীর প্রেমানন্দ উথলিয়া উঠিল। বিরাট মূর্ত্তি ভাবিলে হৃদয় মহৎ হইয়া উঠে, হৃদয়ে উচ্চ ও গুরু ভাবের সঞ্চার হয়। আত্মা পরমাত্মার গুরুত্ব বুঝিয়া স্বীয় লঘুত্ব ছাড়িয়া দেয়। আত্মার উপরে ভূমা পরব্রহ্মের যে গুরুভার পড়িল, সে কোন বস্তুর ভার নহে, সে নিরাকার আকাশের ভার। নিরাকার ভার অতি ভয়ানক ভার, উহার ভারে সমস্ত জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। উপাসনা সাধনভজন গভীর হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, হৃদয় প্রেমাচ্ছন্ন হয়, বৈরাগ্য ও বিবেক ঘনতর ও দৃঢ়তর হয় এবং ধর্ম্মোৎসাহ ও ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রবলতর হয় এবং সমস্ত ধর্ম্মজীবন ঘনীভূত হয়। গুরুভারাক্রান্ত সাধক আনন্দের সহিত তখন বলিয়া উঠেন, হরি হে এতদিনে বুঝিলাম তোমার প্রেম পুণ্যের তোমার জ্ঞান শক্তির কি ভার। বাস্তবিক ঈশ্বর আকাশের ন্যায় শূন্য অথচ অনন্ত গুরুত্বে পূর্ণ। তুমি যত এই নিরাকার আকাশের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিবে ততই তোমার মন মহৎ ও নির্ম্মল হইবে। তুমি দিনে নিশীথে, প্রত্যূষে ও সন্ধ্যাতে চক্ষু খুলিয়া আকাশস্বরূপ ব্রহ্মের পূজা কর, যতই আকাশের দিকে তোমার চক্ষু তাকাইবে ততই তুমি সংসারের নীচ কামনা ছাড়িয়া মহৎ হইবে এবং ক্ষুদ্র বস্তু ছাড়িয়া ভূমাতে আবদ্ধ হইবে। তুমি দেখিবে যে ঐশ্বর্য্যশালী ভগবান্ সমস্ত আকাশে আপন মহিমা মধ্যে বসিয়া আছেন। তাঁহার নাম নাই, আকার নাই, কেবল সত্তা মাত্র। আকাশ তাঁহার মুখ, আকাশ তাঁহার চক্ষু, আকাশ তাঁহার হস্ত, আকাশ তাঁহার চরণ, আকাশ তাঁহার রূপ, আকাশ তাঁহার মূর্ত্তি। এই অনন্ত আকাশ রূপ ব্রহ্মকে লক্ষ্মী, সরস্বতী, মহাদেব, কালী রূপে ভাবিলাম। দেখিলাম পরিমিত লক্ষ্মী, ক্ষুদ্র সরস্বতী, সাকার মহাদেব, সীমাবিশিষ্ট কালী মনে আসিল না, কিন্তু বিশ্বাস চক্ষে অনন্ত রূপিণী লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী, মহাদেব মূর্ত্তি দেখিলাম, শরীর ভক্তিভরে অবনত হইল, মন প্রণত হইল। এই অখণ্ড অনন্ত আকাশ রূপ ব্রহ্ম দর্শনে মানুষের সদ্গতি, ইহাতেই জীবের পরিত্রাণ।

সেবকের নিবেদন।

বিধাতার লেখা।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ৩২ শে শ্রাবণ, ১৮০২ শক।

অদৃষ্ট কি? লোকে যাহাকে কপাল বলে ভাগ্য বলে তাহা কি বাস্তবিক সত্য। যাহা কপালে আছে তাহা হইবেই হইবে এই যে সাধারণের উক্তি ইহা কি সম্পূর্ণ অমূলক না ইহার ভিতরে কোন যুক্তি নিহিত আছে? ব্রাহ্মেরা কি অদৃষ্ট মানিতে পারেন? অদৃষ্টবাদ কি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অনুমোদিত না ইহার বিরুদ্ধ? অদৃষ্টবাদ কি মনুষ্যের স্বাধীনতা হরণ করে না? উহা কি ঈশ্বরের প্রতি অবিচার দোষারোপ করে না? এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে না পারিয়া অনেকে শান্তি হারাইয়াছেন। সাধারণ লোকে মনে করে, ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা যখন ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করেন তখন সমুদয় সৃষ্ট বস্তুর ললাটে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলি লিখিয়া দেন, সেই লিখিত স্থিরীকৃত বিধি অনুসারে বিশ্ব সংসার চলিতেছে। বিধাতার সেই লেখা অনুসারে আকাশে চন্দ্র সূর্য্য এবং গ্রহ তারা এবং পৃথিবীতে নরনারী ও যাবতীয় জীব স্ব স্ব কার্য্য সাধন করিতেছে। জনসমাজে কেহ রাজা হইতেছে, কেহ দরিদ্র হইতেছে, কেহ বড় হইতেছে, কেহ ছোট হইতেছে, কেহ সাধু হইতেছে, কেহ অসাধু হইতেছে, এ সমস্ত সেই বিধাতার খেলা! কেহ ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ করিল, কেহ ধন মান সকলই হারাইয়া পথের কাঙ্গাল হইল, কেহ মহোল্লাসে সম্পদের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে লাগিল, কেহ রোগ শোকে কাতর হইয়া পরিশেষে মৃত্যু গ্রাসে পড়িল লোকে বলে এ সমস্ত বিধির লেখা। ঈশ্বর যদি কেবল সৃষ্টিকর্ত্তা হইতেন

তাহা হইলে অদৃষ্টবাদীদিগের এই কথা গ্রাহ্য হইত, অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে যদি বিশ্বের এখন কোন সম্পর্ক না থাকিত তাহা হইলে সৃষ্টির সময় সমুদায় ব্যবস্থা স্থির করিয়া লিখিয়া রাখা সম্ভব মনে হইত। কিন্তু আমরা ব্রাহ্ম হইয়া এরূপ সৃষ্টির মত মানি না। আমরা ঈশ্বরকে কেবল সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। তিনি ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়া এখন নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। সৃষ্টির সময় একবার তিনি যাহার সম্পর্কে যে বিধির নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন, সে সেই বিধি অনুসারে চিরকাল চলিতে লাগিল, তাঁহার সঙ্গে আর তাহার কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক রহিল না, আমরা এ মতকে কদাচ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। তিনি সৃষ্টির সময় কতকগুলি নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছেন আর তাহাতেই এই প্রকাণ্ড বিশ্ব কল চলিতেছে, ঈশ্বর নিজে আর এ বিশ্ব চালাইতেছেন না, এখন তাঁহার সঙ্গে জনসমাজের কোন সংশ্রব নাই। এ কথা নিতান্ত অমূলক। আদিম মানবকে ঈশ্বর যাহা বলিয়াছিলেন তাহার কপালে যাহা লিখিয়া দিয়াছিলেন সেই পুরাতন বিধি অনুসারে সমুদায় মানব সন্তান বংশপরম্পরা চলিয়া আসিতেছে; সেই আদি মানবের সঙ্গে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল এখন আর কাহারও সঙ্গে তাঁহার তেমন প্রত্যক্ষ যোগ নাই; ব্রহ্মবিশ্বাসীরা এই অসত্যের প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারেন না। আমরা পরিষ্কার চক্ষে দেখিতেছি, ঈশ্বর কেবল আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াই ক্ষান্ত হন নাই; কিন্তু তিনি প্রত্যেক শুভ কার্য্যের কর্ত্তা হইয়া নিত্য আমাদের সঙ্গে কার্য্য করিতেছেন এবং প্রত্যেক শুভ ঘটনা স্বয়ং সংঘটন করিতেছেন। আমরা বিশ্বাসনয়নে দেখিতেছি, ঈশ্বর নির্লিপ্ত হইয়াও জনসমাজে থাকিয়া কল্যাণ সাধন করিতেছেন। আমরা তাঁহার কর্তৃত্ব অস্বীকার করিতে পারি না। ক্রিয়াশীল ঈশ্বরকে মানিতে হইলে পুরাতন অদৃষ্টবাদ অসত্য বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে। যিনি দূরস্থ অথবা অবর্ত্তমান তিনিই লিখিয়া দেন, কিন্তু যিনি স্বয়ং কর্ত্তা, যিনি প্রাণের মধ্যে নিত্য বর্ত্তমান তিনি কেন লিখিবেন? সকলেই জানেন দূরস্থ ব্যক্তিরা লেখে কিন্তু কর্ত্তা বর্ত্তমান থাকিলে সে স্বয়ং কার্য্য করে।

ঈশ্বর যখন সংসার মধ্যে নিজ কল্যাণময়ী ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছেন তখন লেখার প্রয়োজন কি? যাঁহার শক্তি কার্য্য করিবে তিনি লেখনী ধারণ করিবেন কেন? যিনি বিধাতা হইয়া বর্ত্তমান কালে সমুদায় বিধান করেন তিনি ভবিষ্যৎ ঘটনার লেখক হইবেন কেন? বিধাতার অনুষ্ঠানে লেখকের ব্যবসার স্থান পায় না। লেখা ও করা বিধাতার পক্ষে একই। বিধাতা পুরুষ জীবের কপালে বিধি লেখেন ইহা যদি মানিতে হয় তাহা হইলে তিনি প্রতি মিনিটে লেখেন ও করেন ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ঈশ্বর আমাদিগের সৃষ্টিকর্ত্তা, ঈশ্বর আমাদিগের বিধাতা। তিনি ভূত কালে সৃজন করিয়াছেন, তিনিই বর্ত্তমান কালে বিধি স্থাপন করেন, এবং নিজেই বিধাতা হইয়া সেই বিধি পূর্ণ করেন। তিনি জগৎ সৃজন করেন, তিনি জগৎকে নিয়মিত করেন এবং তিনি কর্ত্তা হইয়া স্বহস্তে জগৎ পরিচালিত করেন। তিনি কেবল পুস্তক রচয়িতা নহেন, তিনি কেবল আমাদের কপাল-পুস্তক লিখিয়া দিয়া চুপ্ করিয়া বসিয়া আছেন তাহা নহে; কিন্তু যাহা কপালে লিখিয়া দিয়াছেন তাহা নিজে ঘটাইতেছেন, অথবা যাহা স্বয়ং কর্ত্তা হইয়া ঘটাইতেছেন তাহাই আমাদের জীবনে লিখিত হইতেছে। ঈশ্বরের সম্পর্কে ভূত ভবিষ্যৎ নাই; তিনি ভূতকালে লিখিয়া দিয়াছেন, এখন আর লেখেন না ইহা হইতে পারে না। তিনি ক্রমাগত ঘটনা লিখিতেছেন। যিনি চির বর্ত্তমান তিনি আর ভবিষ্যতের জন্য লিখিয়া দিবেন কি? ঈশ্বর তো আর পৃথিবী ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যান নাই যে তিনি পূর্ব্বেই সমস্ত ব্যবস্থা স্থির করিয়া দিবেন। পৃথিবীর মহাজনেরা বিদেশে চলিয়া যাইবার সময়;বিষয়ীরা পরলোকে যাইবার সময় আপন আপন সন্তানাদির জন্য বিষয়াদি স্থির করিয়া লিখিয়া দেয়। কিন্তু ঈশ্বর কিপৃথিবী ছাড়িয়া কোথায়ও চলিয়া গিয়াছেন? মৃত্যুর পর সন্তানেরা তাঁহার ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হইবে এই জন্য তিনি কি পূর্ব্বেই সমস্ত ব্যবস্থা লিখিলেন? কি আশ্চর্য্য, কি ভয়ানক মত! লেখা কোথায়? কলম কেন? হস্ত বল। তিনি বিশ্বাসীদের হস্ত ধরিয়া আপনি কার্য্য করান। যাহা কিছু সৎকার্য্য সকলই ঈশ্বর করান। যেমন কোরাণে লিখিত আছে;—

"হে মানব ! তোমার যে কোন মঙ্গল হয়, তাহা ঈশ্বর হইতে এবং যে কোন অমঙ্গল হয়, তাহা আপনা হইতে !" মনুষ্য যাহা করে তাহার জন্য ঈশ্বর দায়ী নহেন। যাহা শুভকর, যাহাতে জীবের কল্যাণ হয়, যাহাতে স্বর্গ রাজ্যের স্থাপন ও বিস্তার হয়, যাহাতে অসাধু জগৎ সাধু হয় সে সমস্ত ঈশ্বর করেন। ঈশ্বর কেবল লিখিয়া দেন না, কিন্তু তিনি যাহা লেখেন তাহাই করেন অথবা যাহা করেন তাহাই লেখেন। তিনি আমাদের প্রাণের ভিতরে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া যে সকল কার্য্য করেন তাহাই তাঁহার লেখা। সমস্ত বিশ্ব তাঁহার হস্তের রচনা। জগৎ সৃজন ও জগৎ লেখা একই। মানুষের হিতের জন্য তিনি যে সকল শুভ অনুষ্ঠান করেন তাহাই তাঁহার লেখা। তাঁহার কীর্ত্তি তাঁহার পুস্তক। তিনি যাহা করেন তাহাতে কেহ বাধা দিতে পারে না। বিধাতার লেখা কেহ খণ্ডন করিতে পারে না। কিন্তু বিধাতা কাহারও কপালে পাপ লেখেন না। পুণ্যময় বিধাতা কেবল পুণ্যই লেখেন। পুণ্যহস্ত কিরূপে পাপ লিখিবে? পাপ মানুষ লেখে, মানুষ করে। বিধাতার সঙ্গে পাপের কিঞ্চিন্মাত্র সংস্রব নাই। সুতরাং যাহা বিধাতা লেখেন না তাহা অনতিক্রমণীয় নহে। ঈশ্বরের রাজ্যে পাপ অনিবার্য্য হইতে পারে না। যেখানে পুণ্যের তেজ, যেখানে বিশ্বাস ভক্তি ও যোগের বল সেখানেই বিধির অখণ্ড্য লেখা। পাপ হইতেও পারে না হইতেও পারে। উহা যে হইতেই হইবে এমন কিছু বিধি নাই। এ পৃথিবীতে কাহারও অধর্ম্ম করিতেই হইবে এমন লেখা নাই। পুণ্য অনিবার্য্য, ঈশ্বর উহা লেখেন, উহা অবশ্যই হইবে। যেখানে বিধাতার লেখা সেখানে প্রবলবেগে ব্রহ্মের সুদর্শন চক্র ঘুরিতে থাকে। ঈশ্বরের বল যখন চক্রের ন্যায় ঘুরিতে থাকে তখন জানিবে ইহা নিশ্চিত বিধির লেখা ইহা বারণ মানিবে না। একবার যাহার হৃদয়ে বিধাতা প্রবেশ করিয়াছেন তাহার সাধ্য নাই যে সে বিধাতার কার্য্যে বাধা দেয় অথবা বিধাতার লেখা লঙ্ঘন করে। বিধাতা যাহার সম্পর্কে যাহা লিখিতেছেন তাহার তাহা হইবেই হইবে। তিনি কাহারও কপালে যোগ লিখিয়া দিতেছেন কাহারও অদৃষ্টে ভক্তি লিখিয়া দিতেছেন। তাহাদিগের পক্ষে যোগভক্তি অনিবার্য্য। কপালের লেখা বাস্তবিক

কপালের লেখা নহে। মনুষ্যের সমস্ত আত্মাতে, সমস্ত শরীরে, রক্ত দ্বারা বিধাতা অস্থির মধ্যে লিখিয়া দেন। এ লেখাকে মানুষ অতিক্রম করিতে পারে না, এ দুর্জ্জয় বিধিকে মানুষ পরাজয় করিতে পারে না। কে বিধাতার সঙ্গে যুদ্ধ করিবে? যাহা বিধাতা লেখেন তাহা হইবেই হইবে। পৃথিবী সহস্র প্রকারে উৎপীড়ন করুক না কেন, রাশি রাশি বিঘ্ন বিপত্তি আনিয়া দিক না কেন বিধাতা যাহার সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন তাহা সে করিবেই করিবে। যাহার হৃদয়ে ঈশ্বর দয়া লিখিয়া দিতেছেন, সে সহস্র প্রতিবন্ধক পাইলেও প্রাণ দিয়া পরের দুঃখ মোচন করিবে। যাহার জীবনে বিধাতা ধর্ম্মপ্রচার ব্রত লিখিয়া দিতেছেন সে আত্মীয় বন্ধুদিগের ভয়ানক প্রতিকূল আচরণ সত্বেও তাহার আপনার প্রাণ মন ধর্ম্মপ্রচারে অর্পণ করিবে। ব্রহ্মাণ্ডপতির বিরুদ্ধে পৃথিবী দাঁড়াইবে? মানুষ, তুমি কে যে বিধাতার কার্য্যে বাধা দিবে? বিধাতার বল ভিন্ন তুমি কিছুই করিতে পার না তুমি একটি ভ্রাতার দুঃখ মোচন করিতে পার না যদি তোমার হৃদয়ের ভিতরে বিধির বল না আসে। যখন বিধাতা ক্ষুদ্র মানুষের ভিতরে প্রবেশ করেন তখন সেই মানুষ আপনার ক্ষীণতা ও দুর্ব্বলতা পরিহার করিয়া সহস্র সিংহের মহা পরাক্রমের সহিত বিধাতার ইচ্ছা পালন করে। বিধাতার অভিপ্রায় এবং বল ভিন্ন পৃথিবীতে কোন শুভ ঘটনা ঘটে না। তিনি আমাদের সংসারে জাগ্রৎ জীবন্ত ভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া সমুদয় শুভকার্য্য সংঘটন করিতেছেন। অভিনয়ক্ষেত্রের পশ্চাতে সেই অনন্ত পুরুষ দণ্ডায়মান থাকিয়া গোপনে আপন অভিপ্রায় সাধন করিতেছেন। ইতিহাসের সমস্ত ঘটনাপুঞ্জে তাঁহার মঙ্গল হস্ত প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। বিশ্বাস নয়নে, সুতীক্ষ্ণ যোগদৃষ্টিতে সমুদয় সাংসারিক ঘটনার মধ্যে ঐ হস্ত দেখা যায়। প্রত্যেক শুভ ঘটনার মূলে তাঁহার শক্তি কার্য্য করে। দাম্ভিক মনুষ্য, তুমি মনে কর তুমি জগতে কল্যাণ সাধন করিতেছ; কিন্তু দেখ তুমি তোমার দয়াব্রত ছাড়িয়া দিলে বিধাতার অন্যান্য উৎসাহী সেবকেরা আসিয়া তোমার কার্য্য করিবে এবং তাঁহার অভিপ্রায় পূর্ণ করিবে। বিধাতা স্বয়ং রাজা এবং কর্ত্তা হইয়া সকল

মঙ্গল কার্য্য স্বহস্তে নির্ব্বাহ করিয়া লইবেন। হে অহঙ্কারী মানব; তুমি ভারতবর্ষের কুসংস্কার দূর করিবার ভার ছাড়িয়া দিলে কি আর কেহ ঐ কার্য্য করিবে না? বিধাতার ইঙ্গিতে সহস্র যুবা ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত হইবে। তুমি কে? বিধাতাই সকল কল্যাণের মূলীভূত কারণ। তিনি সকলের প্রাণের ভিতরে থাকিয়া তাঁহার অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিতেছেন। তিনি আমার বাক্ যন্ত্রের যন্ত্রী, আমি যে সকল সৎকথা বলিতেছি তাহার প্রত্যেক কথা তাঁহার কথা। যে দিন বলিব আমি নিজের বলে ও আমার নিজের বুদ্ধিতে শুভকার্য্য করি সে দিন আমি নাস্তিক হইব। প্রত্যেক শুভকার্য্য ব্রহ্ম করাইতেছেন। "আমি" বলিয়া যে এক ভয়ানক অহঙ্কারী আছে তাহার নিজের কোন শুভকার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। যখন আমি কোন শুভ কর্ম্ম করি তখন আমি আমার নহি, তখন আমি ঈশ্বরের। যখন মানুষ আপনার নীচ আমিত্ব পরিত্যাগ করে অর্থাৎ আত্মবিসর্জ্জন করে, তখন সে দেখিতে পায় স্বয়ং বিধাতা তাহার মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া আপনার অভিপ্রায় সকল পূর্ণ করিতেছেন। এই বঙ্গদেশে বিধাতা আসিয়া অলৌকিক ক্রিয়াসকল সম্পন্ন করিতেছেন। তাঁহার আবির্ভাবে নববিধানের প্রাদুর্ভাবে পুরাতন ভ্রান্তি কুসংস্কার ও অবিশ্বাস সকল ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে। সত্যের বল, বিধানের বল প্রবল তরঙ্গের ন্যায় আস্ফালন করিয়া বহুকালের সঞ্চিত অসত্য সকল দূর করিয়া দিতেছে। বিধাতার দুর্জ্জয় বলে এই দেশ টলমল টলমল করিতেছে। বিধাতার বল কি ভয়ানক! যেমন জলপ্লাবনে জল স্ফীত হয়, তেমনি মহাবেগের সহিত নববিধানের রাজ্য বিস্তার হইতেছে। সর্ব্বশক্তিমান্ বিধাতা এই নববিধানভুক্ত প্রতিজনকে বলিতেছেন,—প্রাণপণে আমার এই নূতন বিধান স্থাপন ও প্রচার কর। তিনি বঙ্গদেশের প্রতিজনকে বলিতেছেন,—নববিধান পূর্ণ কর। এই বিধাতা পুরুষ আমাদের সকলের মাথার উপরে নববিধানের গুরুভার স্থাপন করিয়াছেন, আমরা কি ইহা ফেলিয়া দিতে পারি? সাধকগণ, দেখ তোমাদিগের স্কন্ধে কে বসিয়া আছেন। স্বয়ং বিধাতা। তাঁহার লিখিত বিধি, তাঁহার শুভ ইচ্ছা পূর্ণ না করিয়া তোমরা কি ক্ষান্ত হইতে পার?

ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার সত্য রাজ্য স্থাপন করিতেছেন, তিনি যদি তোমাদিগকে যন্ত্র করেন, তোমরা কি অস্বীকার করিতে পার, না বাধা দিতে পার? যাহা কিছু ভাল সকলই তিনি নিজে করিতেছেন, তাঁহার জীবন্ত ধর্ম্ম-স্রোতে পড়িয়া বহুকালের পুরাতন জীর্ণ শীর্ণ অসাড় ভাব সমস্ত চলিয়া যায়। যাহাকে তিনি যে বিষয়ে প্রবৃত্ত করেন সে কিছুতেই তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না। তিনি বিশেষ বিশেষ লোকের কপালে বিশেষ বিশেষ বিধি লিখিয়া দেন, তাহা পূর্ণ হইবেই হইবে। তিনি ভিন্ন ভিন্ন লোককে বিভিন্ন আদেশ করিতেছেন, যথা,—তুমি প্রচারক হও; তুমি বৈরাগী হও; তুমি সপরিবারে যোগ সাধন কর; তুমি ধন ব্যয় করিয়া দয়াব্রত পালন কর এবং পরসেবায় সর্ব্বস্ব সম্প্রদান কর; তুমি রাজা হইয়া প্রজাদিগকে কুশল ও কল্যাণ দান কর; তুমি বিদ্যা দান করিয়া অজ্ঞানতিমির নাশ কর; এ সকল তোমার আমার কপালে লেখা। কপাল কি না ঈশ্বর দত্ত বিশেষ বল। সে বলকে আমরা প্রতিবাত করিতে পারি না। দৈব বল চাপিলে, বিধির কলম স্পর্শ হইলে আমরা আর অন্যথা করিতে পারি না। কপালে লেখা কি কেহ অতিক্রম করিতে পারে? যখন বিধাতা আমার মধ্যে প্রবেশ করিলেন তখন আমি দৈব শক্তি পাইলাম, আমি সহস্র সিংহের ন্যায় তেজস্বী হইয়া উঠিলাম; আমার উৎসাহাগ্নি এমনই প্রবলরূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল যদি শত্রুরা মহাসমুদ্রের সমস্ত জল ঢালে তথাপি তাহা নির্ব্বাণ হইবে না, এবং আমার ভক্তিসিন্ধু এমনই প্রবল বেগে উথলিয়া উঠিল, যে যদি ভয়ানক দাবাগ্নি প্রজ্বলিত কর তথাপি তাহা শুখাইবে না। জয় ধর্ম্মরাজ, জয় ধর্ম্মরাজ বলিয়া জিতেন্দ্রিয় হইয়া পৃথিবীকে জয় করিব, বৈরাগ্য অগ্নি লইয়া আসক্তিকে ভস্ম করিব। স্বয়ং বিধাতা লিখিতেছেন, আর ভয় কি? চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী। বিধাতা যাহা আমার মনের ভিতরে লিখিয়া দিতেছেন আমার কি সাধ্য যে তাহা লঙ্ঘন করি। তিনি লিখিয়া দিলেন বলিয়া দিলেন "ভক্ত তুমি এই উপাসনার পর চক্ষু খুলিলে সৃষ্টির মধ্যে আমাকে দেখিবে।" যেমন উপাসনা শেষ হইল ঘূর্ণিত নয়নে আমি আকাশের পানে তাকাইলাম চারি দিক হইতে এক প্রকাণ্ড নিরাকার বিধাতার বাহু আমাকে চাপিয়া

ধরিল। আমি উন্মীলিত নয়নে সমস্ত বিশ্ব মধ্যে সেই বিরাট মূর্ত্তি দেখিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন ;—"দেখ্‌রে বিধাতাসন্তান, তোর কপালে যাহা লিখিয়াছি তাহা কি লঙ্ঘন করিতে পারিস্ ?" বিধাতার বিধি কেহ খণ্ডন করিতে পারে না। যাহার সম্পর্কে বিধাতা যাহা লিখিয়া দেন ও করেন তাহার তাহা হইতেই হইবে। যখন বিধাতা জীবের কল্যাণ সাধন করেন সমস্ত পৃথিবী বাধা দিতে পারে না। বৈরাগী সর্ব্বত্যাগী সন্তানকে তিনি যদি খাওয়াইবেন মনে করেন কে প্রতিবন্ধক হইতে পারে? নিরাশ্রয় অবস্থাতেও সেই ভক্ত আশ্রয় পাইবে, এবং অসম্ভব হইলেও অন্নাচ্ছাদন লাভ করিবে। কেন না বিধাতার বিধি এইরূপ। ঘোর সংসারীরা যেখানে কিছুই করিয়া উঠিতে পারে না সেখানে আশ্চর্য্য অলৌকিক প্রণালীতে ভক্তকুলের ভরণপোষণ হয় এবং সমুদায় বিঘ্ন ও অভাব মোচন হয়। অনেকে বলে ভক্তের কপালে লেখা আছে, তাহার কল্যাণ হইবেই হইবে। বাস্তবিক হরি রাখিলে মারে কে? কপালে যদি বিধাতা ভক্তের শ্রীবৃদ্ধি লিখিয়া দেন এবং নিজ শক্তিতে তাহা করিয়া দেন লক্ষ লক্ষ শত্রু আক্রমণ করিলেও অন্যথা হইবে না। যাহাতে ভাল হয় ভক্তাধীন বিধাতা এরূপ করিবেনই করিবেন। মন্দ যাহা তাহাতে তাঁহার হস্ত নাই। ভাল হওয়া, সাধু সত্যবাদী হওয়া জিতেন্দ্রিয় বৈরাগী হওয়া, অনাসক্ত সংসারী হওয়া এ সমুদায় বিধির লেখা। মঙ্গলময় বিধাতা কখন অমঙ্গল লিখিতে পারেন না। মন্দ, অমঙ্গল, পাপ মানুষের। আমাদের ধর্ম্ম জীবনে, আমাদের সাংসারিক কার্য্যে জগতের সমস্ত হিতকর ঘটনাতে বিধাতার বিধান দেখা যায়। আবার উৎসব আসিতেছে, এই উৎসব আমাদের কপালে লেখা, বলা যাইতে পারে। যাঁহারা প্রকৃত বিধাতাকে মানেন তাঁহারা অবশ্যই দেখিতে পাইবেন উৎসবের আয়োজন স্বয়ং বিধাতাই করেন। ঈশ্বর আমাদের কপালে লিখিলেন,—উৎসবের স্বর্গীয় সুখে সুখী হও ; আমাদের ঐ সুখে সুখী হইতেই হইবে। উৎসবের আনন্দের জন্য সকলে প্রতীক্ষা কর!

সেবকের নিবেদন।

ব্রহ্মোৎসব।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার রাত্রি ৭ই ভাদ্র, ১৮০২ শক।

কোথায় মার সঙ্গে সন্তানের মিলন হইবে না পৃথিবীর বিবিধ সম্প্রদায়ের লোকে মার সঙ্গে সন্তানের বিবাদ ঘটাইয়া দিল। নানা প্রকার উপধর্ম্ম কুসংস্কার কুযুক্তি এই বিবাদ ঘটাইল। যে মা অতি উচ্চ অভিপ্রায় সাধন করিবার জন্য সাধু সন্তানদিগকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন মানুষ তাঁহার অভিপ্রায় না বুঝিয়া ঐ সন্তানদিগের সঙ্গে মার অনৈক্য সিদ্ধান্ত করিল। সন্তান প্রেরণের অভিপ্রায় কি? ঈশ্বর কি আপনার কার্য্য আপনি করিতে পারিতেন না। তিনি পৃথিবীতে সময়ে সময়ে যোগী, বৈরাগী, ভক্তদিগকে কেন প্রেরণ করেন? এই জন্য কি যে ঈশ্বরের দ্বারা যাহা হইতে পারে না তাহা তাঁহার সন্তান দ্বারা সম্পন্ন হইবে? পৃথিবীতে ব্রহ্মভক্তি, যোগ, বৈরাগ্য প্রভৃতি শিখাইবার বাস্তবিক খুব প্রয়োজন হইয়াছিল, সুতরাং তিনি সময়ে সময়ে এখানে যোগী, বৈরাগী, ভক্তদিগকে প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি নিজে কেন শিক্ষা দিলেন না? ঈশ্বর নিজে ঈশ্বরভক্তির দৃষ্টান্ত হইবেন কিরূপে? মা হইয়া তিনি মাতৃভক্তির দৃষ্টান্ত হইতে পারেন না। পিতা হইয়া ঈশ্বর নিজে পিতৃভক্তির দৃষ্টান্ত হইতে পারেন না। পিতা মাতার কিরূপ চরিত্র হওয়া উচিত তাহা তিনি দেখাইতে পারেন কিন্তু সন্তানের কর্ত্তব্য কি তাহা তিনি নিজ ব্যবহারে বুঝাইতে পারেন না। পিতার এমন পুত্র চাই যিনি জগৎকে পিতৃভক্তি শিখাইবেন, মার এমন কন্যা চাই, যিনি জগৎকে মাতৃভক্তি শিখাইয়া দিবেন। সন্তান গোপনে মার কাছে মাতৃ-

ভক্তি শিখিল বটে, কিন্তু প্রকাশ্যে সমুদায় ভাইভগ্নীদিগকে মাতৃভক্তি শিক্ষা দেয়। সেই মাতৃভক্ত সন্তানের সৎদৃষ্টান্ত দেখিয়া জগতের নরনারী মাকে ভক্তি করিতে শিক্ষা করে। মার প্রতি সন্তানের ভক্তির দৃষ্টান্ত না দেখিলে পৃথিবী সহজে মাকে ভক্তি করিতে পারে না। মা শিখাইতে পারেন মার ভাব। জননী হইলে সন্তানদিগের জন্য নিঃস্বার্থ প্রেম সহকারে দিবস রজনী কেমন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে হয়, জগতের জননী সেই দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন এবং কেমন অসাধারণ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে সন্তানদিগের সমস্ত অত্যাচার বহন ও অপরাধ ক্ষমা করিতে হয়, বিশ্ব-জননী তাহারও দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন; কিন্তু মাকে কিরূপে ভক্তি করিতে হয় তিনি তাহার দৃষ্টান্ত হইতে পারেন না। তিনি কাহাকে ভক্তি করিবেন? ঈশ্বরের আবার গুরু কে আছে যে তিনি তাহাকে ভক্তি করিবেন? অতএব মাতৃভক্তি শিখাইতে হইলে পুত্র চাই। ধর্ম্মের এক ভাগ উপরার্দ্ধ, অর্থাৎ পিতা মাতা রাজা, প্রভু প্রভৃতি গুরুজনের দিকে; আর এক ভাগ নিম্নার্দ্ধ অর্থাৎ পুত্র কন্যা প্রজা কনিষ্ঠের দিকে। ঈশ্বর পূর্ব্বার্দ্ধের দৃষ্টান্ত হইতে পারেন, শেষার্দ্ধের দৃষ্টান্ত মনুষ্য। পিতা মাতাদিগকে কিরূপ ভক্তি করিতে হইবে তাহা কেবল পুত্র কন্যারাই শিখাইতে পারে। এই জন্যই ঈশ্বর জগতে সময়ে সময়ে উচ্চ শ্রেণীর সাধক প্রেরণ করেন। পৃথিবীতে যে যুগে যুগে মহাপুরুষ, মহাত্মা, সাধু সকল আসেন তাহার অর্থ এই। তাঁহারা পৃথিবীতে আসিয়া কিরূপে অন্তরের সহিত সমস্ত প্রাণ দিয়া ঈশ্বরকে ভালবাসিতে হয়, পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হয় তাঁহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। পিতাকে ভাল বাসিলে, মাকে ভক্তি করিতে হইলে কেমন করিয়া মার স্বভাব রুচি ও ইচ্ছা জানিতে হয় এবং তাঁহার সঙ্গে কিরূপে নিগূঢ় প্রাণের যোগ স্থাপন করিতে হয় সেই সাধক এ সকল বিষয় শিক্ষা দেন। যেমন ভক্তের প্রয়োজন সেইরূপ কর্ম্মী অথবা সেবকেরও প্রয়োজন। মা যদি কর্ম্ম করিতে বলেন কায় মনো বাক্যে সেই কর্ম্ম সাধন করিতে হইবে, যদি তিনি আদেশ করেন, তাঁহার দুঃখী দুঃখিনী সন্তানদিগের দুঃখ মোচন করিতে হইবে। মার ইচ্ছাতে যেমন তাঁহার সন্তানদিগের সেবা করিবার জন্য নদ নদী অগ্নি বায়ু ফুল

ফল উৎপন্ন হয় সেইরূপ তাঁহার ইচ্ছাতে সাধু সেবকেরাও জন্ম গ্রহণ করেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতে উৎপন্ন সাধুগণ ঈশ্বরের এক একটি বিশেষ রূপ অথবা গুণ প্রকাশ করেন। ভ্রান্ত মনুষ্য সাধুদিগকে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অধিকতর সম্মান করে এবং মার সঙ্গে অনৈক্য করিয়া দেয়। কোথায় সকলে সেই এক মাকে ভক্তি করিতে শিখাইবে, তাহা না করিয়া সাধু সন্তানগুলিকে মার সিংহাসনে বসাইল এবং মাকে হাত ধরিয়া নীচে টানিয়া আনিল। ব্রাহ্মগণ, তোমরা কদাচ মার প্রতি এরূপ দুর্ব্যবহার করিও না। এই যে তোমরা নারদ ঈশা মুসা প্রভৃতির নাম করিতেছ, সাবধান, মা অপেক্ষা ইঁহাদের কাহাকেও বড় মনে করিও না। প্রভু অপেক্ষা দাসকে উচ্চতর জ্ঞান করিও না। সন্তান অপেক্ষা মাকে ছোট মনে করিও না। তোমরা ব্রাহ্ম হইয়া কদাচ সাধুদিগকে ঈশ্বর অপেক্ষা বড় অথবা ঈশ্বর তুল্য মনে করিতে পার না। তোমরা মাকে সাক্ষাৎ দেখিয়াছ, তাঁহার কোন পুত্রের ভিতর দিয়া তাঁহাকে দেখ নাই। পুত্রের পূজা করিয়া জননীর নিকটে আসিতে হয় নাই। কোন অবতার তোমাদের হাত ধরিয়া ব্রহ্মের নিকটে আনেন নাই। তোমাদের সঙ্গে মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। আমরা আগে মাকে পূজা করিয়াছি। তাঁহার কোন সন্তানকে পূর্ব্বে বিশেষরূপে চিনিতাম না। মাকে বলিতাম, তুমি যাহা করাইবে তাহাই করিব। তুমি যেখানে লইয়া যাইবে সেখানেই যাইব, তুমি যাঁহাদিগকে দেখাইবে তাঁহাদিগকে দেখিব। যাঁহাদিগকে সমাদর ও প্রীতি করিতে বলিবে তাঁহাদিগকে আদর ও প্রীতি করিব। পরে মা যখন তাঁহার এক একটি সাধু পুত্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিতে লাগিলেন তখন তাঁহাদিগকে চিনিতে লাগিলাম। বাস্তবিক যদি সত্য কথা বলিতে হয় ঈশ্বরের সাহায্য বিনা কেহ তাঁহার পুত্রকে চিনিতে পারেন না। মার সাহায্য বিনা কে তাঁহার সন্তানকে বুঝিতে পারে? ঈশ্বরের এক এক গুণ তাঁহার এক এক সন্তানের চরিত্রে অবতীর্ণ ও নিহিত। ব্রহ্মস্বরূপ মনুষ্যের পক্ষে দুর্ব্বোধ; কিন্তু যখন ব্রহ্মের একটি একটি গুণ সাধুর জীবনে প্রকাশিত হয় তখন জগতের লোক সহজে তাহা বুঝিতে ও সাধন করিতে পারে। এক একটি সাধু মার হৃদয়ের সন্তান, হৃদয়

হইতে উৎপন্ন, হৃদয়ে প্রতিপালিত হৃদয়ের স্তনা পানে পরিপুষ্ট। কেহ ব্রহ্মজ্ঞান হইতে প্রসূত। জ্ঞানেতেই তাহার জন্ম, জ্ঞানেতে পালিত ও পরিপুষ্ট। ঈশ্বরের এক এক দিক হইতে তাঁহার এক এক গুণ লইয়া এক এক সাধু জগতে অবতীর্ণ হন। তিনি সেই গুণটি প্রকাশ করিয়া জগতের কল্যাণ সাধন করেন। ঈশ্বরের কোমল দয়ার দিক হইতে যে সন্তান অবতরণ করেন তিনি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন সে দেশ তাঁহার দয়া-গুণে শীতল ও কোমল হয়। শ্রী গৌরাঙ্গের তনু হরি প্রেমে গঠিত তনু। ব্রহ্মের দয়া তাঁহাতে অবতীর্ণ হইয়া বঙ্গ দেশকে ভক্তিরসে অভিষিক্ত করিল এবং সহস্র সহস্র নরনারীকে প্রেমের পথে লইয়া গেল। চৈতন্যমাতা জগজ্জননীকে লইয়া যদি চৈতন্যকে দেখিতে যাও তাহা হইলে যথার্থ শ্রীচৈতন্যকে দেখিয়া কৃতার্থ হইবে। আর যদি পৃথিবীর চৈতন্যকে লইয়া মার কাছে যাও তাহা হইলে দুইয়ের কাহাকেও বুঝিতে না পারিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিবে। চৈতন্য যাঁহার সন্তান তিনি যদি স্বয়ং চৈতন্যকে চিনাইয়া না দেন তোমার কি সাধ্য যে তুমি ঐ ভক্তকে চিনিতে পার? মা প্রদীপ ধরিয়া তাঁহার সুপুত্রদিগকে না দেখাইয়া দিলে কেহই তাঁহাদিগকে দেখিতে পায় না। তাঁহার বাড়ীতে অগণ্য ঘর। এক এক ঘরে তাঁহার এক এক রূপ, এবং এক এক সাধু তাঁহার এক এক রূপের অবতার। যখন তিনি এক এক ঘরে লইয়া গিয়া প্রদীপ হস্তে করিয়া দেখাইয়া বলেন, এই ঘরে আমার ঈশা, ঐ ঘরে মূসা, এখানে চৈতন্য, ওখানে শাক্য, ওখানে যাজ্ঞবল্ক্য, তখনই আমরা তাঁহার সাধু সন্তানদিগকে দেখিতে পাই এবং চিনিতে পারি। তাঁহার এক এক শক্তি হইতে এক এক সাধু উৎপন্ন। তিনি সেই শক্তির পূজা করেন ও জগতে সেই শক্তিকে মহীয়সী করেন। বিশ্বজননীর নিকট শরণাগত হইয়া প্রার্থনা করিলে তিনি আমাদের হস্ত ধরিয়া আপনার সাধু সন্তানদিগের ভবনে লইয়া যান। এই জন্য সময়ে সময়ে আমাদের তীর্থ যাত্রা হয়। সেই তীর্থযাত্রা আর কিছু নয়, মা আদর করিয়া এ পৃথিবীর ভক্তদিগকে বৈকুণ্ঠবাসী সাধু তনয়দিগের সঙ্গে মিলিত করেন। মা নিজে সাধক সন্তানকে তাহার নিকটস্থ আত্মীয় বন্ধুর কাছে লইয়া যান। মার বাড়ীতে যখনই যাই মা তাঁহার ঘরের পার্শ্বে যত সাধু অধিবাস

করেন তাঁহাদিগকে দেখা করিয়া আসিতে অনুরোধ করেন। মার বাড়ীতে গেলেই তাঁহার সন্তানদিগকে দেখিয়া আসা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। যখনই কোন বিশেষ উৎসব উপলক্ষে মার বাড়ীতে যাই মা বলেন এলে যদি স্বর্গে তবে তোমার ভাই গুলিকে দেখে যাওনা। বাস্তবিক যদি পৃথিবী হইতে আকাশ অতিক্রম করিয়া স্বর্গে গেলাম তবে অর্দ্ধ হস্ত ব্যবহিত সাধুদের শান্তি নিকেতনে যাইব না কেন? আর যখন মার একান্ত ইচ্ছা যে সাধুদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় তখন আমরা সাধুদিগকে দেখা না করিয়া কিরূপে স্বর্গ হইতে ফিরিয়া আসিব? মার ইচ্ছা নয় যে আমরা তাঁহার কোন সাধু পুত্রের বিরোধী হই। মা ধরাধামে স্বর্গের কীর্ত্তি দেখাইতে ইচ্ছা করেন। মার ইচ্ছা যেমন স্বর্গেতে তেমনি পৃথিবীতে পূর্ণ হউক। বৈকুণ্ঠে যেমন তাঁহার সকল সাধু সন্তানের মধ্যে সুন্দর ঐক্য তেমনি পৃথিবীতেও হয় এই তাঁহার ইচ্ছা। সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য তিনি বর্ত্তমানকালে নববিধান প্রেরণ করিলেন। এই নব বিধানের জয় হইলে মার সঙ্গে সন্তানের বিরোধ থাকিবে না, এবং সন্তান-দিগের পরস্পরের মধ্যেও আর বিবাদ থাকিবে না। নববিধান আগে কোন বিশেষ সাধুর নিকটে না গিয়া একেবারে মার কাছে গেলেন। মার কাছে গিয়া নববিধান মার প্রাণের মধ্যে সমুদয় ধর্ম্মবিধান অথবা সমুদয় ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মিলন দেখিলেন! মার হৃদয়ের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান বৌদ্ধ, খ্রীষ্টিয় প্রভৃতি সমুদয় ধর্ম্মের ঐক্য দেখিলেন। জগ-জ্জননীর বক্ষের এক দিকে শুকদেব নারদ প্রভৃতি যোগী ঋষিগণ, অপর দিকে ঈশা, মুসা, চৈতন্য প্রভৃতি সাধুগণ। ইহাঁরা বিভিন্ন প্রকৃতির লোক, ইহাঁরা মার স্বভাবের বিচিত্রতার পরিচয় দিতেছেন। মা এক; কিন্তু তাঁহার রূপগুণ অসংখ্য। তিনি যেমন এক যদি তাঁহার রূপ গুণও এক প্রকার হইত তাহা হইলে তাঁহার সন্তানগুলিও এক প্রকার হইত। সমস্ত প্রেরিত মহাপুরুষ এক প্রকার হইতেন, একভাব প্রকাশ করিতেন এবং একই প্রকার কর্ম্ম করিতেন। পরস্পরের মধ্যে কিছুমাত্র বিভিন্নতা থাকিত না। মা এক; কিন্তু মার অনেক গুণ এবং অনেক রূপ আছে। সেই এক এক গুণ হইতে তাঁহার বিচিত্র রূপ সাধু সন্তান জন্মগ্রহণ করিতেছেন।

ঈশা একরূপ, চৈতন্য একরূপ, এবং অন্যান্য সাধুরা মার অন্যান্য রূপ প্রকাশ করেন। মার কোটি রূপ, অসংখ্য রূপ হইতে অসংখ্য প্রকার সাধু চরিত্র গঠিত হয়। পৃথিবী এত দিন বিভিন্ন সাধুদিগের মধ্যে এবং বিভিন্ন ভক্ত জীবনে বিভিন্ন হরিলীলা মধ্যে সামঞ্জস্য দেখিতে পায় নাই এই জন্য পৃথিবীতে এত বিরোধ এবং অনৈক্য। এখন নববিধান পৃথিবীতে আসিয়া বলিলেন ;—"আমি সঙ্কেত শিখিয়া আসিয়াছি, আমি সমুদয় বিরোধের মীমাংসা কিসে হয় তাহা জানিয়াছি। সমুদয় রোগের ঔষধ আনিয়াছি। জগজ্জননী এক ; কিন্তু তাঁহার রূপ অসংখ্য এবং গুণবিচিত্র এই জন্য সন্তানও বিচিত্রগুণ সম্পন্ন। বিরোধ নাই, কেবল বিচিত্রতা। "এতদিনের পর সমুদায় ধর্ম্মের মীমাংসা হইল। মাতৃক্রোড়ে সাধুসম্মিলন হইল।" স্বর্গীয় জননীর এক এক গুণের মধ্যে তাঁহার সেই গুণসম্ভূত শত শত সন্তানকে দেখিতে পাওয়া যায়। যদি মাব জ্ঞানস্বরূপ ভাবি তাহা হইলে সেই রূপের ক্রোড়ে সক্রেটিস্ প্রভৃতি সমুদয় জ্ঞানীদিগকে দেখিতে পাইব। তাঁহার ঘনীভূত জ্ঞানরূপের মধ্যে বাগ্দেবী সরস্বতীর ক্রোড়ে শত শত সুপণ্ডিত সন্তানকে দেখিতে পাইব। সেই জ্ঞানীরা জ্ঞানের সন্তান, ভক্তির সন্তান নহেন। জ্ঞানের পুত্র বলিয়া তাঁহাদিগকে আদর করিবে, কদাচ তাঁহাদিগকে প্রেমের সন্তান বলিয়া ভ্রান্তমত পোষণ করিও না। জ্ঞানী ও ভক্ত, সক্রেটিস ও চৈতন্য উভয়ই বিশ্বমাতার সন্তান বটে, কিন্তু যিনি জ্ঞানী তিনি জ্ঞান স্বরূপের পুত্র এবং যিনি ভক্ত তিনি প্রেমস্বরূপের সন্তান। এই প্রভেদ বুঝিতে না পারিয়া পৃথিবীর অশেষ অকল্যাণ হইয়াছে। যখন ঈশ্বরের জ্ঞানের ঘরে যাইবে তখন তাঁহার জ্ঞানী সন্তানদিগকে দেখিতে পাইবে। আবার জ্ঞানী বলিয়া তাঁহাদিগকে সমাদর করিবে। যখন তাঁহার প্রেমের ঘরে যাইবে সেখানে তাঁহার প্রেমিক ভক্ত সন্তানদিগকে দেখিতে পাইবে। তাঁহাদিগকে প্রেমপুত্র বলিয়া যথোচিত সম্মান দিবে। আবার যখন লক্ষ্মী মূর্ত্তির ঘরে যাইবে, কতকগুলি লক্ষ্মীর দয়াবান্ সন্তান দেখিতে পাইবে, দেখিবে, তাঁহারা গৃহস্থাশ্রমে সংসার ধর্ম্ম পালন করিতেছেন আশ্রিত দিগকে অন্ন বস্ত্র দিতেছেন এবং হতভাগ্যদিগের সৌভাগ্য বর্দ্ধন করিতেছেন। মার শক্তি যখন দেখিবে অমনি দেখিবে মায় কোলে শত শত

কর্ম্মী শক্তি সন্তান জগতের হিত সাধন জন্য নানাবিধ সাধুকার্য্য সম্পন্ন করিতে-ছেন এবং পরোপকারের ধর্ম্ম সাধন করিতেছেন। এইরূপে ঈশ্বরের এক একটি স্বরূপ ধর, এক একটি স্বরূপের অনুরূপ এক এক জন প্রধান সাধু দেখিতে পাইবে। ব্রাহ্মগণ, তোমাদিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না। নববিধান স্বর্গ হইতে মীমাংসার গূঢ় রহস্য জানিয়া আসিয়াছেন, তিনি তোমাদিগকে সকল তত্ত্ব বলিয়া দিবেন। নব বিধানের সাহায্যে সকলকেই তোমরা বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে। তাঁহারা তোমাদিগকে বন্ধু বলুন আর না বলুন তোমরা সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোককে তোমাদের আপনার মার সন্তান বলিয়া আদর করিতে পারিবে। হে নববিধানভুক্ত ব্রাহ্ম, তুমি কাহাকেও অনাদর করিতে পার না। তুমি দীন হীন সামান্য একটি ফকিরকেও অপমান করিতে পার না। যদি একটি ক্ষুদ্র ফকিরকে তুমি অবহেলা কর • মার বৈরাগ্য স্বভাবের অপমান হইবে। মাকে ভালবাসিলে তাঁহার সমুদয় সন্তানগুলিকেও ভালবাসিতে হইবে। আমরা সাধুবিশেষের পক্ষপাতী হইতে পারি না। আমরা কোন সাধুকে ঈশ্বরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অপরাধী হইতে পারি না। আমরা সর্ব্বাগ্রে মাকে ভাল বাসিয়াছি। এবং মার কথাতেই তাঁর সাধু সন্তানদের সেবা করিয়াছি। যদি মা বলিয়া না দিতেন, যদি মা দেখাইয়া না দিতেন তাহা হইলে আমরা এ সকল সাধুদিগের নামও উচ্চারণ করিতাম না। সাধুদিগের মধ্যে আমরা মার নানাপ্রকার শক্তি ও গুণ দেখিতেছি। এক এক মনুষ্যাধারে এক এক দৈবশক্তি। মাকে খুঁজিতে গিয়া সাধুভবনে আসিয়া পড়িয়াছি। আমরা মাকেই অন্বেষণ করিয়াছি, আমরা কোন সাধুকে অন্বেষণ করি নাই; কিন্তু এখন যখন মা তাহার সাধু সন্তানদিগকে শ্রদ্ধা করিতে বলিতেছেন তখন কিরূপে মার কথা লঙ্ঘন করিব? আমরা এখন মার। আমরা আর আমাদের নহি। আমাদের উপর আর নিজের কোন অধিকার নাই। মার হাতে সমস্ত প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছি। আমরা আগামী কল্য কি করিব কোথায় যাইব জানি না। মা যাহা করান তাহাই করিব। মা স্বাধীন, তিনি আমাদের সমুদায় প্রেম ভক্তি পাইয়াছেন, তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন; তাঁহার

উপর আমাদের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। তাঁহার ইচ্ছা হইলে তিনি আমাদিগকে পৃথিবীর কাঙ্গালদের বাড়াতে লইয়া যাইতে পারেন, কিম্বা তাঁহার সাধু দিগের স্বর্গীয় ভবনে লইয়া যাইতে পারেন। তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হইবে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, পৃথিবীর শুভ দিন আসিয়াছে। এই নববিধানে সমুদয় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক পরস্পরের গলা ধরা ধরি করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়াছেন। প্রেমময়ীর একান্ত ইচ্ছা আমরা তাঁহার সাধুসন্তানদের সঙ্গে মিলিত হই। সমুদয় ভাই গুলি সদ্ভাবে মিলিত হউক ইহা মার ইচ্ছা। মার সেই শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হউক!

সেবকের নিবেদন।

একাদশ ভাদ্রোৎসব।

আমার মা সত্য কি না?

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার ৭ই ভাদ্র, ১৮০২ শক।

তোমরা অনেক ভদ্র লোক এই মন্দিরে বসিয়া আছ। এই আনন্দের দিনে তোমরা সকলে মিলিত হইয়া উৎসব সম্ভোগ করিতেছ। তোমাদিগকে আজ একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছি। এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে কোন ক্ষতি নাই, বরং আমি বিবেচনা করি লাভের সম্ভাবনা। সে প্রশ্নটি এই;—তোমরা আমার মাকে দেখিয়াছ কি না? আমার মন জানিতে চায় তোমরা কেহ কি এই মন্দিরের ভিতরে আমার মাকে দেখিয়াছ? আমার জননীকে তোমরা এই বিশ্ব মধ্যে এই নগরের কোন স্থানে এই মন্দিরের মধ্যে কখন দেখিয়াছ? তোমরা বিশ্বজননীকে দেখিয়াছ কি না সাধারণ মনুষ্যমণ্ডলীর মাকে দেখিয়াছ কি না এই কথা বলিয়া আমার প্রশ্নকে শিথিল ও ক্ষীণ করিব না; কিন্তু আমার মাকে কি তোমরা কেহ দেখিয়াছ, অদ্যকার এই প্রশ্নের উত্তর দাও। মাতায় মাতায় বিরোধ উপস্থিত করিতেছি না। তোমাদের মা কি আমার মা নহেন? বিশ্ব জননীকি আমার জননী নহেন? পূর্ব্বাঞ্চলের মা কি পশ্চিমাঞ্চলের নহেন? প্রাচীন জগতের মা কি বর্ত্তমান জগতের মা নন? আর্য্য যোগী ঋষি এবং ভক্তদিগের মা কি তোমার আমার মা নহেন? সকলেরই স্রষ্টা এক, সে বিষয়ে কোন তর্কের সম্ভাবনা নাই। সমুদায় মনুষ্য পরিবারের একই মাতা। আমার প্রশ্ন তত্ত্ব সম্বন্ধীয় নহে, ভক্তি সম্বন্ধীয়। তোমরা ভক্তি ভাবে এই প্রশ্নের মীমাংসা কর। আমি যে এক জন লোক ক্রমাগত এই বেদী হইতে আমার মার মহিমা ঘোষণা করিয়াছি এবং তোমাদিগকে আমার সেই মার গুণের কথা শুনাইয়াছি। তোমাদিগকে এত দিন যে মার কথা বলিলাম তোমরা কি তাঁহাকে কখন দেখিয়াছ? এই মন্দিরের ভিতরে আমার মা লুকাইয়া আছেন। তোমাদিগের পার্শ্বে তিনি বসিয়া

আছেন। ঐ সঙ্গীতের স্থলে এবং ঐ অন্তঃপুরে যে মহিলারা বসিয়া আছেন তাঁহাদিগের সঙ্গেও আমার মা বসিয়া আছেন। কেহ কি তাঁহাকে দেখিয়াছ বল ঠিক করিয়া। এই বেদী হইতে এত বৎসর আমি যে মার কথা বলিলাম সেই মাকে কি তোমরা বিশ্বাস কর? তোমরা কি মনে কর একজন যাদুকর তাহার নিজের কল্পনা দ্বারা নানা প্রকার ঠাকুর নির্ম্মাণ করিয়া এই বেদী হইতে প্রতি সপ্তাহে সেই সকল নূতন নূতন ঠাকুরের মূর্ত্তি দেখাইয়া ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারে লোকের মন বিমোহিত করে? তোমরা কি মনে কর এই যাদুকরের কথার জালে শ্রোতাদের বুদ্ধি এমনি জড়িত হয় যে আর বিচার করিতে পারে না, এবং তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া মনোহর কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া উহার পূজা করে? আমি কি তবে এই মন্দিরে যাদুকরের ব্যবসায় চালাইতেছি এবং কল্পিত ঠাকুর দেখাইয়া তোমাদের মন ভুলাইতেছি? এইরূপ ভয়ানক অসত্য কথা বলিয়া যদি আমার নামে অভিযোগ কর তাহা হইলে আমাকে ইহার প্রতিবাদ করিতে হইবে। আমার মার সম্পর্কে কি আমি মিথ্যা কল্পনার প্রচার করিয়াছি এ অপবাদ আমি সহ্য করিতে পারি না। আমি কি তোমাদিগকে এই বেদী হইতে সপ্তাহে সপ্তাহে প্রবঞ্চনা করিয়াছি? ওহে ব্রাহ্ম, তুমি আমার মাকে দেখিয়া পরীক্ষা করিয়া লও। যদি তোমরা আমার যথার্থ জীবন্ত মাকে পরীক্ষা করিয়া চিনিয়া না লও তবে ভবিষ্যদ্বংশের জন্য তোমরা কল্পনা রাখিয়া যাইবে। যদি আপনারা বাঁচিতে চাও এবং জগতের কল্যাণ সাধন করিতে চাও তবে মাকে কতকগুলি কল্পনার সমষ্টি বলিয়া সিদ্ধান্ত হইতে দিও না। কি কলিকাতা কি অন্য স্থানে মা বাস্তবিক নাই, এবং মার প্রেম রাজ্যও নাই কেবল একখানি কল্পনাচিত্রিত ছবি আছে, এরূপ ভয়ানক মিথ্যা কথা এ পৃথিবীতে তোমাদের থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। এইজন্য আজ তোমাদিগকে মাতৃপরীক্ষা করিতে বলিতেছি। যে মার কথা তোমাদিগকে এতকাল বলিলাম, যদি তোমরা তাঁহাকে আমার কল্পনা মনে কর তবে এই অপরাধী মিথ্যাবাদীকে উপযুক্তরূপে দণ্ড দিয়া তোমাদিগের সমাজ হইতে নির্ব্বাসন কর। কিন্তু ভাই পরীক্ষকগণ, তোমরা যদি নিজে অপরাধী হও আমার নিকট সমুচিত দণ্ড লইয়া তোমাদিগকে আমার মার শরণাগত হইতে হইবে। আমি আমার মাকে কল্পনা দ্বারা সৃজন করিয়াছি এরূপ ভয়ানক অপবাদকে আমি কোনমতেই প্রশ্রয় দিতে পারি না। আমি বিবিধ কল্পনার সাজে সাজাইয়া এক বিশ্বজননী প্রস্তুত করিয়াছি এই অপবাদ খণ্ডনের জন্য আমি তোমাদিগের বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থিত করিতেছি। আমি সত্যকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, আমি মাকে কল্পনা দ্বারা নির্ম্মাণ করি নাই। মার স্বরূপ সম্পর্কে আমি যে সকল বর্ণনা করিয়াছি সে সমস্ত সত্য, অভ্রান্ত সত্য। সে সকল বর্ণনাতে ভ্রান্তি ভ্রম কিছুই নাই। মার রূপ

ঠিক যেমন দেখিয়াছি সেইরূপ বলিয়াছি। মার মুখে যাহা শুনিয়াছি ঠিক তাহাই বলিয়াছি আমার নিজের কল্পিত কথা কিছুই নাই। তোমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে পারেন যাঁহাকে ব্রহ্মেরা এক বলেন আমি তাঁহাকে তেত্রিশ কোটি বলিয়াছি। আমি একেকে বহুকল্পনা করিয়াছি। আমি এখনও বলিতেছি যদিও আমার মা এক তাঁহার রূপ গুণ অসংখ্য ও অগণ্য। আমি চিরকাল কল্পনার প্রতিবাদ করি; আমি নিজে কল্পনার দাস হইব? যদি আমি মার কোটি রূপের কথা বলিয়া থাকি সে এই জন্য যে আমি কনেকগুলি রূপ স্বচক্ষে দেখিয়াছি। নির্জনে পরিবার মধ্যে, বন্ধুদিগের মধ্যে, দেশ বিদেশে, নানাস্থানে তাঁহার অনেকরূপ দেখিয়াছি। তাঁহার এক রূপ নহে, তাঁহার অসংখ্য রূপ। যে দেখিয়াছে সে বলিবেই বলিবে। যে তাঁহার একরূপ অথবা এক বর্ণ বলিবে সে অসত্য কথন দোষে অপরাধী হইবে। অপরাধ আমার নহে, যে অস্বীকার করে তাহার। মার অসংখ্য রূপ। এই মন্দিরে এক এক রবিবারে সেই রূপে এক একখানি ছবি চিত্রিত ও প্রদর্শিত হইয়াছে। এক রবিবারের ছবি অন্য রবিবারের ছবির সঙ্গে মিলে না। বিচিত্র ছবি, যেন ভিন্ন ভিন্ন মা। কখন সরস্বতী, কখন লক্ষ্মী, কখন যোগেশ্বরী, কখন মহাকালী। এ আবার কি? এত ভিন্ন প্রকার দেবীমূর্ত্তি! আমি কি করিব? যাহা দেখিলাম তাহাই বলিলাম। মার বিচিত্র রূপ, সুতরাং ছবি ও বর্ণনা ও বিচিত্র হইল। এ বিচিত্রতা তোমরা অস্বীকার করিতে পার না। আমি যে মার কথা বলিতেছি তিনি তোমাদেরও মা, আমারও মা। যদি তোমরা তাঁহাকে তোমাদের মা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ কর বা সঙ্কুচিত হও তবে তিনি দেশ বিদেশে কেশবের মা বলিয়া পরিচিত হউন। যদি সে বিষয়ে লজ্জা ভয় না থাকে তাহা হইলে আমার মাকে এখনি তোমাদের ও মা বলিয়া স্বীকার কর এবং তাঁহার যতগুলি মনোহর রূপ বর্ণনা করিয়াছি সমুদায় মানিয়া লও। আমার মা সত্য কি মিথ্যা পরীক্ষা করিয়া লও। তাঁহাকে দেখিলে সকল সন্দেহ মিটিয়া যাইবে। যদি আমি মার কোন একটি রূপ মিথ্যা কল্পনা করিয়া থাকি তবে আমি মিথ্যাবাদীর অপরাধে কলঙ্কিত হইব। কিন্তু আমি কি সেই ভয় করি? সর্ব্বারাধ্যা মোক্ষদায়িনী মার সম্পর্কে মিথ্যা বলিতে পারি না। আমি কি পুতুল বিক্রয় করিবার জন্য এই মন্দিরে দোকান খুলিয়াছি? আমি কি মার কল্পিত মূর্ত্তি বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করি? এক মাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মের কথা বলিলে আমার দিন চলে না, তাই কি লক্ষ্মী, বাগ্দেবী, প্রভৃতি বিভিন্ন মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া লোকের নিকট সে সকল মূর্ত্তি উপস্থিত করিতেছি? ব্রাহ্মগণ, তোমরা কি বিশ্বাস করনা যে জগজ্জননীর এ সকল রূপ আছে? আমি নির্ভয়ে এবং নিশ্চিন্তরূপে বলিতেছি মার এ সকল রূপ অবশ্য আছে। আমার হাতে মার এ

সকল রূপের গঠন হয় নাই। আমি এক ব্রহ্মের অসংখ্যরূপ গুণ মানি। সেই বেদ বেদান্তের বর্ণিত নিরঞ্জন নিরাকার সনাতন পরব্রহ্মকে আমি লক্ষ্মী, সরস্বতী, আদ্যাশক্তি, ভুবন মোহিনী রাজ রাজেশ্বরীরূপে দেখিয়াছি। হিমালয়ে যোগেশ্বরী, দীনের ঘরে দীনবন্ধুরূপে দেখিয়াছি। যখন স্বচক্ষে সেই জগজ্জননীর বিচিত্র মূর্ত্তি দেখিলাম তখন কিরূপে সে সকল অস্বীকার করিব কিরূপেই বা গোপন করিব? যদি তোমরা বল, লক্ষ্মী বলিলে, সরস্বতী বলিলে সাকার রূপ মনে হয়, মা বলিলেই একজন স্ত্রীলোক মনে হয়, তোমাদের যদি পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ এরূপ ভাব মনে হয় আমি কি করিব? বিরুদ্ধ দেশাচারের অনুরোধে সত্য বিনাশ করা যায় না। আমি কোন মতেই মার মূর্ত্তি সম্পর্কে সাকার ভাব আসিতে দিব না। মার অসংখ্যরূপ কিন্তু তাঁহার কোন রূপের আকার নাই। মার মুখ সহস্র প্রকার কিন্তু সমুদায় নিরাকার। এই মন্দিরের মধ্যেই তাঁহার নানা মূর্ত্তি দেখ, এই বেদীর সমক্ষে ঐ কাষ্ঠাসনে, ঐ সঙ্গীত স্থলে, ঐ স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে মার বিচিত্র রূপ দর্শন কর। ঐ মাকে যে দেখিয়াছে সে জানে তাঁহার কতরূপ। যদি তোমরা মাকে দেখ আপনাআপনি তোমাদের চক্ষু হইতে ভক্তির জল উথলিয়া পড়িবে এবং সেই জলে ইন্দ্রধনুর ন্যায় মার ভিন্ন ভিন্ন রঙ্গ প্রতিফলিত হইবে। মার অসংখ্যরূপ, অসংখ্য বর্ণ। প্রেমোন্মাদিনী মার মিনিটে মিনিটে বর্ণ পরিবর্ত্তন। ব্রাহ্মগণ, এই অসংখ্যরূপ ধারিণী মা তোমাদিগের নিকট পরীক্ষিত হইতে আসিয়াছেন, তোমরা আজ ভক্তির সহিত ইহাঁর বিচিত্র নিরাকার রূপ পরীক্ষা কর। মার রূপেতে ত্রিভুবন আলোকিত। মা, আজ হাসিয়া বলিতেছেন "সন্তান, আমার না কি তোমার কাছে পরীক্ষা দিতে হইবে? আমি তোমার মা বিচিত্রবর্ণা, মানবকুল উদ্ধারের জন্য আমি বিবিধরূপ ধারণ করি। আমার বিবিধ স্বরূপ আছে কিনা তুমি পরীক্ষা করিয়া দেখ। পরীক্ষিত হইবার জন্য আমি তোমার নিকট প্রকাশিত হইতেছি, মার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখ, কত মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। একই মার মুখে জ্ঞান শক্তি পুণ্য আনন্দ প্রভৃতি সহস্র সহস্র মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে প্রতি মিনিটে আমার ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে, তোমার চক্ষের সমক্ষে প্রতিপলকে মার মূর্ত্তির পরিবর্ত্তন দেখিবে। পরীক্ষা করিয়া দেখ আমি একবর্ণা কি বিচিত্র বর্ণা। সন্তান, যদি সত্যসত্যই আমার মুখের নিত্য নূতনরূপ দেখ, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই মূর্চ্ছিত হইবে, আনন্দে মুগ্ধ হইবে।" মার পরীক্ষকগণ, মার বিচার কর্ত্তৃগণ এখন কি বল? মার এতরূপ, এতগুণ, আজ মা কোটি রূপ ধারণ করিয়া এই উৎসব মন্দিরে আসিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র মন্দিরে মা তাঁহার আপনার অসংখ্য মূর্ত্তি আমাদের চক্ষের সমক্ষে বিকাশ করিতেছেন। আবার দেখ তাঁহার বিচিত্রবর্ণ সন্তানগণ তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন। তাঁহার

কোন সন্তানের যোগের বর্ণ, কাহার ভক্তির বর্ণ, কাহারও সেবার বর্ণ, এক এক সন্তান মার এক এক বর্ণ ধারণ করিয়াছেন। মা, তাঁহার সমুদয় শিষ্য প্রশিষ্যদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। মার রূপের আকর্ষণ কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। যাহার চক্ষে একবার মার প্রেমের রূপ প্রতিভাত হয় সে আর উঠিতে পারে না। কে বলে মার রূপ নাই? নিরাকার ব্রহ্মের রূপ নাই ইহা কেবল ফাঁকি দিবার কথা। তোমরা কি মার রূপ দেখিবার জন্য এত দিন আকুল হইয়াছিলে? এত দিন মা জননীর বিচিত্র রূপ তোমাদের কাছে কেন প্রচ্ছন্ন ছিল? মা তোমাদের ঘরে কেন অদ্যাপি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেন না? তোমরা যে বহুদিন হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়া আছ সেই এক পুরাতন জীর্ণ কল্পিত ব্রহ্মরূপ প্রত্যহ দেখিবে। তোমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক এক মৃত মাকে গ্রহণ করিলে। কিন্তু আমার মা সেই আদ্যাশক্তি, জীবন্ত শক্তি মৃত নহেন, তিনি প্রতিদিন নব নব রূপ ধরেন এবং নবজীবন দান করেন। সাধকগণ, তোমরা প্রতিদিন মাকে বলিতে পার, "মা, আজ আবার তোমার এ কি রূপ?" তিনি হাসিয়া বলেন, "আমাকে একথা জিজ্ঞাসা করিও না।" মা সর্ব্বদাই রূপ পরিবর্ত্তন করিতেছেন। কেন তাহা কে বুঝিবে, কে বলিবে? এ মধুর রহস্য জননীই জানেন আর কে বুঝিতে পারে? মা পলকে পলকে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন রূপ ঘুরাইয়া ভক্তকে মোহিত করিতেছেন; তিনি কেবল বসিয়া দেখিতেছেন ও সম্ভোগ করিতেছেন। এই ভয়ঙ্কর গম্ভীর মূর্ত্তি দেখাইলেন, একটু পরেই আবার শান্তমূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন। এই অবাতকম্পিতদীপ শিখার ন্যায় প্রশান্ত ছিলেন, এই আবার মহা ব্যস্ত হইয়া ভক্তকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যোগীদিগের সঙ্গে গম্ভীররূপে বসিয়াছিলেন, আবার এক মুহূর্ত্ত যাইতে না যাইতে নৃত্যগোপালরূপ ধরিয়া বালকদিগের সঙ্গে খেলা করিতে লাগিলেন। সেই গম্ভীর প্রকৃতি যোগেশ্বর যোগীবন্ধু বালকদিগের সঙ্গে বালকবন্ধু হইয়া এমন আনন্দের বাল্যখেলা খেলিলেন যে তদ্দর্শনে সকলে মোহিত হইয়া বলিতে লাগিল, ইনি আবার গম্ভীর হইবেন কিরূপে? মার একান্ত ইচ্ছা যে তাঁহার বিচিত্র লীলা দেখিয়া ভক্তেরা মুগ্ধ হয় এবং পুণ্য শান্তি সঞ্চয় করে। সন্তানদিগকে মাতাইবার জন্য তিনি নিরন্তর রূপান্তর হইতেছেন, এবং বিবিধরূপে সদাকাল নাচিতেছেন। সেই নৃত্য দেখিলে তোমাদিগের প্রাণ মন আর তোমাদের বশে থাকিবে না। আমার মা, তোমাদের মা তোমার আমার প্রাণের মধ্যে, হৃদয়ের মধ্যে নাচিতেছেন, আনন্দময়ী আনন্দ বিস্তার করিতেছেন। প্রতিজনের দেহ মন্দিরের মধ্যে তিনি নৃত্য করিতেছেন। তাঁহার যে কোন রূপ ভক্তের নয়নগোচর হউক না কেন তাহাতেই ভক্ত মোহিত ও অবাক্ হন। যখন দেখিবে তিনি মা হইয়া জীবকে স্তন্য পান করাইতেছেন, সেই

ধুর মাতৃরূপের মাধুর্য্যে তোমার মন ভুলিয়া যাইবে। মার মুখ সৃষ্টির আবরণে আবৃত বটে; কিন্তু ভাবুক ভক্তদিগের নিকট মা সেই আবরণের ভিতর হইতে তাঁহার ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি প্রকাশ করেন। মা তাঁহার ভক্ত প্রেমিকদিগকে দেখা দিবার জন্য অসংখ্য রূপ ধরিয়া বসিয়া আছেন। ভক্তির সহিত তাঁহাকে ডাক, মা আপনার মুখের আবরণ খুলিবেন। এই মন্দিরের কোণে তিনি বসিয়া আছেন তোমরা তাঁহাকে অন্বেষণ কর। তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াও, যত ক্ষণ পর্য্যন্ত না তাঁহার হাতে তোমার হাত ঠেকিবে, যত ক্ষণ পর্য্যন্ত না তাঁহার পুণ্যের সুমিষ্ট সৌরভ তোমার নাসিকা স্পর্শ করিবে তত ক্ষণ খুঁজিয়া বেড়াও। তিনি এই মন্দিরেই লুকাইয়া আছেন, উপযুক্ত সাধনের পর ভক্তের মন যখন প্রস্তুত হয় তখন তিনি তাহার নিকট আপনার মুখ খোলেন। সেই মুখ দেখিয়া ভক্ত স্তম্ভিত হন, এবং মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন এবং অবশেষে আবার চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া উন্মাদের ন্যায় আনন্দে নৃত্য করেন। হে ভক্ত, মনে করিও না তুমি মাকে দেখিলে বলিয়া সকলেই মাকে দেখিবেন। ভিড়ের মধ্যে মা তোমাকে ইঙ্গিত করিলেন তুমি মার ক্রোড়ে উঠিলে, আবার মা ইশারা করিলেন, সঙ্কেত বুঝিয়া তুমি স্তন্য পান করিতে লাগিলে। সে মধুর ইঙ্গিত কি সকলে বুঝিতে পারে? শত শত লোকের মধ্যে দুই এক জন মাকে দেখিলেন। সেই দুই এক জন ছাড়া অবশিষ্ট লোকেরা যেন বলাবলি করিতে লাগিল, কৈ মা? মা তো এখানে নাই। ব্রাহ্মগণ তোমরা সকলে কেন আজ মাকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির কর না। তিনি তোমাদের খুব নিকটে আছেন, তিনি এই মন্দিরে ঠিক তোমাদের চক্ষের সমক্ষে আছেন। ভাবের নৈকট্য হইতেছে না বলিয়া দেখিতে পাইতেছ না। একবার ভাবের ঘরে প্রবেশ কর, দেখা হইবে। ক্রমাগত তিনি তোমাকে ঐ ভাবের ঘরে ডাকিতেছেন, তুমি যাও না কেন? মার নিমন্ত্রণ পাইয়া মধুময় কল্যাণকর আহ্বান ধ্বনি শুনিয়া মার নিকটে যাও, সেই বিচিত্ররূপধারিণী উজ্জ্বলবর্ণ মাকে দর্শন করিয়া জীবন সার্থক কর, তাঁহার স্নেহে বশীভূত হও। আর কেন বিলম্ব কর? এখনি দেখা সাক্ষাৎ করিয়া লও। সেই মাকে দর্শন করিতে করিতে ক্রমে এমন গভীর আনন্দের ভিতরে পড়িবে যে মাতৃদর্শন ভিন্ন তোমার আর কিছুই ভাল লাগিবে না এবং মাকে ছাড়িয়া আর কোথাও যাইতে পারিবে না। তখন ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্র মাকে দেখিবে। তখন দেখিবে স্বর্গ মর্ত্ত এক হইয়াছে। পৃথিবী দেবলোক এক হইয়াছে, সংসার বৈকুণ্ঠ এক হইয়াছে। যখন মাকে তুমি স্পর্শ করিবে তখন তুমি বুঝিতে পারিবে তোমার হাত মাকে ধরে নাই কিন্তু মার হাত তোমাকে ধরিয়াছে। তুমি ধরিলে ছাড়িতে পার স্বয়ং ব্রহ্ম ধরিয়াছেন তোমার হস্ত, তুমি আর কিছুতেই ছাড়াইয়া যাইতে পার না। মা বলিতেছেন;—

"আমার লোক অতি অল্প, আমি তোমাকে চলিয়া যাইতে দিব না।" মার মুখে এই কথা শুনিয়া ভক্তের মনে কত আহ্লাদ হয়। যে ভক্ত বিধাতার করতলন্যস্ত তাহার কত সুখ। শরণাগত জীব মার স্নেহশৃঙ্খলে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া রহিল। মা বলিলেন, আজ কোন মতে সন্তানকে ছাড়িব না। আজ উৎসবের দিন, আনন্দের দিন, আজ ভক্তকে চলিয়া যাইতে দিব না। এই বলিতে বলিতে সন্তানের প্রতি মার অনুরাগ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া ক্রন্দনের আকার ধরিল। মার স্নেহের কথা শুনিয়া ছেলে আহ্লাদে কাঁদিতে লাগিল। সে ক্রন্দন বাহ্যিক, চক্ষের জল চক্ষে দেখা যায়। ওদিকে মার গভীর ঘন প্রেমের উচ্ছ্বাস নিরাকার ক্রন্দনে পরিণত হইল। ভক্তকে পাইয়া অনুরক্ত, উপাসনান্তে পাছে ভক্ত চলিয়া যায় এই ভাবে উদ্বেলিত ঘনতর অনুরাগ মাকে কাঁদাইল। মার গাঢ় অনুরাগই ভক্তের পক্ষে অসহ্য ক্রন্দন। মা প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত ভক্তকে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেন, ভক্ত বলিল, "আমার স্ত্রীপুত্র পরিবার আমাকে ডাকিতেছে, আমার কাজ কর্ম্ম বন্ধ হইবে, আমাকে ছাড়িয়া দেও, আমি সংসারে ফিরিয়া যাই।" মা বলিলেন "কি বলিতল, কি বলিলে সন্তান," বলিতে বলিতে মার স্নেহ চক্ষু হইতে বৃষ্টি ধারা পড়িতে লাগিল। আহা মরি কি সুন্দর মার প্রেমাশ্রু! ছেলে মার স্নেহ দেখিয়া বিগলিত হইল। মা এই সুযোগে ছেলের হাত দুখানি আরও দৃঢ়তার সহিত আপনার অঞ্চলে বাঁধিলেন। সন্তানকে নিজের অঞ্চলে বাঁধিয়া আপনার অনুরাগের কত ছবি কত মনোহর মূর্ত্তি, কত সুন্দর রূপ দেখাইতে লাগিলেন। অবশেষে মার ব্যবহারে পরাস্ত হইয়া সন্তান বলিল;—"আর ফিরে যাব না মা এবার যে তোমার কাছে উৎসবে ধরা দিলাম, আর তোমাকে ছাড়িয়া যাইব না। মা তোমার যে ভুবনমোহিনী শক্তি আছে ইহা ভাল করিয়া আজ প্রমাণ করিয়া দিলে। আজ দেখিলাম মা, তুমি কেবল নির্লিপ্ত উদাসীন বিরাগী ব্রহ্ম নও, কিন্তু তুমি যথার্থই আমার মা হইয়া আমাকে তোমার স্নেহের বিচিত্র রূপ দেখাইতেছ। জননি, তুমি কাহারও কল্পনা সমুদ্ভূতা নহ, তুমি সত্য সত্যই আমার জীবন্ত প্রেমময়ী মাতা। তুমি আমাকে সত্য সত্য ভালবাস।" সাধে কি মাকে আমরা ভালবাসি এমন মাকে যে দেখিয়াছে সে যে মার রূপের ছটা দেখিয়া প্রেমানন্দে পাগল হয় না এই আশ্চর্য্য। আমার মা কেমন এখন দেখিলে তো। ছাড়িবে? কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিবে? কেমন আমার মাকে তোমাদের মা বলিয়া স্বীকার করিতে হইল! এমন মাকে ছাড়িয়া কি কোন সন্তান বাঁচিতে পারে। আজ ব্রহ্মমন্দির আমার মার গুণ কীর্ত্তন করুক! কেবল কীর্ত্তন করিয়া যেন ক্ষান্ত না হয় কিন্তু মাকে দেখিয়া আজ সকলে মোহিত হউন! আজ জগজ্জননী প্রত্যেক সন্তানের কাছে দাঁড়াইয়া বলুন?— "বৎস, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, শুক, নারদ, ঈশা, মুসা, চৈতন্য মহ-

ধ্রুব প্রভৃতি সকল ভক্তই আমার রূপে মোহিত হইয়াছে, তুমিও আমাকে প্রাণ ভরিয়া দর্শন কর। তোমার মা কেমন সৌন্দর্য্য ও প্রতাপপূর্ণ দেখ। তোমার মা বিদ্যাতে সরস্বতী, ধন ধান্যে লক্ষ্মী, বলে আদ্যাশক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। তোমার মার রূপে ত্রিভুবন মোহিত হইয়াছে, তুমি মোহিত হইবে না। তোমার মার অনুরোধ কাটাইয়া তুমি মাকে ছাড়িয়া আর বাড়ী ফিরিয়া যাইতে পারিবে না।” যে মা এমন মধুর কথা বলেন, বন্ধুগণ সে মা কেমন? খুব ভাল, না? সকলে সেই মার হাতে ধরা দেও। এই উৎসবমন্দিরে আজ মা লক্ষ্মী ঠাকুরাণী সন্তানদিগকে সঙ্গে লইয়া সভা করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার কোটি রূপ চারিদিকে বিকীর্ণ। তাঁহাকে দেখিলে পাপতাপ, রোগ শোক সমুদয় চলিয়া যায়। মাকে দেখিয়া আজ আমরা পুণ্যবান্ পুণ্যবতী হইলাম এই মন্দির সন্তাপহারিণী সুখমোক্ষদায়িনী মার মন্দির, এই মন্দিরে যে কেহ আসিবে মার রূপ দেখিয়া শীতল হইবে। এখানে মা যে ভক্তকে শ্রীচরণ দিবেন তাঁহাকে আর ছাড়িবেন না। ভ্রাতৃগণ, ভগ্নীগণ, প্রত্যেকে আজ প্রতিজ্ঞা কর এমন মাকে আর ছাড়া হইবে না। মার কোটি কোটি রূপের জালে জড়িত হইবে, চারিদিকে মার রূপ, ভিতরে বাহিরে মার রূপ, সর্ব্বত্র মার রূপ। মাকে দেখিতে দেখিতে মার সহাস্যমূর্ত্তি, প্রফুল্ল বদন তোমার নয়নগোচর হইবে। মার সহাস্য বদন সকল নাস্তিকতা ও অবিশ্বাসের উত্তর। মা বলেন; “বৎস, অবিশ্বাসীরা বলে আমি নাই; কিন্তু এই দেখ আমি হাসিতেছি।” মার মুখের সুন্দর হাস্য একটি সোণার শৃঙ্খল, ভক্তকে বাঁধিলে আর ছাড়ে না। সেই হাস্য দেখিলে আর ভক্ত সংসারে ফিরিয়া যাইতে পারে না। তাহার সকল সন্দেহ দুঃখ পাপ চলিয়া যায়। সেই হাস্য অমৃত সরোবর, সেই অমৃত পান করিলে এ জীবনে প্রমত্ততা শেষ হইবে না। সেই হাস্যে যে মুগ্ধ হইল তাহার আর মৃত্যু নাই। মার কোটিরূপের সার রূপ এই হাস্যমূর্ত্তি। ভ্রাতৃগণ, এই সহাস্যবদনা মাকে দেখিয়া বালকের মত তাঁহার সমক্ষে খেলা কর। মার মধুর হাস্যে সমস্ত নাস্তিকতা চূর্ণ হইল। আর আমার মাকে তোমাদের পরীক্ষা করিতে হইবে না; বিচার করিতে হইবে না। মা তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখাইয়া আমাদিগের পানে মধুর দৃষ্টিতে তাকাইয়া আনন্দ বদনে হাসিয়া সমুদয় বিচার নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন। আইস আমার ভাই, মার সুন্দর বাগানে মার হাত ধরিয়া বেড়াই। মা আমাদিগকে বালক সন্ন্যাসীরূপে সাজাইয়া দিবেন। মার যেমন অনেক রূপ আমাদিগকেও বিচিত্র সাজে সাজাইবেন। মার বশীভূত হইয়া ভক্তগণ, এই পৃথিবীতেই স্বর্গের সুখ সম্ভোগ কর।

সেবকের নিবেদন।

নৃত্য।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ২৮ ভাদ্র, ১৮০২ শকাব্দা।

ধর্ম্মের অনেক নিগূঢ় কথা যোগ দ্বারা বুঝিতে পারা যায়; অন্য কোন উপায়ে সে সকল কথা বুঝা কঠিন। যোগরূপ অঞ্জন যখন আমরা চক্ষে লেপন করি তখন চক্ষু উজ্জ্বল হয় এবং সেই চক্ষে ধর্ম্মরাজ্যের অনেক নিগূঢ়তত্ত্ব সকল প্রকাশিত হয় পূর্ব্বে যাহা আমরা বুঝিতে পারিতাম না। এমন অনেক ব্যাপার আছে যাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত কি না যোগ বিহীন অবস্থাতে স্পষ্ট বুঝা যায় না। সে সকল ব্যাপারের মধ্যে নৃত্য একটি ব্যাপার। নৃত্য ধর্ম্মসঙ্গত কি না, ঈশ্বরের অভিপ্রেত কি না, তাহা যোগ ভিন্ন সহজে বুঝা যায় না। পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানে এবং সকল জাতির মধ্যে নৃত্যের প্রথা প্রচলিত। অত্যন্ত অসভ্য জাতির মধ্যে প্রবেশ কর, সাঁওতালদিগের মধ্যে যাও, দেখিবে যাহারা ঘোরতর অসভ্যতার অন্ধকারে আবৃত তাহারাও সপরিবারে সবান্ধবে আনন্দে প্রমত্ত হইয়া নৃত্য করে। কে সেই অসভ্যদিগকে নৃত্য শিখাইল? কোন্ রাজা কোন্ শাস্ত্রকার কোন্ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক অসভ্য জাতিকে এমন নৃত্য শিখাইল ইতিহাস তাহা বলিতে পারে না। বাস্তবিক রাজবিধি কি ধর্ম্মবিধি মনুষ্য জাতিকে কখন নৃত্যে প্রবৃত্ত করে নাই। উহা স্বাভাবিক, উহা শিক্ষা বা শাসনের ফল নহে। মনের আনন্দ উথলিয়া উঠিলেই মানুষ নৃত্য করে। এ বিষয়ে স্বভাবই গুরু। সভ্যজাতির মধ্যেও নৃত্য প্রবর্ত্তিত। সভ্যতম সমাজে নরনারী মহা সমারোহ করিয়া নৃত্য করে। তাহাদিগকেই

বা কে নৃত্য শিখাইল ? মনুষ্যপ্রকৃতি দেখিলে পরিষ্কার রূপে বুঝা যায় নৃত্য স্বাভাবিক। লেখা পড়া দ্বারা এ স্বাভাবিক প্রকৃতিকে বিনাশ করা যায় না বরং সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে উহার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। সভ্য দেশে নৃত্য শিখিবার বিদ্যালয় আছে, সাধনের নিয়মাদি আছে। ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্যতম স্থানের লোকেরা যাবতীয় বড় বড় ঘটনার সঙ্গে নৃত্যের আমোদকে সংযোগ করিয়াছে। বস্তুতঃ মনুষ্য স্বভাব হইতেই এই নৃত্যের প্রথা উৎপন্ন হইয়াছে। অনেকে নৃত্যের গূঢ় তত্ত্ব না জানিয়া মনে করে বুঝি মনুষ্য বিকৃত হইলেই নাচে। তাহারা মনে করে যদি মনুষ্য প্রকৃতিস্থ থাকিত পৃথিবীতে নৃত্যের অসভ্যতা ও পাপ আসিত না। তাহারা বলে ঈশ্বর যদি আদেশ করিতেন তিনি হয়ত বলিতেন, " মনুষ্য কদাপি নাচিও না, সাবধান।" কিন্তু যদি নৃত্য সত্য সত্যই ঈশ্বরের অনভিপ্রেত হয় তবে ভক্তেরা নাচেন কেন ? বিষ্ণুভক্ত চৈতন্যভক্তেরা নাচেন কেন ? সাধুগণ কেহ প্রকাশ্যে কেহ গোপনে নাচেন কেন ? যদি নৃত্য বিকার হইল তবে ধার্ম্মিকেরা কেন এত উৎসাহের সহিত নাচেন ? যেখানে বিশুদ্ধ ধর্ম্মের শাসন, যেখানে শরীর মন বিশুদ্ধ, যেখানে মদ খাওয়া নাই, কোন প্রকার দুর্নীতি নাই, যেখানে হরি নাম মুহুর্মুহু কীর্ত্তিত হয় সেখানে কেন নৃত্য ? মহাযোগী মহাদেব কেন নাচিলেন ? যোগের মধ্যে নৃত্য কিরূপে এবং কেন প্রবিষ্ট হইল ? ভক্ত নাচেন, যোগী নাচেন সকল শ্রেণীস্থ সাধুই নৃত্য করেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই ;—ব্রাহ্মেরা কি নৃত্যকে পাপ মনে করিয়া ঘৃণা করিবেন ? যোগীগণ ভক্তগণ দেবগণ নৃত্য করেন, মহাদেবও নৃত্য করেন, দেশীয় প্রাচীন শাস্ত্রে ইহার প্রমাণ আছে, ইহার যুক্তি আছে। যদি যোগী ঋষি এবং সাধু মহাত্মা-দিগের সম্পর্কে নৃত্য পবিত্র হইল তবে কি রূপে বিশ্বাস করিব যে মনুষ্যের সম্বন্ধে নৃত্য মহাপাপ ? মনুষ্যসমাজ ছাড়িয়া জড় প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করি, সেখানেও ঈশ্বরাভিপ্রেত পবিত্র নৃত্য দেখিতে নাই। আকাশের চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রাদিকে জিজ্ঞাসা করি তাহারা নৃত্য করে কি না, তাহারা সকলে সমস্বরে বলে ;—" এই দেখ আমরা কেমন সুন্দররূপে আমা-দের প্রাণেশ্বর ভুবনেশ্বরকে প্রদক্ষিণ করিয়া আকাশ পথে নিত্য নৃত্য

করিতেছি।" যোগচক্ষে জ্ঞাননেত্রে স্পষ্টরূপে দেখা যায় যাহারা মনুষ্য নহে, স্বাধীন নহে, যাহাদের কোন অবস্থাতে পাপ করিবার সম্ভাবনা নাই সেই সকল জড় পদার্থও নৃত্য করিতেছে। নৃত্য করিলে ঘুরিতে হয়। দেখ আকাশের জ্যোতিশ্চক্র সকল নৃত্য করে, অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট পথে ঘোরে। পৃথিবী ঘোরে, চন্দ্র ঘোরে, গ্রহতারা ঘোরে। যাহারা নৃত্য করে তাহারা তালে তালে নৃত্য করে। নভোমণ্ডলে তারানক্ষত্রাদিও দেখ তালে তালে ঘুরিতেছে ও নৃত্য করিতেছে। তাল কি? তালে তালে নৃত্য করা কি? ঠিক সময়ে পদ নিক্ষেপ। চন্দ্র তারাসকলও ঠিক সময়ে পা ফেলিয়া ঘুরিতেছে। কৌতুকপ্রিয় লীলারসময় হরির কি সুন্দর লীলা! বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে তিনি কত আশ্চর্য্য খেলা খেলিতেছেন! দেখ আকাশরঙ্গভূমিতে তিনি যতগুলি গ্রহ উপগ্রহ ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাহারা কেমন তালে তালে পা ফেলিয়া নাচিতেছে। তাহাদিগের গতি নিয়মিত। আকাশে মনোহারিণী নারীরূপে চন্দ্র নাচিতেছে; আপনার সৌন্দর্য্য, আপনার ভুবনমোহিনী জ্যোৎস্না দেখাইতে দেখাইতে ঐ নর্ত্তকী দুই ঘণ্টার মধ্যে কত দূর চলিয়া গেল। বেতাল হইবে না, একবারও পদস্খলন হইবে না। চন্দ্র আপনার অসংখ্য সখীদিগের সঙ্গে চিরকাল তালে তালে নাচিয়া বেড়াইতেছে। কেন উহারা নাচিতেছে? কে তাহাদিগকে নাচিতে শিখাইল? আনন্দময়ের রাজ্যে সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে আনন্দের নৃত্য হইতেছে। সকলের মধ্যে থাকিয়া দেব দেব মহাদেব ঈশ্বর আপনি নাচিতেছেন, তাঁহার চারিদিকে আর সকলে নাচিতেছে। কে কতক্ষণ ও কি ভাবে নাচিবে সমস্ত ঠিক আছে। আকাশ নাট্যভূমিতে ইহারা কেবলই ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছে ও হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতেছে। সহাশ্য শশী ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছে, এই আমাদের চক্ষের সমক্ষে নাচিতেছিল, আবার কিয়ৎকাল পরে আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া কোথায় নাচিতে গেল, আবার পর রজনীতে ফিরিয়া আসিয়া দেখা দিল। আমরা যে পৃথিবীতে আছি এ পৃথিবীও নাচিতেছে, কিন্তু আমরা ইহাতে বাস করিতেছি বলিয়া ইহার নৃত্য দেখিতে পাই না। প্রকাণ্ড গোলাকার লোকমণ্ডলী সকল আকাশে নাচিতেছে। আহা! কি চমৎ

কার নিয়মে তালে তালে এ সকল ভ্রাম্যমান্ জগৎ শূন্যে নাচিতেছে! আবার যখন নিকটে আসিয়া দেখি তখন নিজের শরীরের মধ্যে সুন্দর নৃত্য দেখিতে পাই। কেমন সুন্দর তালে তালে আমার শরীরের মধ্যে রক্ত নাচিতেছে! শরীর, তোমার ভিতরে দিন রাত্রি কেমন আশ্চর্য্য নৃত্য হইতেছে! যে সময়ে রক্ত সৃজন হইল সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তুড়ুক তুড়ুক করিয়া রক্ত শরীরের ভিতর দিয়া নাচিতে নাচিতে চলিল। কেবল যে রক্ত নাচিতেছে তাহা নহে, আবার উহা ঠিক তালে তালে নাচিতেছে। যদি শরীরের একটু জ্বর বিকার হয় অমনি রক্তের তাল ভঙ্গ হয়। চিকিৎসকেরা ঘড়ী ধরিয়া রক্তের তাল শ্রবণ করে এবং বেতাল রক্ত সঞ্চালন দেখিলেই রোগ সিদ্ধান্ত করে। প্রকৃতিস্থ থাকিলে নিশ্চয়ই দেহ মধ্যে রক্ত, ঠিক মিনিটে মিনিটে চলে, কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় না। যোগীর রক্ত ভক্তের রক্ত, সেবকের রক্ত নাচিতে নাচিতে ব্রহ্মপদ প্রদক্ষিণ করিতেছে। হে রক্ত, তুমি হরিভক্ত, তুমি হরিনাম গান করিতে করিতে নৃত্য কর, তোমাকে নমস্কার করি। রক্ত, তুমি ব্রহ্মের প্রেমানুরঞ্জিত শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া লাল হইয়াছ। হে রক্ত তুমিই আমার প্রাণ বল উদ্যম সুস্থতা সৌন্দর্য্য সকলি। যতক্ষণ তুমি আমার শরীরের মধ্যে নাচিতে থাক ততক্ষণই আমার জীবন। তুমিই আমার শক্তি, তুমিই আমার আশা ভরসা, তোমার নৃত্য বন্ধ হইলেই আমার মৃত্যু। যে দিন তোমার নাচ বেতাল হয় সেই দিন ভয়ানক রোগ আসিয়া আমাকে আক্রমণ করে। যত দিন তুমি আনন্দে নৃত্য কর তত দিন আমি সুখ স্বচ্ছন্দতা আনন্দ সুস্থতা সম্ভোগ করি। রক্ত, কি চমৎকার তোমার নৃত্য! তোমার নৃত্য ভক্তির নৃত্য। যখন তোমার ভিতরে ব্রহ্মোন্মত্ততা প্রবেশ করে তখন তোমার নৃত্য প্রগল্‌ভা ভক্তির নৃত্য ও মহোল্লাসের নৃত্য হয়। তুমি ব্রহ্মের হস্তে উৎপন্ন, ব্রহ্মচরণে প্রণত। হে ব্রাহ্ম, তুমি যদি প্রেমোন্মত্ত হইয়া নাচিতে চাও তবে রক্তের নৃত্যের সঙ্গে তাল দিয়া নৃত্য কর। রক্তের নৃত্য মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। বিধাতা যেরূপ নিয়ম করিয়া দিয়াছেন রক্ত ঠিক সেই নিয়ম অনুসারে নৃত্য করে। তাঁহারই ইঙ্গিতে, তাঁহারই নিয়মে রক্ত নাচিতেছে। কেহ দেখে না

কেহ তাহার প্রতি মনোযোগ করে না, তথাপি উহা অহর্নিশি আপনার আনন্দে নাচিতেছে। রক্তের নাচ গান কেবল হরিই গোপনে বসিয়া দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন। নৃত্য আনন্দের একটি প্রধান লক্ষণ। মনে প্রবল আনন্দ হইলেই মানুষ নৃত্য করে। যখনই কোন বাদ্য যন্ত্রে নৃত্যের বাজনা বাজে তখনই শরীরের অস্থি মাংস সমুদায় নাচিয়া উঠে। সেই বাদ্যে তোমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিবে, শরীরের সঙ্গে উহার এমনি নিগূঢ় যোগ। বেহালা হউক, পিয়ানো হউক, বীণা হউক, মৃদঙ্গ হউক, যে কোন সুমধুর যন্ত্র হউক উহার শব্দ শুনিলেই মন নাচিয়া উঠে। এক জন যন্ত্র বাজাইতেছে, তাহার বাদ্য শুনিয়া শত শত লোকের শরীর মন নাচিয়া উঠিল। বাদ্য যন্ত্র যেন সাঙ্কেতিক ভাষায় বলে ;—"এস, কে নাচিবে এস। "আয় না ভাই নাচি।" পথিমধ্যে কোন দুঃখী বৈষ্ণব মধুর মৃদঙ্গ বাজাইতেছে, আমি উপরের ঘরে বসিয়া বাদ্য শুনিলাম, তৎক্ষণাৎ মন নাচিয়া উঠিল। আমি মনে করিলাম, আমি বড় মানুষের সন্তান, বৈষ্ণবের বাজনা শুনিয়া আমি নাচিব? যেখানে যন্ত্র বাজিতেছিল সে স্থানে আমি গেলাম না; কিন্তু যতক্ষণ আমি উপরে বসিয়া রহিলাম ততক্ষণ আমার প্রাণ নাচিতে লাগিল। আমি অপবাদ ভয়ে, সম্মান লাঘবের ভয়ে সে মৃদঙ্গের দিকেও গেলাম না, কিন্তু মন, তুমি লজ্জা ভয় পরিত্যাগ করিয়া অসভ্যের ন্যায় নাচিলে? বাহিরে আমি নৃত্য সম্বরণ করিলাম কিন্তু ভিতরে তুমি নির্লজ্জ হইয়া নাচিলে। এই যে নৃত্য করিবার স্বাভাবিক ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি বক্তৃতা দ্বারা বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। তোমরা সকলেই ইহা বুঝিতে পারিতেছ। সমস্ত সৃষ্টি নাচে, স্বয়ং ভগবান্ নাচেন। কেবল কাপুরুষ নাচে না। যে না নৃত্য করে সে দুঃখীদিগের মধ্যে অত্যন্ত দুঃখী ও হীন। যে হাতে চাঁদের সৃষ্টি, যিনি চাঁদকে নাচান, তুমি তাঁহার হাতে নাচিবে না? ঈশ্বর নিজে নাচেন, তাঁহার সমুদায় সৃষ্টি নাচে, আর অধম মনুষ্য, তুমি নাচকে নীচ মনে করিবে? ঈশ্বরের এক নাম নৃত্য গোপাল অর্থাৎ তিনি বালকের ন্যায় নৃত্য করেন। বৃদ্ধ নাচে না, বালক নাচে। বালককে একটি সন্দেশ দিলাম, সে সন্দেশটী পাইয়াই নাচিতে লাগিল। প্রিয়

বালক, তোকে সন্দেশ দিলাম, তুই সন্দেশটী মুখে না দিয়া সহাস্য বদনে নাচিস্ কেন ? আর একটি সন্দেশ দিলাম, বালক মাথায় হাত দিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। যত উল্লাস ততই দেখি নৃত্যের উৎসাহ। পবিত্র নৃত্য কখন্ আরম্ভ হয় ? যখন সাধক বালকপ্রকৃতি ধারণ করে। কুটিল বুদ্ধি, বিকৃত বুদ্ধি বৃদ্ধেরা নৃত্য করিতে পারে না, চায় না। দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তার অবস্থায় কেহ নাচিতে পারে না। যে দিন দুঃখে যায় সে দিন কেহ নাচে না। রোগ শোক বন্ধুবিয়োগ ধনহানি, ঘোর বিপদ বা বিষাদের অবস্থায় কেহ নাচে না। কোন প্রকার দুর্ঘটনা হইলে মানুষ নাচে না, নৃত্য সমাজে যায় না। আনন্দ ভিন্ন অন্য অবস্থাতে নৃত্য হয় না। শিশু যখন কাঁদে তখন নাচে না। যার মন বিষণ্ণ মুখ বিরস তার পা কদাপি নাচিবে না। সংসারে যেমন ধর্ম্মরাজ্যেও সেইরূপ, সুখোদয় হইলেই নৃত্য আরম্ভ হয়। যাই ঘরে আনন্দ আসিল, যখনই ভক্ত হরির দর্শন পাইল, যখনই উপাসকের উপাসনা ভাল হইল তখনই সে আনন্দে নৃত্য করিল। যখন অনুশোচনার বিষে মন জর্জ্জরিত, যখন পাপ ব্যাধিতে হৃদয় সন্তপ্ত তখন মানুষ নাচিবে কি রূপে ? নাচ কখন সম্ভব ? আনন্দের সময়, সন্দেশ পাইবার সময়। যখন হৃদয়ের ভিতরে স্বর্গের কোন মধুর যন্ত্রধ্বনি শুনিতে পাই, তখন মন আপনাকে আপনি বলে; "আয়না ভাই ঐ স্বর্গীয় বাদ্যের সঙ্গে তালে তালে নাচি।" কোন্ গুপ্ত নারদ বীণা বাজাইয়া আমার মন ভুলাইল ? কে আমাকে নাচিতে ডাকিল ? সৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া এক গুপ্ত বাদ্যকর মধুর বীণা বাজাইতেছেন, সেই বাদ্যের সঙ্গে তালে তালে সমস্ত সৃষ্টি নাচিতেছে। বৃহৎ বৃহৎ জ্যোতিষ্ক আকাশ পথে নাচে। তাহার সঙ্গে পৃথিবী নাচে এবং পৃথিবীর সকল বস্তু নাচে। স্রোতস্বতী নদী সকল পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে সমুদ্রে গিয়া মিশিতেছে। সাগর মহাসাগর বক্ষে তরঙ্গরাজি মহা আস্ফালন করিতে করিতে নৃত্য করিতেছে। গাছে পাখী আনন্দে নাচে, জলে মাচ উল্লাসে নাচে। বায়ু নাচে, তার সঙ্গে বৃক্ষের লতা পল্লব সকল নাচে। সুমন্দ সমির হিল্লোলে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে সুশোভন ধান্যশীর্ষক সকল কেমন হেলিয়া দুলিয়া নাচে। গাছে নানা বর্ণের ফল ফুল বায়ু সহকারে এদিক

ওদিকে দুলিয়া নৃত্য করে। গোমেষাদি প্রহৃষ্ট মনে লম্ফ ঝম্ফ করিয়া নাচিয়া বেড়ায়। আকাশে দলে দলে বিহঙ্গগণ নৃত্য করিতে করিতে উড়িয়া বেড়ায়। সমস্ত প্রকৃতি নাচিতেছে, আনন্দের উচ্ছ্বাসে সমস্ত জীব নাচিতেছে। যাহারা রোগে শোকে জীর্ণ শীর্ণ, যাহারা কুটিল বিষয় বুদ্ধিতে বিকৃত তাহারাই নাচে না। অতএব হে ভক্ত, যদি তুমি তোমার প্রাণেশ্বরের সঙ্গে এক আত্মা একপ্রাণ হইয়া থাকিতে চাও তবে প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হইয়া তালে তালে নৃত্য কর। চাঁদের সঙ্গে, বৃষ্টির ধারার সঙ্গে, সমুদ্রের ঝঙ্কারের সঙ্গে, বায়ুর হিল্লোলের সঙ্গে, রক্তের গতির সঙ্গে তালে তালে নৃত্য কর। প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে যে ভক্ত নৃত্য করেন তাঁহাকে আর দুঃখ বিকার অভিভূত করিতে পারে না। জননীর নাম করিতে করিতে ভক্ত প্রমত্ত হইয়া নৃত্য করেন। নৃত্য না করিয়া তিনি থাকিতে পারেন না। ঈশা, মুসা, শাক্য, নারদ, চৈতন্য প্রভৃতি সকলেই নৃত্য করিতেছেন, সাক্ষাৎ ভগবান্ আপনার আনন্দে আপনি নৃত্য করিতেছেন। স্বয়ং ভগবানের নৃত্য দেখিয়া তাঁহার ভক্তদিগের হৃদয়েও আনন্দ উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারে যাঁহার পা নাই তিনি নাচিবেন কিরূপে? যাঁহার পা নাই যিনি অনন্ত নিরাকার আনন্দস্বরূপ তিনিই নাচিতে পারেন। পা কি নাচে? মনই নাচে, শরীর কখন নাচে না। যথার্থ নৃত্য অন্তরে, বাহিরে উহার প্রকাশ মাত্র। কেবল পদসঞ্চালন করিলেই কি নৃত্য হয়? হৃদয়ের উল্লাসই প্রকৃত নৃত্য। বাস্তবিক ঘনীভূত আনন্দই নৃত্য। ইহা নিরাকার। বাহিরের চক্ষে উহা দেখা যায় না। যিনি চিদানন্দ যিনি সুখস্বরূপ তিনি অনন্ত নৃত্য। তাঁহার নাচই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ নৃত্য। তিনি আপনাতে আপনি নাচেন। নিত্যানন্দই নৃত্যানন্দ। নিত্যহরিই নৃত্যহরি। আনন্দময়ী মধ্যে নৃত্য করেন, আর চারিদিকে বিশ্বসংসার নাচিতেছে। তিনি স্বয়ং সকলকে নাচাইতেছেন তাই সকলে নাচিতেছে। আনন্দময়ীর ভক্ত সন্তানগণ না নাচিয়া থাকিতে পারেন না। যখনই হৃদয়ে যোগানন্দরস উথলিয়া উঠে তখনই প্রাণের মধ্যে ঘোরতর নৃত্য আরম্ভ হয়। সে অনিবার্য্য দুর্জ্জয় নৃত্য কি কেহ সম্বরণ

করিতে পারে? যখন মন নাচে, তখন শির স্নায়ু অস্থি মাংস সমুদায় নাচে, মাথার প্রত্যেক চুল নাচে। ভক্তের মনের সঙ্গে তাঁহার শরীর মন এবং সমস্ত প্রকৃতি তালে তালে নাচিতেছে। সমস্ত প্রকৃতির এক সুর, এক তান এবং সকলে এক তালে পা ফেলিতেছে। যখন এইরূপে প্রকৃতির সঙ্গে ভক্তের প্রাণ এক হইয়া যায় তখন ঈশা, মুসা, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মাদিগের সঙ্গে একহৃদয় ও এক-তান হইয়া ভক্তেরা নৃত্য করেন। তখন দেবলোক, নরলোক, স্বর্গ মর্ত্ত্য এক মনে হয়। বাস্তবিক সৃষ্টি এক প্রকাণ্ড অবিশ্রাম নৃত্যের ব্যাপার। এই অনন্ত কালের নৃত্যের সঙ্গে আমরা যোগ দিতে চাই। যে দিন আমরা এই নৃত্যে যোগ দিতে পারিব সে দিন আমরা পুণ্য ও আনন্দের নব জীবন লাভ করিব। যখন পুণ্যাত্মা ভক্তেরা বৈকুণ্ঠবাসী দেবগণের সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া ব্রহ্মের চারিদিকে নৃত্য করিবেন, তখন বুঝিব পৃথিবী স্বর্গধাম হইতেছে। বন্ধুগণ, আকাশে চন্দ্র তারকাসকল নাচে, ভূতলে জীব জন্তু কীট পতঙ্গ নাচে, মহানন্দে বালক বালিকা নাচে, ইহাদিগের সঙ্গে যোগ দিয়া, হরি হরি বলিয়া তোমাদিগের প্রাণ শিশুও নাচিতে আরম্ভ করুক। যোগ ভক্তি একত্র করিয়া সকলে দলবদ্ধ হইয়া খুব উৎসাহের সহিত মহাযোগী মহাদেবের ন্যায় প্রমত্ত তাণ্ডব নৃত্য করিয়া ধরাধাম কাঁপাইয়া দেও। স্বর্গের সমস্ত যোগী ঋষি বঙ্গদেশে আসিয়া তোমাদের সঙ্গে নৃত্য করুন। হরিগুণ গান করিতে করিতে তোমাদিগের হৃদয়রূপ বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে সকলে আসিয়া নৃত্য করুন। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন যেন এইরূপ পবিত্র নৃত্য করিতে করিতে আমরা জীবন শেষ করিতে পারি।

সেবকের নিবেদন।

লজ্জারূপিণী।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ২১ ভাদ্র, ১৮০২ শকাব্দা।

ঈশ্বরের সুবিস্তীর্ণ রাজ্য তিন ভাগে বিভাগ করা যায়;—যথা রাজপথ, রাজভবন এবং অন্তঃপুর। এই তিন বিভাগই অতুল ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ। প্রশস্ত রাজপথে সৃষ্টির বিচিত্র সৌন্দর্য্য ও মহিমা। কত চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি আকাশ পথে আলোক দিতেছে। অকূল জলপথ দেখ। কত সমুদ্র মহাসমুদ্র আস্ফালন করিতেছে এবং তন্মধ্যে অসংখ্য জীব ক্রীড়া করিতেছে। চারিদিকে দেখ কত জাতীয় বৃক্ষ লতা পথের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। কত তুষারাবৃত পর্ব্বত স্থির অটল ভাবে সেই মহাদেব মহেশ্বরের যশ ঘোষণা করিতেছে এবং স্থানে স্থানে দুর্গরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার শত্রুদিগকে কম্পিত করিতেছে। সেই রাজাজ্ঞাতে কত নদ নদী চলিতেছে, কত ফুল ফুটিতেছে, কত ফল পাকিতেছে, কত বিচিত্র বর্ণের পাখী গান করিতেছে। রাজপথে মহারাজের সৃষ্টিকৌশল এবং অপার মহিমা বিস্তৃত রহিয়াছে। পণ্ডিত মূর্খ সকলেই এই সৃষ্টির মধ্যে বিশ্বরাজের বিজ্ঞানকৌশল দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হয়। কেহ কেহ এত চমৎকৃত হয় যে কোন কোন সৃষ্ট বস্তুকে স্রষ্টা জ্ঞানে পূজা করে। তাহারা নদ নদী সাগর পর্ব্বত এবং চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতিকে দেবতা জ্ঞানে আরাধনা করে এবং প্রকৃতিকে প্রকৃতির দেবী জ্ঞানে অর্চ্চনা করে। পথিক রাজপথে রাজার অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিতে দেখিতে মনে করিল, রাজপথে রাজার এত বিভব শ্রী সম্পত্তি দেখিলাম; কিন্তু এখনও রাজভবনে প্রবেশ

করি নাই। যখন কৌতূহলাবিষ্ট পথিক রাজবর্ত্ম পরিত্যাগ করিয়া রাজ-সদনে প্রবেশ করিল, তখন ভিন্ন ভিন্ন ঘরে প্রিয়দর্শন সহাস্যবদন প্রশান্তমূর্ত্তি রাজকুমারবৃন্দ দেখিতে পাইল। রাজভবনের বহির্বিভাগে রাজকুমারদিগের ঘর। কি মনোহর শ্রী! কি আশ্চর্য্য শোভা। প্রত্যেক রাজকুমার আপন আপন গুণে ভূষিত হইয়া বিচিত্র স্বর্গীয় বস্ত্র পরিধান করিয়া ঘর আলোকিত করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া পথিক মনে মনে বলিতে লাগিল,—"আহা মরি ঠিক যেন দেবসভা! ব্রহ্মসন্তান সাধুরাজকুমারদিগের কেমন বিচিত্র সৌন্দর্য্য! এক এক জন এক এক দেব ভাবে শোভান্বিত। ঐ রাজপুত্রের কেমন বৈরাগ্য! ইহাঁর কেমন অচলা পিতৃভক্তি! ইহাঁর কেমন দুর্জ্জয় বিশ্বাস! উহাঁর কেমন প্রেমোন্মত্ততা! উহাঁর কেমন গভীর যোগানন্দ! রাজপুত্রদিগের বিবিধ গুণ ও বিচিত্র সৌন্দর্য্য দেখিয়া পথিকদল, ভক্তমণ্ডলী মোহিত হইল। বিশেষ বিশেষ সাধুর রূপ গুণ দেখিতে দেখিতে কতকগুলি লোক এত দূর মুগ্ধ হইল যে তাহাদের ভ্রম হইল, তাহারা পিতা পুত্রকে এক মনে করিল, রাজপুত্রকে রাজা মনে করিল। তাহাদিগের এই ভ্রমহেতু পৃথিবীতে পিতার পরিবর্ত্তে পুত্রের, রাজার পরিবর্ত্তে রাজপুত্রের পূজা অর্চ্চনা প্রবর্ত্তিত হইল। এক প্রকার পৌত্তলিকতা বস্তু পূজা, দ্বিতীয় প্রকার পৌত্তলিকতা সাধুপূজা। এক পৌত্তলিকতা রাজপথে, অন্য পৌত্তলিকতা কুমার-ভবনে। পথিক রাজপথে এবং রাজপুত্রদিগের ভবনে রাজার অতুল ঐশ্বর্য্য এবং মহিমা দেখিয়া বিস্মিত ও মোহিত হইল। পরিশেষে অন্তঃপুর দেখিবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইল। ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে এবং তাঁহার সাধু সন্তানদিগের মধ্যে পথিক ঈশ্বরতত্ত্ব কিছু কিছু বুঝিল বটে, কিন্তু সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য সে আকুল হইল। তিনি কোথায়? অন্তঃপুরে। ব্রহ্মপিপাসু পথিক সেই নির্জ্জন স্থানে প্রবেশ করিবার জন্য স্বভাবতঃ ব্যস্ত হইল। কার্য্য দেখিয়া অথবা সন্তান দেখিয়া ব্রহ্মনির্দ্ধারণে কি মন পরিতৃপ্ত হইতে পারে? পরোক্ষ জ্ঞান হইল, এখন সাক্ষাৎ তাঁহাকে দেখিতে হইবে। তাঁহার কেমন রূপ? যাঁহার সন্তান সকল দেখিতে এমন সুন্দর তিনি নিজে কেমন? এ সকল প্রশ্ন পথিকের মনে উদিত হইল। সৃষ্ট বস্তুতে

ও পুত্রেতে কিয়ৎপরিমাণে ঈশ্বরের জ্ঞান, বল, প্রেম উপলব্ধ হইল, কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বরকে কিরূপে দেখিব? এই চিন্তায় ভক্ত পথিকের প্রাণ আকুল হইল। যেখানে ঈশ্বর লুকাইয়া আছেন ভক্ত সেই অন্তঃপুরে যাইবার সঙ্কল্প করিল। পথিক রাজপথে এবং রাজপুত্রদিগের মধ্যে ঈশ্বরের পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া অন্তঃপুরে রাজ্যেশ্বরী মাতাকে দর্শন করিতে চলিল। মাতৃদর্শন করিবার জন্য অন্তঃপুরে গমন করা নিতান্ত আবশ্যক হইল। ভক্ত ভাবুকের একান্ত ইচ্ছা যে তিনি তাঁহার আপনার মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও আলাপ করেন। ধর্ম্মপথে চলিতে চলিতে কেহ কেহ স্মৃষ্টির সৌন্দর্য্য দেখিয়া স্রষ্টাকে ভুলিয়া যায়, এবং পুত্রদর্শনে মাকে ভুলিয়া যায়। কিন্তু যথার্থ ভক্ত রাজপথ ও রাজভবনের বহিঃপ্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া সাক্ষাৎ জননীকে দেখিবার জন্য সৃষ্টির তৃতীয় এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিভাগে অর্থাৎ অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন। ভক্ত বলিলেন, ঈশা, মুসা, সক্রেটিস্, শাক্য, যাজ্ঞবল্ক্য, শুক, নারদ, চৈতন্য, নানক প্রভৃতি সাধুগণ বসিয়া আছেন দেখিলাম; কিন্তু আমার মা কোথায়? মাকে দেখিবার জন্য ভক্তের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। এমন সময় অন্তঃপুর হইতে মধুর ধ্বনি শুনা গেল; "যদি মাকে দেখিবে তবে অন্তঃপুরে অন্বেষণ কর।" দূর হইতে সুমধুর স্বর শুনিয়া মাকে দেখিবার জন্য ভক্তের প্রাণ আরও আকুল হইল। যে স্থান হইতে সেই মধুর ধ্বনি আসিল কোথায় সেই অন্তঃপুর? ভক্তের প্রাণে ব্যাকুলতা সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃপুরের দ্বার খুলিল। সাধক মনে করিলেন এবার বুঝি ঈশ্বরের অব্যবহিত সন্নিধানে আসিলাম। কিন্তু ক্ষণকাল মধ্যে দেখিলেন ঈশ্বর অবগুণ্ঠনে আবৃত, কিছুতেই দেখা দেন না। ঈশ্বরের মুখ যে শ্রী ও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ তাহা প্রকাশিত হইল না। যেমন চন্দ্রের জ্যোৎস্না তরল মেঘের ভিতর দিয়া অল্প অল্প প্রকাশ হয় সেইরূপ অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়া ব্রহ্মজ্যোতি অল্প পরিমাণে প্রকাশিত হইল; কিন্তু স্পষ্টরূপে ব্রহ্মকে দেখা গেল না। সুতরাং ভক্তের ব্রহ্মদর্শন স্পৃহা সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ হইল না। তিনি ক্রমাগত সাধন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মমুখের আবরণ তিনি সরাইতে চেষ্টা করিলেন। বাস্তবিক ঈশ্বর অত্যন্ত লজ্জাশীল ও গোপনপ্রিয়। তিনি আপনাকে ঢাকিয়া

রাখিবার জন্য সমুদায় বস্তু আবরণরূপে সৃজন করিয়াছেন। সূর্য্য এত উজ্জ্বল কিরণ বিস্তার করিতেছে, চন্দ্র এমন মনোহর জ্যোৎস্না প্রকাশ করিতেছে; কিন্তু যে মা এ দুই জ্যোতিষ্ক সৃজন করিয়া জগৎ আলোকিত করিলেন, তিনি আপনি আপনার মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। সমুদ্রের জলে চন্দ্র প্রতিবিম্বিত হয়; কিন্তু সমুদ্রের জল কখনও তো চন্দ্রের চন্দ্রকে প্রতিভাত করিতে পারিল না। গোলাপ ফুল আপনার সৌন্দর্য্য দেখাইয়া লোকের মন হরণ করে; কিন্তু যে প্রেমময়ীর হস্তে গোলাপ রচিত সেই প্রেমময়ী মাতাকে উহা প্রকাশ করিতে পারে না। চন্দ্র সূর্য্য এবং অগ্নি প্রভৃতি সমুদায় জ্যোতির্ম্ময় বস্তু একত্র হইলেও সেই আদি কারণ আদি জ্যোতিকে প্রকাশ করিতে পারে না। এই সৃষ্টি ব্রহ্মের পরিধের বস্ত্র ও আবরণ। জগদীশ্বর এই সৃষ্টির আবরণে আপনাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। মানুষ সহজে সৃষ্টির ক্রিয়া সকল দেখিতে পায়, অনেক সময় সৃষ্টির ঘটনাপুঞ্জের কার্য্যকারণ অবধারণ করে; যেমন বৃষ্টির কারণ মেঘ, মেঘের কারণ বাষ্প, বাষ্পের কারণ জল] এবং সূর্য্যের উত্তাপ ইত্যাদি; কিন্তু অবিশ্বাসী অভক্ত মানুষ আদি কারণ দেখিতে পায় না। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বাহিরের কারণসকল দেখিল কিন্তু ভিতরের গূঢ় আদি কারণ দেখিতে পাইল না। কেবল অন্ধকার যে বিশ্বস্রষ্টাকে আবরণ করে তাহা নহে আলোক অন্ধকার দুই মার মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। মার মুখ ঢাকিয়া রাখিবার জন্য সৃষ্টির তাবৎ বস্তু যেন শিক্ষিত ও অনুরুদ্ধ। মা লজ্জাশীলা হইয়া অন্তঃপুরে বসিয়া আছেন। অন্তঃপুর ভিন্ন জননী আর কোথাও থাকিতে পারেন না। যেখানে নির্জ্জনতা, যেখানে প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা, যেখানে গভীর অন্ধকার সেইখানেই বিশ্বজননী। গোপনে অন্ধকারে লজ্জারূপিণী জগজ্জননী বাস করেন। তিনিত নিশ্চয় সকল স্থানেই আছেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী। কিন্তু হে যোগী, বৈরাগী, প্রেমিক, তোমরা তাঁহাকে সকল স্থানে দেখাও দেখি। মা আপনার লজ্জা বিনয়েতে আপনাকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। সত্য শিব সুন্দর ব্রহ্ম সৃষ্টির আবরণের ভিতরে আপনাকে অপ্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন। যাহার অধিক গুণ সে আপনাকে ঢাকে; যে নিগুর্ণ সে ঢাক বাজাইয়া বেড়ায়। যাহার ভিতরে

পদার্থ অল্প সেই বাহিরে অধিক আড়ম্বর করে এবং খুব বক্তৃতা করিয়া ধুম-ধাম করিয়া বেড়ায়। জগজ্জননীর অনন্ত শক্তি অনন্ত গুণ কিন্তু দেখ তাঁহার এত লজ্জা যে তাঁহার চারিদিকে ভয়ঙ্কর বজ্রধ্বনি হইতেছে, কোটি কোটি লোক চীৎকার রবে স্তব স্তুতি করিতেছে; কিন্তু জননীর মুখে একটি কথা নাই, যেন তিনি বিনয়ে মাথা হেঁট করিয়া লজ্জায় মুখ ঢাকিয়া বসিয়া আছেন। হে অল্পবিশ্বাসী, তুমি কি মনে কর মা সন্তানদিগের ক্রন্দন ধ্বনি শুনেন না এবং তাহাদের কাতর প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন না? মা তাঁহার অন্তঃপুরে লুক্কায়িত বটে কিন্তু সেখানে থাকিয়া সন্তানদিগের সকল কথা শুনিতেছেন এবং যাহা যাহা আবশ্যক তাহা বিধান করিতেছেন। তাঁহার সমস্ত শক্তি ও নিয়ম জীবের অভাব মোচন করিতেছে, তিনি নিজে লুকাইয়া বসিয়া আছেন। সর্ব্বরাজ্যেশ্বরী জননী প্রত্যহ নিঃশব্দে আস্তে আস্তে সন্তানদিগের ঘরে আসিয়া সমুদায় সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করেন অথচ কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না। তিনি কথা কহিলেন না, গোল করিলেন না, তাঁহার কোন আড়ম্বর নাই, কিন্তু সকল হিতকর কার্য্যই তিনি করিতেছেন। মা গোপনে কার্য্য করেন। নির্লজ্জ অহঙ্কারী পুরুষদিগের ন্যায় তিনি আড়ম্বর ভালবাসেন না। মা এমনি ভাবে কায করেন যেন তিনি কিছুই করেন না। মানুষকে তিনি সকল শুভ কর্ম্মের সুখ্যাতি লইতে দেন, আপনি লুকাইয়া থাকিয়া মনুষ্যকুলের গৌরব বৃদ্ধি করেন। তিনি নিজে গৌরব আকাঙ্ক্ষা করেন না। মা সন্তানদিগকে বলেন;—"তোমরা সুখ্যাতি লও, মা সুখ্যাতি চান না।" মা লজ্জায় মাথা ঢাকিয়া রহিয়াছেন। তিনি সমুদয় কুলবধূর দৃষ্টান্ত, তিনি তাঁহার অন্তঃপুরের বাহিরে এক পদও অগ্রসর হইবেন না। মা কি যাকে তাকে দেখা দেন! হ্রীস্বরূপা জগন্মাতা কি রাস্তার লোকদের নিকট প্রকাশিত হন? মার নামে নির্লজ্জতার কলঙ্ক আরোপ করে এমন পাষণ্ড কে আছে? নাস্তিক পাষণ্ডদিগের নাস্তিকতা দম্ভ এবং পরিহাস ও মাকে অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আনিতে পারে না। মার এমন উজ্জ্বল রূপ আছে যাহা প্রকাশ হইলে পৃথিবীতে এক জনও নাস্তিক থাকিতে পারে না। যদি মা লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেন তাহা হইলে কি পৃথি-

বীতে এত সন্দেহ, অবিশ্বাস নাস্তিকতা থাকিত? মার অসংখ্য রূপ গুণ আছে, কিন্তু কয় জন লোক মাকে দেখিতে পায়? এত সৌন্দর্য্য, কিন্তু কেবল অন্তঃপুরই তাহা দেখিল। এত শ্রী কিন্তু জননী তাহা গুপ্ত রাখিলেন। সুনীল আকাশ মার মুখকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। হে শূন্য, তোমাতে তো কিছু নাই, তুমি কেন ব্যবধান হইয়া ঈশ্বরকে প্রচ্ছন্ন করিতেছ? বস্তু তাঁহাকে ঢাকিল, শূন্যও তাঁহাকে ঢাকিল? কি আশ্চর্য্য! মা আকাশরূপ নীলাম্বর সুনীল বস্ত্র পরিধান করিয়া আপনাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। মা এমনি লজ্জাশীলা যে পথের কোলাহল মধ্যে তাঁহার কথা তো কেহই শুনিতে পায় না, অন্তঃপুরেও যখন তিনি কথা কহেন অত্যন্ত মৃদুস্বরে ভক্তদিগের সঙ্গে আলাপ করেন। সর্ব্ব সাধারণের কর্ণে তাঁহার কথা প্রবেশ করে না। অত্যন্ত বিশ্বাসী ভক্ত তাঁহার গুপ্ত রহস্য শুনিবার অধিকারী। নিভৃত অন্তঃপুরে যোগ গৃহে তিনি কেবল অনুরক্ত ভক্তের সহিত চুপি চুপি কথা কহেন। মা ভক্তের কাছে এমনি নিঃশব্দে আসেন যে চারিদিকে হাজার লোক থাকিলেও তাহারা বুঝিতে পারে না যে মা আসিয়াছেন। ভক্তের ঘরে মা যে দিবা রাত্রি পরিশ্রম করেন তাহাতেও কোন শব্দাড়ম্বর নাই। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি অবিশ্রান্ত সেবা করিতেছেন। এ দিকে নাস্তিকেরা অহঙ্কার করিতেছে, পাষণ্ডেরা আস্ফালন করিতেছে, তাঁহাকে অস্বীকার করিতেছে ও তাঁহার প্রাপ্য গৌরব তাঁহাকে না দিয়া আপনারা ভোগ করিয়া লইতেছে। কিন্তু লজ্জাবতী জননী একটী কথা বলিয়াও প্রতিবাদ করেন না। সকলেই পরিশ্রমের পুরস্কার, সুখ্যাতি ও বেতন গ্রহণ করিল, মা কিছুই পাইলেন না। কর্ত্তা কর্ত্রী দাস দাসী সকলেই সুখ্যাতি গ্রহণ করিল, মা লক্ষ্মী পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হাসিলেন, মনে মনে বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য!" হে ভক্ত, তুমি যে অন্ন আহার করিলে কে ঐ অন্ন প্রস্তুত করিল? সকলই মা লক্ষ্মী করিলেন, কিন্তু কেহ মাকে রন্ধন করিতে দেখিল না, কেহ মার শব্দ শুনিল না। লক্ষ্মীর সংসারে স্ত্রীলোকেরা অলঙ্কার পাইল, কে তাহাদিগকে অলঙ্কার, শ্রী সৌন্দর্য্য দিলেন? স্বয়ং লক্ষ্মী সমুদায় দিলেন, কিন্তু সুখ্যাতি পাইলেন না। লোকে

বাগে গোলাপের কি চমৎকার সৌন্দর্য্য! চন্দ্র কেমন মনোহর! কিন্তু পুষ্পের সৌন্দর্য্যও চন্দ্রের জ্যোৎস্নার ভিতরে য অন্তঃপুর আছে তন্মধ্যে সৌন্দর্য্যের রচয়িত্রী এবং চন্দ্রের নির্ম্মাতাকে অতি অল্প লোকেই দেখিতে পায়। হে ব্রাহ্ম, তুমিও যদি অন্য লোকের ন্যায় বাহিরে বেড়াও, তুমিও যদি অন্তঃপুরে গিয়া ভক্তবৎসলা মাকে না দর্শন কর তবে কে মাকে দেখিবে? মা অন্তঃপুরে থাকিয়া আপনার রূপ ও সৌন্দর্য্য সেখানে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। যোগবলে সেই গুপ্ত রূপ দেখিতে হইবে। সেই অন্তঃপুরে গিয়া যাহারা মার রূপ দেখিয়াছেন তাঁহারা আর ফিরিয়া আসিতে পারেন নাই। অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইয়া কিরূপ পুলকে পূর্ণ হইয়া ভুবনমোহিনী জগজ্জননী বিরলে বসিয়া হাসিতেছেন! একবার সেখানে গিয়া যে মার মুখের মধুর হাস্য দেখিতে পায় সে ভক্তিতে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার পদারবিন্দে পড়িয়া থাকে। মাঁর রূপ গুণের কথা বলিও না। যত রূপ তত লজ্জা; যত গুণ তত বিনয়। পৃথিবীর নর নারীর একটু রূপ থাকিলে তিলার্দ্ধ গুণ থাকিলে কত দেখায়। কি অহঙ্কার! ধিক্ নির্লজ্জ পুরুষ, ধিক্ লজ্জাহীনা নারী! পৃথিবীর মহিলাগণ, তোমরা মার নিকট লজ্জা ও বিনয় শিক্ষা কর। আত্মসংগোপন তোমাদের জননীর ধর্ম্ম, বিদ্যা ও রূপ প্রকাশ করিতে তাঁহার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি ও রুচি নাই। তোমরা তাঁহার ন্যায় লজ্জাশীলা হও। তাঁহার এত লজ্জা, তিনি কদাপি উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতে পারেন না, দৌড়া দৌড়ি করিয়া প্রকাশ্য স্থানে আসিতে পারেন না। সজন নগরে, কোলাহলপূর্ণ পথে মা কখন দেখা দেন না। তিনি কখন অন্তঃপুরের সীমা অতিক্রম করিতে পারেন না। তাঁহার লজ্জা তাঁহাকে বাহিরে আসিতে দেয় না। ভক্তের হৃদয়ের ভিতরে, অন্তরের অন্তরে তিনি আপনাকে প্রকাশ করেন। মার হস্তের রচিত রসনা মাকে গোপন করে। রসনাকে এত অনুরোধ করি মার সুন্দর রূপের কথা বল, সে কিছুতেই বলিবে না। সে বলে, মা বারণ করিয়াছেন; অন্তঃপুরের নিগূঢ় রহস্য আমি কখনই প্রকাশ করিব না। রসনা বাহিরের সকল কথাই আহ্লাদের সহিত বলে, কিন্তু অন্তঃপুরের কথা, গুপ্ত যোগানন্দের তত্ত্ব কিছুতেই বলিতে চায় না। গূঢ় হরিরূপের

কথা, হরিগুণের কথা বাস্তবিক অনির্ব্বচনীয়। যদিও হরির রূপ দেখিয়া মন কখন কখন মুগ্ধ হয়, পৃথিবীর অভিধানে এমন কোন শব্দ নাই যদ্দ্বারা সেইরূপ ব্যাখ্যা করা যায়। হরিরূপের কথা ভক্তেরা বলিতে চেষ্টা করেন কিন্তু কিছুই বলিতে পারেন না, চক্ষু কেবল প্রেমাশ্রু বর্ষণ করে। অতএব যদি সুখী হইতে চাও সেই লজ্জা-রূপিণী মা জগদ্ধাত্রীকে বিশ্বের অন্তঃপুরে মনের অভ্যন্তরে অন্বেষণ কর। হে ব্রাহ্ম যাত্রিগণ, কেবল বাহিরে বিচরণ করিও না, কেবল রাজপথে বিচিত্র সৃষ্টির সৌন্দর্য্য এবং ভক্তদিগের ভবনে সাধুচরিত্র শোভা দেখিয়া ক্ষান্ত হইও না; কিন্তু অন্তঃপুরে গিয়া সেই আদ্যাশক্তি সেই হ্রীস্বরূপা জগজ্জননীকে দর্শন কর। তিনি তোমাদের জীবনের অন্তঃপুরে, তোমাদের অন্তরতম প্রাণের মধ্যে বসিয়া আছেন। ভক্তির অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মাকে দেখিয়া তাঁহার চরণ তলে প্রণত হও। মা বলিবেন;—ধন্য ধন্য সন্তান, অন্তঃপুরে মার দর্শন পাইলে।

সেবকের নিবেদন।

ক্ষমা ও ক্রোধের সামঞ্জস্য।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ১১ আশ্বিন, ১৮০২ শক।

ধর্ম্মরাজ্যে কত বিবাদ কত সংগ্রাম আমাদের দেখিতে হয়। বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে আপাততঃ বিরোধই দেখা যায়, সামঞ্জস্য শান্তি বহুদূরে। ক্ষমাশীল হিন্দুধর্ম্ম শত্রুকেও ক্ষমা করিতে উপদেশ দেয়, আক্রমণকারী মহম্মদধর্ম্ম শত্রুকে নিপাত করিতে উৎসাহ প্রদান করে। হিন্দু যোগী ঋষি স্থিরচিত্ত ও প্রশান্ত, কিন্তু মুসলমান্ ভয়ানক উগ্র ও উদ্ধত। প্রধান প্রধান আর্য্য ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরা বলিয়াছেন, শত্রুকে ক্ষমা কর, যে তোমাকে ছেদন করিতে উদ্যত হয়, তুমি তাহাকে ছায়া দান কর, যে তোমাকে আক্রমণ করে তুমি তাহার উপকার কর, যে তোমার ধনহানি, মানহানি করে তুমি তাহাকে ধন মান দেও। যে তোমাকে অভিশাপ দেয় তুমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ কর। মনের রাগ সম্বরণ কর, মনে প্রতিহিংসা উত্তেজিত হইতে দিও না। যেমন মিত্রের মঙ্গল চেষ্টা করিবে তেমনি শত্রুরও কল্যাণ সাধন করিবে। হিন্দু ধর্ম্ম এরূপ ক্ষমার উপদেশ দেন, কিন্তু মুসলমান্ধর্ম্ম ভয়ানক তেজের সহিত শত্রু নিপাত করিতে আদেশ করে। কাফের বিনাশ মহম্মদধর্ম্মের একটি বিশেষ লক্ষণ। পৃথিবীতে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যত লোক দাঁড়াইয়াছে সকলকে নির্যাতন করিয়া পরাজয় করিবে, ইহা মহম্মদের একটি প্রধান আদেশ। একদিকে হিন্দুধর্ম্মের উপদেশে রক্ত ঠাণ্ডা হয়, অপরদিকে মুসলমান্ধর্ম্মের উপদেশ শুনিলে রক্ত গরম হইয়া উঠে। এস্থলে মুসলমান্ ও আর্য্যদিগের

কিরূপে সামঞ্জস্য হইবে? যদি হিন্দু ও মুসলমান্ উভয় ধর্ম্মের মহাপুরুষগণ ঈশ্বরপ্রেরিত হন তাহা হইলে বাহিরে এরূপ অসামঞ্জস্য কেন দেখা যায়? ঈশ্বরের কি এই অভিপ্রায় যে পৃথিবীতে ধর্ম্মের নামে যুদ্ধ চলিবে? যদি ঈশ্বরের এরূপ অভিপ্রায় হয় তবে তিনি ক্ষমার শাস্ত্র কেন প্রচার করিলেন? হিন্দুধর্ম্ম ক্ষমার ধর্ম্ম। হিন্দুজাতি শান্ত ও ক্ষমাশীল, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রভাবে আরও শান্ত ও ক্ষমাশীল হইবে। ব্রহ্মপরায়ণ হিন্দুর মনে এখনও যতটুকু তেজের ভাব রাগের ভাব আছে তাহাও ক্রমে সাধন দ্বারা বিলুপ্ত হইবে। যথার্থ সাত্ত্বিক হিন্দুর ধৈর্য্যগুণ সহজে ক্রোধের আগুনে দগ্ধ হয় না; নববিধান হিন্দুজাতিকে আরও অধিক পরিমাণে সহিষ্ণু ও ক্ষমাবান্ করিতেছে। নববিধানের ক্ষমা ও উদারতা অতীব আশ্চর্য্য। সহস্র শত্রুতা নির্যাতন ও আক্রমণের পরিবর্ত্তে উহা ক্ষমা, শান্তি ও প্রেম দিবে। যাবনিক ধর্ম্ম ইহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। ঋষিধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম, ক্ষমার ধর্ম্ম, শান্তির ধর্ম্ম; মহম্মদের ধর্ম্ম ইহার বিপরীত। মহম্মদধর্ম্ম বৈর নির্যাতন ও কাফের দলনের ধর্ম্ম। কাফের কে? ঈশ্বরের শত্রু। মহম্মদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে কাফের নিগ্রহ করিতেই হইবে। এই দুই ধর্ম্ম আপাততঃ পরস্পর বিরুদ্ধ। এক দিকে জলের স্রোত, আর একদিকে অগ্নিকুণ্ড। এক দিকে "মার মার কাট কাট" শব্দ উত্থিত হইতেছে, অপর দিকে "শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।" যবনের উষ্ণ শোণিত, হিন্দুর শীতল রক্ত। এই দুই বিরুদ্ধ প্রকৃতির মধ্যে কি বন্ধুতা সম্ভব? পৃথিবীতে পরিণামে হয় ক্ষমার প্রাদুর্ভাব নতুবা ক্রোধের প্রাদুর্ভাব হইবে। বল হে নববিধান, পৃথিবীতে এই দুয়ের কোন্‌টী জয় লাভ করিবে? ক্রোধ না ক্ষমা? নববিধান, তুমি সকল বিরুদ্ধ দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিতে আসিয়াছ, আপাততঃ এই দুই দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিয়া দেও। হিন্দু মুসলমান্ একত্র কর দেখি। নববিধান অতি সুন্দররূপে এই দুই আপাত বিরুদ্ধ মতের সামঞ্জস্য করিলেন। তাঁহার নিষ্পত্তি এই;—শত্রু দুই প্রকার, এক ঈশ্বরের শত্রু, আর এক মানুষের শত্রু। ক্ষমা মানুষের শত্রুর প্রতি, যুদ্ধ ঈশ্বরের শত্রুর বিরুদ্ধে। নববিধানের এই বিধি অনুসারে আমি আমার প্রত্যেক শত্রুতাকে ক্ষমা করিব। যে শত্রু আমার অন্ন

বস্ত্র বন্ধ করে, আমি তাহার অভাবের সময় অন্ন বস্ত্র দান করিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করিব, কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি ঈশ্বরের গৌরব পরিচ্ছদ অপহরণ করে তাহার অবিশ্বাস ছেদন করিবার জন্য আমার পঞ্চাশ খানি বিশ্বাসের খড়্গ উত্থিত হইয়া ঝক্‌মক্ করিবে। যখন ভুবনেশ্বরী মহালক্ষ্মী নববিধান হাতে করিয়া পাপী দুঃখীদিগকে ধর্ম্মের অন্ন বিতরণ করেন তখন যদি কোন পাষণ্ড সেই অন্নদানের বিরোধী হয় শত শত ভক্ত সেই পাষণ্ডের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য দাঁড়াইবেন। মনুষ্যকে যদি কেহ শত্রু হইয়া মারিতে চেষ্টা করে সে বরফের মত শীতল হইয়া তাহার সমস্ত শত্রুতা নির্ব্বাণ করিবে। এই ক্ষমা কঠোর সাধনসম্ভূত নহে। যথার্থ ক্ষমাশীল যিনি তিনি সহজে ক্ষমা করেন। তিনি যে কঠোর সাধন অথবা বিবেক দ্বারা রাগ দমন করেন তাহা নহে; তাঁহার সহজে রাগ হয় না। তাঁহার মনের উপরে ঈশ্বর এমনি ক্ষমাজল, নির্ব্বাণজল ঢালিয়া দিয়াছেন যে সে রাগ করিতে পারে না। দুরন্ত শত্রুদিগের দ্বারা ঈশা ক্রুশে আহত হইলেন, তথাপি তিনি হিংসার বিনিময়ে প্রতিহিংসা না দিয়া ক্ষমা দিলেন। শত্রুদিগের হস্ত হইতে কষ্ট পাইলেও তাহাদিগকে কষ্ট দিবে না। চারি দিকে ভয়ানক নির্যাতনের আগুন জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু ব্রহ্মপরায়ণ সাধু শীতল শ্বেত প্রস্তরের থামের ন্যায় স্থির অটল হইয়া রহিলেন, নিজে পুড়িলেন না, কিছু মাত্র ক্ষত বিক্ষত হইল না বরং নিজের শীতল স্বভাব গুণে শত্রুদিগের দ্বারা যত আগুন নিক্ষিপ্ত হইল সমুদায় ঠাণ্ডা করিলেন। চারিদিকে শত্রুতার আগুন জ্বলিতেছে, মধ্যে ক্ষমাশীল ব্যক্তি দৃঢ় অচল স্তম্ভের ন্যায় স্থির হইয়া রহিয়াছেন। নিজের শত্রুদিগকে ক্ষমা করা তাঁহার স্বভাব। নিজের শত্রুদিগকে ক্ষমা করা উচিত কি না যিনি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন তিনি নিকৃষ্ট শ্রেণীর সাধক। উৎকৃষ্ট ভক্ত যিনি তিনি বলেন, নিজের শত্রুর প্রতি ক্ষমা না করা ভয়ানক অধর্ম্ম। কিন্তু এ সকল বিধানাশ্রিত লোক যেমন এক দিকে ক্ষমাশীল তেমনি অপর দিকে যুদ্ধশীল। নিজের শত্রুর প্রতি ক্ষমা সাধন ইহাদিগের পক্ষে অনিবার্য্য; কিন্তু ঈশ্বরের শত্রুর প্রতি ইহারা সর্ব্বদা খড়্গহস্ত। যেখানে স্বার্থ নাই, যেখানে

আসিল নাই, যেখানে কেবল ঈশ্বর আছেন সেখানে যদি কোন ঈশ্বরবিরোধী পাষণ্ড ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কোন কথা বলে অথবা কোন কার্য্য করে নববিধানাশ্রিত লোক তাহা সহ্য করিতে পারেন না। ঈশ্বরভক্ত কোন মতেই ঈশ্বর-নিন্দা সহ্য করিতে পারেন না। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত কাহারা? যাহারা মাকে ভাল বাসে। যেখানে ব্রহ্মভক্তি, বৈরাগ্য, ক্ষমা সেখানেই ব্রহ্মের শত্রুদিগের বিরুদ্ধে সমরসজ্জা। যাহারা মাকে ভালবাসেনা তাহারা কাপুরুষ। যাহারা মার শত্রুদিগের হস্ত হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রাণপণ করে না তাহারা নীচ স্বার্থপর ভীরু। কাপুরুষ, তুই মুখে বলিস্ মার প্রতি তোর অগাধ অচলা ভক্তি, অথচ মার নামে যত অপমান হয় তৎসমুদায় তুই সহ্য করিস্? যে সাধক সত্য সত্যই মার নাম সাধন করে, মাকে ভাল বাসে সে কদাচ মার নামে নিন্দা অপবাদ সহ্য করিতে পারে না। যত পরিমাণে ব্রহ্মভক্তি বৃদ্ধি হয় তত পরিমাণে ব্রহ্মনিন্দা অসহ্য হইয়া উঠে। যদি ভক্তকে কোন পাষণ্ড এই কথা বলে;—"তোর আবার ঈশ্বর কে? তুই আপনি পরিশ্রম করিয়া আপনার এবং আপনার পরিবারের অন্ন বস্ত্র সঞ্চয় করিস্। ঈশ্বর তোকে অন্ন বস্ত্র দিয়া পালন করেন, কেন তুই এই মিথ্যা কথা বলিস্?" এই কথা শুনিবামাত্র ভক্তের আপাদ মস্তক স্বর্গীয় তেজে পূর্ণ হইয়া উঠে। তৎক্ষণাৎ তিনি রাগ, দয়া ও ভক্তিতে উত্তেজিত হইয়া সেই পাষণ্ডের মতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। আপনার প্রভুর বিরুদ্ধে, আপনার ঈশ্বরের বিরুদ্ধে একটি কথা অগ্নি সমান, উহা কিছুতেই তিনি সহ্য করিতে পারেন না। যখনই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তিনি কোন কথা শুনেন তৎক্ষণাৎ তিনি তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা তাহা খণ্ড খণ্ড করিতে চেষ্টা করেন। ভক্তের অস্ত্র কি? বিশ্বাস। ভক্তের খড়্গ কি? জিহ্বা। ভক্ত তাঁহার বিশ্বাস অস্ত্রে নাস্তিকের অবিশ্বাস কাটিতে থাকেন এবং জিহ্বা যন্ত্রে হরিনাম উচ্চারণ করিয়া, ব্রহ্ম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া লোকের অভক্তি ও অপ্রেম বিনাশ করেন। ভক্তদল বিস্তীর্ণ মাঠে দাঁড়াইয়া তীব্র বিশ্বাস বাণে ঈশ্বরের শত্রুদিগের অবিশ্বাস ও নাস্তিকতা খণ্ড খণ্ড করেন। এস্থলে যুদ্ধ করা অন্যায় ব্যবহার নহে, কিন্তু ন্যায় ব্যবহার। পাষণ্ডদিগের নাস্তি-

কন্তা খণ্ড খণ্ড করা বিশ্বাসী ভক্তের প্রধান ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি মাতৃনিন্দা পিতৃনিন্দা শুনিয়া স্থির থাকিতে পারে সে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের অভক্ত সন্তান। নিজের কর্ণের নিকট সহস্র প্রকারে ঈশ্বর নিন্দা হইতেছে অথচ সে ব্যক্তি একবারও কাঁদিল না, সে কখনও ঈশ্বরের ভক্ত নহে। নিজের শত্রুকে ক্ষমা করিব; কিন্তু ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র শত্রুতা সহ্য করিব না। পৃথিবীতে ঈশ্বরের শত্রুও প্রবল থাকুক মিত্রও আদৃত হউক এরূপ ভাব কদাপি পোষণ করিবে না, এমন কথা মুখে আনিবে না। জনসমাজে কতকগুলি ঈশ্বরবিরোধী, উপাসনাবিরোধী, ধর্ম্ম ও সতীত্ববিরোধী লোক থাকিবে অথচ ঈশ্বর ভক্ত ঘরে বসিয়া হাসিবেন ইহা অসম্ভব। এই পৃথিবী বিশ্বাসীদিগের জন্য, বিশ্বাসী ভিন্ন এই পৃথিবীর মাটী আর কাহারও ব্যবহার করিবার অধিকার নাই। ঈশ্বরের রাজ্যে কেবল ঈশ্বরভক্তেরাই থাকিবেন। যাঁহারা ঈশ্বরকে মানেন তাঁহাদিগেরই জন্য ঈশ্বরের গৃহ। যাহারা ঈশ্বরের বিরোধী নাস্তিক কাফের তাহাদিগের ঈশ্বরভবনে থাকিবার অধিকার নাই। তবে কি কাফের বধ করিতে হইবে? অস্ত্র দ্বারা কি তাহার প্রাণ বিনাশ করিতে হইবে? না। শরীর তো কাফের নহে, তাহাকে নির্যাতন করা অধর্ম্ম। নাস্তিক বিধর্ম্মী ভাবই কাফের, তাহাকে বধ করিতে হইবে। পৃথিবী হইতে তাহাকে বিদায় করিতে হইবে। কাফের বিনাশের যথার্থ অর্থ কি? পাপ ও নাস্তিকতা বিনাশ। কাফের জয় কাহাকে বলে? ব্রহ্মবৈরীদিগের বৈরভাব পরাজয়। এই ভাবে ঈশ্বরভক্তেরা কাফের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন, মানুষের প্রতি আক্রমণ করিবেন না। মানুষের শরীরের বিরুদ্ধে কিঞ্চিন্মাত্র রাগ হইবে না; কিন্তু যেখানে কাফের, অর্থাৎ ঈশ্বরের শত্রু সেখানে তীব্র অস্ত্র সঞ্চালন করিতে হইবে। পৃথিবীতে যত রকম অবিশ্বাস নাস্তিকতা পাপ ব্যভিচার আছে, সে সমুদয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে। ইহারা ঈশ্বরের মহাশত্রু। ইহারা ঈশ্বরকে বিদায় করিয়া দিয়া আপনারা পৃথিবীকে ভাগ করিয়া লইতে চায়। নাস্তিকতা, উপধর্ম্ম, বিষয়াসক্তি, ব্যভিচার, এই চারি দল পৃথিবীর চারিদিক অধিকার করিতে নিয়ত চেষ্টা করিতেছে। নাস্তিকের ইচ্ছা যে পৃথিবী শুদ্ধ লোক

নাস্তিক হয়, ইন্দ্রিয়াসক্ত মদ্যপায়ীর ইচ্ছা যে পৃথিবী শুদ্ধ লোক ইন্দ্রিয় পরায়ণ ও সুরাপায়ী হয়। পাষণ্ডের ইচ্ছা যে পৃথিবীর কেহই ঈশ্বরের পূজা না করে। যাহারা ঈশ্বরকে মানে না, নানা প্রকারে ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা করে তাহাদিগের মনে মনে এই কুবাসনা যে পৃথিবীর সকলেই এরূপ করে। বিকৃত লোক যেমন আপনি অধর্ম্মে ডুবিল তেমনি অপর সকলকেও অধর্ম্মে ডুবাইতে চেষ্টা করে। ইহাদিগের পাপাচারে কাফের বংশ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে। যাহাতে অসুর দল বৃদ্ধি না হয় ব্রহ্ম-ভক্তদল সর্ব্বতোভাবে এ রূপ চেষ্টা করিবেন। তাঁহারা হুঙ্কার রবে বলেন আমরা বাঁচিয়া থাকিতে কাহার সাধ্য পৃথিবীতে নাস্তিকতা প্রচার করে? যে ঈশ্বরের পূজা করিয়া আমরা এমন সুখী হইতেছি কাহার সাধ্য পৃথিবী হইতে সেই ঈশ্বরকে বিদায় করিয়া দেয়? ব্রাহ্মগণ, কাফেরদিগের বিরুদ্ধে তোমাদের যুদ্ধ করিতেই হইবে। আমরা আমাদের শত্রুকে ক্ষমা করিব; কিন্তু ঈশ্বরের শত্রু নাস্তিকতা, ব্যভিচার ইন্দ্রিয়াসক্তির বিরুদ্ধে আমরা হুঙ্কার করিয়া বিশ্বাস কামান ছুড়িব, তীক্ষ্ণ খড়্গ দ্বারা এ সকল শত্রু নিপাত করিব। পাপকে কাটিবে; কিন্তু সাবধান ভাইকে ভগ্নীকে কাটিবে না। ক্ষমা করিবে হিন্দুর ন্যায়, যুদ্ধ করিবে মুসলমান সিপাইদের ন্যায়। নাস্তিকের প্রাণের উপরে কোন আঘাত করিবে না, কিন্তু নাস্তিকতা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিবে। শস্ত্র বিদ্যানিপুন শস্ত্রধারী কেমন আশ্চর্য্য রূপে অস্ত্রাঘাত করিয়া ধরাশায়ী লোকের বক্ষস্থিত সূক্ষ্ম কদলী পত্র ছেদন করে অথচ সেই লোকের অঙ্গে কিছু মাত্র আঘাত লাগে না। মানুষের প্রাণের উপর তোমার কোন অধিকার নাই। ঈশ্বরের বিরুদ্ধ কাফের ভাব বিনাশ করা তোমার ধর্ম্ম। পাপ নাস্তিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবে। ঈশ্বর বিরুদ্ধে, বিধান বিরুদ্ধে, সাধুদিগের বিরুদ্ধে, সতী-দিগের বিরুদ্ধে আক্রমণ সহ্য করিবে না। ঈশ্বরনিন্দা, গুরুনিন্দা, মাতৃনিন্দা শুনিবে না। প্রকৃত ধর্ম্মবীর বলেন, আমাকে সহস্র কষ্ট দেও, অপমান কর, আমি সহ্য করিব, কিন্তু পিতা মাতা গুরু সতীস্ত্রীর নিন্দা কখনও সহ্য করিতে পারিব না, এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তর যিনি সেই প্রাণেশ্বরের নিন্দা কোন মতেই সহ্য করিতে পারিব না। মোক্ষ-

দায়িনী জগদীশ্বরী সন্তানদিগের পাপ দুঃখ মোচন করিবার জন্য যে নববিধান বিস্তার করেন সেই নববিধানকে যদি কেহ মিথ্যা বলে তাহা হইলে ভক্তের বিশ্বাস খড়্গ তেজের সহিত দাঁড়াইয়া উঠে। ভক্তেরা মেদিনী কাঁপাইয়া বলেন, "হে বিধাতার বিরোধী, হে ঈশ্বর বিরোধী, যত ক্ষণ তোমাদিগের নাস্তিকতা চূর্ণ না হইবে তত ক্ষণ অদ্যাশক্তি ভগবতী প্রদত্ত এই খড়্গ, এই শাণিত তীক্ষ্ণ অস্ত্র আমাদের প্রতি জনের হাতে ঝক্‌মক্‌ করিবে।" ঈশ্বরনিন্দা শুনিয়াও যে বরফের ন্যায় শীতল হইয়া থাকে, ঈশ্বর বিরুদ্ধ ভাব বিনাশ করিবার জন্য একটি কথাও বলে না সে কখনই প্রকৃত ভক্ত নহে। সতী যেমন পতিনিন্দা সহ্য করিতে পারেন না, ভক্ত তেমনি বিশ্বপতির নিন্দা কিছুতেই সহ্য করিতে পারেন না। সৎপতির নিন্দায় যে স্ত্রী আমোদ করে সে নারীকে কে শ্রদ্ধা করে? আমাদের মধ্যে যদি কেহ নিজের প্রতি শত্রুতা জন্য রাগে, নিজের মানহানি কিম্বা ধন হানিতে উত্ত্যক্ত হয় সেও কাপুরুষ, তাহারও অনুতাপ গৃহে গিয়া লজ্জায় মুখ ঢাকিয়া রাকা উচিত। নিজের সম্পর্কে সহস্র বার অসংখ্য বার ক্ষমা। কিন্তু সেই ক্ষমাশীল মাটীর মানুষ যিনি নিজের শত্রুর প্রতি কখনও রাগেন না, যাই ঈশ্বর বিরুদ্ধ কোন কথা শুনেন, তখনই তেজস্বী যোদ্ধার স্বভাব ধারণ করেন। তিনি হুঙ্কার করিয়া বলেন, "কি! আমি বাঁচিয়া থাকিতে আমার ঈশ্বরের নিন্দা! ওরে কাণ, এখনও তুই ঈশ্বর নিন্দা শুনিতেছিস্? ওরে ক্ষুদ্র জীব, তুই কি জানিস্ না যে তুই ঈশ্বরের সন্তান, সর্ব্বশক্তিমান্ তোর সহায়, লক্ষ লক্ষ শত্রু তোর কি করিবে? তোর কাহাকে ভয়? ঈশ্বর তোর দিকে, তুই কি নাস্তিক পৃথিবীকে ভয় করিস্? ঈশ্বর যে দিকে নাই সে দিকে শূন্য। শূন্যকে ভয় কি? যাহারা ইন্দ্রিয় ও নাস্তিকতার দাস তাহাদিগকে কি ব্রহ্মদাস ভয় করে?" ব্রহ্মদাসের তেজ ভয়ঙ্কর। যেমন সম্প্রতি নৈনীতাল পর্ব্বতের প্রকাণ্ড শৈলখণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়াতে বড় বড় অট্টালিকা সকল নিমিষে চূর্ণ হইয়া গেল, চারিদিক টল্‌মল্‌ করিতে লাগিল এবং তথাকার হ্রদ হইতে ভয়ানক ঢেউ উঠিয়া মহা আস্ফালন করিতে করিতে এক দিক হইতে আর একদিক পর্য্যন্ত বেগে চলিয়া গেল, সেইরূপ বিশ্বাসের

রাগ কাম্মের বংশ ধ্বংশ করে। সকলে বিশ্বাসী হউক, সচ্চরিত্র হউক, এই জন্য সাধুর এত রাগ ও তেজ। সাধুর রাগ কেবল ব্রহ্মানুরাগ। দেখ ক্ষমা ও রাগের কেমন সুন্দর মিলন। ঈশ্বরের শত্রুদিগের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া দিগ্বিজয়ী ধর্ম্ম বীরের ন্যায় ধর্ম্মরাজ্য বিস্তার কর।

সেবকের নিবেদন।

এক আধারে নরনারী প্রকৃতি।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার, ১৮ আশ্বিন, ১৮০২ শক।

সন্ন্যাস ধর্ম্ম কি? স্ত্রী পরিবার গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার তাহা পরিবর্জ্জন করিলে কি অধর্ম্ম হয়? শ্রীচৈতন্য তাঁহার মাতা স্ত্রী আত্মীয় কুটুম্ব সকলকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করাতে কি তাঁহার অপরাধ হইয়াছিল? চৈতন্য সংসারী, চৈতন্য সন্ন্যাসী, এই দুয়ের মধ্যে কি এক ভয়ানক পাপ হ্রদ দেখা যায়? সংসার হইতে সন্ন্যাসে যাইতে হইলে কি কলঙ্কনদীর উপর দিয়া যাইতে হয়? যখন গৌরাঙ্গ সর্ব্বত্যাগী হইয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিবার জন্য বাহির হইলেন তখন কি তাঁহার চরিত্র কলঙ্কিত হইল, তখন কি তাঁহার মহিমা সূর্য্য অস্তমিত হইল? আজ পর্য্যন্ত সহস্রাধিক লোক যাঁহাকে সাধুশ্রেষ্ঠ বলিয়া কত ভক্তি ও সম্মান দিতেছে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া কি তিনি অধার্ম্মিক হইয়াছিলেন? সংসার ত্যাগ করাতে কি তাঁহার ধর্ম্মত্যাগ করিতে হইয়াছিল? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে বিবেচনা করা উচিত যে যদি কোন বৈরাগী আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়কে প্রশস্ত করিয়া এত বড় করিতে পারেন যে তাহা সমস্ত পৃথিবীকে কুটুম্ব মনে করিতে পারে তাহা হইলে সেটি দৌর্ব্বল্য বা অধর্ম্ম নহে। যখন চৈতন্য আপনার জন্মভূমি এবং আপনার ক্ষুদ্র পরিবার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া গেলেন সাধারণ লোকে মনে করিল তিনি সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তাঁহার যে প্রেম অল্প লোকে বদ্ধ ছিল, তাহা এখন সমস্ত পৃথিবীতে

বিস্তীর্ণ হইল। ইহাতে ত্যাগ কৈ হইল? প্রেমের হ্রাস হইল না, কিন্তু উহা প্রশস্ত হইল। যে প্রেমকে ক্ষীণ করে সঙ্কীর্ণ করে, অল্প লোকের মধ্যে বদ্ধ করে সেই দোষী। কিন্তু ধন্য তাঁহারা যাঁহারা প্রেমের ভূমি বিস্তীর্ণ করেন। ধন্য ঈশা চৈতন্যের ন্যায় সন্ন্যাসী, যাঁহারা একটী মার পরিবর্ত্তে সহস্র মাকে বরণ করেন, সমস্ত পৃথিবীকে ভাই ভগিনী মনে করেন এবং দুই একটি অতিথির পরিবর্ত্তে হৃদয়গৃহে সহস্র সহস্র অতিথি সেবা করেন। যিনি প্রকৃত সন্ন্যাসী তিনি ছোট সংসারের সঙ্গে এক প্রকাণ্ড সংসার যোগ করেন, একখানি ঘরের পরিবর্ত্তে তিনি কোটি কোটি ঘর এবং অল্প কয়েক জন বন্ধুর পরিবর্ত্তে অসংখ্য ভাই ভগিনী লাভ করেন। সন্ন্যাসীর মন অনাসক্ত ও শৃঙ্খলমুক্ত। সন্ন্যাসী ক্ষুদ্র গৃহের প্রতি আসক্তি কাটিয়া সমুদয় পৃথিবীকে আপনার গৃহ করিয়া লন। বাস্তবিক ভক্ত বৈরাগীদিগের হৃদয়ের ভিতরে ঈশ্বরের প্রশস্ত প্রেম অবতরণ করে। যখন নীচ স্বার্থপর মায়াবদ্ধ প্রেমের তিরোভাবের পর ভক্তের অন্তরে স্বর্গের প্রশস্ত প্রেমের আবির্ভাব হয় তখন সেই ভক্তের হৃদয় অতি সুন্দর ও অপরূপ রূপ ধারণ করে। জগজ্জনের প্রতি প্রশস্ত প্রেম ভিন্ন ভক্ত বৈরাগীর কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। হিন্দুস্থানে রাধাকৃষ্ণের প্রেম বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে ব্রহ্মচারী কৃষ্ণ নরনারীদিগের মধ্যে প্রেম বিস্তার করিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম-দিগের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের নাম শুনা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধিকা এই দুইটি নামের প্রতি কি ব্রাহ্মদিগের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নাই? যাঁহাদিগের নামে সমস্ত ভারতে এত প্রেমানুরাগ ব্রাহ্মেরা তাঁহাদিগের প্রতি কেন শ্রদ্ধাবিহীন? যে সকল ব্রাহ্ম যথার্থ ভক্তি সাধন করেন তাঁহাদিগের পক্ষে এই দুইটী নাম বিশেষ আদরণীয় কেন না হইবে? ব্রাহ্মেরা সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে এবং সাধু মহাপুরুষদিগের জীবনে ব্রহ্মের কত রূপ দেখিলেন, রাধাকৃষ্ণের মধ্যে কি কোন দেবভাব দৃষ্ট হয় না? কেবল কৃষ্ণ, কেবল রাধা নহে; কিন্তু রাধাকৃষ্ণ, সংযুক্ত নাম, প্রায় সর্ব্বদাই একত্র উচ্চারিত হয়। স্ত্রী এবং পুরুষ; নরস্বভাব এবং নারীপ্রকৃতির মিলন। এক দিকে শ্রীরাধা আর এক দিকে শ্রীকৃষ্ণ। ভক্তির প্রাধান্য দেখাইবার জন্য প্রথমে নারীর নাম রাধা হইয়াছে। আগে রাধিকা পরে কৃষ্ণ। রাস, দোল,

ঝুলন প্রভৃতি উৎসবে হিন্দুস্থান এই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা কীর্ত্তন ও ঘোষণা করে। হিন্দুস্থানের বৈষ্ণবেরা অনেক শতাব্দী রাধাকৃষ্ণকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিয়াছে। কিন্তু হে হিন্দুস্থান, তুমি কি জান না যে চারি শত বৎসর পূর্ব্বে তোমার মধ্যে প্রেমের ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে? চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে নবদ্বীপ গ্রামে যে এক অদ্ভুত সন্ন্যাসী জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাকে কি তুমি ভুলিয়াছ? তোমার ব্যবহারে বোধ হয় যেন তোমার ইতিহাস পুস্তকের দশ বার পৃষ্ঠা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তোমার এই একটী দোষ যে তুমি ইতিহাসকে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করিয়াছ। শ্রীমদ্ভাগবতের সঙ্গে সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ লীলা গ্রহণ করিলে; কিন্তু হে হিন্দুস্থান, এত বড় ঘটনা, শ্রীগৌরাঙ্গের মনোহর লীলা, কেন তুমি অস্বীকার করিলে? যদি তুমি পূর্ণ ধর্ম্ম লাভ করিতে চাও তবে ধর্ম্মজগতের প্রত্যেক ঐতিহাসিক ঘটনা স্বীকার করিতে হইবে। অবতারের পর অবতার তুমি মানিয়াছ, সমুদয় প্রেরিত মহাপুরুষ স্বীকার করিয়াছ; কিন্তু ভাগবৎ পর্য্যন্ত মানিয়া কেন ক্ষান্ত হইলে? চৈতন্য চরিতামৃত কেন গ্রহণ করিলে না? নবীন হিন্দুস্থান, তোমার রাধাকৃষ্ণ এখন মথুরা বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ নহেন। তোমার রাধাকৃষ্ণ এখন যুগল মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে চৈতন্যরূপে প্রকাশিত। এখন একাধারে দেব দেবী উভয় প্রকৃতি, নরনারী উভয় প্রকৃতি। এখন রাধাকৃষ্ণ স্বতন্ত্র নহেন; কিন্তু দুই এক হইয়া শ্রীচৈতন্যের মধ্যে লুকাইয়া রহিয়াছেন। চৈতন্য লীলায় দেখিবে চৈতন্যের সঙ্গে স্ত্রী নাই, চৈতন্য পরিব্রাজক হইয়া ধর্ম্মপ্রচারার্থ ভ্রমণ করিতেছেন। এক যুগে দেখিলে রাধার সহিত কৃষ্ণ নৃত্য করিতেছেন, রাধাকৃষ্ণ ঐ দুইটী লোক সমস্ত দেশকে মত্ত করিতেছেন, তাঁহাদের প্রেমের ধর্ম্ম যুবা বৃদ্ধ স্ত্রী বালক সকলের মন আকর্ষণ করিতেছে। প্রেমের ধর্ম্মে অনুরাগই সর্ব্বস্ব, জ্ঞান কাণ্ড কর্ম্ম কাণ্ডের প্রাধান্য নাই। কৃষ্ণ ধর্ম্মে রাসের ছবি, ঝুলনের ছবি দেখিবে, নরনারীর একত্র মিলন দেখিবে; কিন্তু চৈতন্যের সন্ন্যাস ধর্ম্মে এক নবীন সন্ন্যাসীর বৈরাগ্য দেখিতে পাইবে। তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় অতি সুন্দর গৌরাঙ্গ একাকী উদাসীন বেশে কীর্ত্তনাদি করিয়া ভ্রমণ করিতে-

ছেন। গৌরাঙ্গ এমন সুন্দর ছিলেন যেন সৌন্দর্য্যের পরিচয় দিবার জন্য তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। সংসারের ভিতরে তিনি সংসারী ছিলেন, বিদ্বান্‌দিগের মধ্যে তিনি বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সর্ব্বগুণে সুন্দর পুরুষ। এমন সুপণ্ডিত অনায়াসে শ্রী সৌন্দর্য্য বিদ্যা বুদ্ধি সমুদায় জলাঞ্জলি দিয়া সুন্দর কেশ মুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন! ইনি জগৎকে হরিনাম সুধা পান করাইবার জন্য উন্মত্ত উদাসীন হইয়া বাহির হইলেন। কিন্তু ইহাঁর সঙ্গে স্ত্রী নাই, একটীও নারী নাই। ইহাঁর স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া ইহাঁর সঙ্গে কেন আসিলেন না? পূর্ব্বের ন্যায় কৃষ্ণের সঙ্গে রাধা রহিলেন না কেন? ইহাঁর সময়ে ঈশ্বরের ভিন্ন অভিপ্রায়। তোমার আমার অভিপ্রায় হইলে কি হইবে? ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। চৈতন্য বৈষ্ণবধর্ম্মের স্রষ্টা নহেন, চৈতন্য প্রেম ধর্ম্মের আদি প্রচারক নহেন, তিনি প্রেমধর্ম্মের এক জন প্রধান সংস্কারক। তিনি প্রেমধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া প্রেমধর্ম্ম পূর্ণ করিলেন। যখন ভারতবর্ষে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের নামে অত্যন্ত ঘৃণিত ও কদর্য্য ভাব এবং অশুদ্ধ ব্যবহার বৈষ্ণব সমাজে প্রবেশ করিল সেই সময়ে শ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাব। চৈতন্যদেব প্রেমধর্ম্মের ভিতরে বৈরাগ্য স্থাপন করিলেন। নরের প্রতি নারীর প্রেম এবং নারীর প্রতি নরের প্রেমকে তিনি বিশুদ্ধ করিলেন। শ্রীচৈতন্য দেখাইলেন, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেম ঈশ্বরের প্রতি প্রেম। শ্রীগৌরাঙ্গ জানিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার জীবনে ও তাঁহার সময়ে বিধাতার কিরূপ লীলা খেলা হইবে। তিনি প্রেম ও বৈরাগ্যকে সম্মিলিত করিলেন। তাঁহার চরিত্রে প্রেম ও পুণ্যের বিবাহ হইল। তাঁহার জীবন প্রেম ও বৈরাগ্যের শুভ সম্মিলন। জগতের প্রতি প্রেমোন্মত্ত হইয়া তিনি আপনার মাতা স্ত্রী পরিবার পরিত্যাগ করিলেন। জগতের লোক আশ্চর্য্য হইয়া বলিল;—"এব্যক্তি সংসার ছাড়ে কেন? ইহাঁর অন্তরে এরূপ অপ্রেম নিষ্ঠুরতা কে প্রেরণ করিল? এমন স্নেহের প্রতিমা মা এবং প্রেমের প্রতিমা জায়ার প্রতি এব্যক্তি বিমুখ কেন?" এইরূপে নির্ব্বোধ লোকেরা তাঁহার চরিত্রে নিষ্ঠুরতার কলঙ্ক আরোপ করিল। তাহাদিগের মতে শ্রীগৌরাঙ্গ সংসারত্যাগী হইয়া অধর্ম্মাচরণ করিলেন। তাঁহার তীব্র বৈরাগ্যবক্ষে

জন্মভূমি দর্শন নিষেধ, নারীর নিকটে ভিক্ষা লওয়া পর্য্যন্ত নিষেধ। অজ্ঞ লোকে বলে চৈতন্যের ধর্ম্ম অপূর্ণ, কেননা তিনি নারীপ্রকৃতিকে একেবারে পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু জ্ঞানী বৈষ্ণব বলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বাহিরের মাতা স্ত্রী প্রভৃতি ছাড়িয়া নিজের হৃদয়ের মধ্যে নরনারীকে এক করিলেন। ঈশ্বরের প্রতি প্রগল্‌ভা ভক্তিই তাঁহার শ্রীরাধিকা, তাঁহার নারীপ্রকৃতি। তাঁহার প্রাণের মধ্যে কৃষ্ণ ভাব রাধা ভাব উভয়ই প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। তাঁহার জীবনে একাধারে দেবদেবী দুই অবতার। তাঁহার পূর্ব্বে যুগেং একাধারে এক এক ব্রহ্মগুণের অবতরণ হইয়া আসিতেছিল; কিন্তু তাঁহার জীবনে নরনারীর মিলন হইল। তিনি একাধারে রাধা কৃষ্ণের মিলন, যোগ ভক্তির ঐক্য, প্রেম পুণ্যের যোগ, নরনারীর বিবাহ, অনুরাগ বৈরাগের সম্মিলন দেখাইলেন। যে নববিধান্ হিন্দুমুসলমান্ এক করিয়াছেন, ক্ষমা ক্রোধ, শান্তি যুদ্ধের সামঞ্জস্য দেখাইলেন, সেই নববিধান শ্রীচৈতন্যের এই ধর্ম্মকে আদর করেন, ভক্তি করেন। নববিধান সন্ধিপ্রিয়, মিলনপ্রিয়। নববিধান পূর্ণ ধর্ম্ম, ইহা নরপ্রকৃতি কিম্বা নারীপ্রকৃতি কিছুই পরিত্যাগ করিতে পারে না। ইহা অখণ্ড ঈশ্বরের অখণ্ড ধর্ম্ম। মনুষ্য প্রকৃতি পরিপক্কাবস্থায় ঈশ্বরের খণ্ড খণ্ড ভাব লইয়া সুখী থাকিতে পারে না; কিন্তু ঈশ্বরের পিতৃভাব ও মাতৃভাব উভয়েরই অর্চ্চনা করে। সাধক সিদ্ধ অবস্থায় আপনার আত্মার মধ্যে দেবভাব এবং দেবীভাব উভয়ই সম্মিলিত দেখিতে পান। সিদ্ধ অবস্থায় মানুষ আপনাকে আপনি বিবাহ করে। পৃথিবীতে পুরুষ নারীকে বিবাহ করে, নারী পুরুষকে বিবাহ করে; কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যে পুরুষ আপনাকে বিবাহ করে, নারী আপনাকে বিবাহ করে। এই যে নরনারী আপনাকে আপনি বিবাহ করে ইহাই স্বর্গীয় বিবাহ। এই স্বর্গীয় বিবাহপ্রথা অনুসারে চৈতন্য নিজেই নিজের স্ত্রী হইলেন। প্রায় সকলেই স্বীকার করে স্ত্রী পুরুষের অর্দ্ধাংশ। ইংরাজ জাতিও স্ত্রীকে পুরুষের উৎকৃষ্ট অর্দ্ধাংশ বলিয়া স্বীকার করে। চৈতন্য দেবদেবী উভয়ের অবতার। চৈতন্য বাহিরের বিষ্ণুপ্রিয়াকে ছাড়িলেন; কিন্তু প্রকৃত বিষ্ণুপ্রিয়া যে ভক্তি তাঁহাকে তিনি অন্তরে প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়া গেলেন। একা শ্রীচৈতন্য যখন নাচেন তাঁহার ভিতরে কৃষ্ণ

ও রাধা প্রকৃতি দুই নাচে। চৈতন্য এক ব্যক্তি; কিন্তু তাঁহার এক চরণ পুরুষের, আর এক চরণ নারীর। সুতরাং যখন তিনি নৃত্য করেন তখন রাধাকৃষ্ণ পুরুষপ্রকৃতি উভয়ই নৃত্য করে। বাস্তবিক প্রত্যেক ভক্তহৃদয়ে কিয়ৎ পরিমাণে নর নারীর মিলন হয়। স্বভাবতঃ নারী নরের প্রতি, নর নারীর প্রতি, দেবী দেবের প্রতি, দেব দেবীর প্রতি অনুরক্ত। পুরুষ স্ত্রীর সহবাসে সুখী, স্ত্রী পুরুষের সহবাসে সুখী। দুই জন পরস্পরকে আকর্ষণ করে। ধর্ম্ম রাজ্যে ভক্তহৃদয়ও এই নিয়মের অধীন। এই জন্যই যুগে যুগে যুগলমূর্ত্তি দেখা যায়, যথা—রাধাকৃষ্ণ, সীতারাম, হরগৌরী। আরও উপরে যাও দেখিবে সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মের ভিতরে পুরুষ ও প্রকৃতি একীভূত। ব্রহ্মেতে নর স্বভাব ও নারী প্রকৃতি এক হইয়া রহিয়াছে। ব্রহ্মের ভিতরে যোগ পুরুষও প্রেম স্ত্রী, দুই একত্র হইয়া নৃত্য করিতেছে। হে ব্রাহ্ম ভাবুক, তুমি যোগ নেত্রে ব্রহ্মের বক্ষে এই যুগল মূর্ত্তি দর্শন কর। ব্রহ্ম পিতৃমূর্ত্তি ও মাতৃমূর্ত্তি উভয়ের আধার। ব্রহ্মের ভিতরে নরপ্রকৃতি ও নারীপ্রকৃতি, পিতৃভাব ও মাতৃভাব দুই, সম্মিলিত হইয়া স্থিতি করিতেছে। ব্রহ্ম সমুদয় ভাবের পূর্ণাধার; কিন্তু জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার এক এক ভাব স্বতন্ত্র হইয়া এক এক অবতারে ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশিত হয়। যখন কেবল প্রেম প্রেম করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম স্বেচ্ছাচার ও ইন্দ্রিয়সেবাতে পরিণত হইল তখন প্রেম ও বৈরাগ্যের সামঞ্জস্য দেখাইবার জন্য মহাপুরুষ চৈতন্য জন্ম গ্রহণ করিলেন। যখন অনেক প্রকার কুসংস্কার ও পাপাচার বঙ্গদেশকে কলুষিত করিল তখন বঙ্গদেশ ব্যাকুল অন্তরে ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করিল;—"হে বিঘ্নবিনাশন ভগবন্, আমাকে এই পুরাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের বিকার হইতে রক্ষা কর।" তখন ভগবান্ বঙ্গদেশের দুঃখ মোচন করিবার জন্য প্রেম ও বৈরাগ্য একাধারে মিলিত করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রেরণ করিলেন। গৌরাঙ্গের তনু হরিপ্রেমে গঠিত। তিনি এত বড় প্রেমিক হইয়াও সংসার ছাড়িলেন। কিন্তু যথার্থ ভাবুক বুঝিতে পারেন, যদিও চৈতন্য বাহিরের সংসার ছাড়িলেন, তাঁহার প্রকৃত সংসার অখণ্ড রহিল। অখণ্ড সচ্চিদানন্দের সন্তান চৈতন্য সাকার স্ত্রীকে নিরাকার বিষ্ণুপ্রিয়া করিয়া লইলেন। ঘরের

বিষ্ণুপ্রিয়া এখন সন্ন্যাসীর বিষ্ণুপ্রিয়া হইলেন। চৈতন্য দেখিলেন তিনি স্ত্রী-প্রকৃতি ভক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। সন্ন্যাস গ্রহণের সময় ভক্তচূড়ামণি আপনার ঐ প্রকৃতিকে আপনি বিবাহ করিলেন। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে যত পুরুষ জন্মিয়াছে সমুদয় ঈশ্বরের পুরুষভাব হইতে এবং যত নারী জন্মিয়াছে সমুদয় তাঁহার নারীভাব হইতে জন্মিয়াছে। ঈশ্বর নরপ্রকৃতি এবং নারীপ্রকৃতি উভয়ের আধার ও উভয়ের স্রষ্টা তাঁহার সন্তান শ্রীচৈতন্যের মধ্যে এই দুই প্রকৃতি একত্র হইল। লোকে জানে না তাই তাহারা বলে চৈতন্য বিষ্ণুপ্রিয়াকে ছাড়িয়াছিলেন। হরগৌরী, রাধাকৃষ্ণ, বিষ্ণুলক্ষ্মী, সকলের মিল আছে, কেবল চৈতন্যের ভাগ্যে কি অমিল? সন্ন্যাসী চৈতন্য, অল্প ক্ষণ পূর্ব্বে তোমার স্ত্রীকে তোমার পার্শ্ববর্ত্তিনী দেখিলাম, এখন কেন তোমাকে একাকী দেখিতেছি? তুমি কি কোমল নারীপ্রকৃতির প্রতি বিরক্ত হইয়াছ? হে ভক্তির অবতার, তুমি কি নারীপ্রকৃতির শ্রেষ্ঠভূষণ যে ভক্তি তাহা ভিন্ন প্রাণ ধারণ করিতে পার? তোমাকে লোকে চিনে না, তাই তাহারা বলে তুমি বিষ্ণুপ্রিয়াকে ছাড়িয়াছ। তোমার বিষ্ণুপ্রিয়া যে তোমার অন্তরে রহিয়াছেন। সাধকের জীবনে যদি নর-প্রকৃতি ও নারীপ্রকৃতির মিলন না হয়, যদি প্রেম বৈরাগ্যের বিবাহ না হয় তাহা হইলে পুণ্য শান্তি বহু দূরে। যত দিন মানুষ আপনাকে আপনি বিবাহ করিতে না পারে তত দিন পুরুষ নারীর প্রতি এবং নারী পুরুষের প্রতি আসক্ত হয়। যদি নিজের প্রাণের ভিতরে নারী মনের মত পুরুষ না পায়, এবং পুরুষ নারী না পায় তবে পুরুষ বাহিরে নারী খুঁজিবে এবং নারী বাহিরে পুরুষ খুঁজিবে এবং পরিণামে দুর্নীতি ব্যভিচার উৎপন্ন হইবে। বৈষ্ণবধর্ম্মে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। মনে করিও না ঈশা চৈতন্য প্রভৃতি বিবাহ করেন নাই, তাঁহারা হরিভক্তিরূপিণী পরমা সুন্দরী স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহঁাদিগের স্ত্রী অত্যন্ত লজ্জাশীলা গোপনপ্রিয়া, ইহঁারা স্বামীর প্রাণের ভিতরে লুকাইয়া থাকেন, বাহিরের লোক ইহঁাদিগকে দেখিতে পায় না। ভক্তের প্রাণের ভিতরে সেই স্বর্গের স্ত্রী আসিয়া পতিকে সম্বোধন করিয়া বলেন;—"আমার নাম ভক্তি, তোমার নাম বৈরাগ্য, এস দুই জনে বিবাহ

করি।" ভক্ত আপনার স্ত্রী আপনি, আপনার স্বামী আপনি। প্রকৃত ভক্তজীবনে একাধারে নর নারী উভয় প্রকৃতির মিলন, এই রহস্য বুঝিয়া এবং জীবনে ইহা সাধন করিয়া জন্ম সার্থক কর।

সেবকের নিবেদন।

মৃণ্ময় আধারে চিন্ময়ী দেবী।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার, ২৫ আশ্বিন, ১৮০২ শক।

একটী মৃত্তিকার পাত্রে সুবর্ণ; পাত্রটী বন্ধ। এই অবস্থাতে সেই পাত্র প্রতি বৎসর আমাদের দেশে আসে। আধারের বাহ্য শোভা দর্শনে নরনারী মুগ্ধ হয়। আধারের মুখ বন্ধ, কেহই আধার খুলিয়া তাহার মধ্যে কি অমূল্য ধন আছে তাহা দেখে না। সিন্দুকের ভিতরে কোটি কোটি মুদ্রা থাকিলেও চাবী বিনা তাহার সম্ভোগ অসম্ভব। সেইরূপ এই যে রত্নভরা মৃণ্ময় আধার বৎসর বৎসর আমাদের দেশে আসে, যাহাকে এই দেশের লোকেরা পূজা করে, ভক্তি করে, সেই আধারের ভিতরে যে চিন্ময়ী দেবী আছেন যোগ চাবী ভিন্ন তাঁহাকে খুলিয়া বাহির করিবার উপায়ান্তর নাই। মৃত্তিকার ভিতরে দেবী স্থাপন, মাটীর ভিতরে মহেশ্বরী। কি আশ্চর্য্য! ব্রহ্মাণ্ডপতি মৃত্তিকা মধ্যে! ভগবতী বাহির হইবেন মাটী ভেদ করিয়া! মৃণ্ময় পাত্র অতি সুন্দর হইতে পারে, নানাবর্ণে অনুরঞ্জিত হইতে পারে; সকলে দেখিয়া মুগ্ধ হইতে পারে। কিন্তু তাহার মধ্যে যে মহেশ্বরী বাস করেন কাহার সাধ্য তাঁহাকে দেখিতে পায়? যোগনেত্রবিহীন হইয়া কেহই মৃণ্ময় পাত্রে ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না। এই খেদ মনে রহিল বঙ্গদেশে যথার্থ ভগবতীকে সাধারণ লোকে পূজা করে না। আশ্বিন মাস আসিল, কত ঘরে দুর্গা প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হইল, কিন্তু বঙ্গদেশে যথার্থ জগজ্জননীকে মা দুর্গা বলিয়া কেহ তো ডাকিতেছে না। বঙ্গদেশে পুত্তল পূজা হইল কিন্তু মার পূজা

হইল না। যথার্থ মা মাটিতে আচ্ছন্ন প্রচ্ছন্ন। কোথায় সেই সতী? সতী পূজা করিবার জন্য সকলেই আকুল। সতী পূজার জন্য মনুষ্য স্বভাব লালায়িত। মাটীর ভিতরে সতী কল্পনা করিব কিরূপে? হিন্দুস্থান কি প্রকৃত সতী পূজা ভুলিল? আমাদিগের পরমারাধ্যা দেবী, সতী যাঁহার নাম, যাঁহার মধ্যে অনন্ত পবিত্রতা ও প্রেম ঘনীভূত হইয়াছে, কে তাঁহাকে কে ডাকিতেছে? সেই আদ্যাশক্তি সতী ব্রহ্মের প্রেম বিভাগ, অপরার্দ্ধ পুণ্য। এক স্বভাব যোগেশ্বর মহাদেবের স্বভাব, আর এক প্রকৃতি করুণাময়ী জননীর প্রকৃতি। সেই দেবী তাঁহার ভক্তদিগের নিকটে আপনার কোন অংশের অপমান অথবা লোপ দেখিলে সহ্য করিতে পারেন না। এই জন্যই আখ্যায়িকায় কথিত আছে, যখন যজ্ঞস্থলে মহাদেবের অপমান হইল তখনই সতী আপনাকে বিনাশ করিলেন। স্বামীনিন্দা সতীর নিকটে অসহ্য। দুর্গাচরিত্রে নারীর সতীত্ব প্রকাশিত। কোমলহৃদয় সতী কোন মতেই স্বামীর অপমান সহ্য করিতে পারেন না। ব্রহ্মের কোমল প্রেম যাহা চির কাল নারীরূপ ধরে, কদাচ ব্রহ্মের অপরার্দ্ধ পবিত্রতার অপমান সহ্য করিতে পারে না। ব্রাহ্মসমাজ জিজ্ঞাসা করিতেছে সেই সতী কোথায় যাঁহার পূজা করিলে যুগপৎ পুণ্য ও প্রেম লাভ করা যায়। মনুষ্যের মানব প্রকৃতি সেই সতী চরিত্র দেখিবার জন্য ব্যাকুল। ব্রাহ্মসমাজ ও অসতী কলঙ্কিনীদিগের পাপরাজ্য ছাড়িয়া সতীর দিকে যাইতে চায়। যাঁহার নাম শ্রবণে জীবের পরিত্রাণ হয়, যাঁহার পূজা করিলে অশুদ্ধ এবং অসুখী মনও শুদ্ধ এবং সুখী হয় সেই সতীপূজা ভিন্ন ভারতবর্ষের কল্যাণ নাই। এখন প্রশ্ন এই সেই সতী কোথায়? কেহ কেহ বলে এই আশ্বিন মাসে সেই সতী বঙ্গবাসীদের ঘরে ঘরে মাটীর আকার ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না যে বিশ্বজননী সতী দেবী মাটী হইতে পারেন, কিন্তু মা মাটীর ভিতরে থাকিতে পারেন। যাহার ভক্তি চক্ষু আছে সে মাটীর ভিতরেও মাকে দেখিতে পায়, মৃন্ময় পাত্রের মধ্যে চিন্ময়ী জননীকে দেখিতে পায়। মৃত মাটীর ভিতরে জীবনময়ী সতীকে উপলব্ধি করাই বোধক্তব্য। যদি মাটীর ভিতরে মূর্ত্তিকে দেখিতে অন্ধ হইলে যথার্থ দেবী পূজা কি তাহার মর্ম্ম বুঝিতে

পারিবে। সতী ভগবতী ব্রহ্মের প্রকৃতি। তেজোময় পুণ্যময় ব্রহ্মের কোমল প্রকৃতি মা নামে নারী স্বভাব ধরিয়া ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। ব্রহ্ম আপনি আপনার কোমল প্রকৃতিকে বলিলেন ;—“প্রকৃতি দেবি, তুমি জগতের মা হইয়া পৃথিবীতে যাও, আমি জগতের পিতা হইয়া অবতীর্ণ হইব। তুমি সুকোমল স্বভাবে জগৎকে বশীভূত কর।” মহাদেবীর অবতরণের অন্য অর্থ আর নাই। এই মা দুর্গা ব্রহ্মের প্রেমস্বরূপ, সৌন্দর্য্য স্বরূপ। যাহারা দুর্গা প্রতিমার মূলে ব্রহ্মের এই কোমল প্রকৃতি দেখে নাই তাহারা অদ্যাপি প্রকৃত দেবীর পরিচয় পায় নাই। প্রাচীনকালে শাস্ত্রকারেরা আকারের মধ্যে ভগবতীকে বদ্ধ করিয়া এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে সমর্পণ করিয়াছেন। লোকগুলি এতকাল ভগবতীর বাহিরের আধার পূজা করিয়া আসিতেছে, এখন পর্য্যন্ত যথার্থ ভগবতীর পূজা হয় নাই। যে মন্ত্রে মৃত্তিকাপূজা হয় তাহাতে ভগবতী পূজা হয় না। যোগ সহকারে মৃত্তিকার আধার খোল, দেখিবে, তাহার ভিতরে জীবনময়ী সতী বাস করিতেছেন, এবং তাঁহার নিরাকার অঙ্গের মধ্যে লক্ষ্মী সরস্বতীও জাজ্বল্য রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। এক মূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে কত মূর্ত্তি দেখিবে। বাস্তবিক ভগবতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ইঁহারা যে তিন ব্যক্তি তাহা নহে; কিন্তু স্বয়ং ভগবতীই লক্ষ্মী ও সরস্বতী। ইঁহারা ভগবতীর এক একটি স্বরূপ। ভগবতী নিজেই গৃহলক্ষ্মীরূপে তাঁহার সন্তানদিগকে ধন ধান্য ও সুখ শান্তি বিতরণ করিতেছেন এবং তিনিই সরস্বতীরূপে অর্থাৎ বিদ্যারূপে সকলকে জ্ঞান দান করিতেছেন। ভারতবর্ষে আর্য্য কবি ও ভাবুকেরা উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বর্ণ লইয়া লক্ষ্মী ও সরস্বতী মূর্ত্তি রচনা করিয়াছেন। ইহা কেবল উপমা। আবার যখন সুনিপুণ মূর্ত্তিনির্ম্মাতা এই উপমা লইয়া দেব দেবীর সুশ্রী মূর্ত্তি গঠন করে তখন উপমা প্রতিমা হয়। প্রথমে মা, পরে উপমা, তাহার পর প্রতিমা। তিনেতেই মা, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। যতক্ষণ পর্য্যন্ত যথার্থ ভক্ত এ সকল উপমা ও প্রতিমা ভেদ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ জীবিতেশ্বরী মাকে না দেখিতে পান ততক্ষণ কিছুতেই তিনি সুখী হইতে পারেন না। কবি উপমা রচনা করিল, মূর্ত্তিনির্ম্মাতা প্রতিমা গঠন

করিল, ভক্ত এই উপমা প্রতিমার ভিতর হইতে আবার মাকে উদ্ভাবন. করিলেন। আদিতে মা অন্তে আবার মা। যথার্থ মা দুই শ্রেণীর লোকের হাতে পড়িয়া দুইটি রূপ ধরিলেন, একটি কবির অলঙ্কার শাস্ত্রের উপমা, আর একটি চিত্রকরের রচিত প্রতিমা। মার সম্পর্কে উপমা পরিত্যাগ করা শাস্ত্রকারের সাধ্যাতীত। মার যে প্রকার রূপ গুণ তাহা দেখিলে কবিত্ব অনিবার্য্য। মার শক্তি বর্ণনা করিতে হইলেই উপমা আবশ্যক হয়। যাই বলা হইল পরমাদেবী ভগবতী অসুর-কুল নাশিনীর অনেক শক্তি, তখনই কবি মাকে দশভূজারূপে বর্ণনা করিলেন; দশহস্তে অলৌকিক বল প্রকাশ করিয়া মা অসুরকুল বধ করিতেছেন। যখন কবি অলঙ্কার শাস্ত্রানুসারে এই উপমা করিলেন, পার্শ্বে ছিল মূর্ত্তিনির্ম্মাতা, সে তৎক্ষণাৎ মার বাহু গড়িল, এবং অসুর সংহারের মূর্ত্তি গঠন করিল। কবির গ্রন্থে বর্ণিত উপমা মনুষ্যের পক্ষে যথেষ্ট হইল না, এই জন্য মনুষ্যস্বভাবের স্পৃহা পূর্ণ করণার্থ চিত্রকর উপমাকে চিত্রে পরিণত করিল। অলঙ্কার শাস্ত্রে তিনি উপমিত হইলেন, চিত্রে তিনি চিত্রিত হইলেন। জগজ্জননীর এক পার্শ্বে সরস্বতী অর্থাৎ শুভ্র জ্ঞান এবং অপর পার্শ্বে লক্ষ্মী অর্থাৎ সুখৈশ্বর্য্যদায়িনী গৃহদেবী বিরাজ করিতেছেন। লোকে বলে লক্ষ্মী সরস্বতী জগজ্জননীর কন্যা, লক্ষ্মী সরস্বতী তাঁহার কন্যা নহেন, ইঁহারা তাঁহার সখী। কেননা জগ-মাতার জ্ঞান ও সন্তান পালনী শক্তি তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয় নাই; কিন্তু তাঁহার প্রকৃতির মধ্যেই স্থিতি করিতেছে। হিন্দুদিগের দুর্গা প্রতিমার মধ্যে এ সকল নিগূঢ় স্বর্গীয়ভাব নিহিত রহিয়াছে। কেবল যোগচক্ষেই এ সকল প্রকাশিত হয়। পৌত্তলিকেরা তাহা জানে না। উৎস জানে না তাহার ভিতর হইতে কেমন নির্ম্মল বারি প্রবাহিত হইতেছে। সিন্ধুক জানে না তন্মধ্যে কত রত্ন আছে। কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুস্থানে জগজ্জননীর এই অপরূপ রূপ প্রকাশিত হইয়াছিল। সহস্র সহস্র বৎসর অতিক্রম করিয়া এই রূপ প্রবাহ চলিয়া আসিয়াছে, ইহার ভিতরে কত অমূল্য রত্ন আছে বঙ্গদেশ দেখিল না। ব্রাহ্ম বঙ্গদেশ, কেবল তুমি মাকে উপমা ও উপমাকে প্রতিমা করিয়া জীবন্ত মাকে হারাও

হলে? যিনি ত্রিজগতের জননী তিনি কি মাটী হইতে পারেন? চিন্ময়ী মাকে, সতীকে, দেবীকে, জগজ্জননীকে কদাচ মৃণ্ময়ী ভাবিও না, তাঁহাকে অন্তরের অন্তরে নিরাকারা আকাশরূপিণী জানিয়া তাঁহার পূজা অর্চ্চনা কর। লক্ষ্মী সরস্বতী মা হইতে ভিন্ন নহেন, এই দুই প্রকৃতি মার স্বভাবের মধ্যে সখীভাব ধারণ করিয়া আছে। যখনই মাকে দেখিবে মার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতীকেও দেখিতে পাইবে। মা তাঁহার জ্ঞান ও বাৎসল্য প্রকৃতি ছাড়িয়া ভক্ত সন্তানের নিকট প্রকাশিত হইতে পারেন না। মাকে দেখিলে, মার পূজা অর্চ্চনা করিলে, অথচ তোমার জীবনে অজ্ঞান অন্ধকার দুর্ভাগ্য দুর্গতি রহিল ইহা হইতে পারে না। প্রকৃত মাকে দেখিলেই তাঁহার সরস্বতী এবং লক্ষ্মী প্রকৃতি আসিয়া তোমার অজ্ঞান ও দুর্গতি হরণ করিবে, করিবেই করিবে। মা তাঁহার দিব্যজ্ঞান, প্রত্যাদেশ ও শাস্ত্র সকল ছড়াইতে ছড়াইতে তাঁহার ভক্তের হৃদয়ে অবতরণ করেন। জ্ঞান ব্রহ্মপ্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত, ব্রহ্ম হইতে জ্ঞানকে বিচ্ছিন্ন করিতে পার না। যখন চিন্ময়ী জগজ্জননী আপনার প্রাণের ভিতর হইতে নিগূঢ় সত্য, যোগ ভক্তি সম্বন্ধীয় বিবিধ রহস্য, প্রত্যাদেশ বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা তত্ত্ব ও শাস্ত্র প্রকাশ করেন তখন তাঁহার আর একভাব জগতের কল্যাণের জন্য সেই জ্ঞানরাশি লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে। যাঁহারা প্রেমের সহিত ব্রহ্ম পূজা করেন তাঁহারা জানেন যিনি দুর্গা তিনিই সরস্বতী; অর্থাৎ যিনি ব্রহ্ম তিনিই জ্ঞানদাতা। মা বেদ বেদান্ত শাস্ত্রাদি বলিতেছেন আর গণেশ সে সমস্ত জগতে বিস্তার করিতেছেন। ভাবিবার জন্য জ্ঞানকে স্বতন্ত্র মনে করিতে পার সরস্বতীকে ভগবতীর পার্শ্ববর্তিনী মনে করিতে পার; কিন্তু বাস্তবিক ব্রহ্ম এবং তাঁহার জ্ঞান, ভগবতী এবং সরস্বতী একই। যখনই সত্যভাবে ভক্তির সহিত মার পূজা করি তখনই দেবীর উক্তি শুনিতে শুনিতে নূতন নূতন শুভ্র জ্ঞান লাভ করি। যখনই দুর্গা দর্শন তখনই সরস্বতী রূপ দর্শন, যেমন ব্রহ্ম দর্শন তৎক্ষণাৎ জ্ঞানের সঞ্চার। জগজ্জননী যেমন অসুর সংহারিণী দুর্গা তেমনি তিনি জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী। যখন তিনি সত্য প্রকাশ করেন তখন তাঁহার সরস্বতী মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়। যদি কেহ ভ্রান্ত হইয়া উপমাকে

প্রতিমা মনে করে, অলঙ্কারকে সত্য মনে করে তবে তাহারই দোষ। জগজ্জননীর যে কেবল সরস্বতী এক সখী তাহা নহে, তাঁহার আর এক সখী লক্ষ্মী। যে ভক্তের বাড়ীতে মার আবির্ভাব হয়, সেখানে মার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়। মা লক্ষ্মীরূপা, শ্রীস্বরূপা। বিশ্রী দেবী, লক্ষ্মী বিহীন দেবী কি কেহ কল্পনা করিতে পারে? ভুবন-মোহিনী মা কি বিবর্ণা কদাকারা? যে নরনারীর হৃদয় মধ্যে মা ভগবতীর আবির্ভাব হয় সেই নর নারীর লক্ষ্মীশ্রী অর্থাৎ সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হয়। নাস্তিক পাষণ্ডের সংসারকে কদাচ লক্ষ্মীর সংসার মনে করিও না। যে দস্যু দশ হাজার মানুষ কাটিয়া ধনী হইল তাহার সংসারকে কি লক্ষ্মীর সংসার বলিবে? ভক্ত যদি দরিদ্র হন তথাপি তাঁহার সংসার লক্ষ্মীর সংসার। ভক্তের গৃহে সামান্য অবস্থার মধ্যে সুখ স্বচ্ছন্দতা। ভক্ত শাকান্ন আহার করিয়াও হাসিতেছেন। লক্ষ্মীর সংসার দেখিলেই বুঝা যায়। ঈশ্বরকে লাভ করিয়া কেহই লক্ষ্মীছাড়া হইতে পারে না। পৃথিবীতে এমন একটি লোক জন্ম গ্রহণ করে নাই যে ঈশ্বরের পূজা করিয়া লক্ষ্মী বিহীন হইয়াছে। লক্ষ্মীর আগমনে ভক্তের সমস্ত বিঘ্ন বিপত্তি ও অকল্যাণ দূর হয়। যাহার বাটীতে দুর্গতিনাশিনী অবতীর্ণ হয়েন তাহার সংসারে আপনা আপনি লক্ষ্মীশ্রীর অভ্যুদয় হয়। যিনি ভক্তের আত্মার পাপ বিনাশ করেন তিনি পার্থিব অকল্যাণও দূর করেন। কার্ত্তিক মূর্ত্তির গূঢ় অর্থ আছে। যে বাড়ীতে কার্ত্তিকের অধিষ্ঠান সে বাড়ীতে অলক্ষ্মী, দুর্ভাগ্য আসিতে পারে না। কার্ত্তিক যুদ্ধের তীক্ষ্ণবাণ দ্বারা সরস্বতীর বিরোধী ও লক্ষ্মীর বিরোধী অকল্যাণ সমুদয় বিনাশ করেন। পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিনা মার জয় হয় না। কার্ত্তিক সেনাপতি হইয়া যুদ্ধ করেন এবং মার ভক্তদিগকে রক্ষা করেন ও সত্যরাজ্য বিস্তার করেন। হে মূঢ় ব্রাহ্ম, তুমি ব্রহ্ম পূজা করিলে অথচ তোমার সংসারে শ্রীবৃদ্ধি হইল না, তুমি অবিদ্যা পাপের উপর জয়লাভ করিলে না, তোমার শত্রুদল প্রবল রহিল, তবে তুমি কার্ত্তিকের পরাক্রম দেখিতে পাইলে না। তবে তোমার প্রকৃত মহাদেবী পূজা হয় নাই। সাধক, যদি তুমি ভগবতীর মধ্যে লক্ষ্মী সরস্বতী, কার্ত্তিক গণেশ এ সকল দেখিতে না পাও তবে তুমি হিন্দু নহ, ব্রাহ্ম

নহ। যদি তুমি যথার্থ হিন্দু অথবা যথার্থ ব্রাহ্ম হও তবে যোগ দ্বারা পুতুলের বক্ষ খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে চিন্ময়ী মা, তাঁহার সখী, এবং সন্তানদিগকে বাহির কর। যে দিন তোমার স্তব স্তুতিতে ব্রহ্ম প্রসাদে তোমার চরিত্রে মাটীর দুর্গার পরিবর্ত্তে চিন্ময়ী দুর্গা প্রকাশিত হইবেন সেই দিন তোমার দেশের সৌভাগ্য সূর্য্য উদিত হইবে। মৃণ্ময় সিন্ধুকের ভিতরে চিন্ময় পদার্থ আচ্ছাদিত রহিয়াছে। সেই সিন্ধুক খুলিয়া সতী দেবীকে বাহির কর, এবং মৃণ্ময়ী মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে সেই জীবিতেশ্বরী সতী দেবীকে অসুর নাশিনী, জ্ঞানস্বরূপা, কল্যাণ দায়িনী এবং শাস্ত্র ও অন্ন প্রসবিনী বলিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে তাঁহার পূজা কর। ব্রাহ্ম, তোমার হাতে ঈশ্বর প্রকাণ্ড ভার সমর্পণ করিয়াছেন। তুমি যোগ সন্ধানে দুর্গা প্রতিমার ভিতর হইতে স্বর্গীয় রত্ন সকল বাহির করিয়া আপনি দেখিবে ও সম্ভোগ করিবে এবং তোমার হিন্দু ভাই ভগ্নীদিগকে দেখাইবে। হিন্দু ভ্রাতার সিন্ধুক খুলিয়া তাঁহাকে তাঁহার সিন্ধুক ভরা রত্ন সকল দেখাইয়া মোহিত করিবে। মাটীর দুর্গা কেবল একটি সিন্ধুক, ইহার ভিতরে মা তাঁহার সখী এবং সন্তানদিগকে সঙ্গে লইয়া বিরাজ করিতেছেন। অতএব হিন্দুস্থান, মৃত মাটীর পূজা পরিত্যাগ করিয়া যথার্থ জীবিতেশ্বরী চিন্ময়ী মহা দেবীর পূজা কর।

সেবকের নিবেদন।

জাতীয় বিধান।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার, ২ কার্ত্তিক, ১৮০২ শক।

দেশীয় আর্য্য পূর্ব্বপুরুষদিগের চরণে আমরা বার বার নমস্কার করি। আমরা তাঁহাদিগের উচ্চ প্রকৃতি ও তাঁহাদিগের জাতীয় মহত্ত্ব অন্তরে উপলব্ধি করি। তাঁহাদের চরিত্র ও বিশ্বাসে, সাধন ও ভজনে যে সকল মহৎ ভাব আছে তৎসমুদয় তাঁহারা আমাদিগকে অর্পণ করুন। হে পিতা, পিতামহ, আর্য্যগণ তোমাদের মধ্যে বিশ্বাস, প্রেম, বৈরাগ্য, সাধুতা প্রভৃতি যাহা কিছু সদ্গুণ আছে, সে সকল মহামূল্য ধন আমাদিগকে অর্পণ কর। হে পূর্ব্বপুরুষগণ, যেমন তোমরা আমাদিগকে তোমাদের বিষয় সম্পত্তির অধিকারী করিলে, তেমনি তোমরা আমাদিগকে তোমাদের ধর্ম্ম ও সাধু ভাবের উত্তরাধিকারী কর। হে মাতৃভূমি, হে হিন্দুস্থান, তুমি পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রদত্ত প্রচুর ধনে ধনাঢ্য ও প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছ, তোমার সে সকল সঞ্চিত পুণ্যধন প্রেমধন আমাদিগকে দান করিয়া গৌরবান্বিত কর। আমরা আর্য্য ঋষিদিগের নিকট ঋণী। আর্য্যরক্ত যত দিন আমাদিগের হৃদয়ের মধ্যে থাকিবে তত দিন আমরা প্রাণপণে জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষা করিব এবং বিজাতীয় হইব না। আমি এ কথা বলিতেছি না যে স্বজাতির পক্ষপাতী হইয়া আমরা স্বজাতীয় ভ্রম কুসংস্কার অধর্ম্ম দুর্নীতি পোষণ করিব। আমি কেবল এই বলিতেছি, যে যখন আমাদিগের নববিধান বৃক্ষ ভারত ভূমিতে রোপিত তখন এই বৃক্ষ নিশ্চয়ই ভারতবর্ষীয় থাকিবে এবং হিন্দু বৃক্ষ বলিয়া পরিচিত হইবে; জাতির বিকার কদাপি হইবে না। পশ্চিম

দেশ এবং ইংলণ্ড আমাদিগকে প্রকৃত সভ্যতা ভূষণে ভূষিত করিবে, কিন্তু আমাদিগের হিন্দু স্বভাব ও চরিত্রের উপরে অন্য কোন জাতির অধিকার নাই। বন্ধুগণ, যেখানে তোমাদিগের নববিধানের জন্ম হইল সর্ব্বাগ্রে তোমরা সেই পবিত্র ভূমিকে চুম্বন কর। এই বঙ্গদেশে নববিধানের জন্ম হইল, অতএব আমাদিগের উচিত সর্ব্বাগ্রে আমরা এই বঙ্গদেশের মাটীকে প্রণাম করি। বঙ্গদেশজাত এই নববিধানবৃক্ষ এক দিন সমুদয় পৃথিবীকে ছায়া দিবে; কিন্তু সকলকেই কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে এই বৃক্ষ আদৌ বঙ্গদেশে রোপিত হইয়াছিল এবং ইহা মূলে হিন্দুজাতীয়। বঙ্গদেশে যে নববিধান রোপিত হইয়াছে এ ঘটনাকে আকস্মিক ঘটনা বলিতে পারা যায় না। ইহাতে অবশ্যই ঈশ্বরের কোন গূঢ় অভিপ্রায় নিহিত আছে। পৃথিবীতে নানাবিষয়ে উৎকৃষ্টতর ও সভ্যতর এত দেশ থাকিতে ঈশ্বর দুর্ভাগা বঙ্গদেশে কেন এই স্বর্গীয় বীজ রোপণ করিলেন? এই বঙ্গ দেশের মাটীতে উহা রোপণ করিলে বিধান বৃক্ষ যে এই দেশের মাটী হইতে রস আর্কষণ করিয়া এই দেশীয় লক্ষণাক্রান্ত হইবে ইহা কি ঈশ্বর জানিতেন না? ঈশ্বর জানিয়াই নববিধানবীজ এই বঙ্গদেশে রোপণ করিয়াছেন। বঙ্গদেশ, হিন্দুস্থান, আর্য্যস্থান যোগপ্রধান দেশ। মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বর জগতে প্রেম যোগ ভক্তি-যোগ বৃদ্ধি ও বিস্তার করিবার জন্যই এ দেশে এই নূতন ধর্ম্ম বীজ রোপণ করিয়াছেন। হিন্দুস্থান অনেক জাতির বাসস্থান; এ সকল জাতির ভিতরে ঈশ্বর বাঙ্গালী জাতিকে মনোনীত করিয়া তন্মধ্যে তাঁহার ধর্ম্ম স্থাপন করিলেন। ঈশ্বর নববিধানকে বলিলেন;—"নববিধান, তুমি যাও, ঐ বাঙ্গালীদিগের সমাজে গিয়া তুমি জন্ম গ্রহণ কর এবং তাহাদিগের জাতীয় ব্যবহারের মধ্যে তুমি বর্দ্ধিত হও।" ঈশ্বরাজ্ঞাতে এই তরুণ নব বিধান বঙ্গদেশের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই দেশের রস আকর্ষণ করিয়া পরিপুষ্ট হইতে লাগিল। মহাপ্রভুর ইচ্ছায় ও তাঁহার নিজের হস্ত দ্বারা এই বঙ্গদেশে নববিধান প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এই বঙ্গদেশের মাটী আমাদিগের নিকট অত্যন্ত আদরণীয়। ইহার ভিতরে সে সমস্ত গুণ আছে যাহাতে এই বিধানতরু সম্পূর্ণরূপে বদ্ধমূল ও পরিপুষ্ট হইতে পারে। এই দেশ কিসের

জন্য বিখ্যাত? কোমল প্রেম ও ভক্তির জন্য। দুঃখীদের জন্য একটি অতি সুমিষ্ট ধর্ম্ম চাই, এমন একটি সহজ ধর্ম্ম চাই যাহাতে সকলের অধিকার আছে। সাধারণের পক্ষে কঠোর তপস্যা কিংবা বেদ বেদান্ত পাঠ দ্বারা ধর্ম্ম অর্জ্জন করা সহজ নহে। এই জন্য দয়াময় হরি, স্নেহময়ী জগজ্জননী এই বঙ্গদেশে কলিকালে এমন একটি সুলভ ধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছেন যাহা সকলেই গ্রহণ ও সম্ভোগ করিতে পারিবে। আর্য্যজাতিসম্ভূত এই বিধান-বৃক্ষে জাতীয় মিষ্টতার সঞ্চার হইতেছে। আমরা যদি সেই মিষ্টতা গ্রহণ না করি তাহা হইলে আমরা হিন্দু জাতি ও বিধান উভয়েরই বিরোধী হইব। যদি আমরা এই নব বিধানের জাতীয় বিশেষ লক্ষণগুলি স্বীকার না করি তাহা হইলে যে ভূমিতে বিধানবৃক্ষ জন্মিয়াছে সেই ভূমির প্রতি আমরা অপরাধী হইব। সমুদয় জাতি হইতে আমরা ঈশ্বরের সত্য গ্রহণ করিব, প্রত্যেক জাতির সাধু ভক্তদিগকে আমরা ভক্তি করিব; কিন্তু আমরা কদাচ বিজাতীয় হইব না। কোথায় মুসা, কোথায় সক্রেটিস্, কোথায় ঈশা, কোথায় মহম্মদ, ইহাঁরা বিদেশী হইয়াও আমাদিগের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতেছেন, কিন্তু আমাদিগের নববিধান য়িহুদী, গ্রীক্ কিংবা মহম্মদীয় বিধান হইতে পারে না, ইহা মূলেতে হিন্দু বিধান থাকিবে। বিদেশীয় মহাত্মারা আমাদিগকে নানা সত্য শিখাইতেছেন। বিদেশীয় মুসা আমাদিগকে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রত্যাদেশ শুনিতে উপদেশ দিতেছেন, বিদেশীয় সক্রেটিস্ আমাদিগকে আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দিতেছেন, বিদেশীয় ঈশা সৎপুত্র হইয়া স্বর্গীয় পিতার ইচ্ছা পালন করিবার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, দূর দেশীয় মহম্মদ একেশ্বরবাদ শিক্ষা দিতেছেন। অপরাপর বিদেশীয় মহাপুরুষেরা স্বর্গের বিচিত্র সৌন্দর্য্য দেখাইতেছেন। ইহাঁদের কাহাকেও আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি না, অশ্রদ্ধা করিতে পারি না। কিন্তু এই নববিধান কোন এক জনের পক্ষপাতী নহে, ঈশ্বর-প্রেরিত এবং ঈশ্বরের এক একটি স্বরূপের প্রতিনিধি বলিয়া ইহা যাবতীয় সাধু মহাপুরুষদিগকে গ্রহণ করিতেছে। তাহা না হইলে আমরা যাত্রী হইয়া ইহাঁদিগের স্বর্গীয় ভবনে যাইতাম না। পরম পিতা ঈশ্বর কেমন নিগূঢ় স্বর্গীয় কৌশলে আমাদিগকে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত সাধুদিগের নিকট লইয়া

গিয়া নানা সদ্‌গুণে আমাদিগকে ভূষিত করিতেছেন। তিনি আপনি আমাদিগের হস্ত ধরিয়া তাঁহার ঐ উজ্জ্বল চিন্ময় সন্তানদিগের নিকট লইয়া না গেলে আমরা আপনারা কদাপি তাঁহাদের কাহারও নিকটে যাইতে পারিতাম না। আমরা আপন ইচ্ছানুসারে অথবা নিজ বলে কোন সাধুর নিকটে যাই নাই; কিন্তু ঈশ্বর আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। আমরা কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ে বদ্ধ নহি, আমরা কোন এক জন সাধুর শিষ্য দলভুক্ত নহি। ঈশ্বর আমাদিগকে যেখানে লইয়া যান আমরা সেখানেই যাই। ঈশ্বরাদেশে যে কোন সাধু আমাদিগকে ডাকিবেন তৎক্ষণাৎ আমরা তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিব। যখন একবার এ সকল সাধুদিগের আহ্বানে আহূত হইয়া ইহাঁদিগের ভবনে গিয়া ইহাঁদিগের সঙ্গে একত্র অমৃত পান করিয়াছি তখন বারংবার আমরা ইহাঁদিগের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু আমরা পৃথিবীর জেরুজেলম, পৃথিবীর মেক্কা মেদিনা, পৃথিবীর মথুরা বৃন্দাবন মানি না। আমরা স্বর্গনিকেতনে গিয়া ব্রহ্মক্রোড়ে আশ্রিত সাধুদিগকে দর্শন করিব। সেখানে জাতিভেদ বা সাম্প্রদায়িকতা নাই। আমাদিগের নববিধান এক দিকে যেমন সার্ব্বভৌমিক আর এক দিকে তেমনি জাতীয় লক্ষণাক্রান্ত। ইহা এক দিকে সমুদয় সাধুদিগের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া একগোত্র, একজাতি, একবর্ণ হইয়া গিয়াছে, আবার ইহা আপনার বিশেষ বিশেষ ভাব প্রচার করিবার জন্য আপনার জাতীয় স্বভাব, জাতীয় লক্ষণ রক্ষা করিতেছে। ইহা দেশীয় বিদেশীয় সকল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তককে স্কন্ধে রাখিয়া তাঁহাদের যশ কীর্ত্তন করে, কিন্তু ইহার বক্ষে হিন্দুশোণিত প্রবাহিত। অপর ধর্ম্মের বিজাতীয় বেশ পরিধান করাইয়া ঈশ্বর এই নববিধানকে প্রেরণ করেন নাই, ইহাকে তিনি জাতীয় বেশে সজ্জিত করিয়া পাঠাইয়াছেন। ঈশ্বরদত্ত এই বেশ আমরা চির দিন রক্ষা করিব। এই হিন্দুজাতীয় বৃক্ষ হিন্দুস্থানে খুব বদ্ধমূল হইলে, হিন্দুরক্তে খুব পরিপুষ্ট হইলে তবে চারিদিকে ইহার শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইবে। আমরা ঈশা, মুসা, মহম্মদ সকলেরই প্রণত ভক্ত, কিন্তু জাতিতে আমরা চির দিন হিন্দু থাকিব। যেমন এক বৃক্ষের নানা শাখা, কিন্তু বৃক্ষের রস এক প্রকার এক জাতীয়, সেইরূপ এই

নববিধানবৃক্ষে ভিন্ন ভিন্ন শাখা বিভিন্ন ধর্ম্মভাব প্রকাশ করে। কিন্তু এই বৃক্ষের রস হিন্দু। এই বিধানের দক্ষিণ হস্তে ইংরাজী বিদ্যা ও সভ্যতা, বাম হস্তে মুসলমানের তেজ; কিন্তু ইহার রক্তে হিন্দুর যোগ ভক্তি, হিন্দুর কোমল প্রীতি। যিনি নববিধানের ব্রাহ্ম তিনিই প্রকৃত হিন্দু। কেন না যিনি প্রকৃত ব্রাহ্ম তাঁহার চরিত্রে স্বজাতীয় ভাব বিশেষরূপে প্রস্ফুটিত হয়। যিনি বেদ বেদান্ত পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে এবং মহাদেব দুর্গা কালী লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্ত্তি হইতে নিগূঢ় তত্ত্ব বাহির করিয়া লন এবং যিনি আপনার দৈনিক আচার ব্যবহারে ধর্ম্মের সাত্ত্বিক নিয়মাদি পালন করেন, তাঁহার ন্যায় যথার্থ হিন্দু আর কোথায় আছে? প্রকৃত ব্রাহ্ম হিন্দুসাগর মন্থন করিয়া তাহার মধ্য হইতে সমুদায় সার রত্ন গ্রহণ করিতেছেন, আর যাঁহারা হিন্দু তাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মের খণ্ড খণ্ড ভাব গ্রহণ করিয়াই পরিতৃপ্ত। নববিধানের ভক্ত প্রকৃত হিন্দু। ব্রাহ্মদিগকে হিন্দুবিরোধী জাতিচ্যুত বিধর্ম্মী বলিয়া নিন্দা করা সঙ্গত নহে, সত্য নহে। বাস্তবিক ব্রাহ্মেরাই প্রকৃত হিন্দু। এই দেশের মাটী হইতে এই নববিধান বৃক্ষকে কে উৎপাটন করিতে পারে? ঈশ্বর হিন্দুমাটী ও হিন্দুরক্ত লইয়া এই নববিধান গঠন করিয়াছেন, কাহার সাধ্য ইহাকে হিন্দুভাববিহীন করে? ঈশ্বর এই নববিধানকে আরও হিন্দুভাবে সুশোভিত করিবেন, এবং ইহা দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের প্রচ্ছন্ন সমুদায় রত্ন পুনরুদ্ধার করিবেন। হে নববিধান ভক্ত, তুমি কি যোগী? তবে তুমি হিন্দু? তুমি বৈরাগী, তবে তুমি হিন্দু, তুমি ক্ষমাশীল, তবে তুমি হিন্দু, তুমি মাতৃভক্ত, তবে তুমি হিন্দু, তুমি দয়ালু, তবে তুমি হিন্দু। তোমার প্রাণের মধ্যে যদি ধ্যানপরায়ণতা, যোগ, বৈরাগ্য, জীবে দয়া, কোমলতা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে তোমার রক্ত হিন্দু। তোমার প্রাণের চাবী খুলিয়া দেখিলাম, হে নববিধান ভক্ত, তুমিই প্রকৃত হিন্দু। আরও যত তুমি উন্নত ব্রাহ্ম হইবে, তত তুমি প্রকৃত হিন্দু হইবে। যতই নববিধান প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম লক্ষণাক্রান্ত হইবে ততই ইহা বদ্ধমূল হইয়া ঈশ্বরের অভিপ্রায় পূর্ণ করিবে। হে ব্রাহ্ম, যতই তুমি হিন্দুর প্রকৃত ধ্যান, যোগ, বৈরাগ্য, কোমলতা, ভক্তি প্রভৃতি বিবিধ রসে অভিষিক্ত হইবে ততই তোমার ধর্ম্ম জগতে আদৃত হইবে, যতই তুমি তোমার স্বজাতীয়

আর্য্য ঋষিগণের ন্যায় ধ্যানপরায়ণ যোগী হইবে, শাক্যের ন্যায় নির্ব্বিকার নির্ব্বাণপ্রিয় হইবে, চৈতন্যের ন্যায় প্রেমোন্মত্ত হইবে ততই অধিকতর আগ্রহের সহিত আমেরিকা ইউরোপ চিন তাতার প্রভৃতি সমুদয় দেশ তোমার ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। যতই তুমি স্বজাতির গৌরব রক্ষা করিবে ততই নববিধান জাতীয় গৌরব ও বিক্রম লইয়া দেশ দেশান্তরে বিস্তৃত হইবে।

আচার্য্যকর্ত্তৃক শ্লোকব্যাখ্যা।

৩ মাঘ, ১৭৯৭ শক।

অপ্রমত্তো গম্ভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্গুণঃ।
অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ॥

ভাগবত ১১ স্কঃ ১১ অঃ ৩১ শ্লো।

অস্যার্থঃ।

আমার ভক্ত অপ্রমত্ত গম্ভীরাত্মা ধৈর্য্যবান্, ক্ষুধা তৃষ্ণা শোক মোহ জরা মৃত্যু তাহার বশীভূত, নিজে অমানী হইয়াও অপরকে সম্মান করে, সুদক্ষ, সকলের মিত্র, দয়ালু ও জ্ঞানবান্।

ঈশ্বরের ভক্ত নিজে অমানী হইয়াও অন্যকে সম্মান দেন। লোক যাহাতে অপদস্থ না হয় তাহার জন্য চেষ্টা করেন। ভক্ত ঈশ্বরের নাম সাধন করিতে গিয়া নিজে অপমানিত হন ইহাতে কুণ্ঠিত হন না; কিন্তু অপরের মর্য্যাদা তিনি রক্ষা করেন। যাহাতে কোন ব্যক্তির অপমান না হয় তাহার জন্য তিনি যত্নবান, অথচ তিনি জানেন. মান অপমান দুইই সমান। অপরের ধন রক্ষা হয় ইহাতে যেমন তিনি মনোযোগী, অপরের মান রক্ষা হয় তাহাতেও তিনি তেমনি সচেষ্ট। আপনার প্রতি বৈরাগী; কিন্তু পরের প্রতি নহে। ভক্তের এই নিগূঢ় লক্ষণ জানা উচিত। অপরের নির্ধনতা অপমানে আমোদ করা ভক্তের লক্ষণ নহে। ভক্তের আপনার প্রাণ অন্যের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য। ভক্তের মধ্যে প্রেম ও জ্ঞানের আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য দেখা যায়। আপনার কার্য্যে তিনি অত্যন্ত সুদক্ষ। তাঁহার জীবনে দয়া এবং জ্ঞানের কদাপি অনৈক্য হয় না। ভক্ত জ্ঞানবান্ বলিয়া পরের প্রতি নিষ্ঠুর নির্দ্দয় নহেন। যেমন ঈশ্বর প্রসাদে তিনি দয়া সঞ্চয় করেন, ঈশ্বর প্রসাদে তেমনি তিনি জ্ঞান সঞ্চয় করেন। ভক্ত জ্ঞানবান্ এবং সকলের প্রতি দয়ালু।

যথা সংকল্পয়েদ্বুদ্ধ্যা যথা বা মৎপরঃ পুমান্।
ময়ি সত্যে মনো যুঞ্জং স্তথা তৎ সমুপাশ্নুতে॥

ভাগবত ১১ স্কঃ ১৫ অঃ ২৬ শ্লো।

অস্যার্থঃ।

আমি সত্য। আমাতে মন সমাধান করিয়া আমার ভক্ত যাহা সংকল্প করে তাহা প্রাপ্ত হয়।

ঈশ্বরের নাম কল্পতরু। ভক্তেরা যে সংকল্প করিয়া তাঁহার পূজা করেন তিনি তাহা পূর্ণ করেন। ঈশ্বরের ভিতরে হৃদয়কে প্রবিষ্ট করিয়া ভক্ত যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই তিনি লাভ করেন। নদীর জলে অবগাহন করিলে যেমন শরীর প্রক্ষালিত হয় এবং প্রাণ শীতল হয়, সেইরূপ যথার্থ ঈশ্বর নিকটে আছেন, এবং আমি যাহা চাহিব সেই সামগ্রী প্রস্তুত হইয়া আমাকে দান করিবার জন্য তিনি কল্পতরু হইয়া সমক্ষে রহিয়াছেন, যখন এই বিশ্বাস হইবে, তখন যাহা সংকল্প করিব তাহা লাভ করিব। কল্পতরু শব্দের অর্থ এই। ভক্ত ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হইলে যে যোগপ্রণালীর ভিতর দিয়া ভক্তের অন্তরে ঈশ্বরের ভাব আসিতে থাকে; সেই যোগ স্থাপন হইলেই ভক্ত বলিতে পারেন আমি যাহা চাহিব তাহাই পাইব। ভগবান্ বলেন;—"আমি সত্য। আমাতে মন সমাধান করিয়া আমার ভক্ত যাহা সংকল্প করে তাহা প্রাপ্ত হয়।" ঈশ্বরের এই কথা এই অঙ্গীকার সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া রাখিতে হইবে। যাহার মন ঈশ্বরে সমাধান হইয়াছে, সেই যোগের অবস্থায় মনের ব্যাকুলতা শান্তি হইবেই হইবে। যোগের দ্বারা আমরা ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হই, তখন যাহা চাহিব তাহাই পাইব। এই আশাতরুর নিম্নে অটল ভূমি দেখিতে পাইব। ঈশ্বর মঙ্গলস্বরূপ, যাহাতে আমাদের মঙ্গল হয় তৎসমুদায় বস্তুর সঙ্গে মনুষ্যের নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। ভক্তি দ্বারা ব্রহ্মযোগ স্থাপন হইলেই ঐ সকল বস্তু ঈশ্বরের মঙ্গল নিয়মে এবং আশ্চর্য্য সুকৌশলে আপনা হইতে ভক্তের জীবনে আসিয়া উপস্থিত হয়। ঈশ্বর স্বয়ং আপনাকে দান করিয়া ভক্তকে কৃতার্থ করেন।

সেবকের নিবেদন।

রাজর্ষি ও দেবর্ষি।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার, ১৩ কার্ত্তিক, ১৮০২ শক।

হিন্দুস্থানে কত আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। ঋষিতে ঋষিতে বিবাদ কেন? ধর্ম্মরাজ্য তো শান্তির রাজ্য, বিরোধবারণ ও শান্তিবিস্তার ধর্ম্মের লক্ষ্য। তাহাতে আবার হিন্দুজাতির জাতীয় একতা আছে এবং ঋষিদিগের মধ্যে বিশেষ ঐক্য আছে। তবে ঋষিতে ঋষিতে বিবাদ কেন? ঠিক যেন বিপরীত ও বিরুদ্ধ ব্যবহার ঋষিরাজ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এক ঋষি সিংহাসনে, অপর ঋষি পর্ণকুটীরে। এক ঋষি রাজা, তাঁহার নিকটে ধন রত্নের ছড়াছড়ি। আর এক ঋষি কি খাইবেন কি পরিবেন, ঋষিপত্নী, ঋষিকুমার, ঋষিকন্যাদের কিরূপে ভরণ পোষণ হইবে, কিছুই জানেন না। আকাশ তাঁহার ধন, আকাশ তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র, আকাশ তাঁহার ঘর, আকাশ তাঁহার অশ্ব রথ। এক ঋষির চারি দিকে ভৃত্যের সংখ্যা নাই; নিয়ত জ্ঞাতি কুটুম্ব স্বজনের কোলাহল; অসীম তাঁহার ধন সম্পত্তি, অসংখ্য তাঁহার অশ্ব রথ। আর এক ঋষির একটি পয়সা বা এক মুষ্টি অন্নের সংস্থান নাই। গিরিগহ্বরে একাকী বসিয়া তিনি ধ্যান করিতেছেন, কিরূপে প্রাণ ধারণ হইবে কিছুই জানেন না, কিছুই ভাবেন না। সমাধি অবস্থায় তিনি বাহ্যিক জীবনের চিন্তা শেষ করিয়াছেন। এক ঋষি ব্যস্ত ও কর্ম্মশীল, আর এক ঋষি নিষ্ক্রিয় ও নিস্তব্ধ। এক ঋষি সর্ব্বদা সংসারের কোলাহলের মধ্যে বাস করেন। আর এক জন যেখানে লোকালয় নাই গোল নাই সেখানে গোপনে অবস্থিতি করেন। ধন সম্পদের প্রলোভন তাঁহাকে

রাস্ত করিতে না পারে এজন্য তিনি সংসারকে দূরে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। বল, হে মহর্ষি, তুমি সংসারে রহিলে না কেন? বল, হে মহর্ষি, হে দেবর্ষি, আপনাদিগের মধ্যে বিবাদ কেন? হে জনক, তুমি যে পথ ধরিয়া ধর্ম্মসাধন করিতেছ, মহর্ষিগণ সে পথে কেন চলেন না? তুমি রাজা হইয়া ঋষি, ঋষি হইয়া রাজা হইলে কেন? অন্যান্য ঋষিগণ দুঃখ দারিদ্র্য আশ্রয় করিলেন, তুমি সুখ সম্পদ্ লইলে কেন? এ বিরুদ্ধ ভাব কেন? কেহ কুটীরে দুঃখীর দুঃখ ভোগ করিতেছেন, কেহ রাজসিংহাসনে বসিয়া রাজার মান সম্ভ্রম সুখ ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করিতেছেন। হে ঈশ্বর, এরূপ প্রভেদ কেন বুঝাইয়া দাও। হে নব বিধান, সমুদায় ধর্ম্মবিধানের মধ্যে শান্তি সংস্থাপন করা তোমার উদ্দেশ্য; পরস্পর বিরুদ্ধ ঋষিব্যবহারের আপাততঃ বিবাদ মীমাংসা করিয়া দাও। পর্ণকুটীর সৃজন করিয়াছেন যিনি রাজসিংহাসনের স্রষ্টাও তিনি। টাকা কড়ী ধন সম্পত্তি যিনি পৃথিবীতে আনিয়াছেন, তিনিই আবার পরীক্ষা বিপদে ভক্তকে ফেলেন। যত কিছু সামগ্রী সকলই ঈশ্বরের। জগদীশ্বর জানেন কখন কাহার সম্বন্ধে কি প্রয়োজনীয়। সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদ আমাদিগের চিন্তার বিষয় নহে, তাহা ঈশ্বরের বিচিত্র বিধির অন্তর্গত। কখন কিসে কল্যাণ হয় তিনি জানেন। রাজসিংহাসনে বসা উচিত, অথবা গাছের তলায় বসা উচিত, তুমি তাহার কিছুই জান না। তুমি কার্য্যালয়ে গিয়া পাঁচ ঘণ্টা পরিশ্রম করিবে এবং স্বয়ং টাকা উপার্জ্জন করিয়া উপজীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, অথবা ধর্ম্মপ্রচারকের ব্রত গ্রহণ করিবে, তোমার কিসে মঙ্গল্ তুমি জান না। কোন্ সময়ে অর্থ উপার্জ্জন করা ধর্ম্ম ঈশ্বর জানেন আমরা জানি না, সে বিষয়ের মীমাংসা তিনি করিবেন। কল্যাণের পথে থাকা, স্ত্রী পুত্র কন্যাকে কল্যাণের পথে রাখা, এই ঈশ্বরের আদেশ আমাদিগকে পালন করিতে হইবে। কিন্তু কিসে আমার এবং পরিবারের কল্যাণ হয় তাহা ঈশ্বরই জানেন। তিনি সিংহাসনে বসাইলেও কল্যাণ, পর্ণকুটীরে বসাইলেও কল্যাণ। কল্যাণের শাস্ত্র কেহ জানে না। ঋগ্বেদ জানে না, কঠোপনিষদ্ কি বলিবে? মহর্ষি ঈশা এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারেন নাই; শুক দেবও এ বিষয়ে কিছু উপদেশ দিতে পারেন নাই। হিন্দুস্থান ইহার কোন পরিষ্কার পথ দেখাইতে

পারে না, ইংলণ্ডও এ বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারে না। কল্যাণের শাস্ত্র কেবল ভগবান্ জানেন, তিনি মনুষ্যকে এ সম্বন্ধে কোন লিখিত শাস্ত্র বা সাধারণ বিধি দেন নাই। অবস্থাভেদে লোকভেদে তিনি কল্যাণের বিশেষ বিধি প্রস্তুত করিয়া দেন। সময়বিশেষে আহার কল্যাণ, আবার কখন উপবাস কল্যাণ। চারি টাকা গ্রহণ কখন কল্যাণ, কখন চারি টাকা ব্যয় করা কল্যাণ। সুখ দুঃখ দুইই কল্যাণ। বিপদের দুইপ্রহর রাত্রি, সম্পদের দ্বিপ্রহর দিবা দুইই কল্যাণ। সন্তান সন্ততি বন্ধু বান্ধব লইয়া বাস করাও কল্যাণ, সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া একাকী গিরিশিখরে বাসও কল্যাণ। কল্যাণের বিধি পৃথিবীর কোন শাস্ত্রে নাই। এ স্থলে আচার্য্য গুরু পিতা মাতা সকলে অনভিজ্ঞ। ঈশ্বর কেবল বলিতে পারেন তোমার আমার কিসে মঙ্গল হইবে। এক দিকে দেবর্ষি যোগধর্ম্ম সাধন করিয়া ঈশ্বরের আদেশ পালন করিলেন, আর এক দিকে রাজর্ষি রাজসিংহাসনে বসিয়া রাজ্য শাসন করত ঈশ্বরের ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন। কে তাঁহাদিগের দুই জনকে দুই স্থানে বসাইলেন? ঈশ্বর। ইঁহারা দুই ভাই। এক জন ঈশ্বরের আদেশে সিংহাসনে আর এক জন বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। দুই জনই ঈশ্বরের অনুগত। এক জন সপরিবারে সংসারে জিতেন্দ্রিয় হইয়া গৃহধর্ম্ম পালন করিলেন, ধন সম্পত্তি তাঁহার আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারিল না, পৃথিবীর সমুদায় লোভের সামগ্রী মধ্যে তিনি নির্লোভ অবস্থায় থাকিলেন। দেখ জনক হিন্দুস্থানে রাজা হইয়া প্রজাপালন করিলেন, তাঁহার মনের ভিতরে ধনের জন্য কিছুমাত্র অহঙ্কার ছিল না। দেবর্ষি যেমন নির্লিপ্ত, তিনিও ধন জন সম্পদ ঐশ্বর্য্য মধ্যে তেমনি নির্লিপ্ত ছিলেন। টাকা পদার্থ আছে কি নাই তাহা দেবর্ষি ও রাজর্ষি কেহই জানিতেন না। দুই জনেরই চিত্ত ব্রহ্ম পাদপদ্মে নিবিষ্ট। সেখানে টাকা থাকা না থাকা দুইই সমান। পরমার্থে নশ্বর অর্থ বিলীন। ব্রহ্মপদে সংসার পদমর্য্যাদা স্থান পায় না। কল্যাণপ্রদ ব্রহ্মচরণে আশ্রয় লইলে সন্ন্যাসী সংসারী উভয়েরই এক গতি হয়। রাজর্ষি দেবর্ষি ভাই, হইয়া ধর্ম্মের দুই দিক্ পালন করিলেন। এক জনের গায়ে রাজপরিচ্ছদ, আর একজনের গাত্রে বৃক্ষের বল্কল। এক জন ঘোর সংসারী আর এক জন ফকীর। কিন্তু উভয়েরই উদ্দেশ্য কেবল

ক্ষের ভিতরে যোগের অবস্থায় স্থিতি করা। বাহিরে দেখি খুব প্রভেদ। ন ইনি এক ধর্ম্ম পালন করিতেছেন, উনি আর এক ধর্ম্ম পালন করিতেছেন। কন্তু বাহির ছাড়িয়া ভিতরে যাই দেখি যে মূলে একই ভাব। দেখিতে ক জন রাজা, আর এক জন দরিদ্র, কিন্তু ভিতরে গিয়া দেখি, দুইয়েরই বিনের মূলে বৈরাগ্য। পৃথিবীর বৈরাগ্য ধনের মধ্যে বাস করিতে য় না। সকলকে এক পথ, দুঃখ দারিদ্র্যের পথ, ধরিতে অনুরোধ করে, ংসার ছাড়িয়া পথে পথে উদাসীন হইয়া বেড়াইতে বলে। উহা রাজসিং-াসনকে বিষবৎ ঘৃণা করে, ধনকে নরক সমান মনে করে। হে জনক, তবে কি তুমি ঋষিকুলে কলঙ্ক দিলে, তোমার দৃষ্টান্ত কি অধোগতির কারণ? মি কি প্রবল আসক্তি বশতঃ সংসার কূপে ডুবিয়াছিলে? না। তাহা ইলে হিন্দুজাতি মধ্যে এত কাল তুমি ঋষি বলিয়া সমাদৃত হইতে না। হে রাজর্ষি, তোমার চরিত্রে বিলক্ষণ ঋষিলক্ষণ দেখিতেছি। তুমি ক্ষের অনুজ্ঞায় কঠোর ধর্ম্ম পালন করিলে, ভয় প্রলোভনের মধ্যে শান্ত চিত্তে প্রকাণ্ড রাজ্যের কর্ত্তব্যভার বহন করিলে, ভয়ানক কোলাহল ও ব্যস্ততা মধ্যে নিরন্তর যোগ সাধন করিলে। বর্ত্তমান ময়ে তোমার এই পথ দৃষ্টান্তের পথ। সত্য উপার্জ্জন করিতে হইবে, দয়া অভ্যাস করিতে হইবে, কর্ত্তব্যবুদ্ধি অনুসারে চলিতে হইবে, ংসারের মধ্যে থাকিয়া ধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে, এ সকল সম্বন্ধে তোমার র্ম্মল দৃষ্টান্ত অতিশয় উজ্জ্বল। বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া ংসারের মধ্যে ঋষি হইয়া কি প্রকারে থাকিতে হয় তাহার দৃষ্টান্ত তুমিই থিবীকে দেখাইয়াছ। তুমি যদি ধনকে জয় না করিতে, ঋষি হইতে । ধন ঐশ্বর্য্য, রাজ্যের আড়ম্বর, কার্য্যের ব্যস্ততা, এ সকলের মধ্যে থার্থ ঋষিভাব না থাকিলে তুমি হিন্দুস্থানের ভক্তি কখন আকর্ষণ করিতে পারিতে না। হিন্দু ঋষিগণের মধ্যে সংসারী ও ধনলোলুপ হইয়া যদি াণধর্ম্মকে ধ্বংস করিতে তবে, হে জনক, তোমার নাম ভারতভূমিতে রস্মরণীয় হইত না। যাহারা সংসারমদে মত্ত হয়, ধনের অহঙ্কারে ীত হইয়া মস্তক উত্তোলন করে, সে সকল লোকের নাম ধর্ম্মপুস্তকে ক কখন স্থান পায়? এমন কোন্ লোকের নাম ভারতের ধর্ম্মইতিহাসে

...ছে? জনকের ছবি আজও ভারতবর্ষে উজ্জ্বল আছে। এমন পবিত্রাত্মা রাজা আর কোথায় আছে? ঋষি রাজা হইলেন কেন, আমি জানি না, তোমরা জান না, হরি জানেন। রাজার ঘরে তিনিই মহাপুরুষ প্রেরণ করেন, সিংহাসনে তিনিই যোগীকে বসান। হরির কি ইচ্ছা কে জানে? জনকের ধর্ম্ম সহজ ধর্ম্ম ছিল না। বৃহৎ রাজ্যের অধিকারী হইয়া ধর্ম্ম সাধন করা কত কঠিন? কিন্তু জনক কি কিছু ভাবিতেন, সমস্ত ব্যাপার ঈশ্বর সমাধা করিতেন। ভাবিয়া কি এত বড় ধর্ম্ম কেহ সাধন করিতে পারে? রাজভবনে ভিখারী, বিপুল ধনসম্পত্তির মধ্যে সরল বালকের ন্যায় ব্যবহার! এ কি সহজ ব্যাপার! কিন্তু দেবকৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়। তিনিই দেবর্ষি মহর্ষি প্রস্তুত করেন। কিরূপে সন্তান পালন করিব, কিরূপে কর্ত্তব্যভার বহন করিব, এ সকল বিষয়ে চিন্তা করা আমাদের পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা। কল্য কি খাইব, কল্য কি পরিব, এ বিষয়ে যে চিন্তা করে সে কখন বিশ্বাসী নহে। হরি যাহা করিবেন, সে বিষয়ে আমরা কেন চিন্তিত হইব? সে চিন্তায় হরির নামে কলঙ্ক পড়ে। যে ব্যক্তি এরূপ চিন্তা করে সে ঈশ্বরের পদ আপনি গ্রহণ করে। যে সংসারে খাইবার পরিবার ভার মানুষ আপনার হস্তে লয়, সে সংসার ছারখার হইয়া যায়। বিষয় চিন্তা করিয়া টাকার ভাবনা ভাবিয়া কে কি করিতে পারে? কেহ কি আপনি ভাবনা চেষ্টা দ্বারা সোপান লাগাইয়া রাজসিংহাসনে উঠিতে পারে? ঈশ্বর পারিলেন না, তিনি পরিবারের সকলকে কষ্টে ফেলিলেন, অতএব নিজ বুদ্ধিতে বিষয় কর্ম্ম চালাইব, এরূপ সিদ্ধান্ত যে ব্যক্তি করিল, সে আপনি ঈশ্বরের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইল, ঈশ্বরকে পদচ্যুত করিয়া আপনি সেই পদ গ্রহণ করিল। ঈশ্বরকে আর তবে কার্য্যভার দেওয়া উচিত নয়, যে নরাধম এরূপ ভাবে, সে ঘোর অবিশ্বাসী। ঈশ্বরের হাতে ভার রাখিয়া সম্পন্ন ও ধনশালীর অবস্থাতে জনক রাজার ন্যায় হও, এবং পর্ণকুটীরবাসী দুঃখীর অবস্থাতে দেবর্ষি মহর্ষিগণের ন্যায় সাত্ত্বিক জীবন যাপন কর। যখন পর্ণকুটীরে, তখন যদি ঈশ্বরের দূত রাজহস্তী লইয়া আসে, তখনই তাহাতে আরোহণ কর। ঈশ্বর রাজসিংহাসনে বসাইতে

আহ্বান করিলেন যাও, সেখানে গিয়া যোগবলে দশ সহস্র প্রজা পালন কর। দেবর্ষি পর্ণকুটীর ছাড়িয়া সিংহাসনে বসিলেন; তাঁহার শরীর সিংহাসনে আরূঢ় হইল বটে, কিন্তু তাঁহার মন সেই পর্ণকুটীরেই স্থিতি করিতে লাগিল। তাঁহার পক্ষে প্রজাপালন এবং নিমীলিত নয়নে ধ্যান একই। তাঁহার মনে কিছুই বিকার হইল না। যিনি যোগবলে ব্রহ্ম-পাদপদ্ম লাভ করিয়াছেন তিনিই পবিত্র ভাবে দশহাজার প্রজা পালন করিতে পারেন। রাজর্ষি জনক সিংহাসনে বসিয়া কৃতার্থ হইলেন, সর্ব্বত্যাগী শুক লজ্জিত হইলেন। কি আশ্চর্য্য! শরীর যাঁহার সিংহাসনে, মন যাঁহার ধন মান ঐশ্বর্য্যের মধ্যে, তাঁহার আত্মা বৈরাগ্য ও যোগবলে সংযত! ফলতঃ দেবর্ষি রাজর্ষির বাহিরে প্রভেদ। এক জন সংসারী হইয়াও সংসারী নহেন। দুইই চিন্তাবিহীন, পাখীর ন্যায় দুই জনই নিশ্চিন্ত। সংসারের ভার দুই জনের মধ্যে একজনের মস্তকেও নাই। স্বয়ং ঈশ্বর দুই জনকেই রক্ষা করেন। দুই জনেরই দাস ভাব। ঈশ্বর বলিলেন বলিয়াই তাঁহারা দুই জনে দুই প্রকার জীবন অবলম্বন করিলেন। ইনি দেবর্ষি হইয়া একাকী নির্জ্জন তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন, উনি রাজর্ষি হইয়া রাজসিংহাসনে বসিয়া রাজ্য শাসন ও পালন করিলেন। হরি কাহাকে কখন কি করান কে জানে? রাজসিংহাসনে বসিয়া প্রজাপালন, দীন ভাবে পর্ণকুটীরে বাস করিয়া কঠোর ব্রত পালন, এ সকল কেবল আমাদের হরির খেলা। ভক্তেরা ইহার মধ্যে নিয়ত হরির প্রেম লীলা দেখেন। হরি আরো লীলা দেখাইবেন। হে ব্রহ্মভক্ত, ধনী হওয়াও ধর্ম্ম নহে, দরিদ্র হওয়াতেও ধর্ম্ম নাই। ঈশ্বর তিনি যাহা করিতে বলিবেন, সে তাহাই করিবে; তাহার পক্ষে তাহাই ধর্ম্ম। তিনি আজ্ঞা করিলে রাজকার্য্য করিব, প্রজা পালন করিব; তিনি আজ্ঞা করিলে বনচারী যোগী হইয়া থাকিব। তাঁহার আদেশে সকলেরই ঋষি হইতে হইবে। ধনীও ঋষি, নির্ধনও ঋষি। উদাসীন ফকীরও ঋষি হইতে পারে, সংসারী ধনী বহু সম্পত্তির অধিকারীও ঋষি হইতে পারে। কেহ গৃহস্থ ঋষি হও, কেহ উদাসীন ঋষি হও। যাঁহার প্রতি বিধাতার যেরূপ আজ্ঞা তিনি সেই ব্র[illegible] গ্রহণ করুন। ব্রাহ্ম, প্রতারিত হইও না। যদি তাঁহার আদেশ ন[illegible]

যাও, জঙ্গলে গিয়া কঠোর তপস্যা করিলেও অভিমান অহঙ্কারে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে; আবার যদি সংসারে বসিয়া ভিতরে লোভ চরিতার্থ করিয়া বাহিরে লোকের নিকটে জনকের ন্যায় দেখাইতে যাও তাহা হইলেও তোমার সর্ব্বনাশ হইবে। ঈশ্বর তোমাকে যেখানে রাখেন সেইখানে থাক, মনকে সর্ব্বদা মহাপ্রভুর শাসনে রাখ। ঋষি হওয়া তোমাদের সকলের জীবনের উদ্দেশ্য, হয় রাজর্ষি কিংবা দেবর্ষি। আমাদিগের যাহার প্রতি যে আদেশ যে বিধি তাহা পালন করিয়া যেন আমরা ঋষি জীবন ধারণ করি। ঈশ্বর কৃপা করিয়া আমাদিগের জীবনে তাঁহার অভিপ্রায় পূর্ণ করুন।

সেবকের নিবেদন।

নিত্য ও অবতীর্ণ ব্রহ্ম।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার, ২৩ কার্ত্তিক, ১৮০২ শক।

নিত্য ব্রহ্ম এবং অবতীর্ণ ব্রহ্ম এ দুয়ের সামঞ্জস্য কে করিতে পারে? নব বিধান। ব্রহ্মের এক বিশেষণ নিত্য, আর এক বিশেষণ অবতীর্ণ। দুই বিশেষণের সংযোগে নিত্য অবতীর্ণ ব্রহ্ম নিষ্পন্ন হয়। এ দুয়ের নিগূঢ় যোগ কেবল নববিধান বুঝাইয়া দিতে পারে। আমাদিগের দুর্ভাগ্যই হউক আর সৌভাগ্যই হউক, আমরা দুই পাঁচটি অবতার মানিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। অবতার মানিতে হইলে আমরা কোটি কোটি অবতার মানিব, নতুবা একটিও মানিব না। বাস্তবিক দশটি অবতারে চলে না। দশটি অবতারে ধর্ম্মরাজ্য রক্ষা হয় না। অনেক ভাবিয়া দেখিলাম দশটি অবতারে পৃথিবীর সকল অভাব মোচন হয় না। কথিত আছে ঈশ্বর অবতীর্ণ হন জগতের দুঃখ দূর করিবার জন্য, অসুর বধ করিবার জন্য। প্রতিদিন সংসারে এত অসুরের উপদ্রব হইতেছে, প্রতিদিন জগতে এত প্রকার রোগের প্রাদুর্ভাব হইতেছে যে ঈশ্বরের প্রত্যহ অসুর-সংহার ও ব্যাধিপ্রতীকারের জন্য অবতীর্ণ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। বহু শতাব্দীর পর এক এক বার আসিলে চলে না। প্রতি বর্ষে, প্রতি মাসে, প্রত্যহ তাঁহার অবতরণ আবশ্যক। তোমার আমার মনের ভিতরে অসুরেরা নিরন্ত আক্রমণ করিতেছে, তাহাদিগকে বধ করিবার জন্য বারংবার তাঁহার আসা উচিত। তোমার আমার রোগ অমঙ্গল দূর করিবার জন্য এক বার নয়, দুই বার নয়, দশ বার নয়, প্রত্যহ ২৪ ঘণ্টা, প্রতি

মিনিটে আসিতে হইবে। বাস্তবিক সামান্য বুদ্ধিতে বুঝিতে পারা যায়, ঈশ্বরকে যে প্রতিমুহূর্ত্তে জীবোদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হইতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংলণ্ড আমেরিকা চিন তাতার এ দেশে ও দেশে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোক কান্দিতেছে, তাহাদিগের প্রত্যেকের দুঃখ দূর করিবার জন্য তাঁহাকে বার বার স্বর্গ হইতে সংসারে আসিতে হয়, পাপবিমোচন কার্য্যে তাঁহার দিবা রাত্রি ব্যস্ত থাকিতে হয়। এরূপ ঈশ্বরকে কখন নিষ্ক্রিয় বলিতে পার না। দেখ তাঁহার হাতে কত কাজ। তোমার আমার প্রার্থনা শুনিয়া প্রার্থিত বস্তু দিতে হইবে, দশটি লোকের দশ প্রকার অবস্থা অনুসারে রোগের প্রতিবিধান করিতে হইবে। এক মুহূর্ত্তে দশ কোটি পাপীর কথা শুনিতে হইবে ও উহার উত্তর দিতে হইবে, অসংখ্য অগণ্য লোকের প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে। এরূপ এক দিন নয়, দুই দিন নয়, নিত্যকাল বিশ্বস্থিত সমুদায় জীবকে তাঁহার সাহায্য দান করিতে হইবে। এ সকল ভাবিলে মনে হয়, তাঁহার এক মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্রাম নাই, তিনি এক দিনের জন্যও শান্ত নহেন, কেবল সামান্য শ্রমজীবীর ন্যায় দিন রাত্রি খাটেন। কোথায় প্রহ্লাদ ভয়ানক অত্যাচারে উৎপীড়িত, কোথায় ধ্রুব জঙ্গলে পড়িয়া ভীষণ জন্তুর ভয়ে কান্দিতেছে, কোথায় কোন্ নিরাশ্রয় ভক্ত আহার বিনা ঘোর সঙ্কটে পড়িয়াছে, কোথায় কোন্ জ্ঞানী সাধক তর্কতরঙ্গে পড়িয়া চিৎকার করিতেছে, কোথায় কোন্ ভক্ত ব্রহ্মের অদর্শনযন্ত্রণায় মৃতপ্রায় হইয়াছেন, কোথায় কোন্ নারী অসহায় অবস্থায় পড়িয়া "কোথা হে অবলা বান্ধব" বলিয়া কাতর স্বরে ডাকিতেছে, কোথায় এক এক নগরী, এক এক দেশ, ঘোর শোকে মৃতপ্রায় হইয়া হাহাকার করিতেছে, কোথায় দুর্ভিক্ষ কোথায় রাজ্যবিপ্লব উপস্থিত, এ সকল সংবাদ নিরত তাঁহাকে লইতে হইবে। কত তাঁহার কাজ, কি ভয়ানক তাঁহার ব্যস্ততা! অথচ তিনি শান্ত ও নির্ব্বিকার। প্রতি মিনিটে তিনি সংসারে অবতীর্ণ, প্রতি মিনিটে তাঁহাকে কার্য্য করিতে হয়, গৃহের লক্ষ্মী হইয়া রাজ্যেশ্বরী হইয়া, পরলোকের অধিপতি হইয়া তাঁহাকে কত কার্য্য কত বিধান করিতে হয়, অথচ তাঁহাকে কিছুমাত্র চিন্তা নাই, চিত্তচাঞ্চল্য নাই, বিকার নাই। তিনি নিরাকার নির্ব্বিকার শান্তস্বরূপ। তিনি

ভাবেন না, তিনি কাজ করেন না। তবে তিনি কি করেন? আপনার মহিমাতে বসিয়া থাকেন। তবে কি তিনি আহার দেন না? রোগের প্রতীকার করেন না? পাপী চিৎকার করিলে তাহা শ্রবণ করেন না? তৃষ্ণায় কাতর হইলে তিনি কি জল দেন না? তিনি এ সমুদায় করেন না তো কে করে? আমাদিগের উদ্যানে যে তৃণ জন্মে তাহাকে জিজ্ঞাসা কর তাহার মূলে কে প্রতি দিন জল সেচন করে? বাগানে গিয়া স্বচক্ষে দেখ সেই জগৎকর্তা স্বয়ং সূক্ষ্ম প্রণালী দিয়া তৃণেতে জল সিঞ্চন করিতেছেন। এমন কে সামান্য তৃণ ইহার প্রতি ব্রহ্মাণ্ডপতির এত সূক্ষ্ম দৃষ্টি! প্রত্যেক সূর্য্য কিরণকে তিনিই বহন করিয়া পৃথিবীতে আনেন এবং তোমার আমার দ্বারে উপস্থিত করেন। কে এই আলোক সকলের গৃহে আনয়ন করেন? স্বয়ং ভগবান্। এই ব্রহ্মমন্দিরে শতাধিক লোক যদি প্রার্থনা করেন, কে তাঁহাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করেন? ভগবান্। তবে তো তাঁহাকে অনেক কার্য্য করিতে হয়! প্রহ্লাদকে পর্ব্বত হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিতেছে, তাহাকে বিষপান করাইবার চেষ্টা হইতেছে, সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিতেছে, ঈশ্বর কি এ অবস্থাতে উদাসীন থাকিবেন? তিনি কি ভক্তবৎসল নহেন? তিনি অবশ্য ভক্তকে ক্রোড়ে করিয়া বক্ষে ধারণ করিবেন। যেখানে যে ভক্ত উৎপীড়িত হন তিনি তাহাকে নিজ অভয় ক্রোড়ে ধারণ করেন। সংসারের বিপদ আপদ অকল্যাণ তিনি স্বয়ং নিবারণ করেন। তিনি সকলের বাড়ীতে যান। কত লোককে তাঁহার আহার দিতে হয়, এবং নিজ হস্তে সকলের কার্য্য সকল সম্পাদন করিতে হয়। কত হাসপাতালে তাঁহাকে রোগী দেখিতে যাইতে হয় এবং কত প্রকার ঔষধ দিয়া বিভিন্ন রোগের প্রতীকার করিতে হয়। কত দুঃখীর চক্ষের জল মুছাইয়া দিতে হয়। ঈশ্বরের স্কন্ধে এত ভার, তাঁহার এত কার্য্য। এক দিকে পুরাণ এই কথা বলিলেন, আর এক দিকে বেদ বলিলেন,—"পুরাণ, তুমি চুপ কর, ঈশ্বর ব্যস্ত, এ কথা বলিয়া চিৎকার করিও না, কুতর্ক করিও না। ঈশ্বর শান্ত।" উপনিষদ নিয়ত বলেন, "শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ"। ঈশ্বর যদি শান্ত, তবে তিনি কি কখন মনুষ্যের দুঃখ হরণ ও অসুরবিনাশ জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন না? বেদ বলিলেন না, তত্ত্ববক্তা-

রোপনিষৎ, বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, বড় বড় বেদান্ত শাস্ত্র মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না, তিনি কিছু করেন না। পুরাণে রাম কৃষ্ণ প্রভৃতির মানবিক লীলা বর্ণিত আছে। আধুনিক পুরাণের মতে ঈশ্বর প্রতি দিন প্রতি জনের গৃহে অবতীর্ণ। তিনি কৃষকের ক্ষেত্রে ধান্য, নদীতে জল, গৃহস্থের ঘরে ধন সম্পদ্ স্বয়ং আনিয়া দেন। সমুদ্র হইতে বাষ্প তুলিয়া তিনি মেঘ সৃষ্টি করেন। সেই মেঘ হইতে বারি বর্ষণ করিয়া পুনর্বার জল সমুদ্রাভি-মুখে লইয়া যান। জ্ঞান বিজ্ঞান বলিয়া দিতেছে প্রত্যেক শক্তিতে ঈশ্ব-রের শক্তি নিহিত। ইহার মতে দশ অবতার নহে, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি অবতার। প্রত্যেক ভৌতিক ও মানসিক শক্তিতে ব্রহ্ম শক্তি অব-তীর্ণ। বর্ত্তমান বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা সমুদায় শক্তিকে এক শক্তিতে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। সকল বস্তুর মূলশক্তি ভগবান্। সকলের মূলে এক শক্তি। ঐ শক্তি সদা ব্যক্ত হইয়া, সকল বস্তুর ভিতর দিয়া কার্য্য করিতেছে। এখন বল ঈশ্বর নিষ্ক্রিয় না ক্রিয়াশীল? বেদ পুরাণ সংগ্রাম করিতেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে নববিধান উপস্থিত। বেদ পুরাণের সামঞ্জস্য করিতে হইবে। বেদ বলিতেছে ঈশ্বর কিছুই করেন না; বেদের এক মত, পুরাণের আর এক মত; বেদের ঈশ্বর নিশ্চেষ্ট, পুরাণের ঈশ্বর কর্ম্মশীল। নিশ্চেষ্ট ও কর্ম্মশীল দুই কিরূপে সিদ্ধ হইবে? নব-বিধানের ভক্ত ইহার মীমাংসা করিবেন; তিনি ইহার সঙ্কেত বুঝি-য়াছেন। সৃষ্টি করিবার সময়ে ঈশ্বর সুকৌশলে সমুদায় বিশ্ব সৃজন করি-লেন। তিনি সৃষ্টির ভিতরে কল্যাণের কল পাতিয়া দিলেন। সৃষ্টি নিয়ত জীবের মঙ্গল বিধান করিতেছে। এক ব্যক্তি যে সময়ে অধর্ম্ম হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ক্রন্দন করে, তিনি ভগবান্ তাহার কাছে বর্ত্তমান। তবে কি তিনি অবতীর্ণ? না, তিনি সমুদয় ঘটনার মধ্যে জাজ্জ্বল্যমান। অব-তরণ কিছুই নহে, অপ্রকাশ ঈশ্বর প্রকাশিত হইলেন। ঈশ্বর অবতার হইয়া পৃথিবীতে আসেন; ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় নিজ হাতে খাওয়ান ইহা সকলি অলীক। ঈশ্বরের সমুদায় সৃষ্টি মধ্যে যত যন্ত্র আছে সমুদায় কল্যাণ নিয়মে দৃষ্ট। এমনি সুনিয়মে সমুদায় ঘটনা সংযুক্ত আছে, ঠিক যখন ভক্তের যাহা দরকার তখনই তাহা আসিবে। কুতার্কিক জিজ্ঞাসা

করিতে পারে, তবে কেন বল অমুক বস্তু ঈশ্বর আনিয়া দিলেন? তর্কের উত্তর এই, ঈশ্বরের কাহ নাই, মনুষ্যের ন্যায় তিনি ভুজবলে কার্য্য করেন না, অথচ তিনি কাজ করেন। লক্ষ লক্ষ তাঁহার বাহু সৃষ্টির মধ্যে বিস্তৃত রহিয়াছে। আকাশ বাতাস জল স্থল বৃক্ষ লতা জীব জন্তু, মনুষ্যের তাঁহার আজ্ঞাবহ ভৃত্য, তাঁহার কর্ম্মসাধনের যন্ত্র। ইহারা সকলে বিশ্বাসী ভক্তদিগের সেবা করে ও আশ্চর্য্যরূপে জগতের কল্যাণ সাধন করে। আমি পাপে পড়িয়া অস্থির হইয়াছি, এক জন সাধু বন্ধুর প্রয়োজন। অমনি ঘটনাযোগে এক জন বন্ধু আমার নিকটে আসিয়া পড়িলেন। ঠিক সেই সময়ে তিনি কেন আসিলেন কেহ জানে না। অনেকে বলিল আকস্মিক ঘটনা, আমি মানিলাম না। আমি মদের বোতল ধরিয়াছিলাম, এক মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার চির জীবনের জন্য সর্ব্বনাশ হইতেছিল, মৃত্যু নিকটবর্ত্তী, বোধ হইল এই আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত। শুভ ক্ষণে এক জন বন্ধু আসিয়া সুরাপান হইতে আমাকে নিবৃত্ত করিলেন। কে তাঁহাকে পাঠাইলেন, কি নিয়মে ঘটনাটি ঘটিল কিছুই বুঝিলাম না। প্রলোভন কাটিয়া গেল। আমি ভাল হওয়াতে শত শত লোকের কল্যাণ হইল। এক মিনিটের মধ্যে আমার সর্ব্বনাশ হইত, তাহা না হইয়া সহস্র লোকের মঙ্গল হইল, মদ খাওয়া সমাজ হইতে উঠিয়া যায় এজন্য আমি যত্নবান্ হইলাম, আমি এক জন সমাজসংস্কারক হইলাম, ধর্ম্মপরায়ণ হইলাম, মনের প্রলোভন ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইলাম, এক জন প্রকৃত ভক্ত হইলাম, সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া পরিণামে সাধকব্রত গ্রহণ করিলাম এবং প্রচারক হইয়া কত লোকের উপকার সাধন করিলাম। তোমাদের মধ্যে কত লোকের জীবনে এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে? সমস্ত দেশের জ্ঞান ধর্ম্মের বিপ্লব হইল, সেই সময়ে ধর্ম্মপ্রচারক জন্ম গ্রহণ করিলেন। কেহ বলিল এটি আকস্মিক, কেহ বলিল ঈশ্বর ঐ সাধুকে প্রেরণ করিলেন। বাস্তবিক ঘটনা ঘটনার পিতা, ঘটনা ঘটনার মাতা। বিশেষ কতক গুলি ঘটনা হইলেই অমনি মহাপুরুষের জন্ম হয় এবং তাঁহার চেষ্টায় দেশ উদ্ধার হয়। শতাধিক ঘটনা একত্র হইয়া একটি আন্দোলন হইল, সেই মহা আন্দোলন দশটি রাজ্যকে স্কন্ধে লইয়া ক্রমভাবে

উপস্থিত করিল। তোমরা যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাহা কত ঘটনার ফল স্মরণ করিয়া দেখ। একটির পর একটি কেমন আশ্চর্য্য সূত্রে ঘটনাগুলি ঘটিল তাই তোমরা ব্রাহ্ম হইলে। তোমরা পাপমদে নয় অবিশ্বাসমদে অন্ধ হইয়া মরিবার উপক্রম করিয়াছিলে, মরিতে, আজ ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া পূজা করিতে না। সম্মুখস্থ নরক হইতে কিরূপে উদ্ধার পাইলে? এ স্থলে সকলেই বলিবে, ইহারা ঈশ্বরের ইচ্ছায় বাঁচিল। কে আজ এই ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া উপাসনা করিত, কে ভাল দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিত, কে ভ্রাতা ভগিনীদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া ব্রহ্মনামগানে সুখী হইত, যদি সেই শুভ ক্ষণে মন ফিরিয়া না যাইত। তোমার আমার সকলেরই এইরূপ ঘটিয়াছে। ঈশ্বর আকাশকে বাতাসকে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডকে বলিয়া দিয়াছেন, দেখ ব্রহ্মাণ্ড যখনই ভক্ত ডাকিবে, তুমি সেবক হইয়া উপস্থিত হইবে এবং সমুদায় কাম্য বস্তু বিধান করিবে। দেখিও আমার কল্পতরু নামে যেন কলঙ্ক না হয়। চন্দ্র সূর্য্য আকাশ বায়ু সমুদায় বস্তু আমার মঙ্গলময় নাম রক্ষা করিও। ধর্ম্মের জন্য এক জন সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিল, দুইটি পয়সা নাই যে সে তদ্দ্বারা অন্ন আহার করে, এমন স্থান নাই যে তথায় মস্তক আচ্ছাদন করে, কোথা হইতে অন্ন বস্ত্র ঘর সকলই আসিল কেহ জানে না। সন্তান সন্ততির ধর্ম্ম উপার্জ্জন বিদ্যা উপার্জ্জন শুভ বিবাহ কোথা হইতে কিরূপে হইল কে জানে? এখান হইতে পাত্র আসিল ওখান হইতে কন্যা আসিল, বিবাহ হইল। এ সকল মানুষ ঘটাইল কিংবা অকস্মাৎ হইল, লোকে এইরূপ বলে। আজ অর্থ নাই, অমুক ধনাঢ্য ব্যক্তি অনুগ্রহ করিল এবং আমি যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিলাম তাই অর্থ আসিল। সকলেই আপন আপন সুখের ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। সকলেই মনে করিল আমরা কর্ত্তা হইয়া সমুদায় করিলাম। ভিতরে ভিতরে কিরূপে কি ঘটিল কে ঘটাইল কেহ জানিতে পারিল না। ধর্ম্মের জন্য ধ্রুব রাজ্য পাইল; শত অত্যাচারেও প্রহ্লাদের কিছু হইল না। ভক্তকে বধ করিবার জন্য সমুদায় মনুষ্যমণ্ডলী সজ্জিত হইল, কত লোকে অপমান করিবার জন্য উদ্যত হইল, ঈশ্বরের সন্তানের অমঙ্গল সাধন করিবার জন্য কত আয়োজন হইল; কিন্তু পরিণামে বিপরীত ফল ফলিল। সূর্য্য যদি সমুদ্র জলে

নিঃক্ষিপ্ত হয়, সমুদায় সমুদ্র যদি শুকাইয়া যায়, সাধ্য কি ভক্ত সন্তানের কেহ অকল্যাণ সাধন করিতে পারে? যুগে যুগে এ কথা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে ভক্তের অমঙ্গল হইবে না, হইতে পারে না, অমঙ্গল নিশ্চয় অসম্ভব। সৃষ্টির সঙ্গে ভক্তের কল্যাণ সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। নদ, নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র, জীব, জন্তু, সকলে ভক্তের কল্যাণ সাধন করিবার জন্য নিয়ম বদ্ধ। প্রহ্লাদের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত কর অস্ত্র লাগিবে না, প্রকাণ্ড হস্তীর পদতলে ফেলিয়া দাও, হস্তী তাহাকে পদদ্বারা দলন করিবে না। ধ্রুব বনে গিয়া ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত, কিন্তু ব্যাঘ্র কখন তাহাকে বিনাশ করিবে না। ধ্রুব ও প্রহ্লাদের আখ্যায়িকা গল্প বটে, কিন্তু উহার ভিতরে নিগূঢ় সত্য আছে। পৃথিবী ভক্তের অকল্যাণ কিছুতে করিতে পারিবে না। অন্যের নিকটে যাহা ভয় ও মৃত্যু তাহা সাধকের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ। অত্যন্ত ভীষণ ব্যাপারও ভক্তকে ভয় করে। ঈশ্বর এ নিয়ম ঠিক করিয়া দিয়াছেন, ইহার অন্যথা কদাপি হয় না। এই নিয়মে সৃষ্টিকে আবদ্ধ করিয়া ভগবান্ সংসার চালাইতেছেন ও ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিতেছেন। তাঁহার হাতে কিছু করিতে হয় না। ব্রহ্ম কোথায় লুকাইয়া আছেন কেহ জানে না। তিনি শান্ত, সত্য শিব সুন্দর, পূর্ণ ব্রহ্ম নির্বিকার। তাঁহার কোন কার্য্য নাই, চিন্তা নাই। কি করিতে হইবে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত। জগতের যাহা হয় হউক, মরে মরুক, এ ভাবে তিনি নিশ্চিন্ত নহেন। সংসার নষ্ট হয় হউক, পরিবার রোগে আক্রান্ত হয় হউক, ইহা বলিয়া কত লোকে বিরক্ত ভাবে সন্ন্যাসী হইয়া অরণ্যে চলিয়া গেল। ঈশ্বর এ রূপ বিরক্ত নিশ্চিন্ত উদাসীন নহেন। তিনি মঙ্গল নিয়ম প্রতিষ্ঠা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। ভক্তের মঙ্গল হইবে, যথা নিয়মে মঙ্গল হইবে, অকস্মাৎ নহে, কিন্তু অনিবার্য্য নিশ্চিত বিধি অনুসারে, এই রূপ ব্যবস্থা করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা বিশ্বরাজ্য চালাইতেছেন। মানুষের ন্যায় তাঁহার সাময়িক চেষ্টা বা ব্যস্ততা নাই। তিনি নির্বিকার থাকিয়া নিত্যকাল সমভাবে সৃষ্টির যাবতীয় শক্তিদ্বারা কল্যাণ বিস্তার করিতেছেন। অন্ধ নিয়ম কিছু করে না, বিশ্বের স্বতন্ত্র শক্তিও কিছু করিতে পারে না। হঠাৎ কল্যাণ হয় না। নিত্য নিয়মে ব্রহ্ম প্রেমরাজ্য পালন করেন। সমু-

হার ঘটনাচক্র কল্যাণ বহন করিতেছে। কোন অন্ধকার গ্রামে বসিয়া এক জন প্রার্থনা করিল, তৎক্ষণাৎ তাহার অভাব পূর্ণ হইল। ঈশ্বর এক স্থান হইতে অপর স্থানে আসিয়া হস্তপ্রসারণ পূর্ব্বক রন্ধন করিয়া দিলেন এবং মানুষকে খাওয়াইলেন, এরূপ মনে করিও না। তিনি মানুষের মত এখানে ওখানে বেড়ান না। এ কার্য্য এক বার ও কার্য্য এক বার করেন না। ঈশ্বরের মঙ্গলময়ী শক্তি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। ঈশ্বর তোমার মুখে আমার মুখে প্রকাশ্যরূপে অন্ন তুলিয়া না দিয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের শক্তির ভিতর দিয়া অন্ন যোগাইতেছেন। ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, অথচ তিনি গূঢ় নিয়মে আমাদের সমুদায় অভাব মোচন করিতেছেন। নগর সহর দেশ গ্রাম সর্ব্বত্র তাঁহার কল্যাণের রাজ্য। শান্ত নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের পূজা করিব, অথচ তাঁহাকেই আমরা ঘরের লক্ষ্মী বলিয়া মানিব। বিশ্ব মধ্যে নিগূঢ় কল্যাণের কৌশলে কার্য্যের স্রোত নিয়ত চলিতেছে। সেই কল্যাণের কৌশল নিপীড়িত ভক্তকে সুখী করে ও সত্যকে জয়ী করে।

সেবকের নিবেদন।

রুচি।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার, ৩০ কার্ত্তিক, ১৮০২ শক।

শরীরে যেমন মনেও তেমনি অরুচি ব্যাধির লক্ষণ। শরীরকে রোগ হইতে রক্ষা করা যেমন উচিত, অরুচি হইতেও যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করা তেমনই উচিত। কেন না চিকিৎসা শাস্ত্রে অরুচি একটি রোগ এবং অনেক রোগ ও অনিষ্টের মূল বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। যদি ভাল বস্তুর প্রতি তোমার রুচি না থাকে তবে নিশ্চয় জানিবে বিকার উপস্থিত। হে আত্মন্! তুমি পরীক্ষা করিয়া দেখ, ধর্ম্মের প্রতি, পরলোকের প্রতি, ব্রহ্মপাদপদ্মের প্রতি তোমার অরুচি হইয়াছে কি না? যদি অণুমাত্র অরুচি হইয়া থাকে তোমার লক্ষণ ভাল নয়। প্রচারক হও আর বহুমানাস্পদ আচার্য্য হও, তোমার উচ্চ পদ মান সম্ভ্রম এ অনিষ্ট হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। অনেকে রুচির সহিত ধর্ম্ম আরম্ভ করিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া শেষে অরুচি জন্য ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দেয়। প্রথমাবস্থায় পূজা অর্চ্চনায় অনুরাগ থাকে, আকর্ষণ থাকে, কিন্তু দেখা যায় শেষে আর উহা তত প্রবল থাকে না। প্রতিদিন রুচি সহকারে উপাসনা ও নাম কীর্ত্তন করা সকলের ভাগ্যে হয় না। এসকল চির দিন ভাল লাগা অনেকের সম্বন্ধে দুর্ঘট। ধ্যান করিবার জন্য প্রবল ইচ্ছা, পুণ্যবান্ হইবার জন্য স্পৃহা, সত্যবাদী হইবার জন্য প্রগাঢ় রুচি, ইহা সকল ব্যক্তিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। ধর্ম্ম ও উপাসনাদির প্রতি রুচি চলিয়া যায় কেন? বাসনা, কামনা, স্পৃহা ও তৃষ্ণা বলবতী না থাকিলে বস্তুর প্রতি আকর্ষণ থাকে না। আকর্ষণ না থাকিলে

তৎপ্রতি অনুরাগ জন্মে না। ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া পাপ পরিহার করা হইল, ব্রহ্মসাধন করা হইল, নিয়মপূর্ব্বক প্রতিদিন উপাসনা করা হইল, অনুষ্ঠান করা হইল, সময়ে সময়ে একান্ত মনে পবিত্র হইবার জন্যও চেষ্টা করা হইল, সকলি হইল, কিন্তু উচিত মনে করিয়া হইল, আকর্ষণ বা অনুরাগে নহে। এ সকল ভাল লাগে বলিয়া যে কর তাহা নহে। যখন অরুচি হয় তখন অতি উৎকৃষ্ট উপাদেয় সামগ্রী আনিয়া উপস্থিত করিলেও রসনা তাহাতে আকৃষ্ট হয় না। প্রচুর ধন সম্পত্তি সম্মুখে রাখ, রোগী তাহা স্পর্শ করে না। সংসারে ইহা অনেক বার প্রমাণিত হইয়াছে, বাহিরে শুধু লোভের বস্তু থাকিলে আকর্ষণ হয় না। ভিতরে লোভ বাহিরে লোভের সামগ্রী, দুয়ের সংযোগে স্পৃহা উদ্দীপ্ত হয়। কেবল ঈশ্বরের উপাসনা করিলেই যে অভাব মোচন হইল তাহা নহে, ভাব চাই, অনুরাগ চাই, উপাসনার প্রতি আসক্তি স্পৃহা ও লোভ চাই। ইচ্ছা বিনা মোক্ষফল লাভ হয় না। লোভ বিনা ভোগ নাই। ধর্ম্মের আনন্দ বিনা তৎপ্রতি আকর্ষণ হইতে পারে না। আমরা যদি বর্ত্তমান অবস্থায় সশরীরে স্বর্গে গমন করি, স্বর্গ দেখিবামাত্র আমরা ঘৃণা করিয়া সংসারে ফিরিয়া আসিব। স্বর্গেও সুখের সম্ভাবনা নাই যদি অন্তরে স্বর্গসুখের স্পৃহা না থাকে। হাতে স্বর্গ পাইলেও আমরা উহা ফেলিয়া দিব যদি উহাতে সুখ বোধ না হয়। ধর্ম্মের প্রতি যদি আসক্তি না থাকে উহা আমরা বিষবৎ পরিত্যাগ করিব। যাহার রুচি নাই তাহার সম্মুখে মিষ্টান্ন রাখিলেও সে উহা পদ দ্বারা দলন করিবে। সেই রূপ বিকৃত আত্মা লইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলে, বৈকুণ্ঠকেও অধার্ম্মিক ব্যক্তি পদ দ্বারা দলন করিবে। বৈকুণ্ঠের প্রতি স্পৃহা না থাকিলে, তৎপ্রতি সমাদর কেন হইবে? অন্তরে যাহাতে ভাল বস্তুর প্রতি লোভ হয়, স্পৃহা হয়, এ জন্য সকলেরই চেষ্টা করিতে হইবে। পুণ্য স্পৃহণীয় বস্তু, ইহা সকলেরই পাওয়া আবশ্যক। রসনা চক্ষু হস্ত পদ হৃদয় মন ও সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত হয়, প্রলোভন পাপ পরাস্ত হয়, কোন প্রকার কুপ্রবৃত্তি কুবাসনা না থাকে, এ জন্য আমরা যে সকল সাধন করি তৎসমুদায় কঠোর সাধন, উহা আজও আমাদের সুখের ব্যাপার হয় নাই। যেমন আহারে সুখ, নিদ্রায় সুখ, তেমনি প্রার্থ-

নায় সুখ, ধর্ম্মসাধনে সুখ হওয়া উচিত। কেন হরি সঙ্কীর্ত্তনে তেমন আনন্দ হয় না? মনে কর কেহ রক্ত দিয়া ভ্রাতৃসেবা করিতে প্রস্তুত, কিন্তু তাহাতে তো সুখ মনে হয় না। ইন্দ্রিয়সংযম আজও অনেকের পক্ষে সুখদ হয় নাই। জিহ্বা কর্ত্তব্যজ্ঞানে অসত্যকথন হইতে নিবৃত্ত হয়, কিন্তু তাহাতে আনন্দ হয় না। অন্যের সুখ সম্পাদন করিলে, স্বীয় ঐশ্বর্য্য জগতের মঙ্গলের জন্য বিসর্জ্জন দিলে, সর্ব্বত্যাগী হইলে পুণ্য হইল, গৌরব হইল, কিন্তু এ সকল হৃদয়কে সুখে প্লাবিত করিতে পারিল না। প্রতিদিন ব্রহ্মের উপাসনা করিলে, চরিত্র শুদ্ধ করিলে, উপকার হইল, কিন্তু তদ্দ্বারা উপাসনায় রুচি হইল অথবা প্রত্যহ ব্রহ্মেতে আনন্দ বাড়িল, এ কথা সকলে বলিতে পারে না। বাধ্য হইয়া অরু-চিতে তুমি সাধন ভজন করিলে, যোগের অনুষ্ঠান করিলে, পূজা করিলে, সত্য কথা বলিলে, বহু কষ্টে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিলে, কিন্তু কিছুতেই আনন্দ হইল না, এ অবস্থা স্পৃহণীয় নহে। অনেক সময়ে উৎকৃষ্ট উপাসনা হইয়াছে, অথচ সুখ হয় না। এক বার আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখ কেন এই সুখ পাইলে না। হে ব্রাহ্ম ভাই, এ বিষয়ে তোমার দৃঢ় বিশ্বাস করা উচিত, যে ধর্ম্ম তুমি গ্রহণ করিয়াছ তাহার প্রথম হইতে শেষ বর্ণ পর্য্যন্ত সুধাময় ইহার বর্ণমালার প্রত্যেক বর্ণ হইতে সুধাক্ষরণ হয়। এ ধর্ম্ম যত দূর ব্যাপ্ত, কোথাও কষ্টদায়ক নহে। ঈশ্বর যেমন স্বর্গে বৈকুণ্ঠে নিত্য সুখ বিধান করেন, এ ধর্ম্মেও তিনি তেমনই নিত্য সুখ সঞ্চার করেন। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, পুণ্য উপার্জ্জন, উপাসনা, সাধন ভজন, সকলই ইহাতে আহ্লাদের হেতু। যদি আনন্দ না পাও, শীঘ্র পরীক্ষা করিয়া দেখ, কোথায় ব্যাধির মূল লুকাইয়া আছে।' সুখ না হইলে নিশ্চয়ই রোগ প্রচ্ছন্ন আছে। সত্যে সুখ পাইলে না, দয়াতে সুখ পাইলে না, বিপন্নের বিপদ নিবারণ করিয়া সুখী হইলে না, উপাসনা করিয়া ম্লান মুখে মন্দির হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিলে, অতি সুমিষ্ট ব্রহ্মসঙ্গীত শ্রবণেও জীবনভূমিতে সুখের স্রোত প্রবাহিত হইল না, বহু আয়াসে নাসিকা মুখ টানিয়া ব্রহ্মধ্যানে প্রবৃত্ত হইলে, ধ্যানে চিত্ত আকৃষ্ট হইল না, মন্দিরে আসিয়া পাপ স্মরণ করিয়া কান্দিয়া অস্থির হইলে, কিছুমাত্র

আনন্দ লাভ হইল না, এরূপ অবস্থায় কাহার থাকিতে ইচ্ছা হয়? অন্তরে তৃষ্ণা থাকিলে ঈশ্বর ও পুণ্যে কি চিত্ত সুখী হয় না? তৃষ্ণার সময়ে যখন জল পান কর তখন কি তৃপ্তি হয় না? এই জীবনে যত বার তৃষ্ণার সময় জলপান করিয়াছ তত বার সুখী হইয়াছ। যদি বল বার বার জল খাইয়াছি বলিয়া এবার তৃষ্ণায় জল মিষ্ট লাগে নাই, তবে মিথ্যা কথা বলিলে। স্বাভাবিক অবিকৃত অবস্থায় লক্ষ বার তৃষ্ণার সময়ে জল পান করিলেও পুনরায় জলপানের সময় তেমনি তৃপ্তি অনুভব হইবে। তৃষ্ণা থাকিলে জলে অরুচি কখন হইতে পারে না। সহস্র বার মাকে ডাক, জননীকে স্মরণ কর, ডাকিলেই, স্মরণ করিলেই প্রাণ শীতল হইবে। মার নামে কোন্ সন্তানের কবে অরুচি হইয়াছে? শরীর যখন রোগে আক্রান্ত, জিহ্বা যখন জ্বরবিকারে বিকৃত, তৃষ্ণা নাই, তখন জল পান করিলে কিছুতেই সুখ হইবে না। যদি তৃষ্ণা না থাকে স্বয়ং ব্রহ্মও সমক্ষে বসিয়া থাকিলে তাঁহাতে সুখ বোধ হইতে পারে না। রসনা কি প্রকারে হরিনামের সুধাস্বাদ অনুভব করিবে যদি রুচি না থাকে, বাসনা না থাকে? তৃষ্ণা না থাকিলে জলে ডুব দিয়া থাকিলেও সুখী হওয়া যায় না। জলের আস্বাদ লাভের জন্য তৃষ্ণা থাকা নিতান্ত আবশ্যক। সুন্দরতম বস্তুও সুখ দিতে পারে না যদি তজ্জন্য স্পৃহা না থাকে। পুণ্যের জন্য বাসনা চাই, চিদানন্দের জন্য লালসা চাই। সত্যের জন্য যে ব্যক্তি লালায়িত সত্য কথনে তাহার কত আনন্দ! সে এই ভাবে, আজ আমি দশটি ঘন্টা সত্য কথা বলিয়াছি, আহা আমি সত্যবাদী হইয়াছি, সম্পূর্ণরূপে মিথ্যার সঙ্গে যোগ কাটিয়াছি, আজ মুহূর্ত্তের জন্যও সত্যের পথ হইতে পদস্খলন হয় নাই। আহা! আজ আমি কেমন সুখী! ধনবান্ সম্রাট্ অপেক্ষাও আমার অধিক সুখ, কেন না আমি সত্যধনে ধনী। মানুষ যত এইরূপ ভাবিবে ততই সত্যের প্রতি স্পৃহা হইবে। তৃষিত ব্যক্তির ন্যায় দিন দিন সে সত্যের প্রতি সতৃষ্ণ হইবে। তুমি যদি যথার্থ দয়ার্দ্র হও, যদি কোন গরীবকে ছেঁড়া কাপড় দিতে পার, এক মুষ্টি অন্ন দিতে পার, বাড়ীতে সংসারের ব্যয় করিয়া যাহা থাকে তাহা হইতে দুটি পয়সা দান করিতে পার, রোগী ব্যক্তিকে ঔষধ দিয়া রোগ

মুক্ত করিতে পার, তুমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবে। তুমি এই ভাবিবে, আহা! এই সামান্য শরীর দিয়া ভ্রাতার উপকার করিতে পারিলাম, ভগিনীর সেবা করিতে পারিলাম!" এই ভাবিতে ভাবিতে দয়ার স্পৃহা আরো বৃদ্ধি হইব। কিসে পরের মঙ্গল করিতে পার তজ্জন্য প্রাণ ছট্ ফট্ করিবে। সত্যের জন্য দয়ার জন্য তৃষ্ণা ক্রমে খুব বলবতী হইয়া মানুষের মনকে অস্থির করে। অসহ্য অস্থিরতা ও ব্যাকুলতার পর সেই পরিমাণে তৃপ্তি ও আনন্দ হয়। একা সত্যসাধনে দয়াসাধনে আনন্দ, আবার দশ জন বন্ধুতে মিলিয়া সাধন করিলে আরো কত আনন্দ! পরস্পরের মুখপানে তাকাইয়া দেখ, তোমাদের কয় জন সত্য কথা বলিয়া সুখ পায়, সত্যেতে আমোদ করে? পরসেবা করিয়া কয় জনের মন আনন্দ রসে প্লাবিত হয়? ভাই ভগিনীর সেবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে হইলে এত স্পৃহা চাই বাসনা চাই যে এক দিন সেবা করিতে না পারিলে অত্যন্ত দুঃখ উপস্থিত হইবে। হায়! অদ্যকার দিন বৃথা গেল, আজ কাহারও অমঙ্গল দূর করিতে পারিলাম না, কাহার সেবা করিতে পারিলাম না, রোগীকে ঔষধ দিয়া তাহার রোগ নিবারণ করিতে পারিলাম না, অনাথিনী বিধবা বা অনাথ শিশুর অন্নোপায় করিতে পারিলাম না, ভ্রান্তকে সৎপথে আনিবার জন্য কিছু সাহায্য দিতে পারিলাম না,—দয়াতে আকুলিত হৃদয় এইরূপে খেদ করে। সে হৃদয় সদা অবকাশ ও সুযোগ অন্বেষণ করে কখন কি উপায়ে পরের পদ সেবা করিবে। এত ব্যাকুলতার পর দয়া চরিতার্থ হইলেই অন্তরে বিমলানন্দ উথলিত হয়। কি সত্যসাধন কি মঙ্গলসাধন দুয়েতেই তৃষ্ণা চাই। তৃষ্ণা থাকিলে সাধনে উল্লাস হইবে, নতুবা অরুচির সঙ্গে অধর্ম্ম বৃদ্ধি হইবে। আমি সত্য বাদী হইয়াছি মনে হইবা মাত্র আনন্দাশ্রু নিপতিত হইবে। আমার এই অসার শরীরের রক্ত দিয়া পরের পদ ধৌত করিতে সক্ষম হইলাম, এই হাত বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিল, রোগীকে ঔষধ দান করিল, ইহা ভাবিবা মাত্র চক্ষু হইতে আনন্দধারা পড়িবে। যে পরিমাণে প্রাণের তৃষ্ণা, যে পরিমাণে বাসনা ও ইচ্ছা, সেই পরিমাণে আনন্দ। বিষয়ী যেমন ধনের জন্য সংসারের কষ্ট বিমোচনের জন্য ব্যাকুল অন্তরে চেষ্টা করে, সাধকও ষড়রিপুদমনের জন্য তেমনি যত্নবান্। সমুদায়

দিনের পর সন্ধ্যার সময় যখন ব্রহ্মসাধক দেখেন, হৃদয় শুদ্ধ ও নির্ম্মল, কোন অবিশুদ্ধ ভাব তাহাতে স্থান পায় নাই, তখন সমস্ত চিত্ত আনন্দে প্লাবিত হয়। চিত্তশুদ্ধি হইলে সুখ হয়, আবার সুখ হইলে নির্ম্মলতা বৃদ্ধি হয়। যেখানে শুদ্ধচরিত্রতার সুখ নাই, সেখানে ইন্দ্রিয়সুখে লোক হাসে বটে কিন্তু সেই হাসির ভিতরে যম বসিয়া আছে। পাপের হাসি মৃত্যুর লক্ষণ। যথার্থ আনন্দ পুণ্যেতে। পুণ্যসাধনের সঙ্গে সঙ্গে সুখ বৃদ্ধি হওয়া স্বাভাবিক। যদি না হয় কোন অস্বাভাবিক গ্লানি বা ব্যাধি নিশ্চয়ই ভিতরে আছে। পুণ্য ও দয়াসম্বন্ধে যেমন পূজা উপাসনাসম্বন্ধেও তেমনই তৃষ্ণা আনন্দের হেতু। বাসনা না থাকিলে উপাসনা সিদ্ধ হয় না। কেবল ব্রহ্মমন্দিরে আসিলে হইবে না। হরিনামধ্বনিতে শরীর রোমাঞ্চিত হওয়া চাই, আনন্দোদয় হওয়া চাই। যদি ব্রহ্মপূজার জন্য তোমাদের প্রবল ঔৎসুক্য ও স্পৃহা থাকে তাহা হইলে এখানে আসিয়া তোমরা অত্যন্ত সুখী হইবে। রাজা রাজ্য পাইলে তাঁহার কত আনন্দ, বিষয়ী প্রচুর ধন লাভ করিলে তাহার কত আহ্লাদ, ধর্ম্মে কি তোমাদের তদপেক্ষা অধিক আনন্দ হইবে না? সামান্য ধনের জন্য তাহাদিগের যে লোভ তোমরা পরম ধন লাভের জন্য কি তদপেক্ষা অধিক লোভ করিবে না? সপ্তাহের পর আজ বন্ধুগণের সঙ্গে ব্রহ্মমন্দিরে সাক্ষাৎ হইবে, তাঁহাদিগের সঙ্গে প্রাণে প্রাণে মিলিত হইয়া একত্র ঈশ্বরকে ডাকিব, ইহা ভাবিয়া কত সুখী হওয়া যায়। কিন্তু অনেকে এখানে আসিয়া কেবল আলোকের শোভা দেখিলেন, অর্গ্যান বাজিল তাহা শুনিলেন, কিন্তু উপাসনায় আনন্দ হইল না, চিত্তক্ষেত্রে সুখের ফুল ফুটিল না; ধ্যান করিলেন, প্রার্থনা করিলেন, সঙ্গীত শুনিলেন, কিন্তু মুখে আনন্দের লক্ষণ প্রকাশ পাইল না, কেহ পূজা করিয়া সুখী হইল না। কিন্তু যিনি বাটীতে বসিয়া ভাবিতেছিলেন, কখন সময় হইবে সকল ভাই ভগিনী মিলিত হইয়া ভক্তবৎসলকে দেখিব, তিনি মন্দিরে আসিয়া আরাধনা ধ্যান করিবামাত্র ব্রহ্ম দর্শন করিলেন এবং ব্রহ্মানন্দ লাভ করিলেন। যেমন আরাধনায় তেমনি ধ্যানে তৃষ্ণা থাকিলে কাতরতা থাকিলে মন প্রবল বেগে ধ্যানসাগরে ঝাঁপ দিয়া পড়িবে। তৃষ্ণায় কাতর ব্যক্তি যেমন

জল পাইলে হাপুস্ হুপুস্ করিয়া উহা পান করে তেমনি সতৃষ্ণ আত্মা যোগানন্দসাগরে ডুব দিয়া আগ্রহের সহিত অমৃত পান করে। তৃষ্ণাতুর হইয়া ধ্যান করিলে ধ্যানে অত্যন্ত সুখ হয়। বিনা তৃষ্ণায় বার বার মৃদঙ্গ বাজাও, হরিসঙ্কীর্ত্তন কর, আহ্লাদ হইবে না। কিন্তু এক বার ব্যাকুলহৃদয় হও, মৃদঙ্গ স্পর্শমাত্র শরীর মন পুলকে পূর্ণ হইবে। কখন সঙ্কীর্ত্তন করিব, কখন মৃদঙ্গের মধুর ধ্বনি শুনিব, এই ভাবিতে ভাবিতে যতই স্পৃহা বাড়িবে ততই দেখিবে মৃদঙ্গ হাতে স্পর্শ করিতে না করিতে একেবারে মন মাতিয়া যাইবে এবং হৃদয়ে আনন্দ উথলিয়া উঠিবে। বস্তুতই এরূপ হয়, ইহা মিথ্যা বা কল্পনা নহে। বাসনা থাকিলে বাসনা পূর্ণ হইবার সময় মন সুখোন্মত্ত হয়। যেখানে বাসনা নাই সেখানে অরুচি এবং নিরানন্দ। হে জীব, যদি সুখী হইবে বাসনা উদ্দীপন কর। বাসনা সুখের হেতু। হে ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছ সুখের জন্য, দিন দিন পবিত্র সুখে পবিত্র হইবার জন্য। ধর্ম্মের পথে ব্রহ্মচারী হইয়া যে ব্যক্তি দিন দিন সৎপ্রবৃত্তিসকল উত্তেজনা করে, কুবাসনা দগ্ধ করে, সাধু ইচ্ছা ও ব্রহ্মস্পৃহা এবং শুভ বাসনা পোষণ করে তাহার সুখের পরিসীমা থাকে না। প্রবল স্পৃহাতে গভীর আনন্দ, আবার বিচিত্র ধর্ম্মস্পৃহাতে বিচিত্র আনন্দ। যত বিষয়ে বাসনা ও রুচি, তত প্রকার সুখ। ধ্যান, প্রার্থনা, আরাধনা, সঙ্কীর্ত্তন, সাধুসহবাস, সৎপ্রসঙ্গ, গ্রন্থপাঠ, প্রকৃতিচিন্তা প্রভৃতি নানা প্রকার বিশুদ্ধ সুখ হৃদয়কে প্রফুল্ল করে। তোমরা স্বর্গীয় ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিতরে এই সকল সুখ সম্ভোগ কর। পাপ হইতে নিবৃত্ত হইলে, ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইলে, এখন আরো অগ্রসর হও। রুচির পথে অগ্রসর হইলে আরাধনা সুখের হইবে, পূজা অর্চ্চনা আনন্দকর হইবে এবং ব্রহ্মের ন্যায় সুখের বস্তু আর দেখিতে পাইবে না। ধর্ম্মে দুঃখ নাই, ধর্ম্মে একান্ত সুখের অবস্থা। সংসার ছাড়িয়া, দুঃখের ধর্ম্ম ছাড়িয়া, রুচির পথ অবলম্বন কর; ইহাতে সমুদায় কাম্যবস্তু ও সুখের বস্তু লাভ হইবে এবং সকলে এই পৃথিবীতেই দেবসুখ সম্ভোগ করিবে।

সেবকের নিবেদন।

জীবনগ্রন্থ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার, ৭ ই অগ্রহায়ণ, ১৮০২ শক।

যখন নববিধান স্বর্গ হইতে অবতরণ করিলেন, তখন তিনি স্বর্গীয় পিতার নিকটে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি পৃথিবীতে গিয়া কি শিক্ষা দিব, শিক্ষার মূল গ্রন্থ কি, এ বিষয়ে আমাকে উপদেশ দিন। ভগবান্ বলিলেন, " নববিধান, তোমার বিশেষ কোন পুস্তক অবলম্বন করিতে হইবে না। লোকের চরিত্র পুণ্য প্রেমে গঠন করিয়া জীবনগ্রন্থ হইতে ঘটনা-শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিবে এবং তদ্দ্বারা জগতে জ্ঞানালোক বিস্তার করিবে। জীবন হইতে জীবন জন্মিবে। তুমি দৃষ্টান্তের প্রমাণে সত্য প্রচার করিবে। তুমি পৃথিবীতে গিয়া মৃত পুস্তকের পরিবর্ত্তে জীবন্ত গ্রন্থ প্রচার কর, এই তোমার প্রতি অনুজ্ঞা। " নববিধান এই উপদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। পৃথিবীতে আসিয়া আজ্ঞা প্রচার করিলেন কোন বিশেষ পুস্তকের আধিপত্য থাকিবে না, বাইবেল কোরাণ বেদ পুরাণ সকল পুস্তকের উপরে ভক্তজীবনরূপ ধর্ম্মপুস্তক সমাদৃত হইবে, সর্ব্বত্র ঐ গ্রন্থ পূজিত হইবে। উহা পৃথিবীকে হরিপ্রেমলীলা জীবন্ত আকারে প্রদর্শন করিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা দিবে। মনুষ্যের নিকটে জীবনের তত আদর নাই, যত গ্রন্থের। পৃথিবীতে গ্রন্থপূজা অত্যন্ত প্রবল। গ্রন্থের পরাক্রম ও মহিমা বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু গ্রন্থের গৌরব জীবন থাকিতে হয় না। জীবন অবসান হইলে গ্রন্থের আদর। যত দিন ভক্তজীবনে হরি জীবন্ত ধর্ম্ম দেখান তত দিন উহাই

ঈশ্বররচিত বাইবেল কোরাণ বলিয়া আদৃত হইবে। মনে করিয়া দেখ, পুরাণাদি শাস্ত্রের প্রতি লোকের এত শ্রদ্ধা কেন? উহাতে ভক্ত-জীবন লেখা আছে বলিয়া। পুরাণের গৌরব এই জন্য যে এক সময়ে ভক্তেরা স্বীয় স্বীয় জীবনে যাহা দেখিয়াছিলেন তাহাই উহার ভিতরে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভক্ত জীবনের ঘটনা লিপিবদ্ধ হইলেই তাহা পুরাণ হইল। যখন ঘটনা ঘটে, যখন লোকে উহা চক্ষে দেখে, তখন উহা গ্রন্থবদ্ধ হয় না। তখন লোকে পড়ে না, দেখে। ঘটনাস্রোত ক্রমে ক্রমে বদ্ধ হইল, ইতিহাস কালক্রমে নিস্তব্ধ হইল। অভিনয় শেষ হইল, রঙ্গভূমি হইতে অভিনেতৃগণ অন্তর্হিত হইলেন। জীবনচরিত ইতিহাসে পরিণত হইল, তখন পুরাণের আরম্ভ হইল। গ্রন্থ জীবনের স্থান গ্রহণ করিল, মানুষের চরিত্র শাস্ত্রে পর্য্যবসিত হইল। প্রত্যক্ষ ঘটনা শ্রুতি স্মৃতি হইল। পূর্ব্বে যাহা চক্ষু দেখিল, এখন তাহা কলম লিখিল, বুদ্ধি বুঝিল। যাহা হউক, মূলশাস্ত্র জীবন, নববিধান এই গূঢ় কথা প্রকাশ করিলেন। এখন গ্রন্থের সময় নহে, জীবন পাঠের সময়, জীবন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের সময়। বর্ত্তমান বিধানে এই শুভ সংবাদ প্রচার হইল যে বেদ পুরাণ অপেক্ষা ভক্তজীবন বড়, উপদেশ অপেক্ষা চরিত্র বহুমূল্য। এখন যে আমরা পুস্তক চাই না, তাহা নহে। পূর্ব্বেও যেমন এখনও তেমনি পুস্তকের প্রয়োজন। ধর্ম্মগ্রন্থ না হইলে পৃথিবীতে ধর্ম্ম প্রচার হয় না। মূল গ্রন্থ না থাকিলে কোথা হইতে শ্লোকের ব্যাখ্যা হইবে, কি অবলম্বন করিয়া আচার্য্য বেদী হইতে উপদেশ দিবেন? মূলগ্রন্থ থাকিলে তবে তাহার টীকা হয়। তাহার ব্যাখ্যা হয় এবং সত্য প্রমাণিত ও বিস্তৃত হয়। ভ্রান্তের ভ্রম, অবিশ্বাসীর সংশয় ও পাপীর পাপ মোচনের জন্য গ্রন্থ চাই। নববিধান এক নূতন অভ্রান্ত ঋগ্বেদ পৃথিবীতে আবিষ্কার করিলেন। হে নববিধান, লোকে বলে তোমার গুরু নাই, গ্রন্থ নাই, বেদ নাই, বেদান্ত নাই, ঈশ্বররচিত কোন ধর্ম্মশাস্ত্র নাই, তবে তুমি কিরূপে লোকসমাজে জ্ঞান বিতরণ করিবে? কি দেখাইয়া জীব উদ্ধার করিবে? হে ব্রাহ্মগণ, তোমরা এ প্রশ্নের উত্তর, দেও লোকের আপত্তি ও উপহাস খণ্ডন কর। জীবন্ত দৃষ্টান্ত লোকের চক্ষের সম্মুখে ধারণ করিতে হইবে, জীবনরূপ বেদ বেদান্ত প্রস্তুত করিয়া মানুষের হাতে

দিতে হইবে। তোমাদের এক এক জনের জীবন পুস্তকরূপে লোকের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। আমাদের প্রত্যেকের জীবন ঋগ্বেদ, আমাদের জীবনই শ্রেষ্ঠ পুরাণ। কেন না আমাদিগের জীবনে দয়াময় হরি আপন প্রেমের লীলা দেখাইয়াছেন, এবং আমাদিগকে তাঁহার সাক্ষী করিয়াছেন। এ ধর্ম্মে অন্য সাক্ষী নাই, ঈশ্বর আমাদের জীবনকে সাক্ষী নিয়োগ করিয়াছেন। সময় হইয়াছে, হে ব্রাহ্মগণ, তোমরা আপন আপন জীবনপুস্তক প্রস্তুত কর এবং মুদ্রাঙ্কিত করিয়া সর্ব্বসাধারণের গোচর কর। পৃথিবী এই সকল কথায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া বলিতেছে, কি নববিধান অভ্রান্ত বেদ আনয়ন করিবে! হিন্দুধর্ম্ম কি ম্লান হইয়াছে? ঋক্ যজু সাম অথর্ব্ববেদ ও পুরাণাদি সমুদায়কে অতিক্রম করিয়া শাস্ত্রশূন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম জয়ী হইবে? ঋগ্বেদ অপেক্ষা কি নববিধান বড় হইবে? দেখ নববিধানকে সকলে উপহাস করিতেছে। হে ব্রাহ্মগণ, তোমরা ইহার মর্য্যাদা রক্ষা কর, তোমরা ইহার মুখ উজ্জ্বল কর, ঈশ্বরবাণীর যথার্থতা সপ্রমাণ কর। কোন পুস্তকের উপরে নির্ভর করিও না। এই নববিধানের জীবনপুস্তকের প্রাধান্য সর্ব্বত্র প্রচার কর। ভক্তজীবন ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম্মগ্রন্থ হইবে। অদ্য ব্রহ্মমন্দিরে এই ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ কর, শত শত বৎসর পরে তোমাদিগের জীবন ব্রহ্মপুরাণ ও ব্রহ্মবেদ বলিয়া গৃহীত ও আদৃত হইবে। যে বিধানে কোন প্রকার পুস্তক নাই, লোকে তাহাতেও পুস্তক অন্বেষণ করিবে। আমরা পুস্তক মানি না, তথাপি পৃথিবীর লোক আমাদিগের নিকট শাস্ত্র চাহিবে। অতএব হে ব্রহ্মোপাসকগণ তোমরা ত্বরায় জীবন গঠন কর। এখন গদ্য পদ্য গ্রন্থ রচনা কর, যেন তোমাদিগের জীবন পড়িয়া লোকে জীবন্ত ভগবানের মহিমা দেখিতে পায়। যদি আজ কাল কোথাও ভগবান্ পাপীর একটী প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া থাকেন, সহস্র লিখিত পুস্তক অপেক্ষা ঐ জীবন্ত ঘটনাটি মানুষের মনকে আকর্ষণ করিবে। প্রাচীন কালে কোথায় ভগবান্ কি লীলা দেখাইয়াছেন, সেই পুরাণ লইয়া এখন কি হইবে? এখন নূতন কথা, নূতন ব্যাপারের প্রয়োজন। আঠার শত বৎসর পূর্ব্বে অমুক সাধু অমুক স্থানে অমুক পাহাড়ে ঈশ্বরকর্ত্তৃক দীক্ষিত ও আদিষ্ট হইয়া শিষ্যগণকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং সত্য প্রচার করিয়াছেন, ইহা শুনিয়া বিশেষ কি লাভ

হইবে। আজ নিজের ঘরে নিজের কর্ণে শুনিতেছি ভগবান্ এই কথা বলিলেন, নিজ চক্ষে দেখিতেছি তিনি এই কর্ম্ম করিলেন। আজ অমুকের ঘরে লক্ষ্মী হইয়া সমুদায় সংসারের কাজ ঈশ্বর আপনি নির্ব্বাহ করিলেন, আপনি অন্ন পরিবেশন করিলেন, আপনি অন্ন দিয়া ক্ষুধা নিবারণ করিলেন। আজ অমুক ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়াছিল, ভগবান্ তাহার সমুদায় ভার নিজ মস্তকে গ্রহণ করিলেন, তাহার সমুদায় বিপদ্ ভঞ্জন করিয়া শান্তি প্রদান করিলেন। এ সকল নূতন কথা প্রকাশ হওয়া চাই। চক্ষে যাহা দেখা হইল লোকসমক্ষে বলা চাই। এই রূপে ঈশ্বর প্রমাণিত হইবেন, এই রূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের মুখ উজ্জ্বল হইবে। যদি পুস্তক আবশ্যক স্বীকার করিলে তবে প্রত্যেকে পুস্তক হইতে চেষ্টা কর। আমি বর্ত্তমান শতাব্দীতে পৃথিবীর একটি ধর্ম্মপুস্তক হইব, আমার চরিত্রে ক্ষমা সহিষ্ণুতা বিনয় নিরহঙ্কারের দৃষ্টান্ত দেখাইব, আমার জীবনসামবেদ ভবিষ্যতে কত লোকে সুমধুর স্বরে গান করিবে। আমাদিগের জীবনে গদ্যে পদ্যে লিখিত প্রত্যাদেশ দেখাইতে হইবে। আমরা কত দূর নিরহঙ্কারী বিনয়ী হইতে পারি, ঘোর বিপদে নিপতিত হইয়া ব্রহ্মের উপর একান্ত নির্ভর করিতে পারি ইহার দৃষ্টান্ত জীবনপুস্তকে বিবৃত করিতে হইবে। ব্রহ্মের আদেশ ঘোষণা করিবার জন্য অনেক গ্রন্থ অনেক পুস্তকের প্রয়োজন। বর্ত্তমান সময়ে নানা পুস্তক নানা পত্রিকা প্রচারের জন্য উদ্যোগ হইতেছে, তৎসংক্রান্ত আমার একটি প্রস্তাব আছে। পুস্তক প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তজীবন প্রচার করিলে একটি বিশেষ অভাব মোচন হইবে। নববিধানের মূল গ্রন্থ নাই, লোকের এই যে কুসংস্কার আছে তাহা আর থাকিবে না। লোকে যখন বলিবে, তোমাদিগের বেদ নাই, সর্ব্বাগ্রে জীবনরূপ মূল গ্রন্থ যেন তাহাদিগের হস্তে প্রদত্ত হয়। তোমরা সকলে জীবনের বৃত্তান্তসকল লিখিয়া সাধারণের এই অভাব মোচন কর। ছোট ছোট পুস্তক প্রচার করিতে তোমরা প্রবৃত্ত হইয়াছ তাহার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনবৃত্তান্ত প্রচারিত হউক। ব্রহ্মধামে যে মুদ্রাযন্ত্র আছে তাহাতে আপন আপন জীবনগ্রন্থ মুদ্রিত কর। যে কয়খানি হয় বিশুদ্ধ ভাষায় জীবনগ্রন্থ রচনা করিয়া ঈশ্বরের যন্ত্রে ছাপাইয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হউক, সকলে জানুক যে জীবন্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের

অভাব নাই। ক্ষমার তত্ত্ব, নীতির তত্ত্ব, উপাসনার তত্ত্ব, যোগের তত্ত্ব, ভক্তির তত্ত্ব, বিশ্বাসের তত্ত্ব, এই সকল তত্ত্বের এক একখানি গ্রন্থ বর্ত্তমান কালের বেদ পুরাণ নামে প্রচারিত হউক। এই সকল পাঠ করিয়া সকলের বিশ্বাস বৃদ্ধি হউক, সকলের পাপ তাপ নিবারণ হউক। মনুষ্যের জীবনই প্রকৃত ধর্ম্মপুস্তক, এই মত বুঝাইয়া দিয়া সকলের ভ্রান্তি দূর করা হউক। প্রত্যাদিষ্ট জীবন জীবন্ত সত্য প্রকাশ করে, ইহা প্রচার করিয়া সকলে নববিধানকে সাহায্য করুন। জীবন পুস্তকে মানুষের বুদ্ধিরচিত প্রবন্ধ লেখা নাই, কিন্তু কেবল হরির আশ্চর্য্য প্রেমলীলা। উহাতে মানুষকে উদ্ধার করিবার জন্য ভগবান্ যে সকল অলৌকিক ঘটনা সংঘটন করেন তৎসমুদায় প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত ও উজ্জ্বল অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। উহা পাঠ করিলে অবিশ্বাসী বিশ্বাসী হয়, নাস্তিক আস্তিক হয়, অভক্ত প্রেমিক হয়, এবং অসাধু সাধু হয়। এমন গ্রন্থ কি তোমাদের কাহারও নিকটে নাই? অবশ্য আছে। গুপ্ত জীবনরহস্য বাহির কর, লুক্কায়িত বেদ বেদান্ত প্রকাশ কর। ভক্তজীবনপুস্তকে প্রথমে যে উৎসর্গপত্র আছে, তাহাতে লিখিত আছে ঐ গ্রন্থ ব্রহ্মপাদপদ্মে উপহারস্বরূপ প্রদত্ত হইল। জীবন সমর্পণরূপ এমন উপহার, তিনি কি গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারেন? যে ব্যক্তির জীবনপুস্তকে ভক্তি শ্রদ্ধা বিনয় উৎসাহ যোগ জীবন্তভাবে প্রদীপ্ত রহিয়াছে, যে ব্যক্তির জীবন কেবল ঈশ্বরের প্রেমকীর্ত্তি প্রকাশ করিতেছে, তাহারই জীবন উপহার গ্রহণে পরমেশ্বর সদা উৎসুক। সেই ভক্তজীবন অমূল্য ধন, উহা দ্বারা পৃথিবীর অশেষ কল্যাণ হয়। ভক্তেরা যোগীরা আপন আপন জীবনে ঈশ্বরকে দেখিয়া যে সকল কথা বলেন তাহা সত্যের সাক্ষী এবং এজন্য ব্রহ্মের অত্যন্ত আদরণীয়। এই গ্রন্থ উৎকৃষ্ট লাল কালীতে মুদ্রিত। কাল অক্ষরে ইহা ছাপা হয় না, কিন্তু ভক্তের শোণিতে ঈশ্বরের কথা মুদ্রিত হইয়া থাকে। জীবনের ঘটনা অন্য কালীতে লেখা হইতে পারে না। সামান্য কালীতে সামান্য কাগজে প্রত্যাদেশের কথা অঙ্কিত হইতে পারে না। হৃদয়ের জীবন্ত তেজস্বী রক্ত ভিন্ন তেজস্বী হরিতত্ত্ব লেখা যায় না। ঈশ্বরের নাম ও তাঁহার শাস্ত্র লিখিবার একমাত্র কালী জীবের

রক্ত। তোমাদের জীবনের চারি বেদ রক্ত দিয়া লেখ, তবেতো উহা জীবন্ত ও জীবনপ্রদ শাস্ত্র হইবে। যত সুখ সম্পৎ জ্ঞান ধর্ম্ম আমরা ঈশ্বরের নিকট লাভ করিয়াছি তাহা নির্ম্মল রক্ত দিয়া প্রকাশ করিতে হইবে, রক্ত দিয়া সত্য প্রমাণ কবিতে হইবে, রক্ত দিয়া ভগবানের মহিমা মহীয়ান করিতে হইবে। আপনার রক্ত দিয়া যাহা লিখিবে, লোকের নিকটে তাহাই চিরাদৃত হইবে। ভক্তরক্তে ঈশ্বর পৃথিবীর পাপ ধৌত করেন। কেবল মুখের কথায় জগতে সত্য সপ্রমাণ হয় না। রসনা সত্যের সাক্ষী হইতে পারে না। যে রক্ত দেয় না সে কেবল বক্তৃতা করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারে না। যদি পৃথিবীর উদ্ধারের পথ প্রমুক্ত করিতে চাও, সতেজ রক্তে জীবন্ত ধর্ম্ম কথা লিখিয়া প্রচার কর। জীবনের সমুদায় ঘটনাগ্রন্থ রক্তবর্ণ অক্ষরে লিখিবে। বুদ্ধির কাল কালীতে আপনার মত একটিও লিখিবে না, কেবল ব্রহ্মের শ্রীমুখের বাণী শোণিতাক্ষরে লিখিবে। একটী একটী ঘটনা একটি একটি শ্লোক। সেই শ্লোক পাঠমাত্র শরীর রোমাঞ্চিত হইবে, নূতন জীবনের সঞ্চার হইবে, লেখক এবং পাঠক উভয়েই কৃতার্থ হইবে। সহস্র গ্রন্থপাঠ করিলেও ঐ একটি শ্লোকের তুলনা হয় না। ঈশ্বর কোন্ কোন্ ভক্তের জীবনে বর্ত্তমান শতাব্দীতে কবে কি করিয়াছেন এই সকল পুস্তকে তাহা বিস্তৃতরূপে লেখা আছে। উহা দেখিবামাত্র সকলে বুঝিতে পারিবে ঈশ্বর কেমন জীবন্ত জলন্ত ভাবে অবিশ্বাস ও অধর্ম্ম বিনাশ করিতেছেন। ঈশ্বরের সাহায্য বিনা কিছুই হয় না, ইহা সকলে বিলক্ষণ জানিবে। আচার্য্যেরা ব্রহ্মমন্দিরে এই সকল পুস্তক হইতে ঘটনাশ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিবেন, তচ্ছ্রবণে উপাসকমণ্ডলীর রোমহর্ষণ হইবে। শুষ্ক নির্জীব বেদ বেদান্ত অপেক্ষা জীবনশাস্ত্র অধিক ফলপ্রদ হইবে। এ সকল গ্রন্থ আবার হৃদয়রঞ্জন। ইহা সচিত্র। মনুষ্য স্বভাবতঃ সচিত্র পুস্তক দেখিতে উৎসুক। ভক্তের জীবনে যে কেবল ঘটনা ও প্রেমতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে তাহা নহে; স্থানে স্থানে উৎকৃষ্টচিত্র সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। ব্রহ্মের ভূমা আকাশমূর্ত্তি কিরূপ যদি আঁকিয়া দিতে পার এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে টীকা ব্যাখ্যান সংযুক্ত কর, তাহা হইলে জগতের নিকটে উহার অত্যন্ত আকর্ষণ হইবে। গৃহলক্ষীর

মূর্ত্তি, যোগেশ্বরের মূর্ত্তি, স্বর্গীয় ভক্তগণের মূর্ত্তি, পৃথিবীতে বৃক্ষতলে যোগী নিস্তব্ধ ভাবে ধ্যানে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন, ভক্ত নদীতটে সায়ংকালে একতারা বাজাইয়া নামগান করিতেছেন, এ সকল মূর্ত্তি চিত্রিত করিতে হইবে। দশ জন ভক্ত একত্র মিলিত হইয়া ব্রহ্ম পূজা করিলেন, এক সময়ে ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া সকলের নিকট প্রদীপ্ত হইল, ইহার ছবি অঙ্কিত করিতে হইবে। সকলে আপন আপন জীবন পুস্তক দেখ, উহাতে বিচিত্র চিত্র দেখিয়া মোহিত হইবে। নববিধানের গ্রন্থ দৃষ্টান্তের গ্রন্থ। উহাতে তত্ত্ব কথা আছে, আবার ছবি দ্বারা উহা প্রমাণিত। উহাতে জীবন্ত বিধান বর্ণিত ও চিত্রিত, সুতরাং ঈশ্বরের লীলার খুব উজ্জ্বল সচিত্র বর্ণনা দেখিয়া লোকে সহজে বুঝিবে এবং মুগ্ধ হইবে। ব্রহ্মভক্তগণ, তোমরা এমন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাইয়াছ, সকলের নিকট উহা প্রকাশ কর। তোমরা গোপনে যাহা দেখিয়াছ যাহা শুনিয়াছ নির্ভয়ে রাজপথে দাঁড়াইয়া লোকের নিকটে তাহা প্রকাশ করিয়া বল। উপাসনার ঘরে যাহা দেখিয়াছ, শুনিয়াছ, ছাদের উপরে উঠিয়া তাহা ঘোষণা কর। কুড়ি বৎসর অন্তরে অন্তরে যাহা চাপিয়া রাখিয়াছ তাহা আর চাপিয়া রাখিবার সময় নাই। নববিধান উদিত হইয়াছেন, এখন আর তোমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পার না। ব্রহ্ম যাহার সম্বন্ধে যাহা করিয়াছেন সকল প্রকাশ করিয়া বল। কে কে পুস্তক লিখিবেন একেবারে স্থির করিয়া ফেলুন। হরিকথামৃত লিখিয়া হরির দয়া প্রকাশ করিয়া গ্রন্থ খানি রচনা করিতে হইবে এবং তাহাতে ছবি আঁকিয়া দিয়া আরও মনোহর করিয়া প্রকাশ করিতে হইবে। সমুদয় গ্রন্থ প্রকাশ হইলে, সমুদয় ছবি তাহাতে আঁকিয়া দিলে সকলে আদরের সহিত উহা গ্রহণ করিবে।

সেবকের নিবেদন।

ইচ্ছাযোগ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

১৪ অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৮০২ শক।

যেখানে যোগধর্ম্ম সেইখানে বিলীন হইবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। যোগ এবং লয় বাস্তবিক একই। সাধনের আরম্ভে যোগ, পরিণামে লয়। যে স্থানে যে লোকের মধ্যে এই যোগের আরম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই স্থানে সেই লোকের মধ্যে কালক্রমে লয়ের ভাব প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। যাহারা যোগ ধরিয়াছে তাহারা নিশ্চয়ই ঈশ্বরেতে লীন হইবে। যোগের অর্থ এই যে দুই বস্তু একত্র হইয়া এক অপরের মধ্যে বিলীন হয়। হিন্দু কিম্বা অন্যান্য যে ধর্ম্মে যোগের তত্ত্ব আছে তাহাতেই জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যের কথা আছে। হিন্দুধর্ম্ম কি বলে তাহা তোমরা সকলেই জান। ইহার অদ্বৈতবাদ, "আমি ব্রহ্ম" সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। খ্রীষ্টধর্ম্মের মূলেও দেখিতে পাই "আমি ও আমার পিতা একই।" হিন্দু ও খ্রীষ্ট ধর্ম্ম আপাততঃ লোকের নিকট বিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য। একটি ধ্যানের ধর্ম্ম, আর একটি কর্ম্মের ধর্ম্ম। এ দেশের ঋষি ধ্যানশীল। ঈশা ও তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে কর্ম্মের প্রাদুর্ভাব। কিন্তু কি আশ্চর্য্য। দুয়ের ভিতরেই ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইবার কথা। দুয়েতেই যোগের লক্ষণ দেখা যায়। দুয়েতেই জীব ও পরমাত্মার ঐক্য, দুয়েতেই পরমাত্মাতে জীবের লয়। হিন্দু ঋষি ও নীতিপরায়ণ সাধুশ্রেষ্ঠ ঈশা এ দুয়ের সাধনের আরম্ভে ভিন্নতা, কিন্তু ক্রমে ক্রমে ঐক্য ও সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। আর্য্য ঋষি যোগের প্রারম্ভে জনকোলাহল হইতে কার্য্যক্ষেত্র

হইতে অবসৃত হইয়া গিরিশিখরে অথবা বৃক্ষতলে বসিয়া ধ্যান করেন এবং ক্রমে সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হন। চক্ষু নিমীলন ও ইন্দ্রিয় নিবৃত্তি তাঁহার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। অবশেষে জলবিন্দু অনন্ত সাগরে লীন হইল। যত ক্ষণ সাধনের অবস্থা, শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের অবস্থা, তত ক্ষণ ঋষি জীব ও পরমাত্মার ভিন্নতা বুঝিতে পারেন, কিন্তু চক্ষু মুদিত করিয়া থাকিতে থাকিতে যখন সমাধি উপস্থিত হয়, তখন পরমাত্মাও নাই জীবাত্মাও নাই, বোধ হয়, সকলই একাকার নিরাকার, অকূল জ্ঞানসমুদ্রে জীবাত্মা বিলীন। এ অবস্থাতে বিন্দুমাত্র ব্যবধান বা ভিন্নতা অনুভূত হয় না। জ্ঞানেতে শক্তিতে প্রেমেতে আনন্দেতে ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের অভেদ হইয়া গেল। এ অবস্থা অতি গভীর ও নিগূঢ়। যেখানে জীব আপনার স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতা অনুভব করিতে না পারিয়া ব্রহ্মেতে ঐকান্তভাবে স্থিতি করিল, সেখানে ধ্যান ও যোগ সম্বন্ধে দুয়ের মধ্যে একতা শব্দ ব্যবহার হইতে পারে, কিন্তু যে ঋষি হিন্দু ঋষির ধ্যানের পন্থা অবলম্বন করিলেন না, অন্য প্রকার সাধনের অনুসরণ করিলেন, তিনি কেন বলিলেন, "আমি এবং আমার পিতা এক ?" এই কথা বলিয়া কি তিনি হিন্দু ঋষিগণের সঙ্গে এক হইলেন ? আর্য্য ঋষি পিতা পুত্র মানেন না, কেবল সাগরের সঙ্গে জলবিন্দুর সম্পর্ক মানেন। জীব পরমাত্মাতে বিলীন হওয়াতে দুয়ের একতা বুঝিলাম, কিন্তু পিতা পুত্রের সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকাতে দুয়ের ঐক্য কিরূপে সম্ভব হইবে ? আর্য্য ঋষি ব্রহ্মসাগরে প্রবিষ্ট হইলেন, জীব ধ্যান করিতে করিতে আপনাকে ব্রহ্মেতে হারাইলেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ঈশার বক্ষ ভেদ করিলে কি এইরূপ ধ্যানযোগ দেখিতে পাওয়া যায় ? সেখানে ঈশ্বর ও জীব ভিন্ন। তবে পিতা ও পুত্র এক হইল কি প্রকারে ? এখানে কি যোগ হইতে পারে ? হাঁ, এখানেও যোগ আছে। ঈশার ধর্ম্মও মূলে যোগের ধর্ম্ম। কিন্তু হিন্দু ঋষিদিগের যোগ হইতে এ যোগ স্বতন্ত্র। এ যোগ ইচ্ছাযোগ, কর্ত্তৃত্বযোগ। অন্তরে এক ইচ্ছা, ইচ্ছাতে ইচ্ছা বিলীন। এখানে স্বেচ্ছার বিনাশ। ইচ্ছাযোগ কি না স্বেচ্ছাসংহার, স্ব ইচ্ছাকে বিদায় দিয়া ব্রহ্মের ইচ্ছাতে জীবের ইচ্ছা বিলীন করা। যেমন আত্মা ধ্যানের সময় পরমাত্মাতে নিমগ্ন হয় ; তেমনি

কার্য্যেতে জীব ইচ্ছা পরমাত্মার ইচ্ছাতে বিলীন হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতে জীব যখন ভ্রষ্ট হয়, তখন সে পাপ করে; লোভ মোহে তখন সে কলঙ্কিত হয়। ভ্রষ্ট ইচ্ছা ব্রহ্মের কাছে আসিতে পারে না, ঈশ্বরকে কর্ত্তা বলিয়া সে স্বীকার করিতে চায় না। এই ইচ্ছাকে শুদ্ধ করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সংযোগ করাকে ধর্ম্ম বলে। চিত্তশুদ্ধির মূলে কেবল স্বার্থনাশ। ঈশ্বরের ইচ্ছা যদি জয়ী হইল স্বেচ্ছা আর থাকিল না। পূর্ব্বে ইচ্ছার পূর্ব্বে একটি অতিরিক্ত বর্ণ ছিল "স্ব," সেটি আর রহিল না। আমার ইচ্ছায় আমি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতাম, এই যে আমি আমার তাহা একেবারে চলিয়া গেল। স্ব বিবর্জ্জিত একমাত্র শূন্য ইচ্ছা রহিল, অর্থাৎ ব্রহ্মের ইচ্ছা। তাঁহার ইচ্ছা জীবের সমস্ত ইচ্ছাকে গ্রাস করিল। যত ক্ষণ আমার ইচ্ছা আছে, তত ক্ষণ সে ইচ্ছা আমাকে সংসারের দিকে টানিবে, ঈশ্বরের দিকে যাইতে দিবে না। "আমি" রজ্জুতে আমাদের জীবনতরী সংসারঘাটে বদ্ধ রহিয়াছে; ঐ রজ্জু কাটিলেই নৌকা ব্রহ্মজলধিতে মগ্ন হইবে। সম্পদের ইচ্ছা সুখ সমৃদ্ধির ইচ্ছা, এইরূপ নানাবিধ সাংসারিক ইচ্ছা ও পাপ কলঙ্কে পূর্ণ নৌকা ঘাটে বদ্ধ ছিল। স্বেচ্ছারজ্জু কাটিবামাত্র নৌকা ঘুরিতে ঘুরিতে ব্রহ্মসাগরের তুফানে পড়িয়া ডুবিয়া গেল, চিহ্নও রহিল না। আর আমার তোমার রহিল না। পুত্রের ইচ্ছা পিতার ইচ্ছা এক হইল, পিতার ইচ্ছাসাগরের তরঙ্গে পুত্র পরিচালিত হইতে লাগিলেন। তত ক্ষণ মনুষ্য পাপী যত ক্ষণ সে নিজে কর্ত্তা। দুর্ম্মতি না থাকিলে কেহ আপনাকে কর্ত্তা মনে করে না। কর্ত্তা হওয়াতে পাপের সৃষ্টি হয়। জীব নিজে পাপ ভিন্ন আর কিছু করিতে পারে না। ধর্ম্মের কর্ত্তা এক মাত্র ঈশ্বর। সেই কর্ত্তাকে ভজিলে, কর্ত্তার নিকট সম্পূর্ণরূপে প্রণত ও অধীন হইলে পাপ আর আসিতে পারে না। কর্ত্তার ইচ্ছা যিনি পালন করেন তিনিই শুদ্ধ তিনিই সুখী। আপনি কর্ত্তা এই ভ্রান্ত মতই সর্ব্বনাশের মূল। আমরা নিয়ত জীবনে দুটি কর্ত্তা স্থাপন করিতে চাই, ঈশ্বর ও আমি। উপাসনা ও সংসার সকল বিষয়েই দুই কর্ত্তা। যে ঘরে দুই কর্ত্তা দুই প্রভু সেখানে নিশ্চয় বিবাদ। আমরা প্রত্যেকে হৃদয়ে দুই কর্ত্তা স্থাপন করিয়া রাখিয়াছি। কতক গুলি টাকা আমার, কতক গুলি

ব্রহ্মের ; কতক গুলি গুণ আমার, আর কতক গুলি গুণ তাঁহার। এই এই বস্তু আমার, এই এই বস্তু ব্রহ্মের। দুই জন কর্ত্তা স্থির করিয়া তালুক মুলুক, ধন সম্পৎ মহিমা ও গৌরব বিভাগ করিয়া লই। এরূপ বিভাগ যেখানে সেখানে কখন সুখের রাজ্য হয় না, কেবলই অশান্তি। বিবেকের সুখ এ অবস্থায় দুষ্প্রাপ্য। দেবাসুরের সংগ্রামে শান্তি ভাঙ্গিয়া যায়। গৌরব লইয়া ঈশ্বর ও জীবাত্মার বিবাদ উপস্থিত হয়। যেখানে দুই জনের কর্ত্তৃত্ব সেখানে সুখ সম্ভব নয়। কিন্তু যিনি যোগধর্ম্ম সাধন করিয়াছেন এবং ইচ্ছার শাস্ত্র জানেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহার ইচ্ছা কামনা বিষয় বাসনা বিলীন হইয়া এক ঈশ্বরের ইচ্ছা বলবতী হয়। তাঁহার সমুদায় জীবন সেই এক প্রবল ইচ্ছার অধীন হয়; সমুদায় বাসনা অভিলাষ ব্রহ্মেতে চরিতার্থ হয়। তিনি আপনার সমুদায় স্বত্বাধিকার পরিত্যাগ করেন। যোগদ্বারা তিনি আপনার সমুদায় ঈশ্বরের ইচ্ছাসাৎ করেন। ঋষির আত্মা ধ্যানযোগে যেমন পরমাত্মাতে বিলীন হয়, তেমনি সকল কার্য্য ঈশ্বরানুগত হইয়া করিলে বিবেকী কর্ম্মীর মনে ইচ্ছাগত যোগ হয়। তখন স্বেচ্ছা আর তিষ্ঠিতে পারে না। তখন আমার ইচ্ছায় আমি বেড়াইতে যাই না, আমার ইচ্ছায় আমি ধন উপার্জ্জন করি না, আমার ইচ্ছায় আমি সংসার করি না, আমার ইচ্ছায় কার্য্যালয়ে যাই না, আমার ইচ্ছায় মন্দিরে আসি না, ধর্ম্ম সাধন ও করি না, সকলই প্রভুর ইচ্ছা। যখন সাধকের জীবন এই যোগের অবস্থায় পরিণত হয়, তখন কি সংসার কি পূজা অর্চ্চনা সাধুসহবাস সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সম্পন্ন হয়। সাধু ঋষি বলিলেন "আমি এবং আমার পিতা এক"। তিনি যোগে ইচ্ছার ভিন্নতা বিনাশ করিলেন, যোগবলে স্বাধীনতা দ্বিধা উড়াইয়া দিলেন। নিজের কর্ত্তৃত্ব নাই। কর্ত্তৃত্বে আমি তুমি বুঝায়। আমি গান করি, আমি বক্তৃতা করি, আমি প্রচার করি, যতক্ষণ এই প্রকার ভাব থাকে, ততক্ষণ মানুষ ধার্ম্মিক হইতে পারে, কিন্তু সুখী হয় না, যোগী হইতে পারে না। যোগী হইলে আর আমি তুমি থাকে না। আমার কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইয়া যায়। অহঙ্কার আর স্বাধীন ইচ্ছা সমান। খাও দাও যাহা কিছু কর, উৎকৃষ্ট কি সামান্য কোন কার্য্য আমার ইচ্ছায় হয় না, এইরূপ বলিতে শিক্ষা

কর, দেখিবে পরিশেষে আর স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই। যেমন সন্তরণে সিদ্ধি। যে সাঁতার জানে না, সে হাত পা ছুড়িতে থাকে। ক্রমে যখন সাঁতারে সিদ্ধ হয়, তখন আর হাত পা ছুড়িতে হয় না, স্রোতে গা ভাসাইয়া সে চলিয়া যায়। এখানে যে সাঁতার দিতেছে সে কর্ত্তা নহে, স্রোতই কর্ত্তা, স্রোতে ছাড়িয়া দিলেই খুব সহজে সন্তরণ করা যায়। সন্তরণে দেহ সিদ্ধ হইলে যেমন স্রোতে আপনাকে ছাড়িয়া দিলে স্রোতের গুণে আর কোন ভয় থাকে না ভাবনা থাকে না, তেমনি ব্রহ্মইচ্ছার স্রোতে আপনাকে ছাড়িয়া দিলে অনায়াসে যোগের আনন্দে ভাসিয়া যাওয়া যায়। কখন কি হইবে তুমি বলিতে পার না, আমি বলিতে পারি না, কিন্তু এই জানি পুণ্য প্রেম আনন্দে ভাসিয়া চলিয়া যাইবে, কে লইয়া গেল কিছুই বুঝিতে পারিবে না। ব্রহ্মের ইচ্ছাস্রোতে এই ভাবে যিনি আপনাকে ছাড়িয়া দেন তিনি এই বলেন বিভু আমার সর্ব্বস্ব, আমি কিছুই নই, আমার সঙ্গে তাঁহার কোন বিরোধ নাই। এই ভাব যখন আর্য্য ঋষি প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি ধ্যানে মগ্ন হইয়া বিমলানন্দ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। আর এক ঋষি ইচ্ছাকে পবিত্র করিলেন, পুণ্যব্রতে ব্রতী হইয়া সিদ্ধ হইলেন, পরের সেবায় নিযুক্ত হইলেন, সর্ব্বদা জগতের কল্যাণকর কার্য্যে ব্যস্ত রহিলেন। এক জন ঋষি যোগানন্দ ভূমানন্দ লাভ করিলেন, আর এক ঋষি বিবেকসুখে মগ্ন হইলেন। এক জনের ধ্যানানন্দ, এক জনের ইচ্ছানন্দ। এক জন ধ্যানে সিদ্ধ, আর এক জন ইচ্ছাতে সিদ্ধ। যিনি ইচ্ছাতে সিদ্ধ তিনি সমুদায় দিন পরিশ্রম করিলেন, অথচ তিনি পরিশ্রমের বিকার, কার্য্যের অশান্তি, অনুভব করিলেন না। তিনি আপনাকে কর্ত্তা মনে করেন না, ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহার জীবন চলিতেছে, সুতরাং তাঁহার মন নির্ব্বিকার থেকে নিয়ত ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে। আমি টাকা আনিলাম আমি ধর্ম্ম প্রচার করিলাম, এ কুবুদ্ধি কুসংস্কার তাঁহার নাই। ইচ্ছাযোগে যোগী যিনি তাঁহার কোন দুর্ভাবনা নাই, নিজের জন্য কোন কষ্টকর চিন্তা নাই, তিনি সুখে সদা প্রভুর ইচ্ছা পালন করেন। তিনি আত্মসমর্পণ করিয়া ব্রহ্মপাদপদ্মে আপনার সকলি বিক্রয় করিয়াছেন, তাঁহার আর আপনার বলিয়া ভাবিবার কিছুই নাই। সকল প্রকার

হিতকর কার্য্যে তাঁহার নিষ্ঠা, কিন্তু সংসারী লোকের ন্যায় তিনি যোগ-ভ্রষ্ট হন না। সমাজসংস্কার, গৃহধর্ম্ম, অন্ধ খঞ্জকে দান, রাজ্যশাসন, বিজ্ঞানশিক্ষা, সাধুতাসঞ্চয়, আহার, নির্জ্জনসাধন, কার্য্যালয়ে দৈনিক কর্ম্ম নির্ব্বাহ, পরিশ্রম, জ্ঞানাভ্যাস, জীবের দুঃখমোচন, এবম্প্রকার সমুদায় বিষয়ে তাঁহার আশ্চর্য্য মনোযোগ, কিন্তু তিনি এ সকল কার্য্য আপনি কর্ত্তা হইয়া করিতেছেন এরূপ মনে করেন না। যিনি অহংজ্ঞানে কিছু করেন না তিনি বিশ্বাস করেন যে বল ক্ষমতা তাঁহার কাছে নাই, চক্ষু কর্ণ হস্ত তাঁহার অধিকারে নাই, তিনি কোন কার্য্যের কর্ত্তা নহেন। তিনি বলেন আমার প্রাণ তো এখন আমার নহে, সেই কর্ত্তার যাহা ইচ্ছা তাহাই হয়। সুতরাং এ অবস্থাতে কোন বিবাদ নাই, কলহ নাই। জীবন যেন ঋষির শান্তিনিকেতন। সহস্র বাধা বিপত্তির মধ্যে ব্যস্ততার মধ্যে তিনি থাকেন, অথচ তাঁহার অন্তরের যোগ কিছুতেই ভঙ্গ হয় না। তোমাদিগের সকলকে এই ইচ্ছাযোগে যোগী হইতে হইবে। আর্য্য ঋষির ন্যায় ধ্যানযোগে পরমাত্মাতে বিলীন হইবে, আবার সুপুত্র হইয়া ইচ্ছাযোগে পিতার সঙ্গে সম্মিলিত হইবে। পিতা পুত্রের ঐক্য নিতান্ত আবশ্যক। আমি আছি মাত্র, নামে আমি, কিন্তু যাহা কিছু সকলই ঈশ্বরের সম্পত্তি। সকলই তাঁহার ঐশ্বর্য্য। ঐশ্বর্য্য শব্দের যথার্থ অর্থ কি? যাহা ঈশ্বরের তাহাই ঐশ্বর্য্য। ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও ঐশ্বর্য্য নাই। মনুষ্যের ঐশ্বর্য্য বলা ব্যাকরণবিরুদ্ধ এবং সত্যবিরুদ্ধ। আমার সমুদায় ক্রিয়ার কর্ত্তা যদি আমি হইতাম, তবে আমার কর্ত্তৃত্ব থাকিত। কর্ত্তারই কর্ত্তৃত্ব। আমাতে কর্ত্তৃত্ব আরোপ ইহাও ব্যাকরণবিরুদ্ধ। আমি কর্ত্তা নই, তবে কেন লোকে আমাকে স্বাধীন বলে? ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বই আমার কর্ত্তৃত্ব, সুতরাং আমি তাঁহার অধীন। আমি বার ঘণ্টা চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ণ মাত্রায় পরিশ্রম করিলাম, বায়ুসেবন করিলাম, মাথার ঘাম পায়ে পড়িল, খুব ভ্রাতৃসেবা করিলাম, রসনাযোগে ব্রহ্মের মহিমা ঘোষণা করিলাম, সমুদায় শক্তিতে মার পদ সেবা করিলাম, পূজা ধ্যান আরাধনা করিলাম, কিন্তু আমার কোন কর্ত্তৃত্ব দেখিতে পাইলাম না। আপনি ঘোর কার্য্যের সাগরে পড়িয়াও আমি কর্ত্তা নহি। আর্য্য ঋষি ধ্যানে ঈশ্বরে যেমন বিলীন, তেমনি

সংসারের কার্য্যের ব্যস্ততা, পরিবারপালন, দুঃখীর দুঃখহরণ বিদ্যা উপার্জ্জন, ধর্ম্মবিস্তার সমুদায় কার্য্য সেই এক ইচ্ছাময়ের সঙ্গে ইচ্ছাযোগে সম্পন্ন হয়। যখন এরূপ হয়, তখন সাংসারিক সকল অবস্থাতে ঈশ্বরের ইচ্ছার পূর্ণতা হইতেছে দেখা যায় এবং সহস্র বিঘ্নের ভিতরে অন্তরে পূজার আনন্দ যোগের আনন্দ অনুভূত হয়। কালক্রমে যোগানন্দের ভিতরে ছোট ইচ্ছা বড় ইচ্ছাতে বিলীন হয়, পৃথিবীর ইচ্ছা স্বর্গের ইচ্ছাতে ডুবিয়া যায়। ইচ্ছা হয় আমরা সকলে আপন আপন ইচ্ছাকে প্রভুর ইচ্ছাতে বিলীন করি। একেবারে স্বেচ্ছাচারিতা ছাড়িয়া ঈশ্বর-সর্ব্বস্ব হই। ইচ্ছা হয় জগজ্জননী মাকে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার পদতলে সমুদায় বাসনা সমুদায় অভিলাষ বিসর্জ্জন করি। ঈশ্বরেতে আমাদের ইচ্ছা বিলীন করাই ব্রহ্মের বৈকুণ্ঠধাম, মোক্ষধাম। ঈশ্বরেচ্ছার অনুগত হইলেই জীবের পবিত্রতা এবং শান্তি হইবে।

সেবকের নিবেদন।

সয়তানবাদ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

২১ অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৮০২ শক।

হে ব্রাহ্মসমাজ, সয়তান অস্বীকার করাতে তোমার কি ক্ষতি না লাভ হইয়াছে? তুমি আমাকে বল, তুমি যে সয়তানবাদ পরিবর্জ্জন করিলে, ইহাতে কি তোমার বিশেষ ইষ্ট সাধন হইল, না ইহাতে অনিষ্ট হইল? প্রত্যেক ব্রাহ্মকে জিজ্ঞাসা করি, হে ব্রাহ্ম, তুমি সয়তানরূপ দৈত্য, দানব ভূত, পিশাচ, রাক্ষসকে মান না, না মানিয়া তোমার ধর্ম্মোন্নতিসম্বন্ধে ক বিশেষ সুযোগ হইয়াছে? সয়তান কে যে তাহাকে আমরা বিশ্বাস করিব? সে কে? এক কৃষ্ণবর্ণ পাপকলঙ্কিত ভয়ঙ্কর দুরাচার দানব নরকে বসিয়া আছে। নিয়ত সে তাহার দুরভিসন্ধি ও ধূর্ত্ত ব্যবহারের পরিচয় দিতেছে। ছলে বলে কৌশলে সে মনুষ্যের সর্ব্বনাশ করিতেছে, নর নারীকে সর্ব্বদা নরকের দিকে টানিতেছে। নরক হইতে পৃথিবীতে আসিয়া প্রত্যেক গৃহস্থ, বড় লোক, ছোট লোক, যুবা বৃদ্ধ, স্ত্রী পুত্র, ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ, সকলের মধ্যে সেই অসুর লুকাইয়া বাস করিতেছে। গোপনে বসিয়া জীবের মনের মধ্যে সে এমন দুষ্ট বুদ্ধি ক্রমে উৎপাদন করে, অসৎ পরামর্শ কুমন্ত্রণা দেয় যে জীববুদ্ধিকে একেবারে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলে। বিবেককে আস্তে আস্তে কৌশলে সিংহাসনচ্যুত করিয়া পশুভাবকে উহার পদে প্রতিষ্ঠিত করে। কুবাসনা ও কুরুচিকে আহার দিয়া পরিপুষ্ট ও বলী করে। মানুষের মনে যে পশু নিদ্রিত আছে, তাহাকে উত্তেজিত করিয়া জাগ্রৎ রাখে। মানুষ ক্ষীণ হইয়া যায়, পশু সবল হয়, পশুর

নিকটে মানুষ হারিয়া যায়। মনুষ্যেতে যে দেবতা আছে অসুরগণ আসিয়া তাহাদিগের অধিকার হরণ করে, এবং আপনাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে। দেবাসুরের যুদ্ধে অসুরগণ জয় লাভ করিয়া সমুদায় প্রজার সর্ব্বনাশ করে এবং জনসমাজে সকল প্রকার পাপ ও দুঃখ বিস্তার করে। স্ত্রী পুরুষ যুবা বৃদ্ধ সকলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলকে আপনাদের করিয়া লয়। শরীর মনকে পাপে কলঙ্কিত করে, সমুদায় পরিবার, সমুদায় নগর, সমুদায় দেশে ভয়ানক পাপের স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে। সয়তানের রাজ্য বিস্তৃত হইয়া পড়ে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভূখণ্ড সয়তানের পদাশ্রয় গ্রহণ করে। সেই সয়তান কোথায়? খ্রীষ্ট পুরাণে কথিত আছে সয়তানের বাসভূমি নরকে, কিন্তু সে তোমার বক্ষের ভিতরে রক্তের ভিতরে, সর্ব্বত্র প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করে। ইহা অতি পুরাতন মত। যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিয়া সকলের মনকে সত্যের আলোকে আলোকিত করিলেন, তখন সকলে বলিলেন আমরা দুই জন সর্ব্বব্যাপী, দুই জন অনন্ত, মানিতে পারি না। ঈশ্বর এবং সয়তান উভয়ের অধিষ্ঠান এক সৃষ্টির মধ্যে নিতান্ত অসম্ভব। ঈশ্বরের সঙ্গে সয়তান সমকক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতেছে এবং বিস্তীর্ণ পৃথিবী বিভক্ত হইয়া দুই জনেরই অধিকারে অধিকৃত হইতেছে, ইহা আমরা মানিতে পারি না। ঈশ্বর সয়তানকে সৃজন করিলেন, পবিত্র ঈশ্বর হইতে একটা পাপময় পুরুষ উৎপন্ন হইল, শুদ্ধ হইতে অশুদ্ধ প্রসূত হইল; বুদ্ধি এ কথাতে সায় দিতে পারে না। হৃদয় চিৎকার করিয়া এই সয়তানবাদের প্রতিবাদ করিল। এখন তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, বিশুদ্ধ বুদ্ধি অনুসারে যেন তোমরা কল্পিত পুরুষাকার সয়তানকে অস্বীকার করিলে, পাপের প্রতি ব্যক্তিত্ব আরোপ অসত্য বলিয়া যেন সিদ্ধান্ত করিলে, তার পর জিজ্ঞাস্য এই যে উক্ত ভ্রান্তমত অস্বীকার করিয়া তোমরা মনের অবস্থাকে বিশুদ্ধ করিতে পারিয়াছ কি না? যদি তাহা না হয়, সয়তানবাদীর নিকটে তোমাকে লজ্জিত হইতে হইবে। পাপরূপ একটা বিকটাকার ভূত আসিয়া মানুষের ঘাড় ভাঙ্গিয়া দেয় এ কথা লইয়া তুমি উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতে পার, কিন্তু সুবুদ্ধিতে যাহা তুমি নির্ণয় করিলে দেখা-

ইতে হইবে তদ্দ্বারা তোমার পাপ দমন হইয়াছে। কেবল কুসংস্কার পরিত্যাগ করিলে হইবে না, পাপ অধর্ম্ম পরিহার করিতে হইবে। মতবিশুদ্ধ হইলে জীবন বিশুদ্ধ হয়। তোমাকে দেখাইতে হইবে সয়তানবাদ ভ্রম বলিয়া পরিত্যাগ করিলে চরিত্র ভাল হয়। অনেকে সয়তান মানে না বটে, কিন্তু তাহারা পাপকে অগ্রাহ্য করে। এটি সামান্য মনের কার্য্য। যে ব্যক্তি এরূপ করিল সে এক ভ্রম ছাড়িতে গিয়া আর এক ভ্রমে পড়িল। সয়তান অস্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে পাপকে তুচ্ছ করা সাধকের পক্ষে ঠিক নহে। সয়তানের আকার মানিলাম না বটে, কিন্তু পাপকে তদপেক্ষা ভীষণতর বস্তু মনে করি কি না? সয়তানের হাত পা আছে এটি গল্প, সত্য নয়। আমাদের দেহে কেবল এক ঈশ্বর আছেন, সয়তান বলিয়া কেহ নাই। সয়তান আসিয়া আমাদের স্কন্ধে চাপিয়া বসিয়া আছে ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। সয়তানের হাত পা না থাকুক, সয়তানকে বিকটাকার ভয়ানক বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। সয়তান মনে হইলে সয়তানবাদীরা ভয়ে বিকম্পিত হয়। চারি দিকে তাকাইয়া মনে করে ঐ বুঝি সয়তান দ্বারের পার্শ্বে লুকাইয়া আছে। সয়তানের ভয়ে সকলে ভীত। কখন সয়তান আসিয়া উপদ্রব করিবে এবং সমুদায় হস্তগত করিয়া লইবে এই ভয়ে জনসমাজ সর্ব্বদা শঙ্কিত। আমরা সয়তানবাদ মানি না, সয়তান বলিয়া কেহ ঘরে বা দেহ মধ্যে বসিয়া আছে ইহা বিশ্বাস করি না, কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা পাপকে সামান্য মনে করিতে পারি না। পাপের হাত পা নাই অথচ উহা ভীষণ। সয়তানবাদ ছাড়িতে গিয়া নব ভ্রান্তি উপস্থিত। প্রাচীন ভ্রান্তি চলিয়া গিয়া নূতন কুসংস্কার আসিয়াছে। প্রাচীনমতে সয়তানের রূপ কল্পনার তাৎপর্য্য কি? মনুষ্যকে ভয় দেখান। পাপ কত ভয়ানক তাহা বুঝাইবার জন্য উহাকে ব্যক্তিত্ব দিয়া গঠন করা হইয়াছে। তুমি জীবনে যত পাপ করিয়াছ তাহার সমুদায় গুলি একত্রিত করিলে বল তাহা সয়তানকে পরাজয় করে কি না? আপনার পাপের বর্ণ কত জঘন্য, তাহার নিকটে সয়তানের বর্ণ কি? স্বকৃত অধর্ম্মের মুখ কি সয়তান অপেক্ষা বিকটাকার নহে? পাপ অবিশ্বাস ব্যভিচার চুরী ডাকাতী সুরাপান

নরহত্যা প্রভৃতি এক একটা পাপের সঙ্গে শত শত সয়তানের তুলনা হয় না। একটা একটা পাপের ছবি আঁকিলে উহা সয়তান অপেক্ষা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বলিয়া বোধ হইবেই হইবে। একটি সামান্য মিথ্যা কথা একটি সামান্য কুচিন্তা, তাহারই যখন এমন ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, তখন ব্যভিচার চুরী ডাকাতি নরহত্যা প্রভৃতি বড় বড় পাপের তো কথাই নাই। আজ ক্ষুধিতকে আহার দি নাই, দুঃখীকে সান্ত্বনা করি নাই, রোগী ব্যক্তিকে ঔষধ দান করি নাই, এ সকল কথা স্মরণ হইলে গা কাঁটা দিয়া উঠে। আমার কুবাসনা কুচিন্তা প্রবঞ্চনা শঠতা অধর্ম্ম নাস্তিকতা এ সকল কি সয়তান নহে? ঈশ্বর নাই, পরলোক নাই, ব্যভিচারই সদাচার, অপরের সর্ব্বনাশ পুণ্য, একটি একটি এরূপ কথা সয়তান, ঘনীভূত সয়তান। এ সকল কথা স্মরণ করিলে হৃৎকম্প হয়। আপন আপন পাপসয়তানকে আঁকিলে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখা যায়। যদি ভয়ঙ্কর মনে না হয় তবে তোমার এখনও পাপ বোধ হয় নাই। বাস্তবিক পাপ অতি ভয়ানক, সয়তান অপেক্ষাও ভীষণ। রাগ দ্বেষ হিংসা লোভ এক একটি সয়তান আমাদিগের স্কন্ধে চাপিয়া আছে। তাহাদিগের হস্ত পদ নাই, তাহারা দংশন করে না, কিন্তু তাহারা যখন তোমাকে ধরিতে আইসে, তখন কি তুমি চীৎকার না করিয়া থাকিতে পার? সয়তান নামে কোন ব্যক্তি নাই, এ কথা বলিয়া ফাঁকি দিলে চলিবে না। অনেকে এইরূপ তর্ক করেন, সয়তান নাই, সুতরাং প্রবঞ্চনা করিলাম, লোকের মনে কষ্ট দিলাম, কাহাকে বধ করিলাম, কাহারও ভূমি সম্পত্তি বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইলাম, তাহাতে কি হইল? হস্ত পদ থাকিলে ব্যক্তিত্ব থাকিলে অবশ্য ভয় হয়, কিন্তু ক্রোধ লোভকে ভয় করিব কেন? উহাদের তো আকার নাই। এইরূপ যুক্তি দ্বারা তোমরা পাপকে অতি সামান্য এবং বিপদকে অতি লঘু করিয়া ফেলিলে। বালকেরা যেমন ভূত প্রেতকে ভয় করে তোমরা ঠিক সেইরূপ পাপ অধর্ম্মকে ভয় করিবে। জ্ঞানী হইয়াছ বলিয়া কি মৃত্যু ভয়ে ভীত হইবে না? বিপদকে বিপদ জানা পাপকে মৃত্যু মনে করা জ্ঞানী সুবোধের কর্ম্ম। তুমি কি বলিবে, যখন সয়তানের মত ছাড়িয়াছি, তখন পাপকে

কেন গ্রাহ্য করিব? কি! পাপকে কেন গ্রাহ্য করিব? পাপই তো সয়তান। শত শত সয়তান অপেক্ষাও আমাদের দৈনিক পাপ বিকটাকার, সয়তান অপেক্ষাও উহা ভয়ানক বস্তু। উহা জন্তু নয়, ব্যাঘ্র নয়, সাপ নয়, ব্যক্তি নয়, কিন্তু সাক্ষাৎ যম, সাক্ষাৎ মৃত্যু, সাক্ষাৎ ভয়ানক মারাত্মক ব্যাধি। যখন পাপ উপস্থিত হয়, তখন প্রকৃত সাধকের শরীরে মৃত্যু যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, অণুমাত্র পাপচিন্তা অসহ্য হইয়া উঠে। এ দেহ সয়তানের বাস স্থান, এ পৃথিবী সয়তানের বিস্তীর্ণ রাজ্য, পলায়ন করিয়া আমরা বাঁচিতে পারি না। সয়তান, তুই প্রাণকে ছাড়িয়া চলিয়া যা, বলিলাম, কিন্তু যেখানে যাই দেখি সয়তান সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে। পাপ, তুই সয়তান, তুই অধর্ম, তুই আমাকে ছাড়, একথা বারংবার বলিলেও উহা আমাদিগকে ছাড়িতে চায় না। ষড় রিপু নামে ছয় সয়তান আমাদের রক্তের ভিতরে বসিয়া আছে, কিছুতে যাইতে চায় না। খুব উচ্চৈঃস্বরে পাপরূপ সয়তানকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর,—রে পাপ, রে সয়তান, তোর জন্ম কোথায়, তোর উৎপত্তি কোথায়? চুরী ডাকাতি ব্যভিচার নরহত্যা প্রভৃতি সমুদায় পাপের একই মূল। ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধে দাঁড়াইলেই পাপ হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা পুণ্য, তাঁহার অনিচ্ছা পাপ। তাঁহার অনিচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ইচ্ছা সাধন করিলে পুণ্য হয়, ধর্ম্ম হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা যে তোমরা পূজা কর, সাধু কার্য্য কর, দান ধ্যান কর। তাঁহার এই ইচ্ছা পূরণই সাধুতা। ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় যে তোমরা রাগ কর, কাহারও অনিষ্ট কর, কাহার প্রাণ বধ কর। তাঁহার এই অনিচ্ছাসাধনই পাপ। ব্রহ্মের ইচ্ছা যাহা নয়, ব্রাহ্মের পক্ষে তাহাই সয়তান। যাহা কিছু ঈশ্বরের নয়, তাহাই সয়তানের। আমাদিগকে ঈশ্বর অনেক গুলি টাকা দিলেন, এবং বলিয়া দিলেন এই সকল গরীব দুঃখীদিগকে বিতরণ কর, আমি তাহার একটী পয়সাও তাহাদিগকে দিলাম না, স্বার্থপর ও নির্দ্দয় হইয়া আপনি সমুদায় লইয়া ভোগ করিলাম। এই যে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ হইল ইহাই সয়তান। বাস্তবিক আমাদের স্বার্থপরতা ও নিষ্ঠুরতাই ঈশ্বরের শত্রু সয়তান। কোমল বক্ষ কখন পরের দুঃখ দেখিয়া উদাসীন থাকিতে পারে না, দুঃখীকে কষ্ট দিতে পারে না। ভাই ভগ্নী সম্মুখে মরিতেছে দেখিয়া মহা-

পান করা, ইন্দ্রিয় সেবায় মত্ত হওয়া, অথবা আপনার সুখের জন্য শত শত দরিদ্রের প্রাণবধ করা, ইহা সয়তান না হইলে কে করিতে পারে? তাহার জীবন সয়তান কর্ত্তৃক পরিচালিত, ইহা ভিন্ন আর কি বলা যাইবে? ব্রাহ্ম, তুমি আপনার নির্দ্দয় হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর কোথায় সয়তান? বিবেক তোমার দুষ্ট ইচ্ছাকে দেখাইয়া দিবে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরোধী স্বার্থপরতাকে সয়তান বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। ধনে কি হইবে যদি সে গরীবের দুঃখ হরণ না করিল, রোগীকে ঔষধ, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র, অজ্ঞকে জ্ঞান না দিল? প্রভুর ইচ্ছা যে আমরা দয়ালু ও প্রেমিক হই, তাঁহার নিকটে ধন পাইয়া তাহার সদ্ব্যয় করিব না, ইহা তাঁহার অনভিপ্রেত। আমার ইচ্ছা এই যে সমস্ত ধন রাখিয়া দি, পুত্র পৌত্র ক্রমে উহা সম্ভোগ করিবে। অন্য লোকে উহার কিছু অংশ পায় আমার ইচ্ছা নয়। আমার এ ইচ্ছা নয়, কিন্তু ঈশ্বরের এই ইচ্ছা। এখানে ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে আমার ইচ্ছার বিরোধ উপস্থিত হইল। আমি আমার ইচ্ছানুসারে কাজ করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছার বিপরীত কাজ করিলাম। এই যে ইচ্ছার বৈপরীত্য ইহাই সয়তানস্বরূপ। ইহা কি কম ভয়ানক ব্যাপার যে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার ইচ্ছা নিয়োজিত হইল? এই বৈপরীত্য, ঈশ্বরের সঙ্গে বিবাদ, ঈশ্বরের সঙ্গে শত্রুতা, ইহাই পাপ, ইহাই আমাদের সয়তান। এই স্বেচ্ছাচার, এই অসাধুতা ভিন্ন আর সয়তান নাই। ঈশ্বরের ইচ্ছামত চলিব না, অথচ ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিব, উপাসনা করিব, সাধন ভজন করিব, ইহা যে মনে করে সে অতি মূর্খ। আমরা যে সকল কাজ করি, আমরা যে খাই বেড়াই, তাহা কি ঈশ্বরের ইচ্ছামত না আমাদের ইচ্ছামত? আমরা যেমন খাই বেড়াই পশুরাও তো তেমনি খায় বেড়ায়। ঈশ্বরের ইচ্ছায় কর্ম্ম না করিলে কোন কর্ম্ম ধর্ম্ম হয় না, অতি উচ্চ এবং পবিত্র কার্য্যও অসার। জগদীশ্বরের সঙ্গে বিবাদ করিয়া কেহ স্বর্গে যাইতে পারে না। ব্রহ্মেচ্ছার বিরুদ্ধে এক বিন্দু জল পান করিলেও তাহা পাপ। সংসার হউক ধর্ম্ম হউক যে কোন বিষয়ে ব্রহ্মের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিবে, হে ব্রাহ্ম, তাহাতেই তোমার পাপ হইবে। ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ তুমি কখন করিতে পার না। প্রাতে দ্বিপ্রহরে রাত্রে পরমেশ্বর আপনার ইচ্ছা জ্ঞাপন

করিতেছেন। তাঁহারই ইচ্ছায় সাধক প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিলেন, উপাসনা করিলেন, সংসারের কার্য্য করিলেন, রাত্রে শয্যায় সুখে শয়ন করিলেন। তিনি সুখী, কেন না তিনি সমুদায় দিন প্রভুর ইচ্ছা পালন করিলেন। তাঁহার হৃদয় মন সুস্থ নিশ্চিন্ত শান্ত প্রফুল্ল। তিনি প্রভুর আদেশ ক্রমে গরীবের গ্লানি ও অসুখ দূর করিয়া সুস্থমনা হইয়াছেন। যাহা কিছু ভ্রান্তি তাহা খণ্ডন করিয়া মনকে বিশুদ্ধ জ্ঞানে উজ্জ্বল করিয়াছেন, ইন্দ্রিয় দমন করিয়া আত্মাকে শান্ত ও শুদ্ধ করিয়াছেন, ঈশ্বরের আদেশ ও ইচ্ছা ঘোষণা করিয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন এবং চারি দিকে শান্তি বিস্তার করিয়াছেন। ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন অনুগত দাস কেমন সুখী! আমরা আমাদিগের ঈশ্বরের ইচ্ছার বিপরীত ইচ্ছাকে ভয় করিব। সয়তানবাদিগণের সয়তান অপেক্ষা পাপ আমাদিগের অধিকতর ভয় ও সন্তাপের কারণ হইবে। ঈশ্বরের ইচ্ছার বিপরীত যে কোন বাসনা ও ইচ্ছা তাহাকে সয়তান জানিয়া সদা জাগ্রৎ থাকিয়া সর্ব্ব প্রযত্নে আপনাকে ঐ শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে। দুর্নীতি দুরাচার কুরুচি কুপ্রবৃত্তি রূপ সয়তান সর্ব্বদা তোমার আমার হৃদয়ের ভিতরে আছে। কি উচ্চ কি নীচ, কি ধনী কি দরিদ্র, সকলের হৃদয়েই ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধ কিছু না কিছু আছে দেখা যায়। ঐ দেখ অন্তরে অহঙ্কার সয়তান বসিয়া আছে। অহঙ্কার লেখা পড়া সাধন ভজন ভাল কার্য্যসমূহের মধ্যেও লুকাইয়া থাকে। ঐ গুপ্ত শত্রুকে ত্বরায় বিনাশ কর। স্বার্থপরতা আর একটি ভয়ানক পাপ। পরের সুখ দুঃখে ঔদাসীন্য, আপনার সুখে মত্ততা, এই ভয়ানক স্বার্থপরতাকে যখন দেখিবে, তখনই ঐ রাক্ষস রক্ত খাইতে আসিল বলিয়া কান্দিয়া উঠিবে। দয়াময় রক্ষা কর, বলিয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইবে। যখনই এই সকল পাপ দেখিবে তখনই ঠিক মনে করিবে উহারা ঈশ্বরের শত্রু, তোমার সর্ব্বনাশ করিতে আসিতেছে, তোমার গলা কাটিবে। এই উপাসক-মণ্ডলী মধ্যে যাঁহারা আছেন তাঁহাদিগের প্রত্যেকের ভিতরে কোন না কোন আকারে সয়তান প্রবেশ করিয়া আছে। উহার গুপ্ত দুর্গসকল চূর্ণ কর, যেখানে দল বল লইয়া পরব্রহ্মের সঙ্গে নিয়ত যুদ্ধ করিতেছে সেই সকল দুর্গম দুর্গ বিনাশ

করিয়া ফেল। ভক্ত বলেন আমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধ ইচ্ছাকে কখন অন্তরে স্থান দিব না, আমি বিরুদ্ধ ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দিব না, এই আমার ইচ্ছা। ইচ্ছা-ময় হরি যিনি ইচ্ছা তাঁহারই, আমার ইচ্ছা করিবার কোন অধিকার নাই। ধন সম্পৎ ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলই ঈশ্বরের, আমার কি আছে? আমার কাজ কেবল তাঁহার ইচ্ছাতে বিলীন হইয়া ইচ্ছাযোগে যোগী হওয়া। সমুদায় তাঁহাকে দিলাম, তবে আর ইচ্ছার বিষয় কি রহিল? আমি আর কি ইচ্ছা করিব? সকলি ঈশ্বরের ইচ্ছায় হইবে। যাহা কিছু ভাল হইবে আমার জন্য নহে, তাঁহারই জন্য। আমার ভাল খাইবার ভাল পরিবার ইচ্ছা রহিল না। সমুদায় ইচ্ছা ঈশ্বরের পাদপদ্মে। এই পুণ্যে পুণ্যবান্ হইতে আমরা চেষ্টা করিব। মানুষ বধ করিলাম না বা মিথ্যা বলিলাম না তাহাতেই কি আমরা সাধু হইলাম? এইরূপ হইলেই কি আমরা শ্রেষ্ঠ লোক হইলাম? অনুসন্ধান করিয়া দেখ, প্রাণের ভিতরে এমন কিছু আছে কি না যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিপরীত। যখনই দেখিবে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিপরীত কোন বাসনা আছে, তখনই জানিবে দুষ্ট সয়তান তোমার মরণের ফাঁদ পাতি-তেছে। দেহ মন ধন মান সকলের উপরে এক মাত্র ঈশ্বরকে কর্ত্তা করিয়া রাখিবে। সকলে ইচ্ছাযোগ সাধন কর ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সমস্ত বিলীন কর। যখন ঈশ্বর আজ্ঞা করিবেন খুব কাজ কর তখন খুব কাজ করিবে, যখন ঈশ্বর ইচ্ছা করিবেন উপাসনা কর তখন উপাসনা করিবে, যখন তিনি আদেশ করি-বেন ধ্যান কর, তখন ধ্যান করিবে। তোমাদের সকলই সেই কল্যাণদায়িনী জননীর ইচ্ছাতে বিলীন হইল। যখন ইচ্ছায় ইচ্ছা মিলিয়া গেল তখন কেমন শান্তি। তখন আর পাপের ভয় পাপের জ্বালা থাকে না। পিতা যাহা বলিতেছেন পুত্র তাহাই করিতেছেন। আমি সয়তানকে ছাড়িয়া মার হইলাম, আর মৃত্যু ভয় রহিল না, ইহাতে ভক্তের কেমন আনন্দ!

সেবকের নিবেদন।

শমনবাদ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

৮ অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৮০২ শক।

সয়তানের ভয় যেমন, লোকের শমনভয়ও তেমনি, কেবল অন্ধকারের মধ্যে এ ভয় স্থান পায়, আলোকের মধ্যে ইহা থাকিতে পারে না। জ্ঞানের প্রদীপ জ্বাল, সয়তানের ভয় শমনের ভয় চলিয়া যাইবে। যত ক্ষণ অন্ধকার থাকে, তত ক্ষণ মনুষ্যের মনের ভিতরে দুইই স্থান পাইবে। খ্রীষ্টধর্ম্মে সয়তানের ভয়, হিন্দু ধর্ম্মে শমনের ভয়। হিন্দুসমাজে যমের বিভীষিকা শমনের বিভীষিকা কেমন প্রবল তাহা তোমরা অবশ্যই জান। যমালয়, শমনভবন কি ভয়ানক স্থান! যত পাপী পতিত ব্যক্তিদের আলয়। সেখানে ভয়ানক যন্ত্রণা। যমের আলয়ে অসহ্য যন্ত্রণার আগুন দিবারাত্রি জ্বলিতেছে। ভীষণ যমালয়! স্মরণ মাত্র হিন্দুর প্রাণ বিকম্পিত হয়। মৃত্যুশয্যায় শমনভয়ে লোকে চীৎকার করিয়া কান্দে। এখানকার সংসার এখানে থাকিবে, যমালয়ে গিয়া পাপের দণ্ড সহ্য করিতে হইবে। কত হিংস্র জন্তু দংশন করিবে, সর্পের মুখে পড়িতে হইবে, উত্তপ্ত তৈলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে হইবে, অগ্নিদগ্ধ হইতে হইবে, আরও কত যন্ত্রণা সহিতে হইবে কে জানে? সকল হিন্দুই যমের ভয়ে ভীত, সমুদায় হিন্দুসমাজ শমন ভয়ে জড়। সয়তানের ভয়ে খ্রীষ্টসমাজ শাসিত, শমনের ভয়ে হিন্দুসমাজ শাসিত হইতেছে। কিন্তু জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া দেখি সয়তান নাই, জ্ঞান চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখি শমন নাই। যম কে? কল্পনার পুত্র। মনুষ্যমন আপনি শমন কল্পনা করিয়াছে, তাহাকে ভয়ঙ্কর

বর্ণে চিত্রিত করিয়াছে। কল্পিত শমন একটি পুরুষ। তাহার নাম করিলেই সকলের ভয় হয়। মানুষের প্রতি এত ভয় সেই যম মানুষের মনের ভিতরে হৃদয়ের ভিতরে। যমালয় বলিয়া বিশ্ব মধ্যে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে গিয়া পাপীরা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। পাপের দণ্ডভোগ যে নরকে তাহা মনুষ্যের অন্তরে। হরিনাম সাধন করিলে আর যমালয়ে যাইতে হয় না। কিন্তু একটু অধর্ম্ম হইলেই যমালয়ে যাইতে হইবে। পাপ এমনি, অমন যে সাধু যুধিষ্ঠির তিনি প্রকারান্তরে একটী মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে কিয়ৎকালের জন্য যমের ভবনে গমন করিতে হইয়াছিল। সেখানে পাপের জন্য সকলকেই যাইতে হইবে। যমালয়ে সকলকেই প্রবেশ করিতে হইবে, সকলকেই যমের হস্তগত হইতে হইবে। তাহার অধিকার বিস্তৃত, তাহার রাজ্য সর্ব্বত্র। রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র জ্ঞানী মূর্খ সকলকেই তাহার বিস্তীর্ণ মুখে পড়িতে হইবে। যমের ভয় সকলেরই আছে। যম আছে, যমালয় আছে ভাবিয়া লোকের উপকার হয়। যাই লোকে মনে করে যমালয়ে যাইতে হইবে অমনি মৃত্যুকে পরাজয় করিবার জন্য মনুষ্য হরিনামসাধনে ব্যস্ত হয়। এই ভ্রম সাধকের পক্ষে হিতকর, কেন না যম আসিবে এই ভবে ভীত হইয়া সাধক হরিনাম করিয়া তাহাকে পরাস্ত করিতে যত্নবান্ হয়। ব্রহ্মসাধক জানেন যে তিনি মরিবেন না, তিনি অমর, তিনি দেবত্ব লাভ করিবেন, নিম্নে যাইবেন না, ঊর্দ্ধে তাঁহার গতি। যম যেমন অন্ধকারে বাস করে, ব্রহ্মপরায়ণ সাধু তেমনি আলোকে বাস করেন। সাধকের উপর শমনের অধিকার নাই। যাহার হরিভক্তি আছে, তাহাকে কি যম স্পর্শ করিতে পারে? ঈশ্বর তাহাকে নিষ্কৃতি দেন। যে ব্যক্তি শমন-ভয়ে ভগবান্‌কে স্মরণ করে, তাহার শমনভয় থাকে না, মৃত্যুযন্ত্রণা বারণ হয়। যমের ভয়ানক মূর্ত্তি দেখিতে না হয়, এ জন্য মনুষ্য ধর্ম্ম সাধন করে এবং ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়। যে শমনের ভয় এত প্রবল সে শমন কিরূপ? তাহাকে কিরূপে জয় করা যায়? ব্রাহ্ম আমরা, আমাদের বিশ্বাস এই যে শমন ব্যক্তি নহে, শমন পুরুষ নহে; যম নাই, যমালয়ও নাই। এ সকল মনুষ্যজাতির কল্পনা। ভয়ে লোকে যমরূপ সংগঠন করিল।

ঈশ্বরের অনিচ্ছাই যম, উহার অপর নাম সয়তান। ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া মানুষ মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়, এই মৃত্যুই যম শমন ও সয়তান নামে আখ্যাত, ইহারই ভয়ে সকলে কম্পিত। শমন আর কিছু নহে, কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধ; তাঁহার ইচ্ছালঙ্ঘনে মৃত্যু। মনের ভিতরে প্রকৃত যমালয়। যম অগ্নিতে দগ্ধ করিবে, শরীর খণ্ড খণ্ড করিবে, শয্যা অগ্নিময় করিবে, ভীষণ জন্তুসকল দংশন করিবে, এ সকল আর কল্পনা করিতে হইবে না। মনের ভিতরে যাও, দেখিবে যমের বিকট মূর্ত্তি। যেখানে যাও এই যম তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। এই যম বিকৃত হৃদয়ের নিকট অতি ভয়ানক। যম বিকারের রোগীকে কম্পিত করে, রোগী রোগশয্যায় পড়িয়া কত বিভীষিকা দেখে, চারি দিকে ভীষণ যমদূত-সকল দর্শন করে। অন্তরের ভয়ঙ্কর যমের নিকট এ সকল কল্পিত যমকিঙ্কর কিছুই নহে। আমি মিথ্যা কথা বলিয়াছি, নরহত্যা করিয়াছি, পরদারা হরণে কলঙ্কিত হইয়াছি, সেই সমুদায় আমার মনকে যন্ত্রণারূপ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছে। রাত্রিতে শয্যায় শয়ন করি কোনরূপে নিদ্রা হয় না, সুশীতল বায়ু কোন প্রকারে পাপসন্তপ্ত শরীরকে শীতল করিতে পারে না। যাহাদিগকে বধ করিয়াছি, যাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়াছি, দেখি তাহারা আসিয়া আমাকে বিভীষিকা দেখায়। হৃদয়ে আমার একটুমাত্র শান্তি নাই, পাপ ভয়ে অস্থি পর্য্যন্ত চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। শিয়রে আমার ভয়ঙ্কর যমদূত, ক্ষণকালও আমাকে আরাম দেয় না! হিন্দু খ্রীষ্টান উভয় ধর্ম্মেতে আমরা দেখিতে পাই পাপে মনুষ্যের মৃত্যু। বাস্তবিক মৃত্যুই শমন ও সয়তান। আপন আপন জীবন দেখিলে পাপ যে মৃত্যু তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়, এজন্য কোন পুস্তক পড়িতে হয় না। বাহিরে মৃত্যুর আলয় কেন খুঁজিতেছ? এখানে ওখানে যমালয় অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছ কেন? ঈশ্বরের বিরোধী ষড়্‌রিপু ভয়ঙ্কর যম অন্তরেই রহিয়াছে। এই যম কখন আমাদিগের মস্তকের কেশ ধরিয়া টানিতেছে, কখন আমাদিগের রক্ত পান করিতেছে, কখন আমাদিগের স্কন্ধে চাপিয়া বসিতেছে। কল্পিত যমালয় দেখিয়া আমাদিগকে আর ভীত হইতে হইবে না। পাপরূপ মৃত্যু মুখব্যাদান করিয়া আমাদিগকে যথেষ্ট ভয় দেখাইতেছে।

যদি যমদূতের ভয়ের সাহায্যে আমাদিগকে ধার্ম্মিক হইতে হয়, তবে তাহারা আমাদিগের হইতে দূরে নাই। অন্তরে যমালয় দেখিলেই ভয় হইবে। যম নাই বলিলে ইহাই বুঝায় যে পাপ বস্তু নয়। সকলে পাপ বলিয়া এমনি চীৎকার করে, যেন পাপ নামে কোন বস্তু আছে। যথার্থ সিদ্ধান্ত এই যে সয়তান বলিয়া কোন ব্যক্তি নাই, যম বলিয়া কোন লোক নাই, পাপ বলিয়া কোন পদার্থ নাই। ইহাদিগকে পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না। পাপ আর কিছু নহে ঈশ্বরের অনিচ্ছা। পাপ যম সয়তান সকলি অভাব পদার্থ, ভাব পদার্থ নহে। ঈশ্বরের অনিচ্ছা পাপ, যাহা নহে, যাহা নাই, যাহা অভাববাচক তাহাই পাপ। ইহাতে কোন বস্তু বুঝায় না। ঈশ্বর যেমন নানাবিধ বস্তু ও পদার্থ সৃজন করিয়াছেন তেমন পাপ বলিয়া একটি বস্তু সৃজন করেন নাই। যাহা ধর্ম্ম নহে, পুণ্য নহে, প্রেম নহে, তাহাই পাপ। ইহার আকার নাই, গঠন নাই, হৃদয়ের বাহিরে ইহার আবাসস্থান নাই। যখন ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে মনুষ্যের ইচ্ছার সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তখন সেই বিরোধ অবজ্ঞা ও অবমাননার অবস্থাই পাপ। ঈশ্বরের ইচ্ছা অনিচ্ছা ইহা ছাড়া পুণ্য নাই পাপ নাই। ঈশ্বরের ইচ্ছা বস্তু, যাহা তাঁহার অভিপ্রেত নহে, যাহা তাঁহার ইচ্ছা নহে, তাহা অবস্তু। যাহা তাঁহার অভিপ্রেত তাহাই ভাল, তাহাই মঙ্গল, তাহাই সত্য। এটী ঈশ্বরের ইচ্ছা নহে, মনে হইলেই কম্পিত হইবে, তখনি মনে করিবে এই যমালয়ে প্রবেশ করিতেছি। তিনি বলিলেন এইটি করিও না, যাই করিলে অমনি নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিলে। এই পাপে এই অপরাধে সয়তানের কুমন্ত্রণায় স্বর্গ হারাইলে, তোমাকে নরকে পড়িতে হইল। ঈশ্বর অনিচ্ছার সমষ্টির নাম যম ও সয়তান। তুমিই তোমার যম, তুমিই তোমার সয়তান। অন্যে যাহা বলুক, তুমি দিব্য চক্ষে দেখিবে, যাই তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিলে অমনি শমন তোমায় টানিল তোমার মৃত্যু হইল। মৃত্যু কি? ঈশ্বর হইতে বিচ্যুতি। শারিরীক মৃত্যু মৃত্যু নহে। রোগে লোকের মৃত্যু হয় না, পাপেই মৃত্যু। পাপীদের জন্যই যমালয়। তুমি দরিদ্রের দুঃখ হরণ করিলে না, নিষ্ঠুর হইলে

যমদূত আসিয়া তোমাকে ধরিল, তখনি তোমাকে বলপূর্ব্বক হৃদিস্থিত গুপ্ত যমালয়ে লইয়া গেল। তুমি পরের অনিষ্ট করিলে, সর্ব্বনাশ করিলে, পরের রক্ত শোষণ করিলে, এই অপরাধের জন্য তোমার চিত্ত আকুল হইবে, অন্তরে ভয়ানক গ্লানি উপস্থিত হইবে, মন যমালয় হইতেও অত্যন্ত ভয়ানক হইবে। পাপের অন্ধকার, পাপের দুর্গন্ধ, পাপের যন্ত্রণাই মনুষ্যের মনকে শমনভবন করিয়া তুলে। এমন বন্ধু কে আছে যে তোমাকে এই মৃত্যুযন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিবে? কে তোমাকে যমের মুখ হইতে রক্ষা করিবে? যমদূত যখন তোমাকে ধরিল তখন হাজার বল, ওরে যমদূত তোর হাতে ধরি, আমাকে মারিস না, এ কথা বলিলে সে শুনিবে না। রে যম, তুই এত কষ্ট দিলি, এত যন্ত্রণা দিলি, বলিতে বলিতে তোমার চক্ষু দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। এ অবস্থায় কেহ রক্ষক নাই, কেহ তোমাকে দয়া করিয়া বাঁচাইবে না। তাই ঈশ্বর আপনি মৃত্যুঞ্জয় নাম ধরিয়া ধরাতলে প্রকাশিত হইলেন। ঈশ্বর আপনার পবিত্র ইচ্ছায় পুণ্য সৃজন করিলেন। মানুষ সেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াতে তাহার মৃত্যু হইল। জীবের অবাধ্যতা পৃথিবীতে মৃত্যু আনিল। মৃত্যু আসাতেই মৃত্যুঞ্জয়ের প্রকাশ হইল। যদি মনুষ্যের পাপেতে মৃত্যু না আনিত, ঈশ্বর কখন মৃত্যুঞ্জয় রূপ ধরিতেন না। মৃত্যু না হইলে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ না করিলে আমরা ঈশ্বরের মৃত্যুঞ্জয় রূপ দেখিতে পাইতাম না। ঈশ্বর অনন্ত জীবনস্বরূপ, তাঁহার সঙ্গে বিচ্ছেদ মৃত্যু, তাঁহার সঙ্গে পুনর্মিলন নবজীবন, জীবননাশে মৃত্যু আবার মৃত্যুনাশে জীবন। যম মনুষ্যকে মারিল আবার যমকে মৃত্যুঞ্জয় মারিলেন। মৃত্যুরূপী শমনকে দমন করিয়া তিনি শমনদমন নাম লইলেন। মৃত্যুঞ্জয় কিরূপে সন্তানের মৃত্যু দেখিয়া উদাসীন থাকিবেন? সন্তানের চীৎকার বিলাপধ্বনি শুনিয়া তিনি মৃত্যুঞ্জয়রূপে অবতীর্ণ হইলেন, পৃথিবীর সৌভাগ্যোদয় হইল। মৃত্যুঞ্জয় মৃত্যুনিবারণ ঔষধ দিলেন, মৃতসঞ্জীবনী শক্তি প্রকাশ করিলেন। পাপের বিষপানে যাহারা মরিয়াছিল তাহাদিগকে অমৃতরস নিত্যানন্দরস দিয়া সঞ্জীবিত করিলেন। যমালয় হইতে হরিনামধ্বনি করিতে করিতে শত শত পাপী স্বর্গারোহণ করিল। হে ব্রাহ্ম! তুমি মৃত্যুকে ভয়ানক দানব মনে করিয়া

ভয় করিও না। মরণ কি কোন পদার্থ হইতে পারে? মরণ নামে কোন বস্তু নাই, মরণ বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, ইহা অপদার্থ। শমনের হস্ত হইতে মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্ত হইবার এক মাত্র উপায় মৃত্যুঞ্জয় নাম সাধন। ব্রহ্মমন্দিরে জীবনস্বরূপকে ডাকিলে মৃত্যু পলায়ন করিবে। মৃত্যুঞ্জয়ের প্রভাবে রবিজ বিনষ্ট হইবে। ঈশ্বরের পুণ্যময়ী ইচ্ছা প্রবল হইলে অসুরের পাপময়ী ইচ্ছা মরিবে, যমের আধিপত্য ঘুচিবে এবং জীবনের রাজ্য বিস্তৃত হইবে। মৃত্যুঞ্জয়ের শরণাপন্ন হইলে আমাদিগের জীবন কি কেহ বিনাশ করিতে পারে? আমরা মৃত্যুকে কাঁপাইব, মৃত্যুকে মারিব। আমাদিগের মৃত্যুভয় এত প্রবল কেন? আমরা শমনদমনকে ভক্ত মানি না এই জন্য। তাঁহাকে মানিলে তাঁহার বলে আমরা মৃত্যুকে মারিয়া নব জীবন লাভ করিব। নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণে পৃথিবীতে মৃত্যু আসিল, এখন অভিনব বিধানে নিত্যানন্দরসামৃত পান করিয়া জীব পুনরায় জীবন লাভ করিবে। মরণের আবার মরণ আছে তাহা কি তোমরা জান না? তোমরা যমকে ও সয়তানকে বিদায় করিয়া দাও। পাপ কি সৎ যে উহা চিরস্থায়ী হইবে? পাপ কি সর্ব্ব শক্তিমান্ যে উহা আর সকল শক্তিকে পরাজয় করিয়া আপনি দিগ্বিজয়ী হইবে? না। অসার পাপ সারাৎসারের হাতে মরিবে। মৃত্যু সকলকে খাবে, আবার মৃত্যুঞ্জয় মৃত্যুকে মারেন। যাহারা মৃত্যুঞ্জয়ের পূজা করে তাহাদিগের মৃত্যুকে ভয় কি? ঈশ্বর সয়তানকে পাপকে মারিবেন, যমকে কাটিবেন, তোমরা মৃত্যুভয়ে ভীত হইও না। আমরা মরিব কেন? বিশ্বাসে অনন্ত জীবন লাভ করিব। জীবন অস্ত্রে শমনের মস্তক ছেদন কর। ঈশ্বরের অনিচ্ছা মন হইতে একেবারে বিদায় করিয়া দাও। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যত বাধ্য হইবে ততই জীবন ও কল্যাণ, যত ইচ্ছা ভাঙ্গিবে ততই জীবন হইতে ভ্রষ্ট ও মৃত হইবে। মৃত্যুকে যমালয়ে প্রেরণ কর। নিরত এই প্রার্থনা কর যেন তোমরা মরণকে মারিয়া এ দেশকে উদ্ধার করিতে পার। শমনদমন নামে চারি দিক কাঁপাও, শমন আর থাকিবে না। ঈশ্বরের অনিচ্ছাতে শমন জন্মিল, ঈশ্বরের ইচ্ছাতে শমন মরিবে। সয়তানকে

শমনকে মারিবার জন্যই ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে নববিধান মৃত্যুঞ্জয়ের নিশান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাঁহাকে দেখিলেই যমের মৃত্যু হইবে, মৃত্যুর মরণ হইবে। আমরা মৃত্যুঞ্জয়ের নাম করিয়া সমুদায় ব্যাধি রোগ ও বিনাশের কারণ নির্ম্মূল করিব, আমাদিগের ভয় করিবার কিছুই থাকবে না। যদি কাহাকেও ভয় করি অন্তরের পাপকে ভয় করিব, ঈশ্বরের অনিচ্ছাতে মৃত্যু জানিয়া উহাকে ভয় করিব। ঈশ্বরের পাদারবিন্দ বক্ষে ধারণ করিয়া আনন্দধ্বনিতে তাঁহার নাম গান করিতে থাকিব। আনন্দময়ীর রাজ্যে প্রবেশ করিয়া মৃত্যুভয় শেষ করিব। অব্রাহ্ম অবস্থায় এত দিন আমরা মৃত্যুকে ভয় করিয়াছি, এখন আমরা মৃত্যুকে ভয় দেখাইব। যমকে আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিব,—"আমরা তোর আসামী নইরে শমন।" মৃত্যুঞ্জয় তাঁহার সন্তানদিগকে মরিতে দিবেন না। সকলে তাঁহার পূজা কর, আর মৃত্যুমুখে পড়িতে হইবে না। নিশ্চিন্ত হও নির্ভয় হও, মৃত্যুরাজ্যের রাজা শীঘ্র মরিবে। ঐ যম আসিতেছে, মনুষ্য সন্তানকে গ্রাস করিতেছে, লোকের আর এরূপ বলিতে হইবে না। মৃত্যুঞ্জয়ের নিশান হস্তে ধারণ কর, তাঁহার নামে পবিত্র হও, দ্বিজ হও। কিসের ভয় কিসের ভাবনা? দ্বিজের কি মরণ সম্ভব? আনন্দধ্বনিতে মৃদঙ্গ বাজাইয়া মৃত্যুঞ্জয়ের নাম চারিদিকে প্রচার কর। পৃথিবীর অকল্যাণ চলিয়া যাইবে, যাহার নামে সকলে কাঁপে সেই ভীষণ শমন পলায়ন করিবে।

সেবকের নিবেদন।

যোগানন্দ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

৫ পৌষ, রবিবার, ১৮০২ শক।

ইহা অতি আশ্চর্য্য কথা যে পৃথিবীর যত বয়োবৃদ্ধি হইতেছে তত উহা ধ্যান বিহীন হইতেছে। বালক পৃথিবী গভীর ধ্যানে মগ্ন হইত, গাঢ় যোগানন্দরস সম্ভোগ করিত। পৃথিবী যখন বালক ছিল তখন উহা ধ্যানের সোপানে আরোহণ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিত; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যুবা পৃথিবী ধ্যানের পথে যোগের পথে চলিতে চায় না। যুবা পৃথিবী যোগধ্যানবিহীন। কার্য্যের ব্যস্ততা যুবা পৃথিবীর প্রধান লক্ষণ। দক্ষিণ হস্ত কলিযুগে ধর্ম্মের প্রধান সহায়। পৃথিবীর বাল্যকালে এই কথা ছিল, চক্ষু নিমীলন না করিলে ধ্যান ও প্রকৃত ধর্ম্ম-সাধন হয় না। বর্ত্তমান যুগের কথা এই যে চক্ষু না খুলিলে ধর্ম্ম হয় না। পৃথিবীর বর্ত্তমান বংশীয় লোকের নিকটে ধ্যানের নাম করিও না, যোগের কথা বর্ত্তমান যুগকে শুনাইও না। বর্ত্তমান কালের সভ্যজাতি কেবল কর্ম্ম করিবে, ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবে। তাহারা বলে ধ্যান কি? যোগ কি? আত্মা আবার কি? পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার যোগ সে আবার কি? এ সকল বিষয় তাহারা অনুসন্ধান করিবে না। বর্ত্তমান কালের যুবকেরা যোগ সমাধি কি, এ সকল আলোচনাতে প্রবৃত্ত হওয়া বৃথা কালক্ষয় মনে করে। হায়! বালক পৃথিবী ও যুবা পৃথিবীর কত প্রভেদ! চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই ভারতবর্ষে কেমন ধ্যান যোগের প্রাদুর্ভাব ছিল। সেই প্রতাপান্বিত তেজস্বী যোগী ঋষিদিগের যোগ সমাধির জন্য ভারতবর্ষ প্রসিদ্ধ।

সেই ভারতবর্ষীয় আর্য মহর্ষিকুল চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে যোগ ধ্যানের প্রভাবও চলিয়া গিয়াছে। এখন ভারতের ধ্যানের ভাব নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে, এখন ভারতে আত্মার পুষ্টি নাই, এখন ভারত শারীরিক সুখের জন্য বাহ্যিক সভ্যতার জন্য ব্যস্ত। ভারতে আর পূর্ব্বের ন্যায় আধ্যাত্মিক সাধনের প্রাদুর্ভাব নাই। কোথায় সেই যোগী ঋষি-গণ, কোথায় সেই উচ্চ ও গভীর আধ্যাত্মিকতা ? ব্রাহ্মসমাজ, তুমি ভার-তের প্রাচীন গৌরব উদ্ধার কর। যে ধ্যান করে না, যে যোগাভ্যাস করে না, তাহাকে ভারতের পুত্র বলিয়া কিরূপে স্বীকার করিবে ? প্রত্যেক ভারত-সন্তানের ধ্যানপ্রিয় হওয়া উচিত। ধ্যানপ্রিয়তা আর্য্যবংশের প্রধান লক্ষণ, যোগই তাঁহাদের জীবন। ভারত বাল্যকালে যোগভূমিতে কেমন খেলা করিত, যোগচক্ষে ব্রহ্মরাজ্যের সৌন্দর্য্য দেখিত, যোগকর্ণে দৈব-বাণী শ্রবণ করিত, যোগহস্তে আকাশের যোগচন্দ্র ধরিত, যোগরসনায় যোগানন্দরস পান করিত। চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতের আর্য্য ঋষিগণ পৃথিবীতে থাকিয়াও যোগবলে দেবলোকে বিচরণ করিতেন, এখন আমরা যোগভ্রষ্ট হইয়া কীটের ন্যায় ইন্দ্রিয়সুখকর্দ্দমে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছি, এই পৃথিবীতেই আমরা বদ্ধ রহিয়াছি। আত্মন্, আর তুমি ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া জড় বস্তুতে বদ্ধ থাকিও না। তুমি কি জড় অপেক্ষা উচ্চতর পদার্থ নও ? হে মোহাচ্ছন্ন আত্মা, হে প্রচ্ছন্ন হৃদয়, তুমি শরীররাজ্য অতিক্রম করিয়া, জড় ভেদ করিয়া আপন গৌরব প্রকাশ কর। এই ইন্দ্রিয়রাজ্য ছাড়িয়া, এই শরীর ভাঙ্গিয়া, হে আত্মন্, আবার তুমি আপনার রাজ্য স্থাপন কর। তুমি আর পরের বাটীতে থাকিও না, আপনার ঘর নির্ম্মাণ কর। আমি বাস্তবিক বুঝিতে পারি না, বাল্যকালে যে দেশে এত ধ্যান যোগের প্রাদুর্ভাব, যৌবনে কেন সেই দেশ যোগভ্রষ্ট হইল। ধ্যানে অরুচি, যোগে ঔদাসীন্য, যোগভ্রষ্ট ব্যবহার, বাস্তবিক আর্য্যোচিত কার্য্য নহে। আমরা নববিধানাশ্রিত লোক। আমরা ধ্যানপ্রিয় হইব, আমরা যোগের পক্ষপাতী হইব। যদি বল সংসারাশ্রম, গৃহধর্ম্ম ছাড়িয়া কেবল যোগ ধ্যান করা কি উচিত ? নিজের প্রতি পরিবারের প্রতি সমাজের প্রতি কত কর্ত্তব্য আছে। সে সকল কর্ত্তব্য পালন না করিয়া, সন্ন্যা-

নাদি পালন, পরসেবা, দেশের উপকার প্রভৃতি সৎকার্য্য না করিয়া, কেবল কি যোগ সাধন করা উচিত? ব্রহ্মমন্দির এই প্রশ্নের এই উত্তর দিতেছেন, যখন ভারতবর্ষে যোগ ধ্যানের প্রতি এত অরুচি দেখা যাইতেছে, যখন এক বিষয়ে এত ব্যভিচার দেখা যাইতেছে, তখন অন্ততঃ কিছু কাল বিশেষ যত্ন সহকারে যোগতত্ত্ব, ধ্যানতত্ত্ব সাধন করা নিতান্ত আবশ্যক। তাহা হইলে যোগ ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য হইবে। ব্রহ্মমন্দির কর্ম্ম ও যোগ ইহার একটিও ছাড়িতে বলেন না। ব্রহ্মমন্দির উভয়ের মধ্যে সন্ধিস্থাপনের জন্য এই কথা বলিতেছেন, যখন কেবল কর্ম্ম কর্ম্ম কর্ম্ম, ইন্দ্রিয়সেবা, ইন্দ্রিয়সেবা, ইন্দ্রিয়সেবা, এই শব্দ হইতেছে, তখন কেবল ধ্যান ধ্যান ধ্যান ধ্যান,যোগ যোগ যোগ এই কথা অন্ততঃ কিছু দিন বলিলে কল্যাণ হইবে। এখন ভারতে কেবলই কার্য্যব্যস্ততা, কেবলই অর্থোপার্জ্জনচেষ্টা, ঈশ্বরের জন্য গভীর ধর্ম্মের জন্য অতি অল্প লোকেই ব্যস্ত। যেখানে যাই, কি রাস্তায়, কি বিদ্যালয়ে, কি পুস্তকালয়ে, কি কার্য্যালয়ে সর্ব্বত্র কেবল ইন্দ্রিয়রাজ্য; সকলেই ইন্দ্রিয়সুখের জন্য ব্যস্ত। চক্ষু বন্ধ করিয়া কেহ যে কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া পাঁচ মিনিট ধ্যান করিবে তাহা প্রায় দেখা যায় না। অধিকতর দুঃখের বিষয় এই যে ব্রাহ্মেরাও ধ্যানকে ভয় করেন। অনেক ব্রাহ্মও বলেন, চক্ষু বন্ধ করিয়া কি কেবল অন্ধকার দেখিব? এখন চক্ষু খুলিয়া চারি দিকে বেশ নয়নতৃপ্তিকর নগর, বাগান, বৃক্ষ, লতা, নদ, নদী, ঘোঁড়া, গাড়ী এবং নর নারী, কত প্রিয় বস্তু দেখিতেছি, চক্ষু মুদ্রিত করিলে কিছুই দেখিতে পাইব না। এইরূপ যোগধ্যানবিহীন ব্রাহ্মকে যাই ধ্যানের আসনে বসিতে বলিলে অমনি তাহার সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হইতে লাগিল এবং তাহার চক্ষে নিদ্রা আসিতে লাগিল। হে ভারতের আর্য্যসন্তান, তোমার এইরূপ অসঙ্গত ব্যবহার কেন? তুমি আর্য্যসন্তান, যোগের কথা শুনিলে তোমার ভয় হয়, কষ্ট হয়? যখন আমি ধ্যানের কথা বলিব, তখন, হে আর্য্যব্রাহ্ম, তোমার এই কথা বলা উচিত, " আহা! কি সুমিষ্ট কথা বলিলে। পৃথিবীর কোন বস্তু ধ্যানের ন্যায় সুমিষ্ট নহে। ব্রহ্মধ্যান করিতে অনুরোধ করিতেছ, কি সরস নিমন্ত্রণ! একটি বার এই অসার সংসার হইতে বিদায় লইয়া ব্রহ্ম-

রূপ দেখিয়া আসিব, স্বর্গ দেখিয়া আসিব? আহা! কি মধুর সংবাদ!!"
হে চঞ্চল মনুষ্য, তুমি মনে কর ধ্যান বড় কঠিন ও কঠোর। কিন্তু যিনি যোগ ধ্যান অভ্যাস করিয়াছেন, তিনি জানেন ধ্যান বড় সরস এবং সুমিষ্ট। তুমি অভ্যাস কর নাই বলিয়াই তোমার পক্ষে ধ্যান এত কঠিন। অভ্যাস ভিন্ন ধ্যান সহজ এবং সুমধুর হয় না। যদিও অনেক বৎসর হইল এই উপাসনামন্দিরে ধ্যানপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে এখন পর্য্যন্ত অতি অল্প লোকেই ইচ্ছা পূর্ব্বক, অনুরাগের সহিত ধ্যান সাধন করেন। ব্রাহ্মগণ, যদি তোমরা ধ্যানে সুখ পাইতে, যদি তোমরা প্রকৃত যোগানন্দরসের আস্বাদন জানিতে, তাহা হইলে ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্তি জন্য যেমন তোমরা দৌড়িয়া গিয়া আহার পানীয় গ্রহণ কর, সেইরূপ আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর করিবার জন্য তোমরা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গিয়া ব্রহ্মধ্যান এবং ব্রহ্মানন্দরস পান করিতে। যখন একবার ধ্যানের আস্বাদ পাইবে, তখন বারংবার যোগানন্দরস পান করিবার জন্য দৌড়িয়া যাইবে। এখন আচার্য্যের অনুরোধে বন্ধুর অনুরোধে ধ্যান করিয়া থাক, কিন্তু তাহাতে সুখ পাও না। ধ্যানে আনন্দ কেন হয় না? যে হৃদয়ে ইন্দ্রিয় রাজা এবং দম্ভ মন্ত্রী, যেখানে নানাপ্রকার বাসনা ও প্রবৃত্তির কোলাহল, সেখানে কি ধ্যানের শান্তি আসিতে পারে? অতএব যদি ধ্যানের সুখ ভোগ করিবার স্পৃহা থাকে, তবে সর্ব্বপ্রথমে বুদ্ধ আত্মাকে আহ্বান কর, অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে বুদ্ধের নির্ব্বাণপথ ধারণ কর। যোগগ্রামের পার্শ্বে নির্ব্বাণ সরোবর রহিয়াছে, সেই নির্ব্বাণসরোবরে অবগাহন না করিয়া কেহই যোগ রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। মনুষ্যের শরীরের ভিতরে কাম, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি নরকের আগুন জ্বলিতেছে, এ সকল আগুন যতক্ষণ জ্বলিবে, ততক্ষণ কিরূপে ব্রহ্মরূপ দেখিতে পাইবে? এ সকল আগুন নির্ব্বাণ না হইলে কোন মতেই শান্তি লাভ করা যায় না, এবং শান্তচিত্ত না হইলে ধ্যান হয় না। এই জন্য মহাপ্রভু বুদ্ধ নির্ব্বাণ সাধন করিয়াছিলেন। বুদ্ধের লক্ষ্য নির্ব্বাণ, বুদ্ধের উপায় নির্ব্বাণ, বুদ্ধের বৈকুণ্ঠ নির্ব্বাণ এবং বৈকুণ্ঠের পথও নির্ব্বাণ। এই এক নির্ব্বাণ কথাতে সমস্ত

বৌদ্ধধর্ম্ম নিহিত। এই কথা শুনিয়া আমরা হাসিব না; কিন্তু ইহার গূঢ় অর্থ অনুসন্ধান করিয়া আবিষ্কার করিব। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, যিনি অধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাকে একবার নির্ব্বাণ-সমুদ্রে ডুব দিতেই হইবে। নির্ব্বাণ ভিন্ন গম্ভীর সমাধি ও ধ্যানযোগ অসম্ভব। মনে কর, তোমার অন্তরে নানা প্রকার সুখ বাসনার অগ্নি-শিখা প্রজ্বলিত রহিয়াছে, সে সকল বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য তুমি ব্যস্ত হইয়া সমস্ত দিন কার্য্য করিতেছ, হঠাৎ তুমি কিরূপে দুই মিনিটের মধ্যে নির্লোভী ও বাসনাশূন্য হইয়া ব্রহ্মসন্নিধানে উপবিষ্ট হইয়া ব্রহ্ম-ধ্যান করিবে? নানা প্রকার বাসনার উত্তেজনায় ছটফট করিতেছে যাহার হৃদয়, সে কি পলকের মধ্যে স্থির ও গম্ভীর হইয়া ধ্যান করিতে পারে? তুমি তোমার বাহিরের গাড়ী থামাইলে, বাহিরের ঘোড়ার গতি রোধ করিলে, তোমার হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ বন্ধ হইল; কিন্তু তোমার মনের ভিতরে যে শত শত বাসনা অশ্ব টক্ টক্ করিয়া দৌড়িতেছে তাহাদিগকে তো শাসন করিলে না। কুবাসনা কুরুচি চারিদিকে ছুটিতেছে। মনকে স্থির করিতে না পারিলে কিরূপে ধ্যান করিবে? অতএব মনকে প্রশান্ত ও সুস্থির করিবার জন্য নির্ব্বাণসরোবরে অবগাহন করিয়া বাসনা জ্বালা নির্ব্বাণ করা আবশ্যক। হে ধ্যানার্থী, হে যোগার্থী, ঠিক্ তোমার সমক্ষে প্রকাণ্ড নির্ব্বাণ সরোবর, সেই সরোবরে মগ্ন হইয়া তোমার সমুদায় আসক্তির আগুন নির্ব্বাণ কর। কিরূপে নির্ব্বাণ লাভ করিবে? নির্ব্বাণ সাধনের সময় কি ভাবিবে? কেবল 'না' ভাবিবে। না ভাবনা, নির্ভাবনাই নির্ব্বাণ। নির্ব্বাণের অর্থ 'না' সাধন। সংসার ভাবনাও ভাবিবে না, স্বর্গের ভাবনাও ভাবিবে না, অর্থাৎ কিছুই ভাবিবে না। সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইবে, অর্থাৎ মনের মধ্যে কোন চিন্তা রাখিবে না। রাগের চিন্তা, লোভের চিন্তা প্রভৃতিকে মনে আসিতে দিবে না। নির্ভা-বনা, নিশ্চিন্ত অবস্থা নির্ব্বাণ। যেমন আগুনে জল ঢালিলে আগুন নির্ব্বাণ হয় এবং লোকে বলে আর আগুন নাই, সেইরূপ মনের মধ্যে নির্ব্বাণের অবস্থা হইলে আর কিছুই থাকে না। নির্ব্বাণের অবস্থায় ভাল মন্দ কিছুই থাকে না। সকল প্রকার কামনা ও বাসনার

আগুন নির্ব্বাণ হইল বটে; কিন্তু এখনও ব্রহ্মাগ্নি উদ্দীপ্ত হয় নাই। নির্ব্বাণের প্রথম অবস্থায় অভাবপক্ষ সাধন, পরে ভাবপক্ষ সাধন। অভাবপক্ষ সাধনে সকল প্রকার বাসনা ও চিন্তা দূর করিব, ভাল মন্দ কিছুই ভাবিব না। এইরূপে যখন দেখিব যে মনের মধ্যে কোন ভাবনা আসিল না, তখন বুঝিব যে ধ্যানের প্রথম অবস্থা সিদ্ধ হইল, এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়কে জয় করিবার শক্তি লাভ করিলাম। নির্ব্বাণ লাভ না করিলে মানুষ কোন মতেই আপনার মনের দুরন্ত অশ্বকে শাসন করিতে পারে না। দুষ্ট বাসনারূপ দুরন্ত অশ্ব মনকে চঞ্চল করে এবং বারংবার ধ্যানভঙ্গ করে। এই জন্য সর্ব্বপ্রথমে নির্ব্বাণ সাধন আবশ্যক। মনের সকল প্রকার চিন্তা নির্ব্বাণ হইলে পরীক্ষা দ্বারা জানা যায় আত্মদমন, আত্মনিগ্রহ, আত্মজয় হইয়াছে। আত্মবশ হইলে অর্থাৎ মন বশীভূত হইলে যখনই মনকে বলিবে, মন, বস, তখনই মন বসিবে, মনকে বলিবে দাঁড়াও, তখনই মন দাঁড়াইবে। কুচিন্তাকে বলিবে দূর হও অমনি দূর হইবে, বিষয়কল্পনাকে বলিবে চলিয়া যাও সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইবে। এই যে মনকে জয় করা ইহাতে ঈশ্বর বল দেন। যে মনকে জয় করিয়াছে তাহার অন্তরে ঈশ্বরের অনুমতি ভিন্ন কোন চিন্তা আসিতে পারে না। ভাল মন্দ সমুদায় চিন্তা বিদূরিত হয়। বাণিজ্য, ব্যবসায়, সংসার, স্ত্রী পুত্র পরিবার, বিষয় সম্পত্তি প্রভৃতি বৈষয়িক চিন্তা, অথবা জ্ঞানচর্চ্চা, আপনার পাপ পুণ্য, পরসেবা, দৈনিক কর্ত্তব্য প্রভৃতি ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় আলোচনা কিছুই তখন মনে স্থান পায় না। নির্ব্বাণসরোবরের ন্যায় তাহার মন তরঙ্গবিহীন ও স্থির হইয়াছে। যখন এইরূপে মন নির্ব্বাণ লাভ করে তখন একটি সম্পূর্ণরূপে নূতন রাজ্য প্রকাশিত হয়। নির্ব্বাণে 'না' সাধন শেষ হইল, অভাবপক্ষ সাধন শেষ হইল, এখন ভাবপক্ষের সাধন আরম্ভ হইল। নির্ব্বাণে সংসারবস্তুকে উড়াইয়া দিলাম, এখন ব্রহ্মবস্তুকে ধরে আনিতে হইবে। অনেকে মনে করেন কেবল ঈশ্বরের এক একটি স্বরূপ কিংবা ধর্ম্মের এক একটি লক্ষণ চিন্তা করাই ধ্যান। আমরা নববিধানের লোক, আমরা যোগরাজ্য মানি। যেমন এই কলিকাতা নগরে রাজপ্রতিনিধির বাড়ী,

তাহার নিকট নদী এবং এখনে ওখানে কত লোকের অট্টালিকা আছে, তেমনি যোগনগরে যোগেশ্বরের বাড়ী এবং অসংখ্য যোগী ঋষি সাধু-দিগের বাসগৃহ ও প্রেমের নদী রহিয়াছে। সেখানে স্থান কিংবা কালের ব্যবধান নাই। যোগনগরে এসিয়া ইউরোপ এক স্থানে, সেখানে ইহকাল পরকাল এক, ঈশা মুসা একস্থানে, সেখানে পৃথিবীর নানাস্থানের সমুদয় যোগী একপরিবারবদ্ধ হইয়া আছেন। যাহারা যোগ ধ্যানের সময়েও স্থান এবং কালের ব্যবধান দেখিতে পায়, তাহারা কল্পনার সাধন করে। নির্ব্বাণসরোবরে ডুব দিয়া যাহারা যোগরাজ্যে গমন করে, তাহারা পরলোকগত মহাত্মাদিগের অব্যবহিত নৈকট্য অনুভব করে। যোগরাজ্যে দেশভেদ, জাতিভেদ নাই। যখন জড়রাজ্য ছাড়িয়া, চিন্ময় হইয়া আধ্যাত্মিক লোকে গমন করি, তখন সমুদয় অশরীরী আত্মা ঈশ্বরেতে সংযুক্ত দেখিতে পাই। সেখানেদেব দেব মহাদেব যোগেশ্বরের চিন্ময় যোগনিকেতন, এবং তাহার মধ্যে যোগীদিগের অসংখ্য নিরাকার গৃহ রহিয়াছে। যোগানন্দ প্রার্থী, তুমি তাঁহা-দিগকে দেখ না দেখ ক্ষতি নাই; তোমাকে কেবল স্বীকার করিতে হইবে যে সেই চিন্ময় যোগরাজ্যে সকলই আছে। যখনই তুমি সেই রাজ্যে গিয়া সেই রাজ্যের ঈশ্বরকে পিতা মাতা বলিয়া সম্বোধন করিলে, তিনি তোমাকে আপনার বাগানের নানাপ্রকার প্রেম ও পুণ্য ফুলে সাজাইতে লাগিলেন। সেখানে বসিয়া পরোলোকবাসী ভক্তদিগের সঙ্গে সহজে একাত্মা হইয়া যাইবে। সেখানে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ, ঈশ্বরের শ্রীমুখের কথা শুনিতে লাগিলে। এক একবার তাঁহার উৎসাহকর কথা শুনিয়া মৃত জীবনে নব জীবনের সঞ্চার হইতে দেখিলে। সমস্ত জীবন কখন্ কি করিবে সেই স্বর্গের পরম বন্ধুর নিকট সমুদায় জানিলে। এক কুৎসিত কৃষ্ণবর্ণ আত্মা নির্ব্বাণসাগরে ডুব দিয়া উঠিল, যাই সে জ্যোতির্ম্ময় যোগেশ্বরের নিকট যোগাসনে বসিল, অমনি একাগ্রচিত্ত হইয়া এক দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া জ্যোতি ও আনন্দসুধা পান করিতে লাগিল। ক্লেশ কলুষ নাশ হইতে লাগিল। গভীরতম অপবিত্রতা, কপটতা, দ্বেষ, হিংসা, লোভ, রাগ, সমুদয় বিনষ্ট

হইতে লাগিল, চরিত্র নির্ম্মল হইল। ঈশ্বরের উজ্জ্বল পবিত্র কিরণে তাঁহার মন আলোকিত হইল। যে পরিমাণে ঈশ্বরের সঙ্গে প্রকৃত যোগ সেই পরিমাণে চিত্তশুদ্ধি এবং আত্মার উজ্জ্বলতা। প্রকৃত যোগ হইলে অন্তরে যে কেবল পাপ কলঙ্ক অপসারিত হয় তাহা নহে, নির্জ্জীবতা অসাড়তা, শুষ্কভাব ও জড়ভাবও চলিয়া যায়। প্রকৃত ধ্যান যোগের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের সুস্থতা, বুদ্ধির প্রখরতা, হৃদয়ের কোমলতা, আত্মার গাম্ভীরতা ও জীবনের নির্ম্মলতা বৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং অন্তরে ও বাহিরে শত শত পুণ্য ও সদ্ভাবের উৎস উৎসারিত হইতে থাকে। যোগীর মুখে এমনি নবপ্রস্ফুটিত কমলসদৃশ প্রফুল্লতা ও সৌন্দর্য্য বিকসিত হয় যে লোকে দেখিবা মাত্র বলে, জ্যোতির সন্তান যোগরাজ্য হইতে কেমন উজ্জ্বল সহাস্য ও বিমল বদনে আনন্দময়ের ঘর হইতে আসিতেছেন।

সেবকের নিবেদন।

সৌন্দর্য্য।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

১২ পৌষ, রবিবার, ১৮০২ শক।

নববিধান শিশুধর্ম্ম। শিশুপ্রকৃতির যত খেলা ইহাতে আমরা তাহাই দেখিতে পাই। ইহার জ্ঞান গভীর, ইহার বেদ বেদান্ত অতি দুর্ব্বোধ, ইহার যোগ প্রগাঢ়, ইহার সমুদায় কথা অতি বিচিত্র অদ্ভুত কথা। ইহা সত্যসাগরে মগ্ন হইয়া অমূল্য অত্যাশ্চর্য্য তত্ত্বসকল বাহির করিতেছে। ইহার দৈবজ্ঞানের নিকট পৃথিবীর বড় বড় জ্ঞানীরা পরাভব স্বীকার করিয়া পলায়ন করিতেছেন। নববিধানের দিব্যজ্ঞানের কথা শুনিয়া সর্ব্ব-শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতেরা লজ্জিত ও অধোবদন হইতেছেন। বাহিরে নব-বিধান এত উচ্চ ও গভীর; কিন্তু ইহার ভিতরে কেমন মধুর বাল্যলীলা। ইহার তত্ত্বসকল অতি সুন্দর, ইহার গল্প গুলি অতি সুললিত, অতি সুমধুর। নববিধানগ্রন্থে কেবল বাল্যধর্ম্মই লেখা। বালকেরাই নববিধানের অধ্যাপক ও অধ্যেতা, কুটিলবুদ্ধি বৃদ্ধেরা ইহার বিরোধী। সরলমতি, সুকোমলহৃদয় বালকেরা ইহার বন্ধু। ইহার আচার্য্য বালক, ইহার শ্রোতা বালক। বাল্যলীলা কি? বালক কিরূপে আহার করে? কিরূপে বস্ত্র পরিধান করে? বালক কিরূপে যোগ সাধন করে? কিরূপে আনন্দে বিচরণ করে? বালক নিজে কি আহার করিবে, কি পরিধান করিবে কিছুই জানে না। সেই রূপ নব বিধানাশ্রিত সাধকেরাও কি আহার করিবে, কি পরিধান করিবে কিছুই জানে না। এক দিকে নববিধান স্বর্গের গভীর জ্ঞানতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া প্রবীণ বার্দ্ধক্যকে লজ্জা

দিলেন, আর এক দিকে নববিধান সেই গভীরতত্ত্বসকল অতি সহজ ও সুললিত বালকভাষায় প্রকাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিলেন। বালকসুলভ এই নববিধানের ধর্ম্ম। ইহার বৈকুণ্ঠে কেবল বালকেরাই ক্রীড়া করে। বাল্যকালের ধর্ম্ম সৌন্দর্য্যের ধর্ম্ম। ঈশ্বর সত্যং শিবং সুন্দরং। সত্যসাধন ব্রহ্মপূজার আরম্ভ, ইহাতে আনন্দের সঞ্চার মাত্র হয়। সত্য হইতে শিব পূজা, মঙ্গলের পূজা, আরও আনন্দকর, মঙ্গল হইতে সুন্দরের পূজা সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দকর। যেমন সঙ্গীতে সা, ঋ, গ, ম, প্রভৃতি সুর ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর হয়, সেই রূপ সত্য হইতে শিব, শিব হইতে সুন্দরের পূজা মিষ্টতর হয়। নববিধানের প্রত্যেক সত্য সুন্দর। ইহার ভিতরে একটি সত্য নাই যাহা স্বর্গের সুন্দর বর্ণে বর্ণিত করা না হইয়াছে। ইহার ভিতরে একটি পুতুল নাই যাহা অতি সুন্দর রঙ্গে অনুরঞ্জিত নহে। নববিধানে এমন কোন গদ্য নাই যাহাতে পদ্য কিংবা সঙ্গীতের ছন্দ নাই। নব বিধানের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কবিত্ব এবং সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। পরম সুন্দর ঈশ্বর ইহাঁর সমুদয় অঙ্গে প্রচুর পরিমাণে মিষ্টতা এবং সৌন্দর্য্যরস ঢালিয়া দিয়াছেন। নববিধানের ঈশ্বর যেমন মিষ্ট, স্বর্গ তেমনি মিষ্ট, বিবেকও তেমনি মিষ্ট। ইহার সাধন সৌন্দর্য্যের সাধন। ইহার প্রত্যেক সত্যের সঙ্গে সুধা মিশ্রিত। ঈশ্বর ইচ্ছাপূর্ব্বক অমিয় মাখিয়া এই নববিধান জগতের পরিত্রাণ জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। সৌন্দর্য্যের সাগর ঈশ্বর কি জড়জগতে কি ধর্ম্মরাজ্যে সৌন্দর্য্য বর্ষণ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। কেবল যদি জীবপ্রতিপালন করা তাঁহার উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে প্রজাদিগের জন্য কেবল ধন ধান্য সৃজন করিলেই হইত। কিন্তু তিনি ধান্যক্ষেত্রের নিকটে সুন্দর পুষ্পোদ্যান রচনা করিলেন কেন? সৌন্দর্য্যের আকর হরি বিচিত্র সৌন্দর্য্য দেখাইয়া সন্তানদিগের, ভক্তদিগের চিত্তরঞ্জন করিতেছেন। স্বর্গ ও পৃথিবীতে যত প্রকার সৌন্দর্য্য আছে সমুদয়ের সমষ্টি নববিধান। ঈশ্বর সর্ব্বত্র সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়াছেন। তাঁহার কোন্ কার্য্যে সৌন্দর্য্য নাই? তাঁহার কোন্ স্বরূপে সৌন্দর্য্য নাই? যতই আমরা ঈশ্বরকে দেখি ও তাঁহার কার্য্য অনুশীলন করি, ততই তাঁহার সৌন্দর্য্য হৃদয় মনকে হরণ

করে। দেখিতে দেখিতে প্রিয়দর্শন ঈশ্বর আরও অধিকতর মনোহর হইয়া উঠেন। ঈশ্বরের মুখে সৌন্দর্য্য, তাঁহার চক্ষে সৌন্দর্য্য, তাঁহার পাদপদ্মে সৌন্দর্য্য। ঈশ্বর যখন কথা কহেন কিংবা উপদেশ দেন, তখন তাঁহার মুখে সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয় এবং প্রত্যেক কথায় সুধা ঝরে। ঈশ্বর যখন শরণাগত জনের বক্ষের উপরে তাঁহার অভয় মঙ্গল চরণ স্থাপন করেন, তখন তাঁহার সেই চরণকমলে কেমন কান্তি বিকশিত হয়। ঈশ্বর যখন তাঁহার কোমল প্রেমহস্তে পাপীকে ধরেন, তাঁহার সেই সুকোমল হস্তের কেমন স্বর্গীয় মনোহর লাবণ্য! ঈশ্বর নিজে সুন্দর, তাঁহার সাধু সন্তানেরাও সুন্দর। ঈশা, মুশা, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি সকলেরই কমনীয় মুখশ্রী। তাঁহারা পুণ্য ও প্রেমানুরঞ্জিত বসন পরিধান করিয়া পরম সুন্দরের সঙ্গে সঙ্গে নাচিতেছেন। কিন্তু বুদ্ধির উপাসকগণ ঐ দেখ, নিরানন্দের কাল বসন পরিয়া আছে। তাহারা যতই কুটিল বুদ্ধির অনুসরণ করিতেছে, ততই দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা আসিয়া তাহাদিগের মনের সুখ শান্তি হরণ করিতেছে। ভক্তদিগের রাজ্যে দুঃখ দুর্ভাবনা নাই। সেখানে ঈশ্বরের স্তব স্তুতি, ঈশ্বরের আরাধনা, ঈশ্বরের ধ্যান, তাঁহার নিকট প্রার্থনা, তাঁহার নাম কীর্ত্তন, এবং তাঁহার অনুগত ভক্তসেবা, সমস্ত ব্যাপার সুন্দর ও সুমিষ্ট। সেখানে শুষ্ক স্তব স্তুতি শুষ্ক ধ্যান ও ভাববিহীন কঠোর সেবা নাই। ভক্তরাজ্যে শৃঙ্খলবদ্ধ কঠিন দাসত্ব নাই। ভক্তিবিহীন সাধকদিগের যত সাধন ভজন, যত ধ্যান সেবা, সমুদায় নীরস, এবং মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক। কিন্তু নববিধানের ধ্যান, যোগ, সেবা সমস্ত ভক্তির ব্যাপার, সমস্ত অশেষ সৌন্দর্য্য ও মিস্টতার পরিপূর্ণ। অন্য ধর্ম্মে যোগ তপস্যা ধ্যান এ সমস্ত ভয়ানক কঠোর সাধন। অন্য ধর্ম্মের যোগভূমি বিস্তীর্ণ বালুক্ষেত্র, তাহার মধ্যে এক বিন্দু জল পাওয়া যায় না। তৃষ্ণাতুর শুষ্ককণ্ঠ তপস্বিগণ উত্তপ্ত বালুরাশির উপর বসিয়া যোগ সাধন করিতেছে ও তাহাদের শরীর মন ক্রমে রুক্ষ, উত্তপ্ত, ও কঠোর হইতেছে। অন্যধর্ম্মাবলম্বী যোগীর জল পান করিবার ইচ্ছা হইলে, ধ্যানরূপ মরুভূমি পার হইয়া স্থানান্তরে গিয়া জল পান করিতে হয়। কিন্তু নববিধানের যোগী গভীর যোগের মধ্যেই শান্তিরস

পান করেন। অন্যান্য ধর্ম্মের সেই কঠোর ধ্যানক্ষেত্র নববিধানে কেমন সুন্দর পুষ্পোদ্যানে পরিণত! ভগবানের আজ্ঞাতে এমন কঠোর যে যোগ ধ্যান তাহাও অত্যন্ত মধুময় হইল। নববিধানের লোকেরা অগ্নির মধ্যে বসিয়া ধ্যান তপস্যা করে না, তাহারা ধ্যান করে অমৃতসরোবরের তীরে এবং ছায়াপ্রদ তরুতলে। যখন হৃদয় বৃন্দাবন প্রফুল্ল কুসুমরাজিতে সুশোভিত ও পিককণ্ঠনিঃসৃত সুমধুর তানে আমোদিত হয়, তখন ব্রাহ্ম যোগী তথায় বসিয়া যোগ সাধন করেন। তিনি যাহা কিছু ভাবেন যাহা কিছু চিন্তা করেন সমুদায় সুমিষ্ট। ধ্যান করিয়া যাহারা বিরক্ত বৈরাগী হয় তাহারা নববিধানের প্রণালীতে ধ্যান করে না। সাধুসেবা করিয়া যাহাদিগের মন কঠোর হইয়া যায়, তাহারা নববিধানের বিধি অনুসারে সাধুসেবা করে না। নববিধানের ধ্যান সরস এবং সুশীতল। যতই সেই ধ্যান হয় ততই মন স্নিগ্ধ হয়। ধ্যানহ্রদের উপরিভাগ সংসাররৌদ্রে কিঞ্চিৎ পরিমাণে উষ্ণ থাকিতে পারে কিন্তু নীচেকার জল অত্যন্ত সুশীতল। ধ্যান করিতে করিতে যোগী যখন নিম্নে অবতরণ করেন, শীতল জলে তাঁহার প্রাণ জুড়াইয়া যায় এবং তাঁহার আর উপরে উঠিতে ইচ্ছা হয় না। নববিধানের ধ্যান অতি সুমিষ্ট. নববিধানের যোগানন্দরস অতি সুস্বাদু। নববিধানের সাধুসেবাও অত্যন্ত সরস। অন্যান্য ধর্ম্মে নীতি কেবল কঠোর কর্ত্তব্যসাধন, নববিধানে কঠোরকর্ত্তব্য সাধন নাই। অন্যান্য ধর্ম্মে নানাপ্রকার অনুষ্ঠানের আড়ম্বর, এখানে কোন প্রকার বাহ্যিক আড়ম্বর নাই। যে পরিশ্রমে ধ্যান ভঙ্গ হয়, অথবা উপাসনার ব্যাঘাত হয়, নববিধানে সে পরিশ্রমের বিধি নাই। নববিধানের সাধক সরলপ্রকৃতি বালক। তিনি বালকের ন্যায় আনন্দ মনে হাসিতে হাসিতে তাঁহার প্রভুর কার্য্যালয়ে কার্য্য করেন। প্রভুর কার্য্যে কখনও তাঁহার আলস্য নাই, প্রভুর সেবায় তাঁহার ক্লান্তি বোধ হয় না। কার্য্যক্ষেত্রে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের তাদৃশ সুখ নাই। তাহারা অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া পরিশ্রম করে; কিন্তু নববিধানের ভক্তের ন্যায় প্রভুর প্রসন্ন মুখ দেখিয়া তাঁহার সমক্ষে কার্য্য সাধন করিবার সুখ শান্তি সম্ভোগ করিতে

পারে না। পরিশ্রম করিতে করিতে মনুষ্যমন অবসন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রভুর যথার্থ ভক্ত হাসিতে হাসিতে পরিশ্রম করেন, অনলস হইয়া সর্ব্বদা প্রভুর আজ্ঞা পালন করেন, পর সেবা করেন, ক্ষুধিতকে অন্ন দেন, রোগীকে ঔষধ দেন, বিপন্নকে সাহায্য দান করেন, অজ্ঞানকে জ্ঞান দেন এবং ভ্রমান্ধকে সৎপথে আনেন। তাঁহার পক্ষে এ সমস্ত ঠিক যেন বাল্যক্রীড়া। তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বার্থ ও অভিমান শূন্য হইয়া পরের দেহ মনের দুঃখ হরণ করেন। যথার্থ নববিধানের যিনি বিশ্বাসী সাধক তিনি চব্বিশ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়াও প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় উজ্জ্বল ও সহাস্যবদন। যতই তিনি তাঁহার প্রভুর সেবা করেন ততই তাঁহার হৃদয় আরও ক্রমশঃ প্রফুল্ল হয়। কার্য্য এখানে সুমধুর। বালকের রাজ্য অতি সুমিষ্ট ও সুন্দর। সরলপ্রকৃতি বালকেরই নববিধানে অধিকার। কুটিলবুদ্ধি বৃদ্ধেরা নববিধান বুঝিতে পারে না। নববিধানের ছোট ছোট কথা সুধামাখা, উহা কবিত্বপূর্ণ। ইতিহাসে লেখা আছে প্রত্যেক জাতি বাল্যকালে পদ্যপ্রিয় ছিল। বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যখন কোন জাতি বুদ্ধির অবস্থায়, সভ্যতার অবস্থায় পদার্পণ করে, তখনই সেই জাতি কবিতা ও পদ্য পরিত্যাগ করিয়া শুষ্ক কঠোর গদ্য ব্যবহার করে। যেখানে সভ্যতা সেখানে বিদ্যার অভিমান, সেখানে শুষ্কতা, সেখানে গদ্য। বালকের বুদ্ধি নাই, স্বাভাবিক সংস্কার ও অনুরাগ হইতে তাহার সকল কথা বিনিঃসৃত হয়। সুতরাং তাহার জিহ্বা অবলীলাক্রমে কেবল পদ্য বলে। চেষ্টা করিয়া বহু আয়াসে শব্দাড়ম্বর সহকারে গদ্য রচনা করিতে বালক ভাল বাসে না, বালক পদ্য ভাল বাসে, পদ্য বলে, পদ্য পাঠ করে, পদ্যেতে রচনা করে। এখন অস্মদ্দেশে বাল্যধর্ম্ম পুনরায় আসিয়াছে। ইহার একটি প্রমাণ এই যে এখন পদ্য ও সঙ্গীতের প্রাদুর্ভাব হইতেছে। আমরা নিশ্চিতরূপে জানিতেছি বঙ্গদেশে সত্যযুগের বাল্যকাল সমাগত। এখন আমরা স্বর্গের আশ্চর্য্য গল্প সকল শুনিতেছি। বালক গল্প, রূপক, তুলনা, অত্যন্ত ভালবাসে। বালক সৌন্দর্য্য দেখিয়াই মোহিত হয়। বালক বলে না যে আমি জ্ঞান বিজ্ঞান সাধন করিব? যখনই বালক চিত্তরঞ্জন সুধাংশু দেখিতে পায়

সে হাসিয়া বলে আমি ঐ চাঁদকে ধরিব। জ্যোৎস্নাপিপাসু হইয়া বালক চাঁদ ধরিতে চায়। আত্মা সেইরূপ বাল্যাবস্থায় চাঁদ হরিকে ধরিতে যায়। তাঁর জ্যোৎস্নায় মুগ্ধ হইয়া সে আর থাকিতে পারে না; কেবল বলে, চাঁদ আয় চাঁদ আয়। যেখানে দেখিবে উপদেষ্টা অধিক পরিমাণে গল্পচ্ছলে উপদেশ দিতেছেন, সেখানে জানিবে সেই উপদেষ্টা সেই আচার্য্য নববিধানের উপদেষ্টা ও আচার্য্য। আর যেখানে কবিত্ব নাই, সৌন্দর্য্যরস নাই, কেবল কঠোর নীতিতত্ত্ব যাহাতে লোক মোহিত হয় না, সেখানে পুরাতন বিধান। সেখানে কেহ বলিবে না, আমি চাঁদ ধরি, অথবা চাঁদ দেখি। হে বৃদ্ধ ব্রাহ্ম, যদি সুখী হইতে চাও তবে আবার যৌবনের ভিতর দিয়া বাল্যাবস্থায় প্রবেশ কর। যাই আবার বালক হইবে, অমনি কুটিল বুদ্ধি ও যুক্তির পথ পরিত্যাগ করিয়া সহজে বলিতে পারিবে আমি ঈশ্বরকে দেখি, আমি ঈশ্বরকে ধরি। ব্রহ্মের সত্ত্বা উপলব্ধি, ব্রহ্মস্বরূপ অবধারণ, বালক এ সকল কঠোর তত্ত্বকথা বলে না। ভক্ত শিশু বলে, আমি ব্রহ্মকে দেখি, আমি ব্রহ্মকে ধরি। যাই একটি ভক্ত বালক স্বর্গরাজ্য হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল "ভাই, আমি ঈশ্বরকে দেখিয়াছি, ঈশ্বরকে ধরিয়াছি" তখন তাহার কথা শুনিয়া শত শত বালক মোহিত হইল। এই এক দর্শন কথা সমস্ত জগৎকে মোহিত করিবে। বালক বলিল আজ প্রেমচন্দ্রকে দর্শন করিলাম এবং তাঁহার সুধা পান করিলাম। কুটিল বুদ্ধি বৃদ্ধের জিহ্বা অত্যন্ত কঠিন, এই জন্য সে এই সুমধুর কথা বলিতে পারে না. সে নানা প্রকার যুক্তি তর্ক দ্বারা সিদ্ধান্ত করে যে যাঁহার কোন আকার কিংবা মূর্ত্তি নাই তাঁহার সম্পর্কে দর্শন কথা ব্যবহার হইতে পারে না। সে তাহার বুদ্ধি দ্বারা ভক্তির সৌন্দর্য্য ও কবিত্ব অনুভব করিতে পারে না। নববিধানে সাধকেরা পদ্যপ্রিয়, সৌন্দর্য্যপ্রিয়, তাঁহাদিগের কথা উপমার কথা, [illegible]ক কথা। তাঁহারা নির্ভয়ে সরল অন্তরে আপনাদিগের মনের ভাব ব্যক্ত করেন, তাঁহাদের কথা শুনিয়া অন্যে কি ভাবিবে কি বলিবে, তাহা তাঁহারা ভাবেন না। পার্শ্বে কএক জন বৃদ্ধ বসিয়া আছে তাহারা তাঁহাদের কথা শুনিয়া উপহাস করিবে, এই ভয়ে তাঁহারা ভীত কিংবা লজ্জিত হন না। তাঁহারা ব্যাকরণের

সমাস সন্ধি সহকারে বড় বড় শব্দের আড়ম্বর করিয়া কোন কথা বলেন না। তাঁহারা লোকনিন্দাকে ভয় করেন না, তাঁহারা আপনার মনের আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন এবং যাহা ইচ্ছা তাহাই বলেন। তাঁহাদের ব্যাকরণ কিংবা বিজ্ঞানের অনুরোধ রক্ষা করিতে হয় না। বালকের কথা মধুর কথা, আশাপূর্ণ কথা, বৃদ্ধের কথা কর্কশ এবং নিরাশপূর্ণ। অতএব বন্ধুগণ, বালকের ন্যায় সরল ও কোমল হইয়া সুন্দর হরির পূজা কর। বৃদ্ধদিগের বিজ্ঞান অভিমান ছাড়। কুটিল বুদ্ধির নির্জীব ও সৌন্দর্য্য-বিহীন ঈশ্বরকে পরিত্যাগ কর। চিরকাল এই নববিধানের মধ্যে থাকিয়া ইহার সত্য শিব সুন্দর ঈশ্বরের পূজা কর। ঈশ্বর যখন সুন্দর হইয়া তোমাদের মধ্যে প্রকাশিত হইবেন, তখন তোমাদের মন ভক্তি ও আনন্দরসে প্লাবিত হইবে, এবং তোমাদের মুখ হইতে অনর্গল সুন্দর ও সুমিষ্ট কথা বাহির হইবে। সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণ হইতে সৌন্দর্য্য নির্গত হইবে। অতএব সকলে নিত্য সৌন্দর্য্যের পূজা কর। বালকস্বভাব সৌন্দর্য্য ভাল বাসে এবং সৌন্দর্য্য দর্শন মাত্র মুগ্ধ হয়। বালকের কাছে যে পুতুল সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর তাহাই সে সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করে। যদি কুটিলতা ও বুদ্ধির পথ পরিত্যাগ করিয়া তোমরা সরল হও তাহা হইলে বালক-সুলভ স্বর্গ অনায়াসে তোমাদিগের হস্তগত হইবে।
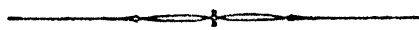
সেবকের নিবেদন।

ব্রাহ্মসমাজ ও নববিধান।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ১৭ পৌষ, ১৮০২ শক।

দুই জন ঈশ্বরপ্রেরিত সাধু যথাসময়ে বঙ্গদেশের অন্ধকার ভেদ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মপ্রেমের পথ প্রকাশিত করিয়াছেন। সেই দুই জনের নাম অনেকেই জানেন, বলা বাহুল্য। এক জন এই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন, আর এক জন অনেক বৎসর এই ব্রাহ্মসমাজ পরিপোষণ করিয়াছেন। এক জন ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়া বঙ্গদেশের ভ্রম, কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা প্রভৃতি অন্ধকার অনেক পরিমাণে দূর করিলেন, আর এক জন ব্রহ্মপ্রেম প্রচার করিয়া ব্রহ্মোপাসনাকে পরিপুষ্ট করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে পরিণত করিলেন এবং বিধিপূর্ব্বক ব্রাহ্মসমাজ গঠন করিলেন। এক জন জ্ঞানাস্ত্রে ভারতবর্ষের অনেক শতাব্দি সঞ্চিত ভ্রমজাল এবং জঙ্গল কাটিলেন, আর এক জন ব্রহ্মপ্রেম প্রকাশ করিয়া নানাস্থানের লোককে একত্র করিয়া সেই পরিষ্কৃত ভারতভূমিতে একটি উপাসকমণ্ডলীরূপ উদ্যান প্রস্তুত করিলেন। ইহাঁরা উভয়েই ভারতবর্ষের প্রাচীন কালের বেদ-বেদান্তপ্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনাতে জীবনকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই দুই জন সাধু মহাত্মা ধন্য। ইহাঁদিগকে ব্রাহ্মসমাজ চিরদিন অবনত মস্তকে কৃতজ্ঞতার সহিত নমস্কার করিবে। এই দুই জনের সাহায্যে হিন্দুসমাজ হিন্দু থাকিয়া যত দূর উন্নত হইতে পারে উন্নত হইয়াছে। এই দুই জন আপন আপন হৃদিস্থিত ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মানুরাগ বলে হিন্দুসমাজকে অনেক দূর উন্নত ও বিশুদ্ধ করিয়া অবশেষে এত দূর

উচ্চ স্থানে আনয়ন করিয়াছিলেন যে, সে স্থানে হিন্দুসমাজ আর কেবল হিন্দুসমাজ থাকিতে পারিল না। তাঁহাদিগের দ্বারা সংস্কৃত সেই হিন্দু সমাজ তখন বিস্তীর্ণ পৃথিবীর দৃষ্টিপথে পড়িল। পৃথিবীর দশ দিক হইতে নানাজাতি আসিয়া তখন সেই সংস্কৃত সমাজকে বলিল ;—"স্বার্থপর হিন্দুসমাজ, ঈশ্বরের সত্য কত কাল আর তুমি কেবল আপনার জাতির মধ্যে বদ্ধ রাখিবে? আমরা কি ঈশ্বরের কেহ নহি; আমরা কি তোমার সত্যরাশির অংশগ্রহণে অধিকারী নহি? হে হিন্দু, কি কারণে তুমি অপরাপর জাতিকে তোমার স্বর্গীয় সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবে?" এ সকল কথা শুনিবামাত্র সঙ্কীর্ণ ব্রাহ্মসমাজের স্বার্থপরতা বন্ধন খসিয়া পড়িল। হিন্দুসমাজ আপনার ভ্রান্তি ও সংকীর্ণতা বুঝিতে পারিলেন। কেবল স্বীয় জাতির প্রতি পক্ষপাতী হইয়া জগতের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করা যে অনুচিত ব্রাহ্মসমাজ তাহা বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তখন ঝনাৎ করিয়া হিন্দুস্থানের দ্বার উন্মুক্ত হইল। চিন দেশ হইতে আমেরিকা পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত দেশ ও যত জাতি আছে সমুদয় হিন্দুস্থানে প্রবেশ করিল। সমুদয় জাতি আসিয়া হিন্দুস্থানের ধর্ম্মকে আপন আপন ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিল। গগনে উড়িতেছিল কেবল হিন্দুধর্ম্মের নিশান, সড়াৎ করিয়া এখন সেই নিশান ভূতলে পড়িয়া গেল, হিন্দুধর্ম্মের নিশানের পরিবর্ত্তে এখন গগনে সার্ব্বভৌমিক নববিধানের নিশান উড়িল। ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্ম এত দিন কেবল হিন্দুস্থানের ব্রহ্ম ছিলেন, এখন তিনি সমস্ত জগতের ব্রহ্ম হইলেন। যেখানে কেবল বেদ বেদান্তের আদর ছিল, সেখানে বেদ, পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ, ললিতবিস্তার প্রভৃতি সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্র আসিল। নববিধানানুসারে যেমন বেদ বেদান্ত পবিত্র, তেমনি বাইবেল, কোরাণ, ও বৌদ্ধশাস্ত্রও পবিত্র। নববিধানের ডালে বসিয়া হিন্দু পাখীদের সঙ্গে খৃষ্টান পাখী মুসলমান্ পাখী, বৌদ্ধ পাখী সকলে একত্র হইয়া স্বরে স্বরে মিশাইয়া ব্রহ্মনাম গান করিতে লাগিল। নববিধানে জাতিভেদ, স্থানের ব্যবধান, কালের ব্যবধান রহিল না। নববিধানে সকল জাতি এক মনুষ্যজাতিতে পরিণত হইল। নববিধানে গঙ্গাজলের সহিত টেম্‌সনদীর জল সম্মিলিত

হইল। নববিধানের আমেরিকাস্থিত প্রকাণ্ড এনৃডিস গিরিশিখরোপরি হিমালয় চড়িল। নববিধানে বঙ্গীয় সাগরের সঙ্গে পেসেফিক্ সমুদ্র এবং আটলান্টিক সমুদ্র এক হইয়া গেল। নববিধানের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে এক দিকে একটি সূর্য্য ছিল, নববিধানের আগমনে দশ দিকে কোটি সূর্য্য প্রকাশিত হইল। পূর্ব্বোক্ত দুই মহাত্মা বঙ্গদেশের হিন্দুসমাজকে এত দূর উন্নত করিয়াছেন যে সেই উন্নতির অবস্থায় নববিধান অনিবার্য্য। ব্রাহ্ম সমাজ এই দুই জনের দ্বারা এত দূর উচ্চ অবস্থায় আনীত, যেখানে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে ইহার যোগ হইবেই হইবে। পৃথিবীর সঙ্গে দেখা হইবামাত্র সঙ্কীর্ণ ব্রাহ্মসমাজ প্রশস্ত হইয়া বিশ্বব্যাপী হইল। নববিধান পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম্মকে আপনার ভিতরে বিলীন করিলেন, ইনি সমুদয় ধর্ম্ম হইতে ঈশ্বরের সম্পত্তি আপনার অধিকার বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আদিম অবস্থা হইতে পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত যত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, নববিধান সমুদয় হইতে সার ব্রহ্মতত্ত্ব গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পৃথিবীও নববিধানের নিকট আপনার সমস্ত উৎকৃষ্টতম সমগ্রীসকল আনিয়া উপস্থিত করিল। পৃথিবী নববিধানকে বলিলেন, "হে নববিধান, আমাকে ঈশ্বর যত প্রকার সত্যরত্ন, সৌন্দর্য্য, এবং মহত্ত্ব দিয়াছেন, সে সমস্ত তোমার হইল। বেদ বেদান্ত, পুরাণ তন্ত্র, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্র তোমার। তুমি কিছুই পরিত্যাগ করিতে পার না। বেদ বেদান্তের পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহাও তোমার। তুমি কেবল এক দেশের কিংবা এক যুগের সচ্চরিত্র সাধুদিগকে ভক্তি করিয়া ক্ষান্ত হইতে পার না, তুমি আদরের সহিত পৃথিবীর সমুদয় সাধুদিগকে বরণ কর।" প্রকাণ্ড নববিধানের প্রাদুর্ভাবে হিন্দুস্থানের চারিদিগের সীমা ভাঙ্গিয়া গেল। হিন্দুর সঙ্কীর্ণ ঠাকুরঘর বিস্তৃত ও প্রশস্ত হইল। হিন্দুর ভাগিরথীর দুই পার্শ্ব ভাঙ্গিয়া গেল। সকলই জলময়, নববিধানের অকুল সাগরে সমুদায় ডুবিল। নববিধান ইহকাল পরকাল এবং সমস্ত স্বর্গ মর্ত্ত্য আলিঙ্গন করিয়াছেন। পূর্ব্বকার বেদ বেদান্তের সীমা ছিল, এখনকার বেদের সীমা নাই। এখনকার বেদ সত্য। নববিধান মতে সত্যই বেদ, সুতরাং সত্যের অন্ত নাই। পূর্ব্বে দশ অবতার ছিল, এখন অপরাপর ধর্ম্মের সমুদয়

অবতারও ঐ দলে সন্নিবিষ্ট হইল। নববিধানের সকলই অসীম। ইহাতে কিছুই সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক নাই। কোন বিশেষ দেশ কিংবা কোন বিশেষ কালে বদ্ধ নহে। যখন বেদ বাইবেল ছিল না, তখনও নববিধান ছিল এবং যখন বেদ বেদান্ত কিছুই থাকিবে না, যখন সমস্ত পৃথিবী চলিয়া যাইবে তখনও ইহা থাকিবে। পৃথিবীর সকল বিধান যাহার মধ্যে নিহিত তাহাই নববিধান। যাহা সমুদয় বিধানকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করে না, তাহা নববিধান নহে। নববিধান প্রকাণ্ড, ইহার বাহু অত্যন্ত দীর্ঘ ইহার তনু বীরের ন্যায় বৃহৎ। কিরূপে ইহা সংকীর্ণ বস্ত্রে বদ্ধ থাকিবে? যেমন ইনি বাহু প্রসারণ করিলেন তৎক্ষণাৎ ক্ষুদ্র গাত্রাবরণ ছিঁড়িয়া গেল। প্রকাণ্ড হস্তী একবার আস্ফালন করিল, আর চারি দিকের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। যাঁহার বাসগৃহ সমস্ত পৃথিবী তিনি কিরূপে হিন্দুর একটি ছোট ঘরে অবরুদ্ধ থাকিবেন? প্রকাণ্ড আকাশ কি আর্য্য মুষ্টিতে বদ্ধ থাকিবে? নববিধান সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। নববিধানের মস্তক স্বর্গে, হস্ত দ্যুলোকে, চরণ পাতালে। প্রকাণ্ড বিধান দেশ কালে অপরিচ্ছিন্ন। যে দিন হইতে আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছি সেই দিন হইতে প্রশস্ততর পথে অগ্রসর হইতেছি। যে ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল হিন্দুস্থানের ধর্ম্ম ছিল, সেই ব্রাহ্মধর্ম্ম এখন সমস্ত পৃথিবীর, সমস্ত মানবমণ্ডলীর ধর্ম্ম হইল। নববিধান কেবল হিন্দুদিগের সঙ্গে সৌহার্দ্দ স্থাপন করিয়া ক্ষান্ত নহেন, ইনি পৃথিবীর সমুদয় জাতির সঙ্গে বন্ধুতাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন। এই নববিধান ঈশ্বরকে প্রেমদান করিয়া ঈশ্বরের সমুদয় সন্তানকে ভাল বাসিতে শিখিয়াছেন। নববিধান বলিলে ইহার সঙ্গে পৃথিবীর সমুদয় পুরাতন বিধানের ভিন্নতা ও যোগ উভয়ই বুঝায়। ইহা একটি বিধান, সুতরাং ইহার সঙ্গে অন্যান্য বিধানের সাদৃশ্য আছে। ইহা নূতন বিধান সুতরাং অপরাপর সমুদায় বিধান হইতে ইহা বিভিন্ন। একটির পর আর একটি এইরূপে যত গুলি বিধান সৃষ্টি অবধি আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে তাহার পূর্ণতা এই বর্ত্তমান বিধানে সমাধা হইল। যদিও নববিধান হিন্দুস্থানের গর্ভে জাত, তথাপি ইহার সঙ্গে সমস্ত পৃথিবী সম্বন্ধ আছে। ইনি একটি ক্ষুদ্র দেশের রাজা নহেন, ইনি বিস্তীর্ণ রাজ্যের রাজা। কয়েক জন হিন্দু প্রজা

ইহাঁকে কর দিতেছে, ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। জগজ্জননীর ইচ্ছা যে ইনি সমস্ত বিশ্বরাজ্য অধিকার করেন। সেই জন্য দেখ ইহাঁর দক্ষিণ বাহু হিমালয়কে ধরিয়াছে এবং বাম বাহু ইউরোপকে ধরিয়াছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ সমুদায় ইহাঁর রাজ্যান্তর্গত। কোথায় ইহুদী বিধান, কোথায় বৌদ্ধবিধান, কোথায় গৌরাঙ্গ বিধান, কোথায় মুসলমান বিধান, কোথায় শিক বিধান, সমুদায়ের সঙ্গে ইনি সম্বদ্ধ। নববিধান কিছুই ভাঙ্গিতে আসেন নাই। ইনি সমুদায় ধর্ম্মবিধান পূর্ণ করিতে আসিয়াছেন। ইনি হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান্, মুসলমান্ সকল ধর্ম্মকে পূর্ণ করিবেন। ইহাঁর নিকটে কোন ধর্ম্মাবলম্বী এবং কোন জাতি অপদস্থ বা উপেক্ষিত হইবে না। ইহাঁর নিকটে যিনি যাহা চাহিবেন তিনি তাহা পাইবেন। যাঁহার যে অভাব তাহা ইনি পূর্ণ করিবেন। এই নববিধান পৃথিবীর সমুদায় ধর্ম্মের সত্যমালার সমষ্টি। ইহাতে সমস্ত ধর্ম্ম ও নীতি একীভূত। এই নববিধানকে টানিতে গেলে, জড়রাজ্য, মনোরাজ্য ধর্ম্মরাজ্য সমস্ত সঙ্গে সঙ্গে আকৃষ্ট হয়। বস্তুবিজ্ঞান, প্রকৃতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান সমাজ-বিজ্ঞান, রাজ্যবিজ্ঞান ধর্ম্মবিজ্ঞান সকল প্রকার বিজ্ঞান নববিধানের অন্ত-র্গত। ইনি বিজ্ঞানবিরোধী নহেন, ইনি বিজ্ঞানের বন্ধু। নববিধান আকাশের বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ তারা, এবং পৃথিবীর সাগর পর্ব্বত সক-লের সঙ্গে ঈশ্বরের নামে সংযুক্ত এবং সকল বস্তুর ভিতরে ইনি সার্ব্ব-ভৌমিক ধর্ম্ম উপলব্ধি করেন। নববিধান আর্য্যজাতি, ইহুদীজাতি, মুসল-মানজাতি প্রভৃতি সকল জাতিকেই আপনার বলিয়া গ্রহণ করেন, কাহারও পক্ষে পর নহেন। ইনি যোগ, ভক্তি, জ্ঞান, সেবা, ফকীরী বৈরাগ্য, প্রভৃতি ধর্ম্মের সমুদয় অঙ্গকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করেন। নববিধান ঈশ্বরের কোন সামগ্রীকে পরিত্যাগ করেন না। নববিধান, সজন নির্জ্জন, পারিবারিক, সামাজিক, সকলপ্রকার সাধন ভজনের প্রতি অনু-রাগী। ইনি ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, সাধু অসাধু, অসভ্য সুসভ্য সক-লকেই আপনার আশ্রয় দেন। ইনি ঈশ্বরের কোন সন্তানকে অবজ্ঞা করেন না। ইনি প্রাচীন আধুনিক সকল জাতিকে সম্মান করেন। ইনি বালক যুবক, বৃদ্ধ, স্ত্রী সকলকে যথোপযুক্ত আদর ও সম্ভ্রম প্রদান করেন।

ইনি ঈশ্বর, পরলোক, বিবেক, প্রভৃতি ধর্ম্মবিজ্ঞানের যত গূঢ় সত্য আছে সমুদায় স্বীকার করেন। নববিধান বিজ্ঞানের ধর্ম্ম। ইহার মধ্যে কোন প্রকার ভ্রম, কুসংস্কার, অথবা বিজ্ঞান বিরুদ্ধ কোন মত স্থান পাইতে পারে না। হে নববিধান, তুমি অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মবিধানের চাবি, যাই তোমাকে অন্যান্য ধর্ম্ম-সিন্ধুকের কুলুপে সংলগ্ন করিলাম তন্মধ্যে যত ধর্ম্মরত্ন গুপ্ত ছিল সমুদায় প্রকাশিত হইল। তোমার প্রসাদে অন্যান্য সমুদায় ধর্ম্মের তাৎপর্য্য বুঝিলাম। ইহুদী মুসলমান্ বন্ধুগণ, তোমরা এত দিন গালে হাত দিয়া ভাবিতেছিলে তোমাদের ধর্ম্মের গৌরব কেহ বুঝিতে পারিল না, আজ নববিধানের প্রসাদে তোমাদের আদর হইল। বৈষ্ণব ধর্ম্ম, তোমাকেও জগৎ ভালরূপে জানিত না, সভ্য ও জ্ঞানীরা তোমাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিত। নববিধানের আবির্ভাবে তোমার নিগূঢ় তত্ত্বসকল আবিষ্কৃত হইতে লাগিল এবং তোমার সম্মান বাড়িল। এই নববিধান প্রত্যেক ধর্ম্ম হইতে অমৃত উদ্ধার করিবেন। ইনি পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম্ম হইতে সত্যরত্ন বাহির করিবেন। ইনি সকলকে উদ্ধার করিবেন। সকলে ইহাঁর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ইনি সমুদায় ধর্ম্মের সার লইয়া জগৎকে প্রকৃত ধর্ম্মবিজ্ঞানের সামঞ্জস্য ও মিলন বুঝাইয়া দিবেন। ইনি সকল শাস্ত্রকে এক মীমাংসাশাস্ত্রে পরিণত করিবেন। ইনি পৃথিবীর সমুদায় মহাপুরুষ এবং ভক্ত যোগীদিগকে এক আসনে আদর করিয়া বসাইবেন। সকলেই নববিধানের সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া ইহাঁকে এক দিন প্রণাম করিবে। আমাদিগের বন্ধু নববিধান, তুমি এত দিন ছিলে কোথায়? তোমা বিহনে হিন্দু বৌদ্ধ, খৃষ্ট, মুসলমান্ সকলেই পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করিত এবং সকলেই ভ্রাতৃবিরোধনিবন্ধন দুঃখে কষ্টে ম্লান ছিল। তুমি এত কাল কেন আমাদের মধ্যে আসিয়া বিবাদভঞ্জন করিলে না? নববিধান আগে যদি আসিতে সকল দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিতে পারিতে। কিন্তু তুমি আপন ইচ্ছায় আসিতে পারিতে না। ভগবান্ তোমাকে যথাসময়ে পাঠাইলেন। যাহা হউক, তোমার আগমনে পৃথিবীর আশা ও আনন্দ হইল। তোমার প্রভাবে পৃথিবীর চারি দিক্ হইতে দলে দলে লোক আসিয়া পরস্পরের হস্ত ধারণ করিতে লাগিলেন। জয় নববিধানের জয়, জয় নববিধানের জয়!!

সেবকের নিবেদন।

ঈশা এবং চৈতন্যের গূঢ় যোগ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ৪ আশ্বিন, ১৮০২ শক।

লোকে বলে যে মহর্ষি ঈশার সঙ্গে ভক্তোত্তম শ্রীচৈতন্যের ঘোরতর বিবাদ। এই বিবাদের আশু মীমাংসা কর্ত্তব্য। সাধারণ লোকের এই সংস্কার, শ্রীচৈতন্যের একটি উপদেশ মহর্ষি ঈশার উপদেশের বিরুদ্ধ। দুই জনের দুই বিধি। অর্থাৎ যে বিষয়ে এক জনের বিধি সেই বিষয়ে অপরের স্পষ্ট নিষেধ। এই দুইয়ের মধ্যে কোনটি সত্য পৃথিবী তাহা জানিবার জন্য ব্যাকুল। পৃথিবী মহামহিম ঈশার নিষেধ মানিবে, না শ্রীগৌরাঙ্গের বিধি পালন করিবে? এক জনকে আদর করিলে যদি অন্যের প্রতি অবজ্ঞা হয়, এক জনকে গ্রহণ করিলে যদি অন্যকে বিসর্জ্জন দেওয়া হয়, এই ভয়ে পৃথিবী আকুল। বিষম সঙ্কট। বুদ্ধি যদি একের ধর্ম্মকে গ্রহণ করিয়া অন্যের ধর্ম্ম অবলম্বনীয় নহে বলিয়া সিদ্ধান্ত করে, তাহা হইলে বুদ্ধির অপরাধ হইবে। নববিধান বলিতেছেন দুইয়েরই মান্য রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু কোথায় দুইয়ের সম্মিলন পৃথিবী তাহা জানে না। পৃথিবী মনে করে, ঈশা এবং গৌরাঙ্গের সঙ্গে এ বিষয়ে চিরবিবাদ থাকিবে। কি বিষয়ে এই দুই জনের বিরোধ? ঈশ্বরের নাম গ্রহণ সম্পর্কে। ঈশা বলেন “ বৃথা অনেকবার ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিবে না, ঈশ্বরের নাম উচ্চারণসম্পর্কে বহুভাষী হইবে না, নিরর্থক ঈশ্বরের নামের পুনরুক্তি করিবে না, সংক্ষেপে ঈশ্বরের নাম লইবে। বিশাল ভক্তির সহিত এক বার ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট। ঈশ্বরের কাছে অল্প কথাতে প্রার্থনা

করিবে, ঈশ্বরের নামসম্পর্কে বহুভাষা, পুনরুক্তি ত্যাগ করিবে। পুনরুক্তি দোষ ও নামাপরাধ হইতে রসনা এবং হৃদয়কে সর্ব্ব প্রযত্নে চিরকাল দূরে রাখিবে।" পক্ষান্তরে শ্রীচৈতন্য বলেন;—"অবিশ্রান্ত হরি নাম সাধন করিবে, হরি নাম করিতে করিতে উন্মত্ত হইবে, যত বার পার হরি নাম করিতে করিতে প্রাণকে আনন্দিত করিবে। হরি নামে ক্রমশঃ পুণ্যবৃদ্ধি শান্তিবৃদ্ধি এবং অবশেষে আনন্দোচ্ছ্বাস হইবে।" এই দুই উপদেশ আপাততঃ পরস্পর এত দূর বিপরীত বোধ হয় যেমন উত্তর ও দক্ষিণ। তবে কি প্রাণের ঈশা এবং প্রাণের গৌরাঙ্গের সঙ্গে বন্ধুতা ও ঐক্য নাই? তাঁহারা দুই জন কি পরস্পরের বিরোধী? শ্রীচৈতন্যের উপদেশ কি মহর্ষি ঈশার কথার প্রতিবাদ? দুই জন যদি পৃথিবীতে এক সময়ে আসিতেন, তাঁহারা কি পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করিতেন, না পরস্পরের মধ্যে গূঢ় সম্মিলন দেখাইতেন? নববিধান তাঁহাদিগের উভয়ের মধ্যে প্রাণগত গূঢ় যোগ দেখিতে পাইয়াছেন। অতএব এই বিষয়ে নববিধানের বিচার নিষ্পত্তি জগতে ঘোষণা করা নিতান্ত আবশ্যক। কোন টোলের পণ্ডিত কিংবা কোন বিজ্ঞানবিদ্ যাহার মীমাংসা করিতে পারেন না, নববিধান তাহার মীমাংসা করেন। আমাদিগের মনে এই আশা রহিয়াছে, ধর্ম্মরাজ্যে যত কঠিন গূঢ় সমস্যা আছে নববিধান সে সমুদায়ের মীমাংসার পথ আবিষ্কার করিবেন। নববিধান দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত বলিতেছেন, উল্লিখিত বিষয়ে মহর্ষি ঈশার কথাও ঠিক, ভক্ত শ্রীচৈতন্যের কথাও ঠিক। ভাববিহীন হইয়া বারম্বার এক শব্দ উচ্চারণ করিলে হৃদয় কঠোর হইতে পারে, এই আশঙ্কায় মহর্ষি ঈশা বারংবার নিরর্থক ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। বৃথা পুনরুক্তি ঈশার অনভিপ্রেত। বাস্তবিক ভাববিহীন হইয়া যদি বারংবার ঈশ্বরের নাম কর, তাহাতে ঈশ্বরের নামের অবমাননা এবং সুতরাং তোমার পাপ হইবে। ভক্তিবিহীন হইয়া বারংবার ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিলে পরিত্রাণ লাভ করা দূরে থাকুক তাহাতে হৃদয় কঠোর এবং মলিন হয়। যদি ভক্তিশূন্য বহুভাষণ দ্বারা স্বর্গলাভ হইত তাহা হইলে কলিকাতা এবং ভারতবর্ষের বহুভাষী সম্প্রদায় সর্ব্বাগ্রে বৈকুণ্ঠধামে যাইত। কিন্তু স্বর্গ বহুভাষীর জন্য নহে। স্বর্গ বহুভাষণ

হইতে অনেক দূরে রহিয়াছে। ভাববিহীন হইয়া অনেক কথা কহা পাপ। এক শব্দ এক ভাবে দুই বার উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ। শব্দের প্রাণ ভাব। নব নব ভাবের সহিত যদি এক শব্দ বারংবার উচ্চারণ করিতে পার তাহাতে হৃদয় সরস হইবে; কিন্তু নূতন ভাববিহীন হইয়া যদি এক নাম বারংবার উচ্চারণ কর তাহাতে কপটতা ও কঠোরতা বৃদ্ধি হইবে। আবার এক দিকে যেমন ভাববিহীন পুনরুক্তি অথবা বহুভাষণ পাপ, তেমনি অন্য দিকে সংক্ষেপে দুই একটি উপাসনার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ঈশ্বরকে ফাঁকি দেওয়া, প্রতারণা করা ভয়ানক অপরাধ। যদি সংক্ষিপ্ত উপাসনা অথবা অল্পকথায় জীবের পরিত্রাণ হইত তাহা হইলে পৃথিবীর অধি-কাংশ লোক এখনই স্বর্গারোহণ করিত। ভাববিহীন হইয়া অনেক কথা বলাও পাপ, আবার ভাবশূন্য হইয়া অল্প কথায় ঈশ্বরকে প্রবঞ্চনা করাও পাপ। মহর্ষির কথা এবং ভক্তের কথা উভয়ই পালন করিতে হইবে। মহর্ষির উপদেশানুসারে ভাবশূন্য পুনরুক্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে, ভক্তের আদেশ মতে নব নব ভাবের সহিত বারংবার হরি নাম উচ্চারণ করিয়া প্রেমোন্মত্ত হইতেই হইবে। উভয়ের উপদেশের গূঢ় ভাবার্থ গ্রহণ করিতে হইবে। সাধারণ লোক এই দুই আপাততঃ বিরুদ্ধ মতের ভাবার্থ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ কল্পনা করে। আত্মবিশ্বাসী অসাড়হৃদয় লোক সর্ব্বদা ভাবের সহিত ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিতে পারে না। এই জন্য তাহারা প্রায়ই পুরোহিতের উপরে ঈশ্বরোপাসনার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হয়। প্রায় সকল দেশেই পুরো-হিতের দ্বারা দেবপূজা করাইয়া লওয়ার প্রথা দেখা যায়। পুরোহিতকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া যদি অল্প মূল্যে স্বর্গে যাওয়া যায়, তবে আর কেন গৃহস্থ নিজে কষ্ট স্বীকার করিবে? নিজের নির্জীবতা এবং সংসারাসক্তি ঢাকিয়া রাখিবার জন্য নির্ব্বোধ মানুষ প্রতিনিধি দ্বারা পুরোহিতের দ্বারা দেবার্চনা সমাধা করিয়া লয়। ব্রহ্মজ্ঞানীরা পুরোহিত রাখিতে পারে না। তাঁহাদিগের ব্রহ্মের আদেশ এই যে তাঁহারা ব্রহ্মের অব্যবহিত সন্নিধানে আরা-ধনা করিবেন, কিন্তু যে সকল ব্রহ্মজ্ঞানী একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া ব্রহ্মের অব্যবহিত সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অর্চনা করিতে কুণ্ঠিত হন,

তাঁহারা একটি পুরোহিত দ্বারা ব্রহ্মপূজা নির্ব্বাহ করেন। অন্যান্য লোক এবং ব্রাহ্মের এই প্রভেদ যে অন্যান্য লোকের পুরোহিত বাহিরে, ব্রাহ্মের পুরোহিত আপনার শরীরের মধ্যে। সেই পুরোহিতের নাম রসনা। যখন হৃদয় মন নির্জীব ও অচেতন হয়, যখন ব্রহ্মজ্ঞানী হৃদয় মনের ঐক্য করিয়া একাগ্রতার সহিত ব্রহ্মধ্যান করিতে পারে না, তখন উপাসনার ও সঙ্গীতের পুস্তক খুলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী তাহার নিজের রসনাকে বলে; "হে রসনা-পুরোহিত, আজ আমার পরিবর্ত্তে তুমি ব্রহ্মপূজা কর।" যেমন ওদিকে গৃহস্থ সহস্র দুষ্কর্ম্ম করিতেছে, অথচ পুরোহিত তাহার প্রতিনিধি হইয়া প্রত্যহ দেবার্চ্চনা করিতেছে, সেইরূপ সাধন ভজনে অলস ব্রহ্মজ্ঞানীর মন সহস্র প্রকার কুচিন্তা করিতেছে, অথচ তাহার রসনা-পুরোহিত ব্রহ্মোপাসনা এবং ব্রহ্মসঙ্গীতরূপ চণ্ডীপাঠ করিতেছে। অন্য লোকের পক্ষে পুরোহিতের হাতে পূজার ভার দেওয়া যেমন পাপ, আমাদের পক্ষে রসনার উপরে ব্রহ্মপূজার ভার দেওয়াও তেমনি পাপ। অতএব সাবধান, কেহই কখনও মুক্তি অন্বেষণের ভার পুরোহিত অথবা রসনার উপরে দিও না। মনের মধ্যে ভাব নাই, প্রেম ভক্তি নাই, রসনা কতক গুলি শিক্ষিত শুষ্ক স্তবস্তুতি পাঠ করিতে লাগিল, ইহাতে কি প্রকৃত ব্রহ্মপূজা অথবা পরিত্রাণ হয়? তোমার আমার কি এরূপ করা উচিত? রসনাকে বেতনভুক্ পুরোহিত করিয়া কে কোথায় পরিত্রাণ পাইয়াছে? ভাববিহীন হইয়া রসনা কতক গুলি শুষ্ক স্তবস্তুতি করিবে মহর্ষি ঈশা তাহা সহ্য করিতে পারেন না; এই জন্যই তিনি গম্ভীর স্বরে বলেন "বৃথা বারংবার ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিও না।" যদি হৃদয় মন ঈশ্বরের উপাসনা করিতে না পারে তবে অচেতন রসনা কিরূপে ঈশ্বরোপাসনা করিবে? রসনা একটি বীণাযন্ত্র, রসনা আপনাকে আপনি বাজায় না। রসনাযন্ত্রের এক মুখ বাহিরের দিকে, আর এক মুখ ভিতরের দিকে। ভিতরের মুখ দিয়া রসনা প্রেমরস, ভক্তিরস আকর্ষণ করিবে, বাহিরের মুখে রসনা সেই সুধারস শ্রোতার কর্ণে ঢালিয়া দিবে। এক মুখে রসনা হৃদয়সমুদ্র হইতে ভাবামৃত টানিয়া লইবে, আর এক মুখে তাহা দান করিবে। এক মুখে অমৃতভক্ষণ, আর এক

মুখে অমৃতদান। রসনা রসের আধার। কোথা হইতে রস আনে কেহ জানে না। ঈশ্বরের কেমন আশ্চর্য্য কৌশল, যদি সমস্ত শরীর শুষ্ক হয় তথাপি রসনাতে রস থাকে। রসনার মূলদেশে রসসাগর রহিয়াছে, প্রেমরস, ভক্তিরস প্রস্তুত রহিয়াছে। এক মুখে রসনা সেই প্রেমরস, ব্রহ্মরস, অমৃতরস, হরিনামামৃত রস পান করিয়া যখন অন্য মুখে সেই রস জীবের কর্ণে ঢালিয়া দেয়, তখন জীবের কল্যাণ হয়। রসনাই কেবল হরিনামামৃতের আস্বাদন বুঝিতে পারে। হস্ত কিংবা অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সে মিষ্ট রস বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু মধু রসনাতে রাখ, তাহা কেমন মিষ্ট বুঝিতে পারিবে। মধু রসনাতে রাখিবামাত্র উহা তোমাকে আনন্দিত করিবে। সেইরূপ সুমিষ্ট ব্রহ্মনাম রসনার উপরে রাখ, ভক্তি-রসে আর্দ্র করিয়া রসনা দ্বারা বারংবার ব্রহ্মনাম উচ্চারণ কর, যত বার উচ্চারণ করিবে ততই ব্রহ্মনামরস গাঢ়তররূপে সুপক্ক হইয়া আসিবে। পাক ভিন্ন পক্কতা হয় না। যতই রসনাযন্ত্রে হরি নাম পাক হয়, ততই সেই নাম মিষ্টতর, মিষ্টতম এবং মিষ্টতম হইতে মিষ্টতর হয়। পাঁচ বার, সাত বার, অনেক বার পাকের পর মিষ্টরস আরও গাঢ়তর হয়। এইরূপে বারংবার হরিনাম উচ্চারণের পর জিহ্বা সেই মিষ্ট নামকে জড়াইয়া ধরিবে। আর কিছুতেই সেই নামের সঙ্গে জিহ্বার বিয়োগ অথবা বিচ্ছেদ হইবে না। তখন অবিশ্রান্ত নামোচ্চারণ করিলে অপরাধ হইবে না। এই শ্রীগৌরাঙ্গের মত। এখানে ঈশা এবং শ্রীচৈতন্যের কেমন গূঢ় মিল? সা, ঋ, গ, ম, প্রভৃতি সপ্ত স্বরে যত সুর ভাঁজিলাম, ততই সেই সুর মিষ্ট হইল। এক মিশ্রী অগ্নির উপরে পাকে ফেলিলাম, দুই ঘণ্টা পরে গাঢ় মিষ্টতা হইল, চারি ঘণ্টা পরে গাঢ়তর মিষ্টতা হইল। লোকে আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "এমন অনির্ব্বচনীয় মধুরতা কোথা হইতে আসিল?" যে হরি নামে সমস্ত ভক্তদল উন্মত্ত হইয়া ভূতলে পড়ে তাহা সামান্য মিষ্ট নহে। অনেক বার পাকের পরে সেই মিষ্ট নাম প্রস্তুত হয়। অতএব ঈশা এবং চৈতন্যকে পরস্পরের বিরোধী মনে করিও না। ভাববিহীন হইয়া ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করা পাপ; কিন্তু যদি ভিন্ন ভিন্ন এবং নব নব ভাবে বারংবার ব্রহ্মনাম সাধন কর তোমার ভয় নাই, তোমার পাপ

টেরে না। হৃদয়ের ভিতর হইতে প্রেমরস তুলিয়া হরি নাম কর, তাহাতে ভক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইবে। যে ভাববিহীন হইয়া কেবল লোককে শুনাইবার জন্য হরি নাম করে তাহারই বিপদের সম্ভাবনা। হরি-নাম করিতে করিতে যদি নিজের মন নরম না হয়, তাহা হইলে জানিবে সেই নাম বৃথা হইতেছে। এমন শব্দ উচ্চারণ করিবে না, এমন বক্তৃতা করিবে না, যাহাতে নিজের উপকার না হয়। ভক্তি-শাস্ত্রানুসারে ভাববিহীন বক্তৃতা করা মহাপাপ। যে বক্তৃতা দ্বারা নিজের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হয় না, সেই বক্তৃতা করা অপেক্ষা মহাপাপ কি আছে? কেবল পরকে শুনাইবার জন্য যে বক্তৃতা করে, অথবা হরি নাম করে, সে কপট। যদি তুমি ভক্ত হও, তবে তোমার উচ্চারিত প্রথম বারের হরি নাম অপেক্ষা দ্বিতীয় বারের হরি নাম মিষ্টতর হইবে। তুমি নিজে হরি নাম করিয়া নিজে সুখী হইবে? নিজের মনকার কথায় নিজে মুগ্ধ হইবে। দয়াময়ী প্রভু, মাতাইয়া হরি নামকে মিষ্টতর করিলে। আগে পিতা নাম মধুর ছিল, এখন মা নাম আরও মিষ্টতর হইল। এই মা নাম আগে-কার ব্রহ্ম নাম হইতে আরও কত মিষ্ট হইয়াছে। এক সময় দয়াময় নাম কত মিষ্ট ছিল। তৎপর পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে হরি নাম কেমন মিষ্টতর হইয়া আসিল। এখন আবার সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্টতম মা নাম পাইয়াছি। এই মিষ্টতম মা নাম এবং সেই পূর্ব্বকার দয়াময় ও হরি নামে কত প্রভেদ। ভক্তির সহিত বারবার মা শব্দ উচ্চারণ কর, এক ভাবে মা শব্দ বারংবার উচ্চারণ করিও না; কিন্তু নিত্য নূতন ভাবরসের সহিত মা নাম উচ্চা-রণ কর, দেখিবে হৃদয় কাটিয়া ভক্তিরস উথলিয়া উঠিবে এবং ভক্তিতে উন্মত্ত হইয়া সেই নাম করিতে করিতে পরিশেষে আনন্দসাগরে মগ্ন হইবে। এই যে রসনা বীণাযন্ত্র, এই যন্ত্রে সাত সুরে সাতগুণ সাত সুরে সেই মা নাম বাজিবে; ভক্তিভাবে যত বার বাজিবে ততই ইহা মিষ্ট হইবে। হে রসনা, তোমাকে আমরা চিনিলাম না। কোন্ সাধকের বীণা তুমি? তোমার মধুর স্বরে আমার হৃদয় মুগ্ধ হই-য়াছে। রসনা, তুমি এক মুখে সুধা পান করিতেছ, আর এক মুখে সুধা ঢালিতেছ। রসনা, তুমি ছিলে কোথায়? আসিলে কোথায়?

স্বর্গের বীণা তুমি, তোমাকে এই মর্ত্ত লোকে কে আনিল ? তোমা দ্বারা এই পৃথিবীতে সুখের বৈকুণ্ঠ সৃষ্ট হইল। একে মার নাম মিষ্ট, তাতে কোমল নরম রসনা তুমি, তোমাতে মার সুমিষ্ট নামে সংযোগ হইলে পৃথিবী আর কঠিন থাকিতে পারিবে না। রসনা, তুমি খুব ভক্তির সহিত মা নাম সাধন কর। মার নাম ও মা অভিন্ন। "নামেতে তাঁহাতে নাহিক প্রভেদ।" তাই, তোমার রসনাবীণাতে সুখমোক্ষদায়িনী মার নাম সংযোগ কর, ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া মাকে মা, মা বলিয়া ডাক, চক্ষে ভক্তি-জল পড়িবে, হৃদয়ে ভক্তিরস উথলিয়া উঠিবে।

সেবকের নিবেদন।

পৃথিবীর মহাজনগণ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ২৩ পৌষ, ১৮০২ শক।

উৎসব নিকটবর্ত্তী। এ সময়ে ঋণচিন্তা আমাদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য। সময়োচিত কার্য্য ঋণ আলোচনা। সামান্য শ্রেণীর ব্রাহ্মেরা বলিবেন, "আমরা দুই জনের নিকট ঋণী, সেই দুই জনকেই কৃতজ্ঞতা উপহার দিব, আর কাহাকেও কৃতজ্ঞতা দিব না।" তাহারা কেবল দুই জন উপকারী বন্ধুর নিকট কৃতজ্ঞ হইবে, তাহারা ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপক ও ব্রাহ্মসমাজের পুষ্টিসাধক মহোদয় দ্বয়ের নিকট কৃতজ্ঞতাভারে প্রণত হইবে। সামান্য ব্রাহ্ম বলেন "এই দুই জনের নিকট আমি ও দেশ উপকৃত, সুতরাং ইহাঁদের ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।" উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্ম বলিলেন, "না, আমি কেবল এই দুই জনের নিকট ঋণী নহি, যদি এই সপ্তাহে আমার ও ব্রাহ্মসমাজের ঋণ গণনা করা উচিত হয়, তাহা হইলে অনেক মহাজনের নিকট আমি ও আমার দেশ ঋণী।" দুই জন কেন, শতাধিক ব্যক্তির কাছে আমরা ঋণী। সমস্ত হিসাব পর্য্যালোচনা করা হউক, কোন্ মহাজনের নিকট কত ঋণ করিয়াছি তাহা দেখা হউক, এমন কত মহাজন আছেন যাঁহারা সুদ পর্য্যন্ত পান নাই। উৎসবের আগে সমুদায় মহাজনদিগের হিসাব পরিষ্কার করিয়া লই। সর্ব্ব প্রথমে যিনি আমাদের সকলকে জীবন দান করিয়াছেন সেই ব্রহ্মাণ্ডপতির নিকটে আমরা সকলেই ঋণী। তার পর সাধু মনুষ্যদিগের নিকটে আমরা ঋণী। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে যত সাধু দেশে দেশে, যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া জগ-

ন্তের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন তাঁহাদিগের প্রত্যেকের নিকটে ব্রাহ্ম-সমাজ ঋণী। আপাততঃ দেখিতে গেলে গ্রীক্ দেশের মহামতি সক্রেটিসের সঙ্গে ভারতের কোন সম্পর্ক নাই। গ্রীক্‌দিগের সঙ্গে হিন্দুগণের না ভাষা, না ধর্ম্ম, না রাজ্যসম্পর্কে কোন সম্বন্ধ আছে। মহামতি সক্রেটিস্ এথেন্স নগরের যুবকদিগের গুরু। তিনি আদি মনোবিজ্ঞানবিৎ ছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে বহু দূরে তাঁহার বাসস্থান। বৃদ্ধ সক্রেটিস্, তুমি কখনও ভারতবর্ষে এস নাই, তুমি ভারতবর্ষ দেখও নাই, তথাপি ভারতবাসী কেন তোমার কাছে ঋণী হইল? তোমার নিকটে কিরূপে ভারত মনো-বিজ্ঞান শিখিল? বৃদ্ধ সক্রেটিস্, তুমি ভারতে না আসিয়াও ভারতে মনো-বিজ্ঞানের গুরু হইয়াছ। তোমার নিকটে ভারত মনোবিজ্ঞানের জন্য ঋণী।

য়িহুদীদিগের প্রধান নেতা মুশা, তুমি বহুদূরস্থ য়িহুদীদিগের ভক্তি-ভাজন নেতা ছিলে. তুমি কিরূপে হিন্দুস্থানের শ্রদ্ধা ভক্তির আস্পদ হইলে? হিন্দুস্থানে বড় বড় আর্য্য সাধু আছেন, যাঁহারা তোমাকে বিজাতীয় ম্লেচ্ছ মনে করেন, এবং তোমার নাম উচ্চারণ করিতে ঘৃণা করেন, তথাপি কিরূপে তুমি নববিধানাশ্রিত ভারতবাসীদিগের শ্রদ্ধাস্পদ হইলে? নব-বিধান আগমনের পূর্ব্বে তুমি কেবল স্বজাতির নিকট গৌরব পাইতে, এখন নববিধানের প্রভাবে তুমি ভারতবর্ষের আদর ও শ্রদ্ধার পাত্র হইলে।

মহর্ষি ঈশা, তুমি পৃথিবীর অনেকাংশ অধিকার করিয়াছ, অনেক জাতিকে তুমি স্বর্গের শোভা দেখাইয়াছ, তুমি অনেকের উপকার করি-য়াছ। সূর্য্য তোমার রাজ্যে অস্তমিত হয় না। ইউরোপ, আমেরিকা সর্ব্বত্র তোমার রাজ্য, কিন্তু আর্য্যজাতি কেন তোমাকে গ্রহণ করিবে? ভারতসন্তান কেন বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত তোমার নাম সাধন করিবে। হিন্দুস্থানের রাজা তুমি নও। অন্যান্য দেশের রাজা হইয়াছ বলিয়া কি তুমি এই দেশের রাজা হইবে আশা কর, দুরাশা তোমার। উপবীত ধারী ব্রাহ্মণ, আর্য্য হিন্দুসন্তান কি তোমার পদধূলি লইবে? তুমি বিজাতীয় বিদেশী সাধু, তোমাকে কিরূপে হিন্দুরা গ্রহণ করিবে? সামান্য ব্রাহ্মেরাও বলিতেছে তাহারা তোমার কাছে ঋণী নহে। ব্রাহ্মেরা যে

উৎসব করিবে তাহাতে কি তাহারা তোমার নাম করিবে, তোমাকে আদর করিবে? কোন্ ব্রাহ্ম সরলান্তরে, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বলিতে পারেন, "আমি এই এই সত্য ঈশার নিকট শিখিয়াছি, কুড়ি হাজার টাকা ঈশার নিকট ঋণ করিয়াছি।" চিন্তাহীন অকৃতজ্ঞ ব্রাহ্মেরা বলিতেছে, "বিজাতীয় মহাজনেরা আমাদের নিকট এক কড়া কড়িও পাইবে না।" কিন্তু প্রত্যেক সরল ব্রাহ্ম উৎসবক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে সমুদায় বিদেশীয় মহাজনদিগের চরণে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রণাম করিতেছেন। বিদেশীয় মহাজনদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘরে আসিয়া দেখি সমুদায় হিন্দু মহাজনেরাও আমাদিগের কাছে দাওয়া দাবি করিতেছেন। যোগপরায়ণ যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণুভক্ত নারদ, প্রজাবৎসল রাম, সত্যনিষ্ঠ যুধিষ্ঠির এবং ভারতের অন্যান্য সমুদায় সাধু ও মহাত্মাগণ আমাদিগকে রাশি রাশি সম্পদ ঐশ্বর্য্য বিতরণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রতিজনের নিকটে আমরা ঋণী। কৃতবিদ্য দাম্ভিক যুবা সগর্ব্বে বলিতে পারে "আমি বেদ পুরাণের কুসংস্কার ভ্রম হইতে মুক্ত হইয়াছি। আমি কিরূপে মন্ত্র তন্ত্র, রাম সীতা গার্গী মৈত্রেয়ী প্রভৃতিকে মানিব?" অহঙ্কারী যুবা বলিতে পারে "যেমন আমি বিদেশীয় মহাজনদিগের নিকট ঋণী নহি, তেমনি দেশীয় কোন মহাজনের নিকটেও আমি ঋণী নহি।" অহঙ্কারী ব্রাহ্ম বলিতে পারে, "আমি প্রাচীন কোন মহর্ষির নিকট ধ্যান শিক্ষা করি নাই," আমি নূতন প্রণালীতে ধ্যান করি, আমার ধ্যান নিজস্ব, সুতরাং এই বিষয়ে আমি প্রাচীন যোগী ঋষির গুরুত্ব কেন স্বীকার করিব?

আর এক প্রকাণ্ড ধর্ম্মবীর বুদ্ধদেব ভারতবর্ষে বসিয়া আছেন। ব্রাহ্ম, তুমি এই মহাজনের নিকটে কি কিছু ঋণ গ্রহণ করিয়াছ? ব্রাহ্ম হাসিয়া বলিলেন "আমি কি বুদ্ধের ন্যায় নির্ব্বাণ সাধন করি? বুদ্ধের নিকটে কিরূপে আমি ঋণী হইলাম?" শাক্যসিংহের শেষ জীবন কি হইল? তিব্বত দেশে, চিনদেশে, লঙ্কাদ্বীপে তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইল; কিন্তু হিন্দুস্থানে তাঁহার নাম লোপ হইল। হিন্দুস্থানে শাক্যসিংহের নাম লোপ হইয়াছে সত্য, কিন্তু হিন্দুস্থানের অস্থির ভিতরে শাক্যসিংহের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। শাক্যের নিকটে ব্রাহ্মেরা অশেষ ঋণে ঋণী।

আরও নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ওহে নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ, ওহে ভক্তির অবতার চৈতন্য, তুমি কি ব্রাহ্মদিগকে কিছু ঋণ দিয়াছ? জ্ঞানগর্ব্বিত ব্রাহ্ম বলিতেছে, ব্রাহ্মের ভক্তি সভ্যতার ভক্তি, ব্রাহ্মের ভক্তি বৈষ্ণবদিগের অন্ধভক্তি নহে। সভ্য ব্রাহ্ম জিজ্ঞাসা করেন, ব্রাহ্মেরা কি বৈষ্ণবদিগের ন্যায় দশাপ্রাপ্ত হয়? ব্রাহ্মেরা কি প্রেমোন্মত্ত হইয়া অচেতন হয়? জ্ঞানী সুসভ্য ব্রাহ্মেরা কেন শ্রীচৈতন্যকে মানিবে? চৈতন্য আপনার স্ত্রী সন্তান প্রভৃতি ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া গেলেন, ব্রাহ্মেরা সংসার ত্যাগ করা অধর্ম্ম মনে করেন, সুতরাং ব্রাহ্মেরা চৈতন্যকে কিরূপে ভক্তি দিবেন। হে অহঙ্কারী অকৃতজ্ঞ ব্রাহ্ম, কি স্বজাতীয়, কি বিজাতীয় কোন মহাজনের নিকটে তুমি ঋণ গ্রহণ কর নাই এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত মনে তুমি ব্রহ্মোৎসবক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছ; কিন্তু দাঁড়াও, গম্ভীর ভাবে আলোচনা করিয়া দেখ, যথার্থই তুমি অঋণী কি না। ভয়ানক ঋণের ভার কমাইবার জন্য তোমার মনে অকৃতজ্ঞতা এবং নীচ ভাবকে মনে স্থান দিও না। অনন্ত ঋণে তুমি ঋণী, সৃষ্ট প্রত্যেক বস্তু এবং প্রত্যেক জীবের নিকটে তুমি ঋণী। সৃষ্টির দিনে যে সত্য সূর্য্য উদিত হইল, যে প্রেমচন্দ্র আকাশে উদিত হইল, তাহার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক। প্রত্যেক দেশের কি জাতীয় কি বিজাতীয় সকল গুরুর নিকটে তুমি সত্যঋণে ঋণী। প্রত্যেক গুরুর পদতলে তুমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রণাম করিবে। নববিধানের ব্রাহ্ম, তুমি কোন জাতির সাধু গুরুকে অনাদর করিতে পার না। ঈশা, মুসা, মহম্মদ, চৈতন্য সকলেই তোমার ভক্তি-ভাজন। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা কেবল আপন আপন ধর্ম্মশাস্ত্র ও সাধুদিগকে সমাদর করে। খ্রীষ্টান কেবল খ্রীষ্ট এবং বাইবেল, মুসলমান কেবল মহম্মদ ও কোরাণ, শিখ কেবল নানক ও গ্রন্থকে আদর করে, কিন্তু নববিধানের লোকের নিকট বেদ বেদান্ত বাইবেল কোরাণ প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র আদৃত। নববিধানের লোকের ঋণ অনেক। এই ঋণনদী যে কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়া কত দূর গিয়াছে কেহ তাহা নিরূপণ করিতে পারে না। এই নদী কেবল অস্মদ্দেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষে বদ্ধ নহে। ইহা কেবল ভারতের বেদ বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র, এবং বৌদ্ধধর্ম্মের ঋণে ঋণী নহে;

কিন্তু এই ঋণনদী সমস্ত এসিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি পৃথিবীর সমুদায় ভূমি হইবে প্রবাহিত হইতেছে। পৃথিবীর সমুদায় জ্ঞানী পণ্ডিত ধার্ম্মিক সাধু-দিগের ঋণজাল আসিয়া আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়াছে। আমাদের সাধ্য নাই যে আমরা এই ভয়ানক ঋণভার হইতে মুক্ত হই। যে ব্রাহ্ম দর্প করিয়া বলে যে আমি কাহারও নিকটে ঋণী নহি, দর্পহারী ঈশ্বর তাহার দর্প চূর্ণ করিবেন। হে ভ্রান্ত অকৃতজ্ঞ ব্রাহ্ম, তুমি কি একবার বিচার করিয়া দেখিলে না যে তোমার ধর্ম্মজীবনের প্রত্যেক রক্তবিন্দুর মধ্যে পৃথিবীর সাধু মহাজনদিগের ঋণ রহিয়াছে। তুমি কি এক বার ভাবিয়া দেখিলে না যে কাহার নিকটে তুমি ব্রহ্মস্তবস্তুতি, ব্রহ্মারাধনা শিখিলে, কাহার নিকটে তুমি যোগ ধ্যান শিখিলে, কাহার নিকটে তুমি সাধুসেবা শিখিলে, কাহার নিকটে তুমি সংসারে বৈরাগ্যসাধন শিখিলে। তুমি যে আপনার রাজ্য মধ্যে বিবেককে রাজসিংহাসনে স্থাপন করিতেছ, ইহা তুমি কাহার নিকটে শিখিলে? তোমার প্রত্যেক রক্তবিন্দু বলিতেছে আমার গুরু অমুক, অমুক। পৃথিবীর সমুদায় মহাজনদিগের নিকটে ধারে ধারে তুমি বিক্রয় হইয়া গিয়াছ। সাধুদিগের নিকটে তোমার সর্ব্বস্ব বিক্রী হইয়াছে। অমুক সাধু বলিতেছেন, বঙ্গবাসী, অমুকভাব আমা হইতে পাইয়াছে, আর এক সাধু বলিতেছেন, বঙ্গবাসী অমুক দৃষ্টান্ত আমা হইতে পাইয়াছে। মিসর দেশ, আরব দেশ, চিন দেশ, পৃথিবীর সমস্ত দেশ বলিতেছে, বাঙ্গালীর মাথার মকুটে যত রত্ন আছে, সমুদায় আমাদের হইতে। তবে কেন দাম্ভিক ব্রাহ্ম তুমি বলিতেছ যে তুমি কাহারও নিকটে ঋণী নহ। তোমার বাড়ীতে যেমন দশখানি সামগ্রী দশ স্থান হইতে আনীত, তোমার ধর্ম্মের ভাবসকলও সেইরূপ নানা স্থান হইতে সংগৃহীত। যখন পৃথিবীর সমুদায় মহাজনেরা আপন আপন ঋণের কথা বলিলেন, তখন গুরুতর কৃতজ্ঞতার ভারে ভারতের মাথা অবনত হইয়া পড়িল। অসরল হওয়া পাপ। ঋণ অস্বীকার করা ও অসত্য বলা পাপ। আমাদের মস্তক ধারে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। ভারতমাতা আমাদিগকে বলিতেছেন, "ব্রাহ্মগণ, যদি সত্যই তোমরা আমার সুসন্তান হও, তবে আমাকে আর ঋণী রাখিও না, ঋণ পরিশোধ কর। ভারত যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে কত ধার করিয়াছেন তাহা গণনা করা যায় না। ইংরাজ রাজা

ভারতকে কত ঋণ দিয়াছেন। রাজ্যসম্পর্কে সাহিত্যবিজ্ঞানসম্পর্কে ভারত ইংলণ্ডের নিকট কত ঋণে ঋণী। ভারত, তুমি কি ইংলণ্ডের বিজ্ঞানবিৎ এবং কবিদিগকে অস্বীকার করিতে পার? বিলাতের বিজ্ঞান, কবিত্ব ভারতকে কত উন্নত করিয়াছে। বিলাতের উন্নতিকর ও মঙ্গলময় বিজ্ঞানাদি ব্যতীত ভারতের দিন চলে না। যেমন এক দিকে বিদেশীয় মহাত্মারা ভারতের কৃতজ্ঞতাকর গ্রহণ করিতে লাগিলেন, তেমনি অন্য দিকে ভারতের আপনার বুদ্ধ, ব্যাস, কবীর, নানক প্রভৃতি সকলে দাঁড়াইলেন, আর ভারত সকলের চরণে প্রণাম করিলেন। কত লোকের কাছে ভারত ঋণ করিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা করা যায় না। অতএব ব্রাহ্মগণ, তোমরা বিবেচনা কর, আলোচনা কর, কায়মনোবাক্যে মার ঋণ পরিশোধ কর। ঋণ স্কন্ধে করিয়া যোগীর গুণ, ভক্তের গুণ কীর্ত্তন কর। আনন্দমনে সাধু মহাত্মাগণের গুণগান করিতে করিতে উৎসবে যাত্রা আরম্ভ কর। পৃথিবীর মহাজনদিগের চরণ ধরিয়া বল, দেও বুদ্ধদেব, আমাদের হস্তে তোমার নির্ব্বাণ নিশান দেও, মহর্ষি ঈশা, তুমি আমাদিগকে তোমার পিতার ইচ্ছা পালনের নিশান দেও, মহম্মদ, তুমি আমাদিগের হস্তে তোমার একমেবাদ্বিতীয়ং ঈশ্বরের নিশান দেও, শ্রীগোরাঙ্গ, তুমি আমাদিগকে হরিপ্রেমোন্মত্ততার নিশান দেও। কৃতজ্ঞতা, বিনয় নম্রতা সহকারে সেই মহাজনদিগকে স্মরণ কর। মহাজনদিগের কাছে সাধুতা ও সত্য রত্ন সকল লইতেই হইবে। অদ্যকার দিন মহাজন স্মরণের দিন। আজ সাধু মহাজনদিগের নামে এই মন্দিরের প্রাচীর সকল সুশোভিত হইল। তাঁহাদিগের সাধুজীবনের শোণিত এই মন্দিরের উপাসকদিগের শোণিতে প্রবেশ করুক। আমরা কেবল হিন্দুস্থানে বসিয়া আছি তাহা নহে। বিশ্বেশ্বরের সমুদায় বিশ্ব মধ্যে আমরা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছি। হৃদয়, আজ পৃথিবীর সমুদায় সাধুদিগকে প্রণাম কর। তাঁহারা সকলে আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন।

আচার্য্যকৃত শ্লোকব্যাখ্যান।

সোমবার, ২৫ আষাঢ়, ১৮০০ শক।

"বাগ্‌গদ্‌গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি ক্বচিচ্চ।
বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি॥"

১১, ১৪, ২৩। শ্রীমদ্ভাগবত।

ভক্ত যিনি তিনি রোদন, হাস্য, গান এবং নৃত্য এই চারিটি লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পৃথিবীকে পবিত্র করেন। রোদন, হাস্য, গান, নৃত্য এই চারিটি দ্বারা পৃথিবী পবিত্র হয়। পুণ্যের এমনি ক্ষমতা, ভক্তির এমনি শক্তি যে যাহার হৃদয়ে এই শক্তির সঞ্চার হইয়াছে সে কোন মতে পৃথিবীকে স্পর্শ করিলেই পৃথিবী পবিত্র হয়। জ্ঞান প্রচার দ্বারা লোকের মন শুদ্ধ হয়, দেশ দেশান্তর ধর্ম্মপ্রচার দ্বারা পৃথিবী উন্নত হয়; কিন্তু সে এক প্রকার প্রচার। ভক্তির প্রভাব সেরূপ নহে। ভক্ত দ্বার বদ্ধ করিয়া যদি কাঁদেন, হাসেন, গান করেন, অথবা নৃত্য করেন, তাহাতেই পৃথিবী শুদ্ধ হয়। নির্জ্জনে বসিয়া যেখানে ভক্ত গান করিলেন, তাঁহার কোমল কণ্ঠনিঃসৃত সুস্বর সেখানকার বায়ুকে শুদ্ধ করিল। গোপনে ভক্ত নৃত্য করিলেন, তাঁহার পদাঘাতে পৃথিবী পবিত্র হইল। দশ জনের কাছে গিয়া গোল করিলেই যে পৃথিবী শুদ্ধ হয় তাহা নহে। নির্জ্জনে বসিয়া যদি কাঁদা যায়, হাসা যায়, তাহা কি নিষ্ফল হইতে পারে? গান কর, নাচ, রোদন কর, হাস, পৃথিবীকে দেখাইবার প্রয়োজন নাই। লোকে দেখিতে না পাইল তাহাতে ক্ষতি নাই, যে স্থানে বসিয়া তোমরা ঈশ্বরের নামে উন্মত্ত হইয়া কাঁদিবে, হাসিবে, গান করিবে, অথবা নাচিবে সেই স্থান শুদ্ধ হইয়া পৃথিবীকে উদ্ধার করিবে। ভক্তির রোদন, ভক্তির হাস্য, ভক্তির গান অথবা ভক্তির নৃত্য, ইহার এক এক বিন্দু লাগিলে পৃথিবী পবিত্র হয়। ইহার এক এক বিন্দু এক এক টুকরো হীরা। যেমন হীরকের সঙ্গে পয়সার তুলনা হয় না, তেমনি এসকল ভক্তির উচ্চ অঙ্গের সঙ্গে সামান্য ধর্ম্ম জ্ঞানের উপমা হইতে পারে না। এক বিন্দু ভক্তির অশ্রুর মূল্য নাই। ভক্তির উন্মত্ততা যাহা পৃথিবীর উপহাসের বিষয়, তাহাই পৃথিবীকে শুদ্ধ করিবে।

মঙ্গলবার, ২৬ আসাঢ়, ১৮০০ শক।

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"

১১, ২, ৪৩।

"যিনি সমুদায় মনুষ্যের মধ্যে স্বীয় পরমেশ্বরকে এবং পরমাত্মাতে সমস্ত মনুষ্যকে দর্শন করেন, তিনি ভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

ভক্তদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যিনি তিনি সকল মনুষ্যের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখেন। সকল মনুষ্য মধ্যে ঈশ্বরকে দেখা পরিত্রাণের একটি প্রধান উপায়। মনুষ্যকে দেখিলে কত সময় কত প্রকার কুভাবের উদয় হয়। ইহার এক মাত্র ঔষধ মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখা। শত্রুকে দেখিলে রাগ হয়, কিন্তু সেই শত্রুর ভিতরেও ঈশ্বর আছেন ইহা জানিলে প্রাণ শুদ্ধ হয় এবং কোন প্রকার দুষ্প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয় না। স্বীয় পরমেশ্বর, অর্থাৎ আমারই ঈশ্বর সেই শত্রুর ভিতরেও খেলা করিতেছেন, ইহা দেখিতে পাইলে আর শত্রুর প্রতি শত্রুভাব থাকে না। আমারই ঈশ্বর সকল নর নারীর মধ্যে রহিয়াছেন এই ভাবটি সর্ব্বদা মনের মধ্যে জাগ্রৎ থাকিলে কোন পাপের ভয় থাকে না। অত্যন্ত পতিত ব্যক্তিও ঈশ্বরের আবাসস্থান, অত্যন্ত কলঙ্কিত শরীরও ঈশ্বরের মন্দির, বিশ্বাস চক্ষে ইহা দেখিলে আর কেহ মনুষ্যের প্রতি অত্যাচার করিতে পারে না। মহাপাপীর ভিতরেও ঈশ্বর বাস করিতেছেন, সকল নর নারীর সঙ্গেই ঈশ্বরের নিগূঢ় অখণ্ড প্রাণের যোগ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে, তবে অন্য লোকে পাপ করিয়াছে বলিয়া পাপকে ঘৃণা না করিয়া কেন তাহা-দিগকে ঘৃণা করিব? তাহাদিগের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিলে মনে পবিত্রতার উদয় হইবে। অত্যন্ত অধার্ম্মিকের মধ্যেও ঈশ্বর আছেন, অতএব অধর্ম্ম ও অধার্ম্মিককে স্বতন্ত্র করিয়া অধার্ম্মিকের মধ্যে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া শুদ্ধতা সঞ্চয় করিতে হইবে। এইরূপে সকলের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিলে আমাদের দৃষ্টি পবিত্র হইবে, এবং আমরা ধন্য হইব।

সেবকের নিবেদন।

ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মশ্রবণে প্রমাণ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ১৯ শ্রাবণ, ১৮০১ শক।

ব্রাহ্মসমাজের ইহা অন্যায় যে এক জন ব্যক্তির স্কন্ধে সমুদায় দায়িত্ব স্থাপন করা হয়। ব্রাহ্মসমাজের বিশ্বাসের কথা সকলেরই বলা কর্ত্তব্য। যদি আমরা সকলে একত্র দলবদ্ধ হইয়া চলিয়া থাকি, তবে কেন তোমরা এক জন বা পাঁচ জনকে স্বতন্ত্র করিয়া দিয়া সকলের বিশ্বাসকে অল্প-সংখ্যকের বিশ্বাস বলিয়া প্রতিবাদ কর। ইহা ভাল দেখায় না। সত্যের অনুরোধ হইতে মনুষ্যসমাজের অনুরোধ অধিক মনে করা ন্যায়সঙ্গত নহে। যখন সকলে একত্র যাত্রা আরম্ভ করিয়াছি, এক মত এক ঈশ্বর এক বিশ্বাসে এক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছি, তখন চলিতে চলিতে জন কয়েককে স্বতন্ত্র করিয়া দিয়া তোমরা তাহাদিগকে নির্য্যাতন করিতেছ, মিথ্যাবাদী, কুসংস্কারী, মূর্খ, অবিশ্বাসী, সাধনবিহীন বলিতেছ। পূর্ব্বের মত, বিশ্বাস, মন্ত্র, গুরু, দীক্ষা সকল অস্বীকার করিতেছ, পূর্ব্বে যাহাদিগের সহযাত্রী ছিলে তাহাদিগকে উপহাস করিতেছ, নিন্দা করিতেছ, ইহা ন্যায়বিরুদ্ধ। ব্রহ্মসঙ্গীতপুস্তকে ব্রাহ্মসমাজের কীর্ত্তি, অনেক ভাব, অনেক সত্য রহিয়াছে, তদ্ব্যতীত আর এক গুরুতর বিষয়ে উহা সাক্ষী আছে। কোন্ সময়ে কোন্ মত ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইয়াছে ব্রহ্মসঙ্গীত ঈশ্বর এবং মনুষ্যের নিকটে, বিশেষতঃ মনুষ্যের নিকটে সাক্ষ্য দিতেছে। ভাবী ইতিহাসলেখকের নিকট সঙ্গীতপুস্তক সাক্ষ্যদান করিবে অমুক সময়ে অমুক মত প্রচলিত ছিল। সমস্ত ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা বলিবে

অমুক সময়ে অমুক ভাব, অমুক সময়ে যোগ, অমুক সময়ে বৈরাগ্যের ভাব প্রবল ছিল। এই ব্রহ্মসঙ্গীত ব্রহ্মদর্শন ব্রহ্মশ্রবণের কথা, যোগ ধ্যানের কথা, ব্রহ্ম সহ নিগূঢ়সম্বন্ধস্থাপনের কথা সাক্ষ্য দিতেছে।

ব্রাহ্মসমাজ যে মন্ত্রে দীক্ষিত এই সকল ব্যাপারে যাহা প্রকাশ পাইতেছে, ব্রহ্মসঙ্গীত গুরু হইয়া সমস্ত প্রদর্শন করিতেছেন। আমরা ব্রহ্মের নিকট যে মন্ত্র শিখিলাম তাহার প্রমাণ সঙ্গীত। সকলে উহা গান করিয়াছেন, ঈশ্বরসমক্ষে বন্ধুগণসমক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন, এখন অস্বীকার করিলে সঙ্গীতপুস্তক দগ্ধ করিয়া ফেলিতে হয়। ব্রহ্মদর্শন কেহ অস্বীকার করিতে পার না, সঙ্গীতে উহা বদ্ধ হইয়াছে। হৃদয়ের নিগূঢ় ভাব সঙ্গীত দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, একথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। যদি ব্যক্তিবিশেষে এই মত বদ্ধ থাকিত, যদি কোন সাধক কোন ব্রাহ্মযোগীর নিকটে ঈশ্বরের পরিচয় হইত, তাহা হইলে সাধারণের মত বলিয়া বিচারিত হইত না। এই সকল গান যদি সাধারণের হয়, ইহা কেবল নির্জ্জনে বদ্ধ থাকিতে পারে না, ব্যক্তিবিশেষের হইতে পারে না। শত শত লোক উচ্চারণ করিয়া জগতের সমক্ষে ক্রমাগত এই মত প্রকাশ করিয়াছে। ভবিষ্যৎ ইতিহাসলেখকেরা এই সকল পাঠ করিবেন, তাঁহাদিগের নিকটে এ সকল সহজ কথা নহে। তাঁহারা যখন দেখিবেন, বড় বড় যোগী নহে কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মগণ নিরাকার ব্রহ্ম দর্শন করিয়াছেন লিপিবদ্ধ আছে, তখন অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে ব্রাহ্মসমাজ ঋষি যোগী ছিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম যোগধর্ম্ম ঋষিধর্ম্ম সাধন করিয়াছিলেন। তোমাদিগকেও এখন একথা স্বীকার করিতে হইবে।

ঈশ্বরকে দেখা যায়, ঈশ্বরের কথা শুনা যায়, কেবল তোমরা মুখে বল নাই, গান দ্বারা এ মত স্বীকার করিয়াছ। এখন যদি এই কথা বল ইহা অধিকাংশের মত নহে, দু পাঁচ জনের মত, অধিকাংশের পুস্তকে যে মত, তাহা খণ্ডন করিবে কি প্রকারে? এখন কি আর অল্পবিশ্বাসিগণের মধ্যে গণিত হইতে চাও। ইতিপূর্ব্বে যাহা বলিয়াছ, এখন বলিতেছ, ভবিষ্যতেও বলিবে এই প্রতিজ্ঞা আবশ্যক। এক সময়ে ব্রহ্মদর্শন হইয়াছে, কঠোর হৃদয় বিগলিত হইয়াছে, এখন যদি না হয়, তবে অবিশ্বাসের পথে

গিয়াছ বলিতে হইবে। ঈশ্বর কথা কন, দিবারাত্র তাঁহার কথা শুনিতেছ, ইহা যদি বলিতে পার, তবে বলি বিশ্বাসের রাজ্য সুদৃঢ় হইতেছে। ঈশ্বর দেখা দেন, ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করা যায় স্বীকার করিয়াছ, সঙ্গীত উহার সাক্ষ্য দিতেছে। এখন যদি বল তিনি কেবল যোগীর হৃদয়ে প্রকাশিত হন, তিনি কি সকলের নিকটে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন, মানুষের ন্যায় কথোপকথন করেন, তবে তাহা মানিব না। পূর্ব্বে এ সকল স্বীকার করিয়াছ ব্রহ্মসঙ্গীত পৃথিবীর নিকট বলিবে। এখন এরূপ বলিলে নাস্তিক বলিয়া খ্যাতি হইবে। এক বার যাহা বলিয়াছ, সত্যের অনুরোধে তাহা অস্বীকার করিতে পার না। যদি বীজমন্ত্রের প্রতিবাদ কর তবে যে অবিশ্বাসী হইলে। যদি পূর্ব্বের কথা সকল অস্বীকার কর, ব্রহ্মসঙ্গীত মিথ্যা বলিয়া উহাকে দগ্ধ করিয়া ফেল, ব্রহ্মবীজমন্ত্র গঙ্গাজলে ডুবাইয়া দাও। এক বার সত্য স্বীকার করিয়া তাহা অস্বীকার করিতে পার না। যাহা স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত করিলে তাহা উৎপাটন করিলে আপনি উৎসন্ন হইবে।

ব্রাহ্মসমাজ যাহা এত দিন মানিত, তাহা কি এখন অল্প কয়েক ব্যক্তিতে বদ্ধ হইবে? কেহ কেহ যোগ করেন. অধিক হয়তো ৫০ জন হইবে, তাঁহারই কি এখন দর্শন শ্রবণের কথা বলিবেন? ব্রহ্মযোগী স্বতন্ত্র বিধি স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মদর্শন করেন, অল্পাধিক ব্রহ্মকে বুঝিতে পারেন, নিজ নিজ জীবনে ব্রহ্মের কথা শ্রবণ করেন, যদি এইরূপ হইল, তবে এত দিনে উন্নতি কি হইল? এখন আন্দোলনায় পড়িয়া বিপাকে পড়িয়া কি সকলে বলিবেন, এ মতে দুই পাঁচ জন বিশ্বাস করে। ভ্রাতৃগণ, তোমাদের পক্ষে ইহা সাজে না। পরীক্ষার সময়ে দুই একটি প্রহার বা নিন্দায় বলিবে, কৈ আমরা বলি নাই নিরাকার ঈশ্বরকে দর্শন করা যায় বা তাঁহার কথা শুনা যায়, আমরা এ কথা শুনিয়া কর্ণে হাত দিয়া থাকি। কয়েক জন অহঙ্কারী হইয়া নিরাকার ঈশ্বরকে স্পর্শ করে, দেখে ও শুনে। দর্শন আদেশশ্রবণ ইহাতে আমাদের হস্ত নির্লিপ্ত, ও মন্ত্র তন্ত্রে আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই, কখন আমরা উহাতে হস্তক্ষেপ করি নাই। মনে হইতেছে এই বলিয়া অধিকাংশ পলায়ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, সত্যকে ফেলিয়া দিয়া সরিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

ইহার আশু প্রতিফল অবিশ্বাস নাস্তিকতা। নিরাকারের বীজমন্ত্র পরিত্যাগ করিলে আর কি থাকিল? যে মত ব্রাহ্মধর্ম্মের ভূষণ তাহাই পরিত্যাগ করিতে চলিলে। ব্রাহ্মধর্ম্মের যাহা শিরোভূষণ, ব্রাহ্মধর্ম্মের যাহা নিজস্ব ধন তাহা পরিহার করিলে আর আর মত লইয়া কি হইবে? আর আর মত কি অন্যান্য ধর্ম্মে নাই? যোগের শাস্ত্রও অন্যত্র আছে। কিন্তু নিরাকার পুরুষকে অন্তরের সহিত ভাল বাসা কোথাও নাই। আর সব প্রাচীন বলিতে পারা যায়, কিন্তু নিরাকার ঈশ্বরকে ভক্তি করা ভাল বাসা, তাঁহার কথা শ্রবণ করা, তাঁহাকে দেখা, আর কোথাও নাই।

তোমরা জগতের নিকট নিরাকার ঈশ্বর দর্শন তাঁহার কথা শ্রবণ, তাঁহাকে অনুরাগ করার কথা বলিবে, পৃথিবীকে এই শুভ সংবাদ দিবে, ইহার মর্য্যাদা পরে লোকে বুঝিয়া সাধুবাদ প্রদান করিবে, ধন্যবাদ দিবে। ব্রাহ্মগণ যে অমৃত রাখিয়া যাইবেন, উহা দশ শতাব্দী পরে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইবে। যেমন সাকারকে দেখা যায়, তেমনি নিরাকারকে হৃদয়ে ধারণ, তাঁহার নিরাকার মুখ হইতে কথা শ্রবণ, ইহাতে একান্ত সুখী হইবে। এ কিছু সামান্য কথা নয়। তোমরা যে সত্য উদ্ভাবন করিলে তোমাদের নিকট তাহার আদর যদি না হয়, অন্য দেশের নিকট তাহা সমাদৃত হইবে। তোমরা যে গান করিয়াছ সে গান শেষ হইল, কিন্তু সেই সুন্দর সঙ্গীত পৃথিবীতে পুস্তকে নিবদ্ধ থাকিল, তোমাদের এই হৃদয়ের গান ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা আদর করিবে; পৃথিবীর ধর্ম্ম পথে অনুসন্ধান করিয়া এই ফুলের মালা লাভ করিবে; তাহারা এই মালা গলায় পরিয়া সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের পূজা করিবে।

আমার আজ বেদী হইতে এই বক্তব্য যে, তোমাদের দেওয়া সত্য শত সহস্র বৎসর পরে কেমন আদৃত হইবে। এই মন্দির যেখানে এই সত্য তোমরা প্রকাশ করিয়াছ, যদি সে সময়ে তোমরা আসিতে পারিতে, দেখিতে কত লোক তাহার কিরূপ আদর করিতেছে। তাহাদের চক্ষু হইতে কেমন প্রেমের ধারা পড়িতেছে, নিরাকারকে দেখিয়া কেমন প্রমুগ্ধ হইয়া তাঁহার কথা শুনিতেছে। সকল মনুষ্য সহজে তখন তাঁহার নিরাকার প্রেমমুখ দর্শন করিতেছে। কোন যুক্তি তর্ক নাই, সমস্ত পৃথিবী

এই সত্য সহজে সাধন করিতেছে। আজ ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা কি করিবে বলা হইল, কিন্তু আমরা যে সত্য লাভ করিলাম আমরা নিজে কেন তাহা হইতে বঞ্চিত হই। সকলে মিলিয়া সবল ভাবে যে সঙ্গীত করিয়াছি, এখন সেই সঙ্গীতঅনুসারে কেন বলিব না, নিরাকারের তন্ত্র মন্ত্র দু জনের মত নয়, ইহা সকলের মত। জগতের উৎপীড়নের ভয়ে নিরাকার দর্শন শ্রবণের মত মিথ্যা এ কথা যেন মুখ হইতে বাহির না হয়। ব্রাহ্মসমাজ ইহার সাক্ষী আছে, নিরাকার ঈশ্বরকে দেখা শুনা যায়। যাহা মানিয়াছ তাহা স্থাপন করিতে হইবে। মিথ্যা কথা কখন বলিতে পার না, ইহা যে আমাদিগের প্রাচীন তন্ত্র। এ জন্য ১০ জন কেন রক্ত দিবে, আমরা সকলে মিলিয়া ইহার জন্য রক্ত দিব। পাঁচ জন এ জন্য উৎপীড়ন সহ্য করিবে, আর তোমরা উপহাস করিবে উৎপীড়ন করিবে, সংসারের সহায়তা করিবে, ইহা কখন ন্যায়সঙ্গত নহে যখন দর্শন শ্রবণের সঙ্গীত মুখে আনিয়াছ, তখন সকলে দলবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হও, নিরাকারকে দেখা যায় না, তাঁহার কথা শুনা যায় না, পৃথিবীর এই অবিশ্বাসের কথার প্রতিবাদ কর। সেই গান মনে কর, সেই সঙ্গীত করিতে থাক, প্রাচীন ভাব পুনরুদ্দীপন কর, তখন দেখিবে নিরাকারে জ্বলন্ত বিশ্বাসে কিরূপ সুখী হও। প্রায় ৫০ বৎসর ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। এই ব্রহ্মমন্দির হইতে দর্শন শ্রবণ বিষয়ে উচ্চ উচ্চ কথা অনেক সময়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, নিরাকার ঈশ্বরকে দক্ষিণে বামে রাখিয়া মধুর সঙ্গীত করা হইয়াছে। সেই সকল কথা অমৃত হইয়া কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে। তাঁহার রূপ চক্ষের ভূষণ; তাঁহার কথাশ্রবণ কর্ণের ভূষণ হইয়াছে। ইহা কত দূর হইয়াছে জীবন ও চরিত্র প্রকাশ করিবে। নিরাকার ঈশ্বর কেমন সুখপ্রদ ইহা শিখাইবার জন্য ব্রহ্মমন্দিরের প্রত্যেক উপাসককে অনুরোধ করিতেছি। তোমাদিগের প্রতিজনের এ সম্বন্ধ দায়িত্ব রহিয়াছে। যাঁহারা এই সকল সঙ্গীতে যোগ দিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকে এ বিষয়ে দায়ী। পৃথিবীকে দেখাইতে হইবে নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস গ্রহণ করিলে জীবন কিরূপ হয়। পৃথিবী বলিবে তোমরা নিরাকার বন্ধুর সহিত কথোপকথন করিয়াছ তাহার উৎকৃষ্ট ফল দেখিতে চাই। কে

বলিতে পারে যে এরূপ হইবে না, দশ বৎসরের পরে এই রাজপথ দিয়া যাহারা চলিবে, তাহারা আমাদিগকে বলিবে তোমরা নিরাকারের কথা কও শুনিব। যদি তোমরা তাহাদের কথায় উত্তর না দাও তামাদিগকে অবিশ্বাস করিবে, অশ্রদ্ধা করিবে। তাঁহার রূপের মধুরতার কথা গান করিলে, বল তাঁহার রূপ কেমন, একথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর কি? চক্ষু যাঁহাকে দেখে নাই, কর্ণ যাঁহার কথা শুনে নাই, তোমরা তাঁহাকে দেখিয়াছ শুনিয়াছ, সত্যকে সাক্ষী করিয়া বলিতে হইবে। হাঁ আমরা দেখিয়াছি, আমরা তাঁহার কথা শুনিয়াছি, সহজ ভাবে তাঁহাকে দেখা যায়, সহজ ভাবে তাঁহার কথা শুনা যায়, ইহা তোমাদিগকে প্রকাশ করিতে হইবে। বিশ্বাসের রাজ্য বিস্তার করিয়া সাকার ঈশ্বর অনাবশ্যক জগদ্বাসীর নিকট সপ্রমাণ করিতে হইবে। নিরাকারকে দেখ, স্পর্শ কর, তাঁহার কথা শ্রবণ কর। সকলে উদ্যোগী হও, তোমাদিগকে এ বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে যথোচিত পুরস্কৃত হইবে।

যেখানে ঈশ্বর সেখানে ভক্ত।

রবিবার ১৫ই ফাল্গুন ১৭৯০ শক।

ভক্তিশাস্ত্রের একটী কথা যোগ শাস্ত্রের সাহায্যে স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। মতটি ভক্তিশাস্ত্রের; কিন্তু যে আলোকে তাহা বুঝা যায় তাহা যোগ শাস্ত্রের। যখনই মনুষ্য ঈশ্বরকে ডাকে, তখন সে বুঝিতে পারুক আর না পারুক ঈশ্বর সশিষ্য তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। ভক্তের নিকট ঈশ্বর একাকী দেখা দেন না। ভক্তবৃন্দ সহ তিনি দেখা দেন। তিনি যখন আবির্ভূত হন তাঁহার সঙ্গে২ তাঁহার সাধুভক্ত সুসন্তানগণও প্রকাশিত হন। ইহার গূঢ়তত্ত্ব কি? কেন ঈশ্বর ভক্তদিগকে লইয়া আসিবেন? যোগশাস্ত্রে কথিত আছে, যোগ দ্বারা সাধকের প্রাণ ঈশ্বরের সঙ্গে গ্রথিত হয়। যোগ সহকারে যোগী ঈশ্বরকে ক্রমে২ প্রাণের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া ফেলেন। যেখানে যোগী বসিয়া আছেন, সেখানেই পরমাত্মা। যোগীর হৃদয় ঈশ্বরেতে প্রবিষ্ট, অতএব অন্যান্য যে সকল যোগী ভক্ত ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ

স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারাও যোগীর সঙ্গে গ্রথিত। যেখানে ঈশ্বর সেখানে তাঁহার প্রিয় শিষ্যগণ বসিয়া আছেন। যেখানে ঈশ্বর সেখানে ভক্তবৃন্দ, যেখানে ভক্তবৃন্দ সেখানে ঈশ্বর। স্বর্গ কখনও খালি হইয়া আছে, ইহা ভাবিতে পার না। অতএব ইহা সত্য কথা যে ঈশ্বরকে ডাকিলে তাঁহার সঙ্গে তাঁহার ভক্ত সাধকগণও আসেন। ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে নরক অভক্ত ভাবিতে পার না। ভক্তকে প্রত্যাহার করিলে ভক্তবৎসলকে পাইবে না। ঈশ্বরকে ভাবিতে গেলেই স্বর্গের ঈশ্বরকে, ভক্তবৃন্দের ঈশ্বরকে ভাবিতে হইবে। স্বর্গে দেবর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি, যোগী প্রভৃতি ঈশ্বরের পার্শ্বস্থ হইয়া বসিয়া আছেন। ঈশ্বর তাঁহার ভক্তগণের হৃদয়ে বিহার করিতেছেন। কোন্ ভক্ত কোন্ জাতির প্রতিনিধি, কি কি নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিলেন এবং কি নামে তিনি স্বর্গে আখ্যাত তাহা আমরা জানি না; কিন্তু এই জানি ঈশ্বরকে আদর করিলে তাঁহার ভক্তদিগকে আদর করিতেই হইবে। সকল জাতি এবং সকল যুগে পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত যত ভক্ত জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা সকলেই ভক্তহৃদয়ে শুভাগমন করেন। কেহ কেহ কেবল এক একটি ভক্তকে জানেন এই জন্য তাঁহারা বলেন, যখন ঈশ্বর আমাদের নিকট প্রকাশিত হইবেন তখন তাঁহার সঙ্গে আমাদের অমুক ভক্তিভাজন আচার্য্য অমুক ভক্তবন্ধু আসিবেনই আসিবেন। ঈশ্বর সেই ভক্তকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, সেই ভক্ত তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহারা অন্যান্য ভক্তদিগের তত্ত্ব জানেন না, অতএব সমুদায় ভক্ত যে ঈশ্বরের সঙ্গে গ্রথিত রহিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারেন না। ভক্ত ভক্তবৎসলের সঙ্গে আছেন এই জন্য যত ভক্তকে ভক্তি করি তত ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বৃদ্ধি হয়। আবার ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বৃদ্ধি হইলে ভক্তের প্রতিও সমাদর বৃদ্ধি হয়। এইরূপে ভক্তসাধন দ্বারা সমুদায় ভক্তের সঙ্গে ঈশ্বর কিরূপে সংযুক্ত আছেন আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। এতদ্ব্যতীত দেখ স্বর্গের এক জনকে পাইলেও কত রত্ন পাওয়া যায়। ঈশ্বরকে না দেখিতে পাইলে কোন ভক্তকে পাওয়া যায় না। ভক্ত বলিয়া আমরা যে একটি মনুষ্যকে পূজা করিব তাহা নহে। আমরা কেবল ঈশ্বরকেই ডাকিব, আমাদের হৃদয় ক্ষুদ্র, ঈশ্বর তাহা প্রশস্ত করিয়া লইবেন, এবং তাহাতে তাঁহার ভক্তদিগের স্থান করিয়া দিবেন। আমাদের মন ক্ষুদ্র, আমরা কোন ভক্তের নাম শুনিতে চাই না; কিন্তু ঈশ্বর যখন আমাদের হৃদয়কে প্রশস্ত করিবেন, তখন সেই অশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ভক্তিভাজন হইয়া উঠিবেন। সেই রক্ত মাংসের পিণ্ড মানুষ আমাদের ভক্তিভাজন নহেন, কিন্তু তাঁহার আত্মার ভক্তিভাব আমাদের ভক্তি উদ্দীপন

করিবে। পৃথিবীতে ভক্তের কি নাম ছিল তাহা নাই জানিলাম, আমাদিগের পক্ষে এই পর্য্যন্ত জানিলেই হইল, অমুক ব্যক্তি ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য স্বার্থ এবং সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া বৈরাগী হইয়াছিলেন, অমুক লোক পতিতদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য আশ্চর্য্য ক্ষমা, ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতা সহকারে আত্মজীবন দান করিয়াছিলেন, অমুক ব্যক্তি ঈশ্বরের নাম শ্রবণ কীর্ত্তন করিবামাত্র মত্ত হইয়া যাইতেন, অমুক সাধক দিবা নিশি প্রগাঢ় ধ্যান যোগ সাধনে মগ্ন থাকিতেন। অমুক লোক ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিবার জন্য আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন এবং সকলের পদানত বিনীত দাস হইয়াছিলেন। কাহার বুকের ভিতর স্বর্গের কি ধন আছে তাহাই আমরা দেখিব, তাঁহাদের নামে আমাদের প্রয়োজন কি? ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য যাঁহার মনে ব্যাকুলতা এবং বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, তিনি এক জন ভক্ত, তাঁহার আর কিছু জানিবার আমার আবশ্যক নাই। পতিতকে উদ্ধার করিবার জন্য যাঁহার প্রাণ কাঁদে তিনি এক জন ভক্ত, ঈশ্বরের নামরসে যাঁহার মন গলে তিনি এক জন ভক্ত। ঈশ্বর সহবাসে যিনি বসিয়া থাকেন, ঐ সহবাস যাঁহার ভাল লাগে, তিনি একজন ভক্ত যোগী। ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ করিবার জন্য যিনি আপনার ভাই ভগিনীদিগের সেবা করেন তিনি এক জন ভক্ত। ইহাঁদের সকলকেই ঈশ্বর তাঁহার সঙ্গে লইয়া বসিয়া আছেন, ইহাঁদের এক জনকেও অভক্তি করিলে ঈশ্বরকে অভক্তি করা হইবে। যে পরিমাণে আমাদের ভক্তি বৃদ্ধি হইবে সেই পরিমাণে ইহাঁদের সঙ্গে নিগূঢ় যোগ হইবে। ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়িলে, ইহাঁদের প্রতিও শ্রদ্ধা বাড়িবে। যত টুকু আমরা ভক্ত হইব, তত টুকু আমরা অন্য ভক্তকেও ভক্তি করিতে শিখিব। ঈশ্বরের জন্য যিনি জিতেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বত্যাগী হইয়াছেন, তাঁহাকে ভক্ত বলিয়া প্রণাম করিব, ঈশ্বরের নামে যিনি মত্ত তাঁহাকে ভক্ত বলিয়া প্রণাম করিব। ব্যাকুলতা, বৈরাগ্য, বিনয়, বিশ্বাস, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা, প্রেম, নির্ভর, আনুগত্য, যে কোন ব্যক্তির জীবনে এ সকল ভক্তির লক্ষণ দেখিব, তাঁহাকে ভক্ত বলিয়া প্রণাম করিব। ঈশ্বর মধ্যস্থলে সশিষ্য বসিয়া আছেন। তাঁহার মুখের প্রকাশ ভক্তদিগের মুখে দেখিব। যত ভক্তদিগকে ভক্তি করিব তত ভক্তবৎসল আমাদের আয়ত্ত হইবেন, অতএব কোন ভক্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চেষ্টা করিও না। প্রাণ যদি ঈশ্বরকে দাও, তিনি যদি তোমাদের প্রিয় হন, তাঁহার সমস্ত ভক্তগণও তোমাদের প্রিয় হইবেন, কেন না ভক্তদিগের সঙ্গে তাঁহার নিগূঢ় যোগ। এই জন্য প্রথমেই বলিয়াছি, যোগশাস্ত্র দ্বারা ভক্তি শাস্ত্রের একটি সত্য স্পষ্টতররূপে বুঝা যায়।

সেবকের নিবেদন।

ঈশ্বরপ্রেরিত।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ২৩ ভাদ্র, ১৮০১ শক।

আমার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের কোন গুরুতর বিষয়ে বিবাদ হইয়াছে, সেই বিবাদের নিষ্পত্তি হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি কিছু অধিক বিশ্বাস করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। আমি বলি ব্রাহ্মসমাজ দেবতার খেলা। উহা যে দেবতার খেলা তাহার প্রমাণ আছে। ব্রহ্মলীলার নাম ব্রাহ্মসমাজ। বর্ত্তমান কালে বর্ষে বর্ষে মাসে মাসে পক্ষে পক্ষে সপ্তাহে সপ্তাহে দিবসে দিবসে, আরো বলি ঘণ্টায় ঘণ্টায় মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ধর্ম্মরাজ্যে যে সমুদায় ঘটনা ঘটিতেছে তৎসমুদায় ব্রহ্মলীলা। কেন না ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় নির্গুণ নহেন, জগৎক্রিয়া ধর্ম্মজগতের বিশেষ ক্রিয়া স্বয়ং ব্রহ্ম সম্পাদন করেন। ব্রাহ্মসমাজের লীলার মধ্যে মানুষ আছেন, যাঁহারা ব্রহ্মের পক্ষ। অবশ্য তাঁহারা অল্পসংখ্যক যাঁহারা ধর্ম্ম বিতরণ করিতেছেন, ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, গভীর উচ্চতর তত্ত্ব নিজ জীবনে সাধন করিতেছেন। এই সকল সাধক আচার্য্য বা প্রচারককে আমি বলি "ঈশ্বরপ্রেরিত"। আমি "ঈশ্বরপ্রেরিত" বলি, নির্ভয় হইয়া বলি, বলিব মনে করিয়াই বলিতেছি। এই সকল লোক ঈশ্বরপ্রেরিত ব্রাহ্মসমাজ এই ভাব গ্রহণ করিবেন, বরণ করিবেন এবং শ্রদ্ধা করিবেন। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে এ কথা লইয়া বিবাদ হইয়াছে, হয়তো চারিদিকের লোকেও বলিতেছে, আমরা উহা স্বীকার করি না। লোকে বলিতেছে, যাঁহাদিগকে প্রেরিত বলিতেছি তাঁহারাও বিরুদ্ধে বলিতেছেন। উভয় দিকেই মত বৈপরীত্য, বিবাদ বিসংবাদ। যাঁহাদিগেরই হস্তস্পর্শ

করিয়া যদি তোমরা ঈশ্বরপ্রেরিত, তাঁহারাই অস্বীকার করেন, আমি নই আমি নই বলেন। যিনি আপনাকে অস্বীকার করেন, জগৎ তাঁহাকে কেন স্বীকার করিবে? তথাপি আমি স্বীকার করিব। সময়ে স্বীকার হয়, অসময়ে হয় না। ফল পরিপক্ক না হইলে কি তাহাকে ফল বলিতে পারা যায় না? তবে স্বীকার বিলম্বে কেন হইবে? যাঁহারা প্রেরিত তাঁহারা কেন আপনাদিগকে সমাদর করেন না? এস্থলে সমাদর না করা পাপ ও অবিশ্বাস।

তোমরা বলিবে ইহাতে অবিনয় হয়। তবে অসত্য কি বিনয়? হস্তী যদি আপনাকে কীট বলে তাহা কি বিনয়? তাহা বিনয় নয়, কিন্তু অসত্য এবং কলঙ্ক। তোমরা বলিবে হউক, আমরা ইহাতে ঈশ্বরের নিকটে অপরাধী হইয়াও মনুষ্যসমাজে বিনয়ী বলিয়া সমাদৃত হইব। আমি তোমাদের এ চরিত্র ভাল বলি না। পরিত্রাণের সংবাদ তোমাদের হাতে আসিল, মিথ্যাবাদী হইয়া তোমরা বলিলে কি না হাতে কিছু নাই। এ মিথ্যা কথায় কেবল তোমাদের নহে, ইহাতে তোমরা অন্যেরও সর্ব্বনাশ হইতে দেখিবে। ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপন হইতে সংস্থাপক ও ঋৎবিক্‌গণ ব্রহ্মলীলাতে বিশেষরূপে সংযুক্ত। সাধারণ ভাবে সকলেই নিযুক্ত, কিন্তু সেই সাধারণ শ্রেণীর উপরে দেখিতে পাইবে বিশেষভাবে নিযুক্ত আছে, ব্রহ্মপ্রেরিত আছে। এই প্রেরিত এক জন নয়, দুই জন নয়, পাঁচ জন নয়, দশ জন নয়, অনেক। কত জন আমি বলিতে চাই না, সময় তাহা বলিবে।

ইঙ্গিতে জানিয়া বলিতেছি, বর্ত্তমান শতাব্দীতে এই ঘোর কলিযুগে প্রত্যাদেশ হয় না, অন্ধকারের ভিতরে আলোক দেখায় না, এ কথা থাকিবে না। আত্মীয় ঈশ্বরপ্রেরিত মনুষ্য মধ্যে বাস করিলে নিঃশব্দে তাহা জানা যায়। কাহারও দর্শন করিলেই জানিতে পারা যায় ইঁহারা ঈশ্বরপ্রেরিত কি না? ঈশ্বর প্রেরণ করেন, ইহা বলিয়া কি হইল? ঈশ্বর কাহাকে প্রেরণ না করেন? কীট পতঙ্গ হইতে রাজা কে না প্রেরিত? সকলেই ঈশ্বরপ্রেরিত সত্য, কিন্তু বিশেষরূপে প্রেরিত আছে। বর্ত্তমান বিধানে যাঁহারা বিশেষ সাধন করিবেন, তাঁহারা বিশেষ কীর্ত্তিস্বরূপ হইবেন। ঈশ্বরের জ্যোতির প্রদীপসমূহ ভারতের অন্ধকারের ভিতরে তাঁহারা মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছেন, দেখ না

হন, চন্দ্র না হন, তারা না হন, অন্ততঃ এক একটি দীপ হইয়া সেই অন্ধকারের মধ্যে প্রকাশ পাইবেন। ইঁহারা ঈশ্বরপ্রেরিত, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের অন্তর্গত। এই যে তোমরা দুই শত পাঁচ শত লোক একত্র হইয়া আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি সাধন করিয়া আসিতেছ, সত্যের জ্যোতির উপরে সকলের দৃষ্টি পড়ে ইহার উপায় করিতেছ, ইহা সামান্য ব্যাপার নহে। পুনরায় বলিতেছি, তোমরা ঈশ্বরপ্রেরিত। কেন না তোমরা সাধন করিতেছ, সংসারে সাধক হইয়াছ; অসার কার্য্য, ধন, বিত্ত, নীচ কামনা পরিত্যাগ করিয়া জীবন উৎসর্গ করিয়াছ। কি কার্য্যে ? জগতের কার্য্যে; সাধক বলিয়া পরিগণিত হইবার জন্য জীবন পবিত্র করিবার কার্য্যে; এক জন হইতে দশ জন, দশ জন হইতে দশ সহস্র, দশ সহস্র হইতে দশ লক্ষ জন হইবে, এই কার্য্যে; অর্থকামনা ত্যাগ করিয়া মহর্ষির উৎসবে, ধ্যানে, সৎপ্রসঙ্গে, সচ্চিন্তায় আপন জীবন উন্নত করিবার কার্য্যে; পবিত্র স্থান, পুস্তক, নির্জ্জন চিন্তা হইতে জ্ঞানলাভ, পক্ষী বৃক্ষলতা পল্লব নদীস্রোত নির্ম্মল শীতল বায়ু হইতে শুদ্ধি লাভ করিয়া ধর্ম্মজীবন লাভ করিবার কার্য্যে। যাঁহারা এই সকল কার্য্যে নিযুক্ত তাঁহারাই সাধক। পাপ, অধর্ম্ম, ভীরুতা, এখন পর্য্যন্ত থাকিলেও তথাপি সাধক। অমুক নগর বা পল্লীতে অমুক লোক সংসারে ডুবিয়াছিল, সংসার হইতে একটু উঠিয়াছে, সেই বিপদের ঘোর সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য সাধন করিতেছে, বাঁচিবার উপায় পাঠ করিতেছে, ইহা ঈশ্বরের কীর্ত্তি, ঈশ্বরের লীলা। ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বরের লীলা, আর সকলি ভ্রম।

অমুক স্থানে অমুক লোক ধ্যান ধারণায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, সংসারে বদ্ধ ছিল, রাশি রাশি ধন পরিবর্জ্জন করিয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, ঈশ্বরের হস্ত হইতে বিশেষ উপায় বিশেষ সাধন লাভ করিতেছে। এ সকল ব্রহ্মলীলা। যে সকল লোকের দ্বারা এই ব্রহ্মলীলা সম্পাদন হইতেছে, তাঁহারা সামান্য নন। তাঁহারা ঈশ্বরলীলার সাক্ষী। ব্রহ্মলীলা যেখানে যেরূপ হইতেছে একত্রিত করিয়া ঈশ্বরপ্রেরিতগণকে গৌরব দিতে হইবে। সে সমুদায় লোক প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়া থাকুন বা না থাকুন, তাঁহারা বৃক্ষতলে বসিয়া সাধন করুন

অথবা সংসারে বসিয়া ধর্ম্মসাধন করুন, যেখানে যে অবস্থাপন্ন কেন না হউন, ধনী হইয়া অট্টালিকায় থাকুন বা দরিদ্র ভিখারী হইয়া বেড়ান, যে প্রকার অবস্থাপন্ন কেন যিনি হউন না, সকলেই ঈশ্বরপ্রেরিত, সমাদরের পাত্র। তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য করিতেছেন; তাঁহাদিগের জীবন দেখিয়া সাধক বলিব, সহায় বলিব, সামান্য বলিয়া মনে করিব না। যাহা তাঁহারা প্রকাশ করিতেছেন, জীবনে তাহা সত্য করিব, হৃদয়ে তাহা আলোচনা করিব। এই সকল লোককে ডাকিয়া বলিব, তোমারা সাধক ঈশ্বরের প্রেরিত। তাঁহারা স্বীকার না করিলেও সাধু বলিয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিব। কে ব্রহ্ম প্রেরিত? ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রহ্ম কি কাহাকেও প্রেরণ করেন না? এক সময়ে তিনি করিতেন, এখন তিনি করেন না, যাহা কিছু হইতেছে নিয়মানুসারে হইতেছে, একথা বলিলে কি করা যায়? এ বিবাদ নিষ্পত্তি কঠিন। যীশু যদি অম্লান প্রকাশ জন অন্য সমুদায় কাজ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মের আজ্ঞা প্রচার করেন, ব্রহ্মের দূত হইয়া আসিয়া ঈশ্বরের আজ্ঞায় জগতের হিত সাধন করেন, সেই সকল লোককে অনাদর করিয়া কেন বলিব, তাঁহারা ঈশ্বরপ্রেরিত নহেন? তাঁহারা সত্যের সমাচার গোপন করিবেন কি প্রকারে? যদি কোন সত্য শিক্ষা দিতে, কোন বেদশাস্ত্রে দীক্ষিত করিতে আসিয়া থাকেন, তিনি বলুন না বলুন, আমি সেই লোককে প্রেরিত বলিব, নিশ্চয় বুঝিব তিনি সামান্য সাংসারিক লোক নহেন।

যিনি আমাদিগের মধ্যে অতিহীন, তিনিও যে ঈশ্বরপ্রেরিত ইহার প্রমাণ আছে। আমি এক জন কার্য্য সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ঈশ্বর যে যে বিষয় আমার দ্বারা সাধন করিয়া লইয়াছেন, সে সকল বিষয় আমা হইতে হইতে পারে না। অন্য বিষয়ে আমার অবহেলা থাকিতে পারে, কিন্তু যে বিষয়ে প্রত্যাদিষ্ট তদ্বিষয়ে আমার উপেক্ষা নাই। আমার মন দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার সহিত সেই বিষয়ের দিকে ধাবিত হইয়াছে। বলুন, সাক্ষাৎ দেবতা ঈশ্বর হইতে এ সকল হইয়াছে, ঈশ্বরের বল হইতে মেদিনীতে আমি আসিয়াছি, অন্যথা আমি আসিতাম না। যাহা করিতে আসিয়াছি যদি তাহা না করি জন্ম বিফল। ব্রাহ্মেরা ইহাই স্বসিদ্ধ করি-

বার জন্য প্রস্তারমান। তাঁহাদিগের দ্বারা পৃথিবীর উন্নতি হইবে। কতক গুলি লোক সদ্‌দৃষ্টান্ত দেখাইয়া উন্নতি বিস্তৃতি করিবেন।

বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের গন্ধ অল্প। এ ব্রাহ্মসমাজের আদর কি প্রকারে হইবে? হরিবিহীন ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্মসমাজ হইবে কি প্রকারে? হরির হাত ধরিয়া উঠিবে, হরির হাত ধরিয়া বলিবে, হরির কথা ঘোষণা করিবে। হরির আদেশ স্বীকার করাতে নিন্দা অপমান কি? হরির কথা স্বীকার করিতে নিন্দা অপমানের ভয়, লজ্জার বিষয়। ঈশ্বর স্বজন করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, বঙ্গদেশে আদেশবাদ প্রতিষ্ঠিত হইবে, ব্রাহ্মসমাজ তৎসম্বন্ধে জ্ঞান বিতরণ করিবে। উপদেশ সাধু দৃষ্টান্ত দ্বারা সকলকেই উন্মত্ত করিতে হইবে, আদেশবাদ সর্ব্বত্র প্রচার করিতে হইবে, একথা বলিতে লজ্জা কি? বিশ বৎসর সাধন করিলে, এখনও বলিতে পার না সংসারবন্ধন শিথিল হইয়াছে, জীবন্মুক্তি হইয়াছে, বড় লজ্জার বিষয়। দশটি পরিবারের ভার লইয়া আজও ব্রাহ্মপরিবার সঙ্গঠনের চেষ্টা হইল না! যথার্থ কথা প্রচ্ছন্ন রাখিলে কি হইবে? লোকে খড়্গহস্ত হইবে বলিয়া কি সত্য বিলোপ করিতে হইবে? সত্য বলিতে লোকভয় কি? ভীরু হইয়া প্রবল সত্য সঙ্কোচ করিবে? সত্যপ্রকাশে লোকলজ্জার বিষয় কি? ঈশ্বর প্রেরণ করিয়াছেন একথা বলিলে লোকে উন্মত্তপদস্থ বলিবে এই তোমার বুদ্ধি? সত্য বলিলে অহঙ্কার প্রকাশ পাইবে, অসত্য বলিয়া বিনয়ী হইতে চাও? তুমি ব্রাহ্ম হইয়া নিজের বুদ্ধিমতে চলিতে চাও, ঈশ্বরের উপর কি তোমার সমুদায় ভার নহে? ঈশ্বর তোমাকে সত্য প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। তাঁহার নিকটে তোমরা প্রত্যেকে অঙ্গীকার করিয়াছ, তাঁহার নিকটে ব্রত গ্রহণ করিয়া ব্রতী হইয়াছ, এসকল পরিষ্কার কথা কিরূপে অস্বীকার করিবে? তোমরা কি ব্রহ্মের সঙ্গে বাক্ করিবে? তোমরা যাহাই কর ব্রহ্মমন্দিরের বেদী তোমাদিগকে স্বীকার করিবে। যাও অন্ধকার নিবারণ করিয়া জ্যোতি বিস্তার কর। যাও ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা তোমরা যে প্রেরিত প্রমাণ কর। মূর্খ বলিয়া ছল করিলে কি হইবে? যদি তোমরা হীনলোক বলিয়া স্বীকার কর, তথাপি ব্রহ্মমন্দিরের বেদী ঈশ্বরের প্রেরিত ভিন্ন আর কিছু বলিবে

নাও। চন্দ্র সূর্য্য যদি বিলুপ্ত হয়, তথাপি তোমাদিগের এ পবিত্র জগতের নিকট থাকিবে। তোমরা সত্যের সাক্ষী, যতই তোমরা সত্যের সাক্ষ্য দান করিবে, ততই তোমাদিগের দীপ্তি প্রকাশ পাইবে।

ব্রহ্মের প্রেরিত মানুষের সংখ্যা ক্রমশঃ ক্রমশঃ বাড়িবে। যাঁহারা ঈশ্বরপ্রেরিত তাঁহাদিগের এক কথায় সমুদায় অবিশ্বাস চূর্ণ হইয়া যাইবে। তাঁহারা ব্রহ্মের নিকট কি কথা শুনিলেন, কি মূর্ত্তি দর্শন করিলেন, কি কি নূতন কার্য্য অঙ্গীকার করিলেন, কি কি নূতন মন্ত্র লাভ করিলেন, একবার জিজ্ঞাসা কর, দেখিবে বেদ পুরাণ যেমন, ব্রহ্মপ্রেরিত লোকদিগের জীবন তেমনি। হরির তত্ত্ব যাঁহারা শুনিতে পান তাঁহাদিগের জীবন ধন্য। জীবনে যাঁহারা জাগ্রৎ সত্য দর্শন করিয়াছেন, ব্রহ্মলীলা যাঁহাদিগের জীবনে চলিতেছে, সেই সকল সাধককে ডাকিয়া এক স্থানে করিলে মহাব্যাপার অনুষ্ঠিত হইবে। সকল সাধক একত্র হইয়া হরিতত্ত্ব কথা বলিবেন, ইহা শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছি। হরিনামের তত্ত্ব শুনিয়া তাঁহার যশোগান করিব, তাঁহার সুমধুর নামের পরিচয় দিব, তাঁহার নামে চমৎকৃত হইয়া বিস্মিত হইব; হরিকথায় প্রমত্ত হইব, এ এক নূতন দৃশ্য। যাঁহারা যেখানে আছেন, সকলে মিলিত হইয়া জীবনের কার্য্য আরম্ভ করুন, সকলে সফল হউন, তাঁহাদিগের মুখে হরিকথা শুনিয়া জীবন কৃতার্থ হইবে।

ব্রহ্মতেজ।

রবিবার ২২ ফাল্গুন ১৭৯৮ শক।

মনুষ্য ঈশ্বরের অংশ একথা বলা ঠিক নহে। একথা যথার্থ বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। ইহা নীতি এবং সত্যবিরুদ্ধ। এই মতে অহঙ্কার আছে। ঈশ্বর একটি প্রকাণ্ড অগ্নির ন্যায়, তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিলে যে ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হয়, তাহা মনুষ্য আকারে জন্ম গ্রহণ করে। এই সমুদায় অগ্নিকিরণ একত্র করিলে আবার একটি প্রকাণ্ড সূর্য্য হয় এই মত ভ্রমাত্মক। কিন্তু ইহা সত্য কথা যে মনুষ্যের আত্মাতে পরমাত্মার অগ্নি আছে। যে পরিমাণে সেই অগ্নির উজ্জ্বল দীপ্তি, সেই পরিমাণে মনুষ্যের গৌরব। মনুষ্য ঈশ্বরের অংশ নহে; কিন্তু মনুষ্যের

আত্মাতে ব্রহ্মাগ্নি নিহিত আছে। আত্মা তেজোময়, যখন আত্মা সেই তেজ বিহীন হয় তখন আত্মার মৃত্যু হয়। সমস্ত মনকে পরীক্ষা করিয়া দেখ প্রাণের মধ্যে সেই ব্রহ্মাগ্নি আছে কি না। এই ব্রহ্মাগ্নি এই তেজ এই উদ্যমই আত্মার সর্ব্বস্ব। পাপবিনাশের ক্ষমতা এই তেজ। উপাসনা সাধনাদি দ্বারা এই তেজ বৃদ্ধি হয়। তেজ বৃদ্ধির অর্থ পুণ্য প্রেম বৃদ্ধি। মনকে তেজোদৃপ্ত রাখিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করা উচিত। তেজের হ্রাস হইবার একটি কারণ বয়োবৃদ্ধি। যত বয়স বাড়ে, তত সেই তেজ ম্লান হয়। বয়োবৃদ্ধি সহকারে যেমন শরীর শীতল হইয়া আসে, তেমনি আত্মাও শীতল হয়, ইহা ভয়ানক কথা। ইহা যদি সত্য কথা হয় তবে ধর্ম্ম যে উন্নতিশীল ইহা আমরা মানিতে পারি না। যে মত আত্মার উন্নতি এবং পরলোক অস্বীকার করে তাহা অবিশ্বাস বৃদ্ধি করে। যাহারা বলে যুবা বিদ্যা, ধর্ম্ম, পুণ্যে তেজস্বী হইতে পারে; কিন্তু বৃদ্ধের তেজ কোন শাস্ত্রে পাওয়া যায় না, তাহারা অবিশ্বাসী হয়। যুবা যখন বার্দ্ধক্যের মুখে পড়িল, তখন আত্মার সমুদায় গুণ নিস্তেজ হইল। যৌবনে যত ক্ষণ সেই তেজ থাকে, তত ক্ষণ পাপ আসিলে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া সেই পাপকে তাড়াইয়া দেওয়া যায়, কিন্তু বৃদ্ধকালে আর সেই তেজ থাকে না। যত ক্ষণ উপাসনা করিবার ক্ষমতা আছে তত ক্ষণ ভয় নাই, তত ক্ষণ সমুদয় বিঘ্ন বিপদ দূর করিয়া দিতে পারি। কিন্তু যখন উপাসনা করিবার শক্তি হ্রাস হইল, তখন আত্মা বলবীর্য্যবিহীন হইয়া পড়িল। বয়োবৃদ্ধি সহকারে উপাসনার তেজ হ্রাস হইবে ইহা যদি সত্য কথা হয় ইহা ভয়ানক কথা। আজ আমরা সজীবভাবে উপাসনা করিয়া হাসিতেছি, উপাসনার তেজে বিপদকেও তাড়াইয়া দিতেছি; কিন্তু বার্দ্ধক্যের মত মানিলে এমন সময় আসিবে যখন আত্মা শিথিল, অলস, নিরুদ্যম এবং নির্জীব হইয়া পড়িবে। ইহা মরিবার কথা, এই কথা ঠিক নহে। যথার্থ কথা এই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তেজ হ্রাস হয় না, তেজ বৃদ্ধি হয়, কত উপাসনা গভীরতর হইবে, ক্রমাগত আত্মার মধ্যে সেই তেজ উজ্জ্বলতর হইবে। তপস্বীদিগের শরীরের চারিদিকে পবিত্র তেজ এবং স্বর্গীয় প্রভা নির্গত হইতেছে, শত্রুরা সেই জ্বলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ হয়; এই কথার ভিতরে আমরা এই সত্য গ্রহণ করিতে পারি, যত দিন তপস্যার বল আছে ততদিন কোন ভয় নাই। তপস্যার তেজ নির্ব্বাণ হইলেই বিপদ, তখন মনুষ্য এই প্রকার বিপদে পড়ে যে সে চেষ্টা করিলেও আর উঠিতে পারে না, তাহার আর দুর্গতির সীমা থাকে না, সে কোন মতেই তাহার মনকে উৎকৃষ্ট অবস্থায় আনিতে পারে না তাহার পাপগুলি আর দমন করিতে পারে না। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করিব শরীরের বার্দ্ধক্য আসিলে আত্মার তেজ, আত্মার তপস্যার বল কমে না, তবে অল্প

বিশ্বাসীর তেজ হ্রাস হইতে পারে ; কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত বিশ্বাসী এবং নিত্য সাধন করেন, তাঁহারা মৃত্যু শয্যাতে আরও উজ্জ্বলতর দীপ্তি প্রকাশ করিতে থাকেন তাঁহাদের ব্রহ্মতেজ যায় নাই। যে বস্তু অনন্তকালের ব্যাপার তাহার উপরে কালের মৃত্যুর আধিপত্য নাই। দেহের সঙ্গে আত্মাও দুর্ব্বল হয় ইহা মিথ্যা কথা। বৃদ্ধকালে ক্ষত্রিয় অর্থাৎ দৈহিক বল ক্ষয় হয়, কিন্তু আত্মার তেজ বৃদ্ধি হয়। ব্রহ্মবলের তেজ যেখানে সেখানে কালের কোন ক্ষমতা নাই। ব্রহ্মতেজে যিনি তেজস্বী তিনি মৃত্যু শয্যায় বলেন, শমন আমি তোমার ধার ধারি না আমার উপরে তোমার কোন অধিকার নাই। মৃত্যুঞ্জয় ঈশ্বর, আমার মন্ত্রদাতা, দীক্ষাদাতা গুরু, মৃত্যু, তুমি আমার কি করিবে ? আমি তোমার দ্বারা কখনই পরাস্ত হইব না। অতএব যে বল, যে ব্রহ্মতেজ সাধন দ্বারা বৃদ্ধি হয় তাহাই আমাদের প্রার্থনীয়। শরীর ক্ষয় হউক না কেন, শরীর যখন নষ্ট হয় তখনইত আত্মা স্ফূর্ত্তি প্রকাশ করে। পিঞ্জর ছাড়িয়া যখন পাখী উড়ে তখনইত তাহার অধিক বল প্রকাশিত হয়। অবিশ্বাসীরাই কেবল এই কথা বলে:— আগে আমাদের উপাসনা ধ্যান যত দ্রুতবেগে চলিত এখন আর তেমন হয় না, এখন অধিক বয়স হইয়াছে এখন অধিকক্ষণ ঈশ্বরকে আয়ত্ত করিয়া রাখিতে কষ্ট হয়। বিশ্বাসী বলেন যত বয়স বৃদ্ধি হইতেছে তত ঈশ্বরের সঙ্গে গাঢ়তর ঘনিষ্ঠতর যোগ হইতেছে। যৌবন কালে আধ ঘণ্টা কঠোর সাধন করিলে ঈশ্বরের দর্শন পাইতাম, এখন ঈশ্বরকে স্মরণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার দর্শন লাভ করি। বৃদ্ধের এই কথা শুনিয়া যৌবনকালের সাধক লজ্জায় মস্তক অবনত করিল। শরীর শীর্ণ হইল বলিয়া কি নিরপরাধী আত্মা উপাসনা করিতে পারিবে না ? শরীরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কি নিরপরাধী আত্মাকে ঈশ্বর বধ করিবেন ? শরীরের চক্ষু অন্ধ হইয়াছে বলিয়া কি আত্মার চক্ষে ভক্তি প্রেমের অশ্রু পড়িবে না ? যদি তুমি ভক্ত হও তোমার শরীর যত শীর্ণ হইবে তোমার আত্মা তত অধিক তেজ ধারণ করিবে। বৃদ্ধের উৎসাহ দেখিয়া যুবারা উৎসাহী হইবে। স্বর্গীয় উৎসাহের কথা আর কি বলিব ? স্বর্গের উৎসাহ বৃদ্ধকালে আরও অধিকতর তেজ লাভ করে। যত উপাসনা করিবে উপাসনা তত সুমিষ্ট এবং সরস হইবে। উপাসনাই উৎসাহের আকর। এই উপাসনা দ্বারা আমাদের আত্মা স্বর্গলোক, পরলোকের জন্য উপযুক্ত হউক !

সেবকের নিবেদন।

ব্রহ্মদর্শন ও শ্রবণ স্বাভাবিক।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ৫ই শ্রাবণ, ১৮০১ শক।

রোগপ্রতীকারের জন্য চিকিৎসা করা ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য। এক রোগীর সেবা করিবার জন্য কত নিগূঢ় বিষয় জানিতে হয়, কত উপায় উদ্ভাবন করিতে হয়, কত পরিশ্রম ও পুস্তক পাঠ করিতে হয়। এত পরিশ্রম, এত যত্ন, এত বিদ্যা বুদ্ধি, এ সকলের শেষ ফল কি হইল,—রোগের প্রতীকার, রোগীর আরোগ্য। আরোগ্য শব্দের অর্থ কি? রোগ হইতে মুক্তি। রোগ হইতে মুক্তি আরোগ্য, ইহার সহজ ভাষা, শরীরকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন; যে বিকৃতি হইয়াছিল তাহা ঘুচাইয়া প্রকৃতিকে পুনঃপ্রকাশ। আরোগ্যে অস্বাভাবিক স্বাভাবিক হইল। এত যত্ন পরিশ্রমের ফল হইল শরীরের স্বভাব। শরীরের যাহা হওয়া উচিত ছিল তাহাই হইল। এ দিকে আত্মাসম্বন্ধেও অস্বাভাবিক অবস্থায় থাকা পাপ, মোহ, অবিশ্বাস, আসক্তি; স্বাভাবিক অবস্থায় থাকা উন্নতি, ধর্ম্ম, শান্তি। চিত্ত বিকারের নাম নরক, প্রকৃতিতে অবস্থিতির নাম স্বর্গ।

ধর্ম্মসাধনপ্রণালীর অর্থ কি, অভিপ্রায় কি? বিকৃত মনকে প্রকৃতিস্থ করা। পৃথিবীর যত লোক অস্বাভাবিক বিকারের পথে ভ্রমণ করিতেছে, প্রকৃতি ঘুচাইয়া বিকৃতি আনয়ন করিয়াছে, বিকারের ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছে, উপাসনা যোগ ধ্যান সাধুসঙ্গ প্রভৃতি তাহাদিগকে সেই বিকৃতি হইতে প্রকৃতির পথে আনয়ন করিবার জন্য। ধর্ম্মের দ্বারা কি হয়? মনুষ্যেরা সত্যের পথে ঈশ্বরের পথে আগমন করে। অন্য ভাষায় বলিতে গেলে

বলিতে হয়, আমরা স্বাভাবিক হইতে চেষ্টা করি। এখানে কঠোর ভাষা অবলম্বন করিবার প্রয়োজন নাই, সহজে মনের ভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে। ধর্ম্ম স্বাভাবিক না হইলে রোগ, ধর্ম্ম স্বাভাবিক হইলে মনুষ্যের কর্ত্তব্য সহজ হইল। ঈশ্বরদর্শন শক্ত, আদেশশ্রবণ শক্ত লোকে মনে করে, ফল শক্ত নহে। দর্শন শ্রবণ স্বাভাবিক। কাণা ও বধির দেখিতে শুনিতে পায় না, কিন্তু তদ্ভিন্ন কে দর্শন শ্রবণ করিতে চেষ্টা করে, পরিশ্রম করে? শিশু যুবা বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ সহজে দেখে, সহজে শুনে। দেখা শুনা ভয়ানক ব্যাপার নহে। বল, কে দেখা শুনা সহজে সম্পন্ন করিতে পারে না? শরীর এমনি গঠিত, মনুষ্য চক্ষু খুলে আর অমনি দেখিতে পায়। অন্ধ হইলে লোকে দয়া করে, চক্ষু আছে বলিয়া কেহ প্রশংসা করে না। দর্শন জন্য গৌরব দেয় কে? চক্ষু চন্দ্র সূর্য্য দেখে তাহাতে তাহার পুরস্কার কি, গৌরব কি? চক্ষুর যেমন সেখানে গৌরব নাই, তেমনি শব্দ শুনিতেও কর্ণের গৌরব নাই। কর্ণের শব্দশ্রবণ প্রশংসার বিষয় নহে। যাহা স্বাভাবিক সহজ, কে তাহাতে গৌরব দিতে চায়? শরীরসম্বন্ধে দর্শন শ্রবণ যেমন সহজ, আত্মসম্বন্ধে তদ্রূপ হওয়া উচিত। শারীরিক চক্ষু যদি দেখিতে না পায়, যাহাতে দেখিতে পাই তজ্জন্য চিকিৎসকের শরণাগত হই। চিকিৎসাপ্রণালী আর কিছুই নহে চক্ষুকে প্রকৃতিস্থ করা। অনেক ঔষধ অনেক পরিশ্রম, শেষে এই ফল হয় যে, রোগীকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন। বিকার ঘুচিয়া গেলে চক্ষু স্বাভাবিক অবস্থায় পুনরায় দেখিতে পায়। আত্মা ব্রহ্ম দর্শন করিবে তাহাতে কঠোর উপায় অবলম্বন শাস্ত্রপাঠ প্রভৃতির কি প্রয়োজন? আর কিছুর প্রয়োজন নাই কেবল স্বাভাবিক অবস্থায় থাকা চাই। আত্মাকে স্বাভাবিক পথে আন, দেখিবে সকলি সিদ্ধ হইবে। চেষ্টা কর, আয়োজন কর, অধ্যবসায় নিয়োগ কর, সাধন কর, কিন্তু এসকল স্বাভাবিক প্রণালীতে নিযুক্ত কর।

হে ব্রাহ্ম, কল্পিত পথে যাইও না। স্বাভাবিক সহজ প্রণালী অবলম্বন কর, চক্ষু খুলিবে আর তৎক্ষণাৎ দেখিবে। নিমেষ মধ্যে ব্রহ্মদর্শন না হইল তো হইল না। হৃদয় বিকারগ্রস্ত, যদি ব্রহ্মের গম্ভীর বাক্য শ্রবণ করিতে না পাও, নূতনবিধ শাস্ত্র বুঝিতে না পার। সহজ উপদেশ

শুনিয়া তোমার কি হইবে, তোমার শ্রবণশক্তি এখনও প্রকৃতিস্থ হয় নাই। তোমার কর্ণ প্রকৃতিস্থ হইলে কত উপদেশ শুনিতে পাইবে। ঈশ্বরের বাণী নিয়ত আসিতেছে, নিয়ত তিনি আদেশ করিতেছেন, প্রাতঃকাল সায়ংকাল গভীর নিশীথ কোন্ সময়ে তিনি কি বলিবেন কে জানে? যাহাতে পরব্রহ্মের আদেশ ও উপদেশ সহজে বুঝিতে পার তজ্জন্য প্রস্তুত হও। ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বাভাবিক ধর্ম্ম, আমাদিগের ধর্ম্ম অস্বাভাবিক হইতে পারে না। যে পথ অস্বাভাবিক, ব্রহ্ম কখন সে পথে যান না। শরীর যদি শীতল বায়ু চায়, তাহা স্বাভাবিক প্রণালীতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রেমের শীতল বায়ু লাভ করাও আত্মার পক্ষে তেমনি স্বাভাবিক। সমুদায় অভাব গুলির পূরণ স্বাভাবিক প্রণালীতে হইবে, ইহাতে বাহিক আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। প্রকৃত ধর্ম্ম আড়ম্বরশূন্য। ইহার সাধন সহজ, যোগ বৈরাগ্য প্রভৃতি সকলই সহজ। বহুকষ্টে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে হয় না।

আমাদিগের মধ্যে এখনও ধর্ম্ম ঔষধসেবনের ন্যায় হইয়া আছে। ফলতঃ এখনও আমাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয় নাই। কঠিন উপধর্ম্ম এখনও রহিয়া গিয়াছে, যে বস্তু আমরা চাই এখনও তাহা প্রাপ্ত হই নাই। যথার্থ বস্তু না হইলে ধর্ম্মসাধন কঠিন থাকিবেই। নিরবলম্ব উপায়ে ধ্যান করিতে হইবে। এখনও ধ্যান অত্যন্ত কঠোর হইয়া আছে। এরূপে কখন ধ্যান অভ্যাস হইবে না, ধ্যান করিতে গিয়া সংসারের চিন্তা দূর করিতে পারিবে না। যথার্থ ধ্যান করিতে অনেক সময় লাগে, ঈশ্বরে চিত্তসমাধান বহু আয়াসসাধ্য, সহজে ব্রহ্মানন্দ লাভ করা যায় না, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস অবরোধ করিয়া যোগ করিতে হয়, যথার্থ ব্রহ্মযোগী এরূপ কখন বলেন না। যথার্থ যোগী যখন যোগ সাধন করিতে থাকেন, তখন তিনি পৃথিবী হইতে দশ হাত ঊর্দ্ধে উঠেন। মন্দিরে আমরা একত্র হইয়া "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" বলি, কিন্তু এক "সত্যং" উচ্চারণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ যোগীর আত্মা ১০০ ক্রোশ উপরে চলিয়া যায়। তুমি যদি বল বহু কষ্টে বহু চেষ্টায় সাধন করিতে হইবে, তবে যোগে ঊর্দ্ধে উঠিতে পারা যায়, এ কথা ঠিক নয়। এ কথা অন্যান্য ধর্ম্মে সাজে। বহু আড়ম্বর বহু উপায় বহু সাধন বিবিধ প্রণালী অবলম্বন করিয়া ফল কেবল কষ্ট।

ব্রহ্মকে এরূপে লাভ করা যায় না, সুতরাং এরূপ পথ অবলম্বন অসঙ্গত। জলে নামিলেই যেমন তাহাতে মগ্ন হওয়া যায়, পক্ষী যেমন অনায়াসে উপরে উঠে, আত্মার ব্রহ্মে নিমগ্ন হওয়া, মানসপক্ষীর ঊর্দ্ধে উঠা তেমনি সহজ। উড়িতে ডুবিতে কিছুমাত্র কষ্ট নাই। স্বভাবের ধর্ম্ম স্বীকার করিলে, অনায়াসে কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, ইহাতে কিছু অস্বাভাবিক নাই। যোগ ব্রহ্মদর্শন সহজ, অন্যথা দুবৎসর চিন্তা করিয়াও কেহ ব্রহ্মকে দর্শন করিতে পারে না। কঠোর চেষ্টাতে স্বভাবকে ছাড়িয়া যাওয়া হয়। কষ্টে সাধন, প্রকৃতির ফল নয়। সে ফল প্রকৃত ফল নয়, সে প্রণালী ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রণালী নয়। অন্য ধর্ম্মে এ সকল অস্বাভাবিক প্রণালী অনুসরণ শোভা পায়, কিন্তু এই মন্দিরে যাঁহারা উপাসক, তাঁহাদিগের নিকট দর্শন, বস্তুস্পর্শ, প্রার্থনা এবং তাহার সদুত্তর শ্রবণ যদি সঙ্গে সঙ্গে না হয়, তবে সংশয় হয় এ সকল প্রকৃত নহে কল্পনা, কেবল টানিয়া মন জোরেতে বাহির করা। প্রকৃতিস্থ থাকিলে তৎক্ষণাৎ ফল লাভ হয়। সর্ব্বদা সাবধান হও, অস্বাভাবিক বস্তুর জন্য কখনও প্রয়াস করিও না। স্বভাবতঃ ব্রহ্মকে দর্শন কর, সমুদায় বাহ্যাড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া সহজ পথে আসিতেছ কি না দেখ। শরীরকে প্রকৃতিস্থ কর, মনের পাপ, কুসংস্কার, মিথ্যা চিন্তা দ্বারা মন চঞ্চল না হয় এজন্য স্বভাব দ্বারা পাপকে জয় কর, দেখিবে অতি সহজে যোগী হইবে। এক মিনিট বসিয়া দেখ দর্শন হয় কি না? এক মিনিটে দর্শন হইলতো হইল, নতুবা দুই পাঁচ বৎসর চেষ্টা করিয়াও বিকার না ঘুচিলে কিছু হইবে না। স্বভাবতঃ অঙ্গস্পর্শ করিয়াই বুঝিতে পারা যায় অঙ্গ প্রকৃতিস্থ কি না? হৃদয় প্রকৃতিস্থ কি না, স্বভাবের নিকটে তাহার মীমাংসা।

অনেক চিন্তা অনেক ক্রন্দন ইহাতে কিছু হয় না। যদি অর্দ্ধ ঘণ্টা সরল প্রার্থনা হয়, চেষ্টা স্বভাবসিদ্ধ হইল, ফল তৎক্ষণাৎ হইবে। ব্রহ্মদর্শন যখন হয়, তখন নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় সহজ হয়, অন্যথা অত্যন্ত কঠিন। ঈশ্বর আছেন, এই বক্ষে আছেন, প্রেরিত মহাজনগণকে রক্তের ভিতরে দেখিতেছি, এরূপ সহজাবস্থা ভিন্ন সুখ হয় না। বহু আয়াস

চেষ্টাতে শান্তি হয় না। প্রকৃত ব্রাহ্ম আড়ম্বরশূন্য। স্বাভাবিক ভাবে ঈশ্বরকে ডাকিতে থাক, যাহা কঠোর তাহার অন্বেষণ করিও না। পিতার প্রতি সন্তানের সন্তানের প্রতি পিতার ভাল বাসা সহজ, অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া আর তাহা আয়ত্ত করিতে হয় না। কর্ণ পাতিয়া শুন ঈশ্বর কি বলিতেছেন। একথায় যে ব্যক্তি সন্দেহ করিয়া অস্বীকার করিল, তাহার কর্ণ আছে কে বলিতে পারে? যদি কর্ণ থাকে, যেমন শুনিবে অমনি নিশ্চিত বিশ্বাসের সহিত তাহা গ্রহণ করিবে। চক্ষুকে স্বাভাবিক কর, দেখিবে কেমন তাঁহাকে বাহ্য বস্তুর ন্যায় দেখা যায়। ব্রাহ্মের চক্ষু আছে, শ্রবণ আছে, অথচ সে দেখিতে পায় না, শুনিতে পায় না, তাহার সমুদায় বৃত্তি স্বাভাবিক আছে অথচ ধর্ম্মসঞ্চয় করিতে পারে না, ইহা হইতে পারে না। তাহার সমুদায় বৃত্তি বিকৃত হইয়াছে, চিকিৎসার প্রয়োজন। কিন্তু বিকৃত প্রণালীতে চিকিৎসা করিও না। প্রকৃতিস্থ করিতে শুভ ক্ষণের প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। এমন দিন হইবে, যে দিন জল পান করার ন্যায় ভাত খাওয়ার ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান সহজ হইবে। কখন সহজ ভাব ছাড়িব না। যদি সহজে শুনিতে না পাই, চিকিৎসার অধীন হইব, কিন্তু যোগধ্যান কঠিন বলিব না। ত্রিশ বৎসর কঠোর সাধন করিয়া ধ্যান করিবে ইহা কঠিন, ইহাকে বিফল যোগ বলি। প্রকৃত ধ্যান তাহাকে বলি, যাই চক্ষু বন্ধ অমনি প্রাণ ঊর্দ্ধে উড়িয়া গেল। যদি তোমাকে কতক্ষণ চেষ্টা করিতে হয়, সংসারে চলিয়া যাও, তোমার ধ্যান হইল না। চেষ্টা কি জানি না। জলে নামিলাম আর ডুবিলাম। চেষ্টা করিব, যোগ করিব, প্রেম সঞ্চয় করিব, ইহা হয় না। চেষ্টা করা পাপ, কঠোর যোগসাধন অপরাধ। সেই ব্রাহ্ম মূর্খ যে চেষ্টা করে, সেই ব্রাহ্ম অপরাধী যে কঠোর সাধন করে। যদি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ৫ মিনিট চেষ্টা করিতে হয়, তখন সংশয় হইবে হৃদয় বিকৃত হইয়াছে। ব্রহ্মযোগী বিলম্ব করেন না, পরিশ্রম করেন না, যোগানন্দসম্ভোগ তাঁহার নিকটে জল পান করার ন্যায় সহজ। যেমন তিনি বসিলেন তৎক্ষণাৎ যোগ হইল, তাঁহাকে কষ্ট করিতে হইল না, চেষ্টা করিতে হইল না। সন্তরণ শিখিতে চাও,

গা ছাড়িয়া দাও, সহজ অবস্থায় সন্তরণ শিখিতে পারিবে। যদি সন্তরণে আয়াস প্রকাশ করিয়া জলে আঘাত কর, সন্তরণ করিতে পারিবে না, জলমগ্ন হইয়া যাইবে। যদি যোগী হইতে চাও আপনাকে সহজাবস্থায় ছাড়িয়া দাও, টানাটানি করিয়া করিলে কিছু হইবে না। সহজাবস্থায় আপনাকে ছাড়িয়া দিলে ফল লাভ হইবে, ব্রহ্ম তোমার বক্ষে সহজে তাঁহার পাদপদ্ম ধারণ করিবেন। হে মনুষ্য, আধ্যাত্মিক অবস্থা সহজ এবং স্বাভাবিক। শরীরের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় প্রকাণ্ড যোগের ব্যাপারও সহজ। সহজ অবস্থায় থাকিয়া সহজ উপায় অবলম্বন কর, সমুদায় বিকৃত পরিশ্রম দূর করিয়া দাও। জলে নামিলে যেমন সহজে ডোবা যায়, তেমনি ব্রহ্মেতে ডুবিতে পারিবে পক্ষীর ন্যায় সহজে উর্দ্ধে উড়িয়া যাইবে। সহজ পথে চল, স্বভাবের উপর নির্ভর কর, ঈশ্বর তোমাকে আশ্চর্য্য সুধাপান করাইবেন।

দর্শন ও নিরীক্ষণ।

রবিবার, ২৯ ফাল্গুন, ১৭৯৮ শক।

ব্রহ্ম পুষ্পের ন্যায় ক্রমে ক্রমে ভক্তের হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হন। যদিও ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ, তথাপি তিনি ক্রমে ক্রমে সুন্দর হইতে সুন্দরতর হইয়া উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া সাধকের আত্মাতে প্রকাশিত হন। ঈশ্বরের মনের গুপ্ত ভাবসকল ক্রমে ক্রমে ভক্তের নিকট প্রকাশ পাইতে থাকে। প্রথমে যে ঈশ্বরের অল্প প্রকাশ হয়, তাহার প্রতিই সাহসপূর্ব্বক দৃষ্টিকে স্থির রাখিতে হইবে। অনেকে অস্থির হইয়া ভীত হন। তাঁহারা বলেন, নিরাকারের প্রতি কিরূপে অধিক ক্ষণ দৃষ্টি স্থির রাখিব? কিন্তু ধৈর্য্যশীল হইয়া নিরাকাররূপ একটি ক্ষুদ্র স্থূল ধরিয়া থাক, ক্রমে ক্রমে সেই স্থূল হইতে অনেক প্রকার সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইবে। একটি গোলাপ ফুল যখন কেবল ফুটিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার সমুদায় সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয় না; কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহা অতীব সুন্দর হইয়া প্রস্ফুটিত হয়। সেইরূপ ব্রহ্ম-পুষ্প ক্রমে ক্রমে তাঁহার সৌন্দর্য্যরাশি প্রকাশ করেন। ব্রহ্মাণ্ডের পতি ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন, আমি ভক্ত হৃদয়ে প্রকাশিত হইব। ভক্তির পরি

মাণ অনুসারে সাধকের হৃদয়ে ঈশ্বরের শক্তি, জ্ঞান, প্রেম এবং পবিত্রতা প্রভৃতি অল্পে অল্পে প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। যত মনুষ্যের প্রাণকে অন্য বস্তু টানিয়া লয়, তত তাহা চঞ্চল হয় এবং তত তাহা ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। আর সাধক অন্য বস্তুর প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া যত ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখেন, তত তাঁহার হৃদয় ঈশ্বরে সংলগ্ন হইয়া যায় এবং তিনি ক্রমাগত ঈশ্বরের নূতন নূতন সৌন্দর্য্য দর্শন করেন। বিষয়াসক্ত মন ঈশ্বরেতে সংলগ্ন হয় না। শুষ্ক অভক্ত চক্ষের নিকটে ব্রহ্ম অপ্রকাশিত থাকেন। অনেকেই অনুভব করিয়া থাকিবেন, দৃষ্টি স্থির করার অর্থ ঈশ্বরকে ধারণ করা। নিরাকার নির্গুণ ঈশ্বরকে ধারণ করা চঞ্চল মনের কার্য্য নহে। চক্ষু, আর কিছুই দেখিও না, কেবল এইখানে ব্রহ্ম আছেন তাঁহাকেই দেখ, চক্ষু যদি অভক্ত হয় সে বলিবে আমি কিছুই দেখিতে পাইলাম না, কোথায় ব্রহ্ম, কেবলই শূন্য দেখিতেছি। অভক্ত চক্ষুকে যদি আরও স্থির করিতে চেষ্টা কর, সে আরও ভয়ানক হৃদয়বিদারক কথা বলিবে। সে বলিবে আগে যেন নিকটে একটি হৃদয়বন্ধু আছেন বোধ হইত এখন দেখিতেছি কেহই নাই। এই অবস্থায় মানুষের পক্ষে কি করা উচিত? সে বলিবে যখন দৃষ্টি স্থির করিলে কিছুই দেখিতে পাই না, তখন অত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে চেষ্টা না করিয়া কেবল উদ্দেশে তাঁহাকে ডাকাই ভাল। খুব সূক্ষ্মরূপে তাঁহাকে দেখিতে চেষ্টা করিলে যখন তিনি একেবারে দৃষ্টি পথের বহির্ভূত হন, তখন ভিতরে বাহিরে সমুদ্রে পর্ব্বতে ফলে ফুলে সর্ব্বত্র তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা না করিয়া দিনান্তে নিশান্তে এক আধবার প্রাণের সহিত তাঁহাকে ডাকাই ভাল। এই যুক্তির মধ্যে যে কেবল অসত্য আছে তাহা নহে ইহার মধ্যে ঘোর বিপদ্ স্থিতি করিতেছে। ফলতঃ শুষ্ক নয়নে যেখানে সেখানে ঈশ্বরকে দর্শন করিতে আশা করিলে নাস্তিকতার হস্তে পড়িতে হয়। আগে দৃষ্টিকে প্রেম ভক্তি রসে অভিষিক্ত করিয়া লও, পরে সেই প্রেমার্দ্র চক্ষু যখনই ব্রহ্মের উপরে পড়িবে, তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মরূপসাগরে মগ্ন হইয়া যাইবে। ভক্ত চক্ষু একেবারে ব্রহ্মের সঙ্গে সংলগ্ন হইয়া যায়। যখন এইরূপে দুইয়ের যোগ হইবে তখন যতই ব্রহ্মদর্শন করিতে ইচ্ছা কর

ভয় নাই। কেন না তখন তোমার সরস ভক্ত নয়ন প্রেম রজ্জুদ্বারা ব্রহ্মকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। যখন ব্রহ্ম তোমার চক্ষুর সঙ্গে গ্রথিত হইলেন, তখন তোমার চক্ষের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মকে যাইতেই হইবে। তখন ব্রহ্ম তোমার নয়ন-অঞ্জন হইলেন। এই অবস্থার পূর্ব্বে ব্রহ্মকে নিরীক্ষণ করিতে চেষ্টা করিলে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়, তখন কেবল দুই একবার পথের দেবতার ন্যায় ব্রহ্মকে দর্শন এবং নমস্কার করিয়া যাওয়াই ভাল। প্রথমাবস্থায় নিরীক্ষণ করা বিপদের কারণ। প্রথমে হে ঈশ্বর, তুমি আছ, এই কথা বলা যায়, কিন্তু হে ঈশ্বর, তুমি কেমন, এ প্রশ্ন করিয়া ঈশ্বরের রূপ নিরীক্ষণ করিতে চেষ্টা করা বিপদের বিষয়। মধুকর যেমন প্রথমে অল্পে অল্পে পুষ্পমধু পান করে, পরে ক্রমশঃ পুষ্পের মধ্যে প্রবেশ করি সুধা পান করিয়া মত্ত হইয়া যায়, ভক্ত সাধকও সেইরূপ প্রথমাবস্থায় বারংবার ঈশ্বরকে দর্শন করেন, কিন্তু উন্নত অবস্থায় ব্রহ্মকে নিরীক্ষণ না করিলে তাঁহার হৃদয়ের তৃপ্তি হয় না। যত ক্ষণ না কোন বস্তু স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়, তত ক্ষণ তাহার গুপ্ত মনোহর ভাব গণনা করা যায় না। কোন একটী সুন্দর ছবি প্রথমে আমরা দর্শন করি পরে নিরীক্ষণ করি, তার পরে সূক্ষ্মরূপে নিরীক্ষণ করি। বন্ধুকে ঘরে পাইলে প্রথমে তাঁহার মুখ অবলোকন, পরে যতই প্রেমচক্ষে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করি, ততই চক্ষু বন্ধুর রূপরসে ডুবিয়া যায়। সেইরূপ, হে উন্নত ব্রাহ্ম, যত ঈশ্বরেতে দৃষ্টি স্থির রাখিয়াছ, ততই ঈশ্বরকে মনোহর দেখিয়াছ কি না বল? আকাশের মধ্যে শুষ্ক নয়নে তাকাইলে কেবলই শূন্য, এবং ধূম দর্শন করিবে, আর যদি ভক্তিনয়নে দেখ ব্রহ্মকে নিকটে দেখিতে পাইবে, এবং দেখিবে সেই এক জন ক্রমাগত নূতন নূতন বেশ ধরিতেছেন, নূতন নূতন সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছেন। সেই রূপ দেখিতে দেখিতে ভক্তনয়ন অবশেষে একেবারে ব্রহ্মরূপসাগরে ডুবিয়া যাইবে। অতএব তখন নয়নকে ঈশ্বরের প্রতি স্থির করিবে যখন নয়ন সরস হইবে। তখন যত দেখ তত লাভ, তখন আর ভয় নাই। তখন নির্ভয়ে ঈশ্বরকে নিরীক্ষণ করিবে, কারণ তখন নাস্তিকতাবিপদের আশঙ্কা চলিয়া গিয়াছে।

সেবকের নিবেদন।

ভাগবতী তনু।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ৪ঠা ফাল্গুন ১৮০১ শক।

আত্মার আধার শরীর। শরীরের আধার আত্মা। শরীরের ভিতরে আত্মা থাকে, আবার আত্মা বিনা শরীর জীবিত থাকিতে পারে না। আত্মাকে অবলম্বন করিয়া শরীর বাঁচিয়া আছে আত্মা না থাকিলে মৃত শরীর কোন কার্য্য করিতে পারে না। আবার শরীর বিনা আত্মা পৃথিবীতে কোন ক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে না, সুতরাং শরীর যেমন আত্মার আধার আত্মাও শরীরের অবলম্বন। দুই কথাই সত্য। আমরা মনে করি আত্মা শরীরের মধ্যে থাকে, কিন্তু শরীরের সাহায্যে যে আত্মা ভক্তিরস, যোগরস, জ্ঞানরস, পুণ্যরস, ও শান্তিরস লাভ করে তাহা সর্ব্বদা ভাবিয়া দেখি না। জীবাত্মা এই শরীরের ভিতর দিয়া পৃথিবী হইতে ধর্ম্ম মধু, জ্ঞানমধু, প্রভৃতি নানা প্রকার সুমিষ্ট রস আহরণ ও সঞ্চয় করে, অতএব শরীর যে আমাদিগের পক্ষে আদরের বস্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যদিও আমরা জড়বাদীর ন্যায় এই অসার অস্থায়ী শরীরকে সর্ব্বস্ব মনে করি না, তথাপি প্রত্যেক ব্রাহ্মকে মানিতে হইবে যে এই অনিত্য শরীর আত্মার নিত্যধর্ম্ম, নিত্য জ্ঞান এবং নিত্য সুখ উপার্জ্জনের বিশেষ সহায়। জীবাত্মা ধরাধামে এই অসার শরীরের দ্বারা অনন্ত কালের জন্য প্রচুর সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া পরলোকে গমন করে। কিন্তু একদিকে যেমন আমাদের এই তনু আত্মার জ্ঞানোন্নতি ও ধর্ম্মোন্নতির প্রধান সহায় আর একদিকে আবার তেমনি আত্মার অধোগতি ও সর্ব্বনাশের কারণ। একদিকে যেমন এই

দেহ নানা প্রকার ধর্ম্ম ও বিপুল আনন্দের কারণ, অন্যদিকে ইহা আবার নানাবিধ অধর্ম্ম ও অশেষ যন্ত্রণার হেতু। আমরা এই শরীর দ্বারা যেমন পুণ্য ও শান্তি সঞ্চয় করিতে পারি তেমনি ইহা দ্বারা আবার নানা প্রকার পাপ ও দুঃখ সঞ্চয় করিতে পারি। মনুষ্য, তোমার কাম, ক্রোধাদি পাপের আধার কোথায়? তোমার শরীরের ভিতরে। যতদিন পর্য্যন্ত না তোমার তনু ভাগবতী তনু হইবে ততদিন ইহা পশু তনু ততদিন ইহা ষড়রিপুর তনু দুর্দ্দান্ত দৈত্যদিগের বাস গৃহ। হয় তনু ভগবানের এবং ভক্তদিগের বাসস্থান হইবে, নতুবা ইহা অসুর দিগের আলয় থাকিবে। হে মানুষ, যদি তুমি তোমার শরীরের মধ্যে ভগবান্ ও তাঁহার সাধু দিগকে প্রতিষ্ঠিত না কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অসুরেরা আসিয়া তোমার শরীর অধিকার করিবে। তোমার দুই চক্ষু দুই ভয়ঙ্কর অসুরের বাসস্থান হইবে, তোমার দুই কর্ণ দুই দৈত্যের গর্ত্ত হইবে, তোমার রসনা কাল সর্পের আধার হইয়া চারিদিকে নরনারীর কর্ণে পাপ গরল ঢালিয়া দিবে, তোমার প্রত্যেক হস্তের পাঁচ অঙ্গুলীতে পাঁচ কাল দৈত্য আসিয়া বসিবে। তোমার সমস্ত শরীর পাপের আলয় হইয়া উঠিবে। তোমার শরীরের কোন অংশ, কোন যন্ত্র শুদ্ধ থাকিতে পারিবে না। শরীরকে যদি আপন বশে না রাখিতে পার তবে কেবল মন শাসন করিয়া কি হইবে? শরীর যদি পাপের উত্তেজক না হয় কেবল মনের মধ্যে কি দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইতে পারে? পাপের ইচ্ছা চরিতার্থ হয় কিসে? এই অপবিত্র দেহে। এই শরীর দেখিতে অতি সুন্দর এবং নির্দ্দোষ মনে হয়; কিন্তু ইহার ভিতরে যখন পাপাসুরেরা আসিয়া বাস করে তখন ইহা অত্যন্ত বিকৃত ও ভয়ঙ্কর হয়। যখন সয়তান আসিয়া চক্ষু কর্ণ হস্ত পদ এই আটখানি যন্ত্র অধিকার করে তখন এই শরীর নিতান্ত দুর্গন্ধ নরক হইয়া উঠে। যদি তোমার তনু অসুরের তনু হয় তবে বাহিরে একটু সামান্য প্রলোভন দেখিলেই তোমার শরীরের ভিতরে কুবাসনার অনল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে। শরীরের কোন স্থানে পাপ লুকাইয়া থাকে তাহা নহে। আমার চক্ষে অমুক পাপ, আমার মস্তিষ্কে অমুক পাপ, অথবা আমার হস্তে অমুক পাপ,

এরূপে কেহ পাপ ধরিতে পারে না। শরীরের অতি সূক্ষ্ম স্নায়ুকেও তুমি ধরিতে পার; কিন্তু অতি স্থূল পাপকেও তুমি ধরিতে পার না। যত দিন না ভাগবতী তনু লাভ করিতে পার তত দিন তোমার তনু পাপে পূর্ণ থাকিবে, কিন্তু সে পাপকে তুমি দেখিতে পাইবে না। এক আসুরিক তনু, আর এক ভাগবতী তনু। এই দুইয়েতে অনেক প্রভেদ। আসুরিক তনু ষড়রিপুর অধীন, ভাগবতী তনু রিপুর অতীত, কেবল ভগবান ও তাঁহার ভক্তদিগের লীলা বিহার ক্ষেত্র। পশু তনুতে কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, হিংসা, স্বার্থপরতা এ সমস্ত রিপু উত্তেজিত হয়। বাহিরে কাম্য বস্তু দেখিলেই পশু তনুর ভিতরে কামনার অনল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, বাহিরে রাগের কারণ দেখিলেই পশুতনু ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধ হয়, বাহিরে টাকা প্রভৃতি লোভের সামগ্রী দেখিলেই পশুতনু সেই দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হয় এবং লোভ চরিতার্থ করিবার জন্য নির্দ্দোষ বালকের মুণ্ড ছেদন করিতেও কুণ্ঠিত হয় না, অপরের শ্রীবৃদ্ধি দেখিলে পশু তনুতে ঈর্য্যানল প্রজ্বলিত হয়। এইরূপে অজিতেন্দ্রিয় আসুরিক তনু সর্ব্বদাই নানাপ্রকার নরকের অগ্নিতে দগ্ধ হইতে থাকে। ভাগবতী তনু ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ভাগবতী তনু যিনি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার মন প্রশান্ত, তিনি সম্পূর্ণরূপে জিতেন্দ্রিয়। তাঁহার শরীর অতি শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। উহা দেবতাদিগের বাসস্থান। তাঁহার শরীর মন্দিরের মধ্যে কোন পাপাসুর আসিতে সাহস করে না। তাঁহার শরীর পুণ্যের দুর্ভেদ্য দুর্গ। সয়তান সে দিকে যাইতে পারে না। যে ব্রহ্মচারী যুবা ভাগবতী তনু লাভ করিয়াছেন, নিত্যোপাসনা তাঁহার প্রাণের সম্বল, তাঁহার অন্তরে নিরন্তর বৈরাগ্যানল জ্বলিতেছে। কোন প্রকার পাপাসক্তি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ব্রহ্মচারী বৈরাগীর ভাগবতী তনু দর্শন করিয়া ষড়রিপু পরস্পরকে বলে,—"ভাই এই ব্যক্তি বজ্রদেহী, ইহাকে স্পর্শ করি আমাদের এমত সাধ্য নাই, ইহার অস্থির ভিতরে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম এবং তেজস্বী পুণ্যাত্মা সকল বাস করিতেছেন, এ শরীর আমাদিগের বাসের পক্ষে অনুকূল নহে। ইহার মস্তিষ্কে নিরন্তর সুমতি ও সচ্চিন্তার উদয় হয়। ইহার

হৃদয়ে ব্রহ্ম প্রেমের প্রবল স্রোত বহিতেছে। ইহার রক্ত মাংস ও অস্থি মধ্যে সাধু বীরেরা হুঙ্কার করিতেছেন। এমন ভয়ানক স্থানে থাকা হইবে না। চল আমরা ইহাকে ছাড়িয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোকদিগের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করি।" এই রূপে ভাগবতী তনুর তেজ দেখিয়া কাম ক্রোধ প্রভৃতি সমস্ত আসুরিক ভাব ও পশুভাব পলায়ন করে। যে শরীর এই রূপে কুভাব শূন্য হয় সেই শরীর, ঈশ্বরের আদেশে, প্রকৃতির নিয়মানুসারে শীঘ্রই সাধুদিগের বাসস্থান হয়। প্রকৃতির এই নিয়ম যে কোন স্থান শূন্য থাকিবে না। যখনই কোন শরীর হইতে কাম ক্রোধাদি সমস্ত অসুর দল চলিয়া গেল, এবং উহা পাপ ও পাপ শূন্য হইল, তখনই সেই শরীর শূন্য দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ, ঈশা, মুসা, সক্রেটিস্ মহম্মদ, শাক্য, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সাধু মহাত্মগণ আসিয়া সেই শূন্য শরীর পূর্ণ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা পরস্পরকে বলেন 'কেমন ভাই, আমরা ইহার শরীরের ভিতরে স্থান পাবত? শ্রীগৌরাঙ্গ ঈশা ও শাক্য প্রভৃতি দেবাত্মাদিগকে বলিলেন "এই শরীর আমার অত্যন্ত মনোনীত হইয়াছে। ইহার বক্ষ এমন প্রশস্ত যে এমন বক্ষ ছাড়িয়া আমি আর কোথায় গিয়া নৃত্য করিব?" মহর্ষি ঈশা বলিলেন, "ভাই গৌরাঙ্গ আমিও এই শরীর মন্দিরে বাস করিব, আমি পৃথিবী ছাড়িয়া আসিবার সময় আমার বন্ধুদিগকে বলিয়াছিলাম, তোমরা আমার রক্ত মাংস পান আহার করিলে আমি তোমাদিগের শরীরের মধ্যে বাস করিব। এই সাধু যুবা আত্মেচ্ছা বিনাশ করিয়াছে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছে, অতএব আমি ইহার শরীরের মধ্যে রক্ত মাংস রূপে বাস করিব। শ্রীগৌরাঙ্গ, কেবল তুমি ইহার শরীরের মধ্যে গিয়া বাস করিবে, আমি কি ইহার শরীরের মধ্যে যাইব না?" যখনই শরীরের ভিতর হইতে অভক্তি ও স্বেচ্ছাচাররূপ দুই অসুর পলায়ন করিল, দুই দুষ্প্রবৃত্তি চলিয়া গেল, তখনই দুই স্বর্গীয় প্রবৃত্তি, দুই সাধু সেই শরীরের মধ্যে অবতীর্ণ হইলেন। মহর্ষি ঈশা ও শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়া সেই সাধু যুবার রক্ত নদীর উপকূলে দুই সুন্দর বাগান যুক্ত বাড়ী নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহাদিগের শুভাগমনে সেই সাধুহৃদয়ের ভিতরে দুই

জীবন্ত ফোয়ারা উৎসারিত হইতে লাগিল। সেই সাধু যুবার অন্তরে দুটী মধুময়ী প্রকৃতি প্রতিষ্ঠিত রহিল, দুই সাধু আসিয়া তাহাকে দুটী স্বর্গীয় প্রবৃত্তি দান করিলেন। এক জনের পিতার প্রতি অনুরাগ, আর এক জনের প্রভুর প্রতি আনুগত্য। অতএব শরীরকে সর্ব্বদা শুদ্ধ রাখিবে। শরীর যদি প্রতিকূল হয়, পাপাচরণ করিয়া শরীরের রক্ত যদি বিষাক্ত হয়, তবে তোমার শরীরের দুর্গন্ধে ঐ দুই মহাপুরুষ পলায়ন করিবেন। শরীরকে শুদ্ধ না রাখিয়া যদি তুমি ঐ দুই মহাপুরুষের জন্য বহু ব্যয় করিয়া জয়পুরের শ্বেত প্রস্তরে দুটী মনোহর অট্টালিকা নির্ম্মাণ কর, তথাপি তাঁহারা পলায়ন করিবেন। আশ্চর্য্য লাবণ্যযুক্ত অট্টালিকার পার্শ্বে যদি তোমার দুর্গন্ধময় শরীর থাকে সেই অট্টালিকায় রাজারাত থাকিবেনই না, তাহাতে কাঙ্গালেরাও থাকিবে না। পাপেতে মৃত্যু হয়, এবং মৃত্যু হইলেই শরীরে দুর্গন্ধ হয়, সেই দুর্গন্ধময় শরীরের নিকটে কেহই থাকিতে পারে না। তোমরা কি জান না এই কলিকাতা মহা নগরীতে দুর্গন্ধময় স্থানে যদি অতি সুন্দর অট্টালিকাও থাকে তাহা কেহ লয় না। সেইরূপ পাপ দুর্গন্ধময় শরীর বাহ্যিক শোভায় অত্যন্ত সুন্দর হইলেও তাহা সাধুদিগের মনোনীত হয় না। যাহার শরীরের ভিতর হইতে কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা প্রভৃতির ভয়ানক দুর্গন্ধ উঠিতেছে তাহার শরীরের মধ্যে কিরূপে পুণ্যাত্মা সাধুগণ বাস করিবেন? এই জন্য হে জীবসকল, তোমরা মনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শরীরের পবিত্রতা সাধন কর। শরীরকে কোন কারণে অপবিত্র হইতে দিও না। শরীরকে লোভী, স্বেচ্ছাচারী, ইন্দ্রিয়াসক্ত ক্রোধান্ধ অর্থাৎ ঈর্ষ্যানলে প্রজ্বলিত হইতে দিও না। শরীরের অস্থির মধ্যে যদি অনবরত জ্বলন্ত বৈরাগ্যানল পোষণ করিতে না পার, তবে শরীর বিলাসী হইবে, শরীর ভাল খাইতে চাহিবে, ভাল পরিতে চাহিবে, ভাল শয্যায় শয়ন করিতে চাহিবে। শরীর ঈশ্বরের আদেশ, ধর্ম্মের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া নানাপ্রকার বিলাস সুখ ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত হইবে। তোমরা যদি বল, "আমাদের শরীর যাহা করুক না কেন আমাদের মন উন্নত।" তোমাদিগের সেই কথা আমি বিশ্বাস করিব না। দুর্গন্ধ স্থানে সোণার বাড়ী যেমন তেমনই বিলাসপরায়ণ দুর্গন্ধ-

শরীরের মধ্যে স্থন্দর মন। যদি প্রলোভনের অতীত ও নিরাপদ হইতে চাও তবে শরীর মন উভয়কে শুদ্ধ রাখিতে যত্ন কর। দেখাও তোমার দক্ষিণ হস্তে ঈশা, তোমার বক্ষস্থলে শ্রীগৌরাঙ্গ এবং তোমার মস্তিষ্কে মহাত্মা সক্রেটিস্। দেখাও তোমার দক্ষিণ হস্তের মধ্যে ঈশা অবতরণ করিয়া তাঁহার স্বর্গস্থ মহাপ্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছেন এবং তোমার বক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গ হরিনাম রসে উন্মত্ত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন এবং তোমার মস্তিষ্কের মধ্যে সক্রেটিস্ ধর্মচিন্তা পারলৌকিক চিন্তা এবং আত্ম-জ্ঞান ও নীতিতত্ত্ব দ্বারা তোমার মনকে উজ্জ্বল করিতেছেন। দেখাও যেমন জব্বলপুরের নির্ম্মল প্রস্রবণে লোকে মহা আনন্দ ও মহা আগ্রহের সহিত স্নান করিয়া আপনাদিগকে শুদ্ধ ও সুখী মনে করে সেইরূপ তোমার রক্ত প্রবাহরূপ নর্ম্মদা নদীতে স্বর্গের সাধুগণ আসিয়া স্নান করিতেছেন। দেখাও তোমার দক্ষিণ হস্তের পাঁচটী অঙ্গুলির মধ্যে পাঁচটী পুণ্যাত্মা দয়াল সাধু বসিয়া আছেন। দেখাও তোমার মস্তকের কেশ রূপ নিবিড় কাননের মধ্যে সেই প্রাচীন আর্য্য যোগী ঋষিগণ আসিয়া ধ্যান সমাধিতে নিমগ্ন রহিয়াছেন। এইরূপে যখন দেখিবে যে তোমার সর্ব্বাঙ্গে নানা দেশের এবং নানা যুগের সাধুভক্তগণ আসিয়া তাঁহাদিগের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তোমার রক্তনদীর মধ্যে পৃথিবীর সমুদায় সাধু মহাত্মা-দিগের রক্ত মিলিয়া গিয়াছে তখন জানিবে যে তুমি ভাগবতী তনু লাভ করি-য়াছ। নববিধানাশ্রিত ব্রাহ্মগণ, সাধুদিগের রক্ত মাংস পান ভোজনরূপ নব-ব্রত তোমরা সাধন কর। পশুর ন্যায়, ইন্দ্রিয়াসক্ত মানুষের ন্যায় আর তোমরা পান ভোজন করিও না। তোমরা ঈশার পুণ্যরূপ অন্ন আহার কর, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমরূপ বারি পান কর। পশু জন্তু সকল অসার অন্ন খায়, ভক্তগণ দেবপ্রসাদ, দেবীপ্রসাদ গ্রহণ করেন। সাধুগণ অন্নের মধ্যে ব্রহ্মের প্রেম এবং ব্রহ্মের তেজ আহার করেন। ব্রহ্ম পরিপূরিত অন্ন আহার করিয়া সাধুদিগের মনে যোগবল, ভক্তিবল, পুণ্যবল বৃদ্ধি হইতে থাকে। ঈশা প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে তোমরা আহার পান করিতে আরম্ভ কর। যে ভাবে অন্ন আহার করিলে সাধুজীবন পোষিত ও পরিবর্দ্ধিত হয় সেইভাবে তোমরা অন্ন গ্রহণ কর। অকৃতজ্ঞ অভক্তভাবে

কদাচ তোমরা ঈশ্বরের দান গ্রহণ করিও না। আহারকে কদাচ তোমরা ইন্দ্রিয় সুখের পরিপোষক মনে করিও না। অতি পবিত্র ও গম্ভীর ভাবে আহার করিবে। পবিত্রতার অন্ন আহার কর, ভক্তিবারি পান কর। অশুদ্ধ মনে অন্ন ভোজন করিও না, অভক্ত ভাবে জল পান করিও না। ভোজন পান করিবার সময় ঈশা চৈতন্যের জীবন ভোজন পান করিবে, সাধুজীবন আহার না করিলে ভাগবতী তনু লাভ করিতে পারিবে না। তোমার তনু সাধুদিগের সেবায় উৎসর্গ কর। তোমার নিজের জন্য আর তোমার তনু রাখিও না। যিনি তোমার এই তনু সৃজন করিয়াছেন সেই বিশ্বপতি সেই দেহপতি সেই প্রাণারাম, সেই প্রাণাভিরামের সেবায় এই তনু নিযুক্ত করিয়া ইহাকে রামতনু ভাগবতী তনু করিয়া লও। যদি তোমার তনু ঈশ্বরের বিরোধী হয় তবে আর সেই পাপতনুকে আদর করিও না। তোমার চক্ষু, কর্ণ, রসনা, হস্ত, পদ, কিম্বা শরীরের কোন যন্ত্র যদি ঈশ্বরের অবাধ্য হয় তবে তাহা কাটিয়া ফেল। তোমার শরীরের সমুদয় অঙ্গ ভাগবতী তনুর অঙ্গ হইবে। তোমার চক্ষু ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন দ্রব্য দেখিবে না। তোমার কর্ণ তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা শুনিবে না। তোমার রসনা তাঁহার নামরস ভিন্ন অন্য রস পান করিবে না। মনের আধার এই শরীরকে ধর্মের অনুকূল করিয়া লইবে। যখন হস্ত দ্বারা তোমার নিজের অঙ্গ স্পর্শ করিবে তখন তুমি বুঝিতে পারিবে যে তুমি দেবর্ষিদের অঙ্গ স্পর্শ করিতেছ। তোমার শরীরের রক্ত মাংস তাঁহাদিগের অধিকৃত এবং তাঁহাদিগের সঙ্গে একীভূত হইয়া গিয়াছে। তুমি স্পষ্ট দেখিতে পাইবে ঈশা গৌরাঙ্গ প্রভৃতি আসিয়া তোমার রক্ত নদীতে খেলা করিতেছেন। তোমার শরীর আর তোমার থাকিবে না। তোমার শরীর স্বর্গীয় দেবতাদিগের লীলাক্ষেত্র হইবে। মানুষ ভ্রমান্ধ হইয়া বলে আমার শরীর, তোমার শরীর, উহার শরীর, কিন্তু বাস্তবিক প্রত্যেক মানুষের শরীর ঈশ্বর এবং সাধুদিগের লীলার ক্ষেত্র। যাঁহারা সত্যবাদী তাঁহারা বলেন "আমার তনু আমার নহে, ইহা সাধুদিগেরই তনু। এই তনুর উপরে আমার কোন অধিকার নাই।" দয়াময় পিতা কৃপা করুন আমরা যেন সকলে এইরূপ ভাগবতী তনু লাভ করি।

সেবকের নিবেদন।

ত্রিনীতিবাদ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ১৪ চৈত্র ১৮০২ শক।

ত্রিতাপের শান্তি ত্রিনীতিবাদ। যখন সত্য ত্রয় বিজ্ঞানের দ্বারা এক হয় তখন ত্রিতাপের শান্তি হয়। তিনকে যিনি এক করেন তিনিই সুখী হন। তাহারা ত্রিতাপে কষ্ট পায় যাহারা তিনকে স্বতন্ত্র মনে করে। এককে যিনি তিনের মধ্যে উপলব্ধি করেন ধন্য সেই সাধু, ধন্য সেই ব্রহ্মজ্ঞানী। নববিধানের আলোক অবলম্বন করিয়া ত্রিনীতি মত বিবৃত করিতেছি, ব্রাহ্মগণ, শ্রবণ কর। ত্রিসত্যের মধ্যে এক সত্য, ত্রিসত্তার মধ্যে এক সত্তা, ত্রিনীতির মধ্যে এক নীতি উপলব্ধি করা প্রকৃত বিজ্ঞানের কার্য্য। তিন বাস্তবিক মূলে এক। এই সত্য মানিতে হইবে, এই সত্য সাধন করিতে হইবে, এই সত্য সাধন করিয়া সুখী হইতে হইবে। সমুদয় বিবাদের মীমাংসা, সকল বিরোধের সামঞ্জস্য হওয়া কেবল নববিধানের দ্বারাই সম্ভব। অতএব বল হে নববিধান, তিন কিরূপে এক হইল। ঈশ্বর, আমি এবং জগৎ এই তিন সত্তা, এই তিন সত্তা, এই তিন কিরূপে এক হইবে? এই আমি, এই তোমরা, আর আমার এবং তোমাদের মধ্যে এই ব্রহ্মাণ্ডপতি ঈশ্বর। এক ঈশ্বর আমাদের প্রতিজনের মধ্যে প্রাণরূপে বর্ত্তমান। সেই এক সত্তা, সেই এক সত্তা ঈশ্বর, তোমার আমার মধ্যে না থাকিলে আমরা কেহই বাঁচিয়া থাকিতে পারিতাম না। মূল সত্তা, মূল সত্তা তিনি। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমরা সকলে অবস্থিতি করিতেছি। কিন্তু এই ঈশ্বর, এই আমি, এই তোমরা, যত ক্ষণ এই তিন

স্বতন্ত্র দেখিতেছি তত ক্ষণ আমরা ভ্রমে ভ্রান্ত ত্রিতাপে সন্তপ্ত। এই ভেদজ্ঞান হইতে নানা প্রকার অধর্ম্ম, শোক, জ্বালা, যন্ত্রণা উৎপন্ন হয়। যত ক্ষণ আমরা এই তিনের মধ্যে এক না দেখিতে পাই তত ক্ষণ কিছুতেই প্রকৃত শান্তি লাভ করিতে পারি না। এই তিনের মধ্যে একত্ব অনুভব করাই প্রকৃত শান্তির অবস্থা। এই তিনকে স্বতন্ত্র জ্ঞান করিয়া যদি ব্রহ্মপূজা করি সেই অপূর্ণ ব্রহ্মপূজাতে পাপের স্রোত বন্ধ হয না। ব্রহ্মের মধ্যে আমি এবং জগৎ, অথবা জগৎ এবং আমার মধ্যে ব্রহ্ম, এই সত্য স্পষ্টতর রূপে উপলব্ধি না করিলে পুণ্যের পথ শান্তির পথ আবিষ্কৃত হয় না। আমি যদি ব্রহ্ম ছাড়া জগৎ কিম্বা ব্রহ্ম ছাড়া আমি ভাবিতে পারি, অথবা যদি জগৎ এবং আমি ছাড়া ব্রহ্ম ভাবিতে পারি তবে তিনের ঐক্য হইল না। বাস্তবিক ব্রহ্মের মধ্যে সমস্ত জগৎ অবস্থিতি করিতেছে। জ্ঞানের অবস্থায় আমরা কোন মতেই ব্রহ্মবিহীন জগৎ কল্পনা করিতে পারি না। ব্রহ্মের মধ্যে জগৎ এবং আমি, আবার আমার মধ্যে ব্রহ্ম এবং জগৎ। ব্রহ্মবিহীন জীব হইতে পারে না। অতএব যখনই আমি আমাকে দেখিব, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার মধ্যে ব্রহ্মকে দেখিব। ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, প্রতিপালক, পরিত্রাতা ঈশ্বর দূরে নহেন; কিন্তু তিনি প্রত্যেকের প্রাণের মূলে প্রাণরূপে বসতি করিতেছেন। তিনি যেমন প্রতিজনের সঙ্গে বাস করিতেছেন সেইরূপ আবার সমষ্টিভাবে সমস্ত মানবমণ্ডলীর সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছেন এবং বিশেষরূপে প্রেরিত মহাত্মাদিগের মধ্যে স্থিতি করেন। যখন আমরা ঈশ্বরকে মহাপুরুষদিগের জীবনে দেখি তখন আমরা ইতিহাসের ঈশ্বরকে মহীয়ান্ করি। প্রথমতঃ বেদবেদান্তের সময় যোগী ঋষিরা নির্গুণ নির্ব্বিকার ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতেন। ঈশ্বর স্বয়ম্ভু, তিনি আপনার মহিমাতে আপনি বিরাজ করিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ যখন ঈশ্বর তাঁহার পুত্র মহাপুরুষদিগের জীবনে অলৌকিক ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করেন তখন পৃথিবী তাঁহাকে পুরাণ কিম্বা ইতিহাসের ঈশ্বর বলে। তৃতীয়তঃ ঈশ্বর পবিত্রাত্মা হইয়া প্রত্যাদেশ দ্বারা প্রত্যেক জীবাত্মাকে পবিত্র ও উন্নত করেন। বস্তুতঃ ব্রহ্মময় এই জগৎ। কি মহাপুরুষ, কি ক্ষুদ্র আত্মা

প্রত্যেকেই ঈশ্বরেতে জীবিত ও প্রতিপালিত। ঈশ্বর ভিন্ন কাহারও গতি নাই। তিনি প্রতি জনের জীবন, তিনি প্রতি জনের আশ্রয়। এই আমি, এই তোমরা, এই ঈশ্বর, বল এই তিনের মধ্যে যোগ না বিয়োগ? যদি বল এই তিন এক সুসূত্রে বদ্ধ এবং পরস্পর গূঢ়রূপে গ্রথিত তবে তোমরা যোগানন্দ রস পানের অধিকারী। যদি বল এই তিন স্বতন্ত্র, অথবা এই তিনের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে গূঢ় যোগ নাই তবে তোমাদের এই ভেদ জ্ঞান তোমাদিগকে অযোগী ও অবৈবাগী করিয়া তোমাদিগকে নানা প্রকার অধর্ম্মের নরক কুণ্ডে নিক্ষেপ করিবে। বিজ্ঞান চক্ষে, বিশ্বাস নেত্রে দেখিতে পাইবে এই তিনের মধ্যে গূঢ় যোগ রহিয়াছে। ব্রহ্ম, আমি এবং জগৎ এই তিন গূঢ়ভাবে সম্মিলিত। তিন সত্যের মধ্যে এক সত্য, ত্রিসত্তার মধ্যে এক সত্তা, ত্রিনীতির মধ্যে এক নীতি, এই গূঢ় রহস্য বুঝিতে হইবে। বাস্তবিক নিরাকার নির্ব্বিকার ব্রহ্ম কদাচ জীব কিম্বা জগৎ হইতে পারেন না। পিতা কিরূপে পুত্র হইবেন? স্রষ্টা কিরূপে সৃষ্ট হইবেন? অনন্ত কিরূপে ক্ষুদ্র হইবেন? অথচ এই তিন মূলে এক—এই গূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে হইবে। [illegible]বিমান এই গূঢ় রহস্য জানিয়াছেন। সত্য-স্বরূপ ঈশ্বরের দেহ নাই। ব্রহ্ম সৎ চিন্ময় [illegible]কার নিরবয়ব। তিনি সত্য স্বরূপ, পূর্ণ সত্য। তাঁহার সত্য কখন [illegible]র্ম্মের এক খণ্ড। ইহার জন্য দেহ চাই। সত্য বচন বলিবার জন্য রসনা অর্থাৎ মাংসের প্রয়োজন হইল। এই জন্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যে সত্য ঈশ্বরেতে ছিল, জগতের পরিত্রাণের জন্য সেই সত্য মাংস রূপ ধারণ করিল। অর্থাৎ যদিও ঈশ্বর স্বয়ং সত্যস্বরূপ তিনি সাকার মনুষ্যের ন্যায় সত্য কথা বলিতে পারেন না। এই জন্য পৃথিবীতে দৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থ তাঁহার ইচ্ছাতে রক্তমাংসময় দেহ ধারী তাঁহার একজন সত্যবাদী পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল। সত্য কথা বলিতে হইলেই রসনা চাই, মাংস চাই। আবার সত্য শ্রবণ করিবার জন্য কর্ণ চাই সুতরাং সত্য শ্রবণের জন্যও মাংসের প্রয়োজন হইল। আবার সত্য অনুষ্ঠানের জন্য হস্ত চাই, এই জন্য মনুষ্যকে রক্ত মাংসময় হস্ত প্রদত্ত হইল। দুগ্ধ পোষ্য শিশুর জীবন রক্ষা করিবার জন্য ঈশ্বরের নিরাকার স্নেহ মাতৃস্তনের আকার ধারণ

করে। সেই এক প্রেমময় ঈশ্বর হইতে জননীর হৃদয়ে স্নেহ এবং স্তনে দুগ্ধ সঞ্চারিত হয়। এইরূপে বিজ্ঞান চক্ষে দেখিলে বুঝিতে পারিবে, কি জড়রাজ্যে কি মানব দেহে সর্ব্বত্র ঈশ্বরের জ্ঞানলীলা এবং প্রেমলীলা। জীবশরীর ব্রহ্ম প্রেমের নিদর্শন। ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাঁহার অসীম জ্ঞান এবং অসীম প্রেমের পরিচয় দিতেছে। ক্ষুদ্র শিশুর মুখ যেমন, মাতৃ স্তন রূপ দুগ্ধ নিঃসারণ যন্ত্র ঠিক তাহার উপযোগী। জীবের নানা প্রকার অভাব মোচন করিবার জন্য ঈশ্বরের জ্ঞান এবং প্রেম, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা, হস্ত, মাতৃস্তন প্রভৃতি নানারূপ ধারণ করে। এ সমস্ত ঈশ্বরের প্রেমলীলার যন্ত্র। ব্রহ্মের সত্য জিহ্বার আকার ধারণ করিয়া সত্য কথা এবং প্রেমবাক্য বলিয়া পতিত জগৎকে উদ্ধার করে। ঈশ্বরের স্নেহ মাতৃস্তনের ভিতর হইতে দুগ্ধের আকারে বাহির হইয়া নিরাশ্রয় ক্ষুদ্রশিশুদিগের জীবন পোষণ করে। এইরূপে অল্পাধিক পরিমাণে ঈশ্বরের গুণ সকল মনুষ্যের ভিতরে আকৃতি ধারণ করে। ঈশ্বর স্বয়ং নির্লিপ্ত ও আকৃতি বিহীন; কিন্তু তাঁহার দয়া স্নেহ প্রভৃতি ভাব মনুষ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মনুষ্যের আকার ধারণ করে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ঈশ্বর বর্ত্তমান রহিয়াছেন। সাধু অসাধু উচ্চ নীচ সকলেই ঈশ্বর তনয়; কিন্তু যাহার রসনা খুব অধিক পরিমাণে হরিনাম করে সেই নরোত্তমের জীবনে উজ্জ্বলতর রূপে ঈশ্বরের প্রকাশ হয়। যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু ভাল যাহা কিছু পবিত্র সকলই ঈশ্বরের। ঈশ্বরের শক্তি ভিন্ন রসনা একটী সত্য উচ্চারণ করিতে পারে না, কর্ণ একটী সত্য শ্রবণ করিতে পারে না, মন একটী সত্য চিন্তা করিতে পারে না। মানুষের প্রত্যেক সত্য কথনের মধ্যে সত্যস্বরূপের প্রকাশ হয়। ঈশ্বরের সত্য মনুষ্যের রসনা দ্বারা উচ্চারিত ও প্রকাশিত হয়। ঈশ্বর অনন্ত প্রেমের আধার; কিন্তু পৃথিবীতে একটী ক্ষুদ্র স্নেহের প্রতিমা মা না থাকিলে আমরা তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতে শিখিতাম না। অর্থাৎ আমরা তাঁহার অনন্ত সন্তানবাৎসল্যের কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে ঈশ্বরের প্রেম সেই সন্তানের মার মনে স্নেহ, এবং স্তনে দুগ্ধ রূপে পরিণত হয়। ঈশ্বর বলেন আমি সতীর হৃদয়ে সতীত্বরূপে এবং জননীহৃদয়ে

অপত্য-স্নেহ রূপে প্রকাশিত থাকিব। সৃষ্টিতে নিয়ত ব্রহ্মের এই বাঞ্ছা পূর্ণ হইতেছে। ঈশ্বরের দয়া মাংস হইয়া প্রেমিক মানবদেহে আকার ধরিতেছে। সেই রূপ নির্ব্বিকার, সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী ঈশ্বরের বৈরাগ্য বৈরাগীশরীরে মাংসের আকার ধরিতেছে। পৃথিবীর মহাপুরুষদিগের কাঠোর বৈরাগ্য ব্রহ্মের অনন্ত বৈরাগ্যের আভাস মাত্র। সেই পরম বৈরাগী ঈশ্বর জীবের শরীরের ভিতরে বসিয়া অনাসক্তি ও আত্মনিগ্রহ রূপে খেলা করিতেছেন। আমার হাত যখন কোন দুঃখী গরিবকে পয়সা দেয় তখন আমার হাতের ভিতরে ঈশ্বরের দয়ার হস্ত কার্য্য করে। এই কথা শুনিয়া হে ভ্রান্ত মনুষ্য, কখন বলিও না যে ঈশ্বর মানুষ হইলেন! এইরূপ অসত্য কথা বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিও না। কিন্তু বল যে ঈশ্বরের অনন্ত প্রেম বিন্দুরূপে মানুষের মধ্যদিয়া প্রকাশিত হইয়া দুঃখীর দুঃখমোচন করিল। জীবের ভিতর দিয়া ব্রহ্মের প্রেম বিনিঃসৃত হইল। ঈশ্বর সকল গৌরবের অধিকারী; সকল সৎকর্ম্মের গৌরব তাঁহারই। সৎকর্ম্ম করিয়াছি বলিয়া ঈশ্বরের নিকটে কাহারও দর্প করিবার অধিকার নাই। তাঁহার নিকটে সকল দর্প চূর্ণ হইয়া যায়। অত্যন্ত জঘন্য লোক যদি সৎকর্ম্ম করে তাহাও ঈশ্বরের প্রেমের উত্তেজনায় সম্পাদিত হয়। সকল মানুষের ভিতরেই ঈশ্বরের অবতরণ কিন্তু তাঁহার বিশেষ অবতরণ মহাপুরুষদিগের জীবনে। চকমকির পাথর আঘাত করিলে কিম্বা দীপ শলাকা জ্বালিলে যেমন অন্ধকার মধ্যে চড়াৎ করিয়া আগুন বাহির হয় সেইরূপ এই পাপ অন্ধকারময় মলিন হৃদয়ের মধ্যে স্বয়ং ঈশ্বর প্রত্যাদেশ বাহির করেন। যখনই এইরূপে আমি প্রত্যাদিষ্ট হই তখনই ইন্দ্রিয় দমন হয় এবং মন ঈশ্বরের পুণ্য শান্তির অধিকারী হয়। ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ মৃতসঞ্জীবনী শক্তি লইয়া জীবাত্মার মধ্যে অবতীর্ণ হয়। ঈশ্বর স্বয়ং আমাদিগের ভিতরে আমাদিগের শক্তি হইয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করেন। প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বরের প্রাণ হইতে নূতন নূতন প্রেম সঞ্চার হইতেছে। প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি জানেন তিনি আর কোন গুরুর হস্তে নাই, ব্রহ্ম তাঁহাকে পাইয়াছেন এবং তিনি ব্রহ্মকে পাইয়াছেন। তিনি ব্রহ্মের এবং ব্রহ্ম তাঁহার। তিনি ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত। ব্রহ্মের

সংস্বভাব তাঁহার স্বভাব। আপনার বক্ষে ঈশ্বরের আবির্ভাব অনুভব করিয়া প্রত্যাদিস্ট আত্মা কি ইতিহাসের মধ্যে কি প্রকৃতির মধ্যে সর্ব্বত্র ঈশ্বরকে দেখিতে পান। ঈশ্বর ইতিহাসের মহাপুরুষদিগের মধ্যে, ঈশ্বর প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট আত্মার ভিতরে এই তিনেতেই ঈশ্বর। যথার্থ পূর্ণ ঈশ্বরকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হইলে ইতিহাস ও প্রকৃতির মধ্যে যে তাঁহার আবির্ভাব ও বিচিত্র লীলা তাহাও গ্রহণ করিতে হইবে। ঈশ্বর তাঁহার সাধুভক্ত সন্তানদিগকে ছাড়িয়া তোমার বাড়ীতে যাইতে পারেন না। যদি তুমি তাঁহাকে চাও, তাঁহার প্রেরিত মহা-পুরুষদিগকেও সমাদর করিতে হইবে। জগতের ইতিহাসে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি যত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের নাম লেখা আছে সে সমুদয়কে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্ম তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাসীর বাটীতে আবির্ভূত হন। হে ভক্ত, তুমি ইতিহাসের একটী পাতাও কাটিতে পার না। প্রাচীন যোগী ঋষিদি-গের মধ্যে ভগবান যোগেশ্বর রূপে প্রকাশিত; বুদ্ধদেবের ভিতরে সর্ব্ব-ত্যাগী পরম বৈরাগী রূপে; মুসার ভিতরে বিবেকসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত রাজা রূপে; ঈশার প্রাণের মধ্যে পিতা ও প্রভুরূপে; শ্রীগৌরাঙ্গের হৃদয়ে প্রেমোন্মত্ত সখা রূপে। ঈশ্বর দেশে দেশে যুগে যুগে যত লীলা করিয়াছেন এবং তাঁহার যত বিচিত্র স্বভাব প্রকাশ করিয়াছেন সে সমস্ত গ্রহণ করিতে হইবে। নববিধান ইতিহাসের কোন অংশ হইতে ঈশ্বরকে বিযুক্ত করিতে পারেন না। হে ব্রাহ্ম, তুমি বলিতেছ তোমার হৃদয় ছোট; কিন্তু ঈশ্বর তোমার হৃদয়কে তাঁহার সমুদয় বিধান গ্রহণ করিবার উপযুক্ত করিয়া সৃজন করিয়াছেন। যোগী, ভক্ত, প্রেমিক, জ্ঞানী, কর্ম্মী, সকলেই তোমার বক্ষের ভিতরে স্থান পাইতে পারেন। এক ঈশ্বর নানা রূপে নানা প্রকার সাধকের নিকট প্রকাশিত হইয়াছেন। যিনি হিমালয় শিখরে করতলন্যস্ত আমলকবৎ যোগীদিগের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিলেন, তিনিই ঈশা মুসা ও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি মহাত্মাদিগের নিকটে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা দিয়াছিলেন। সেই তিনিই আজ তোমার আমার প্রাণের মধ্যে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করিতেছেন। সেই পুরাতন ইতিহাস ও বর্ত্তমান প্রকৃতির ঈশ্বর ঘনীভূত হইয়া আমার প্রাণের ভিতরে প্রত্যা-

দেশের অগ্নি জ্বালিয়া দিতেছেন। ইতিহাস, প্রকৃতি এবং আমার আত্মার মধ্যে সেই এক ঈশ্বরকেই দেখিতেছি। ঐ এক ঈশ্বর পৃথিবীর ভিতর দিয়া, জনসমাজের ইতিহাসের ভিতর দিয়া আমার ভিতরে আসিলেন। আমার মধ্যে তিন এক হইল। যিনি ইতিহাসের ঈশ্বর তিনিই প্রকৃতির ঈশ্বর, এবং যিনি ইতিহাস ও প্রকৃতির ঈশ্বর তিনিই আমার ঈশ্বর। অতএব তিন ঈশ্বর হইল না, এক ঈশ্বর। একেতে তিন মিশিয়া গেল। এক ব্রহ্মসত্তার ভিতরে সমুদয় সত্তা ডুবিয়া গিয়াছে। এক সত্য স্বরূপ ব্রহ্মকে সমুদায় সৃষ্ট সত্তা অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। সেই এক ব্রহ্ম অনন্ত আকাশে বিস্তৃত, ইতিহাসের মহাপুরুষদিগের জীবনে প্রকাশিত, আবার প্রত্যেকের আত্মার ভিতরে অভ্যুদিত।

সেবকের নিবেদন।

পাপীর জন্য সাধুর প্রায়শ্চিত্ত।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ২২ চৈত্র, ১৮০২ শক।

ঈশ্বরের একটী কার্য্য আপাততঃ অন্যায় বলিয়া বোধ হয়। এই কার্য্যটীর গূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া কত লোক কুতর্ক করে, এবং কুতর্ক করিয়া ভ্রমে পড়ে। সে অন্যায় কার্য্যটী কি? জগতের দোষের জন্য নির্দ্দোষ সাধুদিগকে কষ্ট দেওয়া। বাস্তবিক অনেকে এই প্রশ্ন করে যদি ঈশ্বর যথার্থই ন্যায়বান্ হন তবে তিনি জগতের পাপ রাশির জন্য তাঁহার ভক্তদিগকে কেন প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলেন? এ কি সুবিচার? এ কি ন্যায় নিষ্পত্তি? কোন্ ন্যায় অনুসারে অপরাধী জগতের জন্য সাধুদিগকে দণ্ড পাইতে হইল? দুষ্ট ব্যভিচারীদিগের জন্য পৃথিবীর মহাপুরুষেরা আপনাদিগের জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। তাঁহারা আপন আপন বহুমূল্য রক্ত দিয়া পাপী পৃথিবীর জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। দুষ্ট পৃথিবী মহাপুরুষদিগের মস্তক ছেদন করিয়া ভয়ানক নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিল। ইতিহাস এ সকল নিদারুণ ঘটনা লিখিবার সময় কাঁদিতে লাগিল। ন্যায়বান্ ধর্ম্মরাজ ঈশ্বরভক্তদিগের পরিত্রাণের জন্য সাধুজীবন বলিদান রূপে গ্রহণ করেন। অসাধুদিগের কল্যাণের জন্য সাধুরা অকাতরে আপনাদিগের প্রাণ দান করেন। পাপী উদ্ধারের জন্য স্বর্গস্থ প্রভু সাধুদিগের মস্তক চাহিলেন; প্রভুর দাস সাধুগণ হাসিতে হাসিতে তাঁহাদিগের মস্তক দিলেন। শত শত ভীষণাকার নিষ্ঠুরচিত্ত দানবপ্রকৃতি মনুষ্য পৃথিবীর এক এক জন সাধুর মস্তক ছিন্ন করিল। শত্রুদিগের অস্ত্রাঘাতে সাধুর শরীর হইতে

রক্তপাত হইতে লাগিল। সেই রক্তপাতে সাধুর মৃত্যু হইল। কিন্তু সেই এক এক বিন্দু রক্ত হইতে সিন্ধুতুল্য পুণ্য উঠিয়া পৃথিবীর রাশি রাশি পাপ কলঙ্ক ধৌত করিল। নরবলি যদি দিতে হয় তবে ব্রহ্ম-সিংহাসনের সমক্ষে সাধু সজ্জনের জীবন বলি দেওয়াই কর্ত্তব্য। সাধু ভিন্ন আর কে নরবলির উপযুক্ত? যেমন তেমন জীবন ঈশ্বর গ্রহণ করেন না। সাধু সর্ব্ব ত্যাগী বৈরাগী হও তবে ঈশ্বর তোমাকে বলিস্বরূপ গ্রহণ করিবেন। যাঁহারা জগতের পরিত্রাণের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া দীন বৈরাগী হইয়াছিলেন অসাধু পৃথিবী তাঁহাদিগকেই নিষ্ঠুররূপে সংহার করিয়াছে। কোন সাধুকে ক্রুশে হত করিয়াছে, কাহাকেও অগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছে, কাহাকেও হিংস্র জন্তুর নিকটে নিক্ষেপ করিয়া মারিয়াছে, কাহাকেও নানাপ্রকার যন্ত্রণা দিয়া বধ করিয়াছে। সাধুদিগের প্রতি অবিশ্বাসী পাপাসক্ত পৃথিবীর ভয়ানক নিষ্ঠুরতা ও নির্য্যাতন স্মরণ করিলে হৃদয়ের রক্ত শুকাইয়া যায় এ সকল দুর্ব্বিষহ ঘটনা দেখিয়াই অনেকে জিজ্ঞাসা করে সাধুদিগের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুরাচরণ হইতে দেওয়া কি ঈশ্বরের অবিচার নহে? পরের পাপের জন্য সাধু কেন মরিবেন? কিন্তু সাধু ভিন্ন আর কে পরের দুঃখ ভার লইয়া মরিবেন? দুঃখী পাপী পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য আর কে এত ব্যাকুল হইবেন? আর কাহারও স্কন্ধ পাপভার বহন করিতে পারে না। এই জন্য পতিতপাবন ভগবান্ দশ বংশের পাপ, দশ জাতির পাপ, সমস্ত পৃথিবীর পাপভার সাধুর স্কন্ধে স্থাপন করেন। সাধু পরদুঃখে সর্ব্বদা দুঃখী হন। তাঁহার সমস্ত শরীরে পরের দুঃখানলের জ্বালা যন্ত্রণা। হে সর্ব্বত্যাগী সাধু, ঠিক তুমি তোমার আপনার স্ত্রী পুত্র পরিবার ও ধন সম্পত্তির জন্য তো এত ভাব না, তুমি পরের জন্য কেন ব্যস্ত? পর দুঃখে কেন তুমি দুঃখী হইলে? পরের দুঃখানলে কেন তুমি জ্বলিতেছ? আহা অমুক ব্যক্তির অন্ন বস্ত্র নাই, অমুক ব্যক্তি রোগে মরিতেছে, অমুক ব্যক্তি কেন সুরাপান করিল, অমুক গ্রামে আজ পর্য্যন্ত কেন বিদ্যালয় স্থাপিত হইল না, কেন এখন পর্য্যন্ত নর নারীর ব্যবহার পবিত্র হইল না, এ সকল চিন্তায় কেন তুমি আপনাকে আকুল করিতেছ? পরের দুঃখের জ্বালায় রাত্রিতে তোমার নিদ্রা হয় না। তুমি দিবানিশি

কেবল পৃথিবীর নরনারী সকল কিরূপে শুদ্ধ ও সুখী হইবে এই ভাবি-
তেছ। হে সাধু, তুমি আত্ম-বিস্মৃত হইয়া জগতের সুখে সুখী, জগতের
দুঃখে দুঃখী হইয়াছ। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে তুমি একীভূত হইয়া গিয়াছ!
কি চীন্ রাজ্যে কি আমেরিকা ভূখণ্ডে যে কেহ কোন প্রকার দুঃখ
সহ্য করে তাহা তোমার দুঃখ। অন্য লোক কাঁদিলে তুমি কাঁদ, অন্য
লোক হাসিলে তুমি হাস। চীন হইতে আমেরিকা পর্য্যন্ত যত দেশ,
যত গ্রাম, যত নগর আছে, এ সকল স্থানে যত লোক বসতি করিতেছে
তাহাদের সকলের বিপদে তুমি বিপন্ন, তাহাদিগের প্রতিজনের দুঃখে
তুমি দুঃখী। তোমার দুঃখ ভারের পরিমাণ নাই। অন্য লোককে ব্যাঘ্রে
কামড়াইল, তুমি মনে করিলে তোমাকে বাঘে কামড়াইয়াছে। অপরের
রোগ হইয়াছে তুমি মনে করিলে তোমার রোগ হইয়াছে; অপরে পাপের
জন্য আত্মগ্লানিতে পুড়িতেছে, তুমি মনে করিলে যেন তুমি পুড়িতেছ।
বাস্তবিক সাধু হওয়া বিষম দায়। সাধুর মস্তকের উপরে সমস্ত মানব
মণ্ডলীর গুরুতর দুঃখভার আপনা আপনি আসিয়া পড়ে। সাধারণ
লোক সাধুর বুকের দুঃখাগ্নির গভীরতা ও তেজস্বিতা বুঝিতে পারে না।
সকল পৃথিবী যদি এক জন হয় তবে সেই একজন সাধু সজ্জন। স্বার্থ-
পর সংসারের কীট পর দুঃখে কাতর হইতে পারে না। পর দুঃখে
কাতর হওয়া, পর দুঃখ মোচন করিবার জন্য দয়ার্দ্র হওয়া যথার্থ নিঃস্বার্থ
সাধুর লক্ষণ। সাধুর আপনার দুঃখ নাই, কিন্তু পর দুঃখে তিনি সর্ব্বদা
দুঃখী। সকলে ঠাণ্ডা জল খাইল, সাধু আগুনের জল খাইলেন। দুর্ভিক্ষ
যন্ত্রণায় সহস্র সহস্র লোক মরিতে লাগিল, সাধারণ লোকেরা এ সকল
দুর্ঘটনা দেখিয়া সুখে নিদ্রা গেল; কিন্তু সাধু কাঁদিতে লাগিলেন। সাধু
হইবামাত্র আপনার জীবনকে বলির জন্য প্রস্তুত রাখিতে হইবে। যে পরি-
মাণে সাধু সেই পরিমাণে পরের দুঃখ ভার বহন করিতে হয়। জগতের পাপ
দুঃখ ভার লঘু করিবার জন্যই ঈশ্বর তাঁহার স্বর্গ হইতে সাধু সন্ন্যাসী,
বৈরাগী, যোগী, ভক্ত সকলকে প্রেরণ করেন। যিনি যে পরিমাণে সাধু
তাঁহাকে সেই পরিমাণে পরের দোষের জন্য দণ্ড সহ্য করিতে হয়।
পরের দোষের জন্য সাধুকে দণ্ড সহ্য করিতে হয়, এই কথা বলা হইলেই

অনেকে মনে করে তবে ঈশ্বর অন্যায় আচরণে অপরাধী; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কেননা সাধুগণ যে পরের দুঃখী দুঃখী হন তাহা তাঁহাদিগের পক্ষে দণ্ড নহে; কিন্তু সাধুতার পুরস্কার, এবং তাহা জগতের মঙ্গল সাধনের বিশেষ উপায়। যদি কয়জন্ম মহা পুরুষ জীবন না দেন তবে পাপী জগৎ কিরূপে উদ্ধার হইবে? যখন পাপী বিশ্বাসের সহিত, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে এই কথা বলিতে পারিবে "অমুক সাধু আমার জন্য মরিয়াছেন" তখন সাধুর জীবন ধারণ সার্থক হইবে। জগতের এই স্বাভাবিক উক্তি;—"সাধুরা রক্ত না দিলে উপাসনা বিহীন লোক সকল উপাসনাশীল হইত না, পাপাসক্ত লোক সকল বৈরাগী হইত না।" সাধুর জীবদ্দশায় পতিত জগৎ তাঁহার মহত্ত্ব বুঝিতে পারে না। তাঁহার মৃত্যুর পরে যখন পাপীরা সাধুর নিঃস্বার্থ উদার ভাব বুঝিতে পারে তখন তাহারা সাধুর দুঃখ ও মনোবেদনা স্মরণ করিয়া হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে। প্রত্যেক সাধু মহাপুরুষ পাপী জগতের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেন। প্রায়শ্চিত্তের অর্থ ইহা নহে যে ঈশ্বর সাধুর রক্তে তুষ্ট হন। ভগবান্ কি প্রিয় পুত্রের রক্ত গ্রহণ করিতে ভাল বাসেন? তিনি কি ভক্তরক্ত লোলুপ, না ভক্তবৎসল? প্রায়শ্চিত্তের অর্থ এই যে, যে কেহ পরের দুঃখ স্মরণ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করে; কিম্বা পরদুঃখ মোচনের জন্য আপনার রক্ত পাত করে ঈশ্বর বিশেষ আশীর্ব্বাদের সহিত সেই অশ্রু ও সেই রক্ত গ্রহণ করেন এবং উহা দ্বারা জগতের মুক্তি সাধন করেন। হে ব্রাহ্ম, তুমি আপনার স্ত্রী পুত্রের জন্যইবা কতকষ্ট বহন কর এবং কত রাত্রিই বা জাগরণ কর? তোমার ভাবনার বিষয় তিন চারিটী লোক; কিন্তু যে সাধুর কোটি কোটি সন্তান তাঁহার কত দুঃখ একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। যাহার প্রতি তোমার বিন্দুমাত্র ভালবাসা আছে তাহার দুঃখ দেখিলে তোমার কত দুঃখ হয়। আর যে সাধুর প্রেম সমস্ত জগতের প্রতি বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে সমস্ত জগতের দুঃখে তাঁহার কত দুঃখ? হে গৃহস্থ ব্রাহ্ম, তুমি একটি ক্ষুদ্র পরিবারের দুঃখ ভার বহন করিতে পার না, আর যিনি শত শত গ্রাম, শত শত নগর এবং বড় বড় ভূখণ্ডের দুঃখ ভার বহন করেন তাঁহার দুঃখের গুরুত্ব কেমন অসহনীয়! সাধুর মনে যত দয়া বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ পরদুঃখ

মোচন করিবার জন্য যত আকুলতা বাড়ে তত তাঁহার দুঃখ বৃদ্ধি হয়। পরদুঃখহারী ঈশ্বর সাধুদিগকে এই নিয়মের অধীন করিয়া দিয়াছেন। সাধু হইলেই শত শত দেশের দুঃখ ভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিতে হয়। সাধুরা যতই পৃথিবীর বিলাস লালসা পাপাসক্তির আগুন এবং রাশি রাশি দুঃখ যন্ত্রণা দেখিতে পান ততই তাঁহারা সহানুভূতি জন্য পরদুঃখের জ্বালায় অস্থির হন। এই দুঃখ অথবা দয়ার জ্বালাতেই তাঁহারা মরিয়া যান। সাধুদিগকে বধ করিবার জন্য ক্রুশ, অগ্নি, অথবা শেলকে নিমন্ত্রণ করিবার প্রয়োজন নাই, তাঁহারা আপনাদিগের দয়ার জ্বালাতেই আপনারা দগ্ধ হন। দয়াশীল পুরুষেরা জানেন দয়ার আগুন কেমন অসহ্য আগুন। প্রেমিক ব্যক্তি জানেন প্রেমের আগুন কেমন অসহনীয়। যেমন বাতি অপরকে আলোক দান করিয়া আপনার আগুনে আপনি ক্ষয় হইতে থাকে এবং ক্রমে দগ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ মহাপুরুষেরাও পৃথিবীর দুঃখী পাপীদিগকে সুখী করিবার জন্য প্রেমালোক দিতে দিতে আপনাদিগের প্রেমানলে আপনারা দগ্ধ হন। "হে প্রেমিকদল, তোমরা পরের জন্য প্রাণ দেও," সাধুদিগকে এরূপ উপদেশ দিতে হয় না। তাঁহারা আপনাদিগের প্রেমের উত্তেজনাতেই আপনারা মরিয়া যান। হে ভারতবর্ষের নববিধানাশ্রিত ব্রাহ্মগণ, পৃথিবীর সাধুদিগের জীবন অথবা মরণ দেখিয়া তোমাদিগের মনে কি কোন মহৎ ভাবের উদয় হয় না? পৃথিবীর, বিশেষতঃ ভারতের দুঃখ মোচন করিবার জন্য তোমরা কয়জন যদি ঈশ্বরের চরণে জীবন উৎসর্গ না কর তবে হিন্দুস্থানের অধর্ম্মপাপের জন্য আর কে প্রায়শ্চিত্ত করিবে? এত শতাব্দীর রাশীকৃত পাপ জঞ্জাল দূর করিবার জন্য একটা প্রকাণ্ড জনহিতৈষী সর্ব্বত্যাগী সাধুদল চাই। অসাধারণ দয়া, অসাধারণ হিতৈষণা চাই। দুই একজন সামান্য লোক হাজার বৎসরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারে না। নববিধানের বন্ধুগণ, তোমরা সকলে এক হৃদয় হইয়া জাগিয়া উঠ। তোমাদিগের জীবনে যাহা কিছু ঈশ্বরের ভাব, স্বর্গীয় ভাব আছে, তাহা প্রদর্শন করিয়া পতিত জন্মভূমিকে উন্নত ও উদ্ধার কর। অসাধারণ সহিষ্ণুতা, অসাধারণ দয়া, অসাধারণ বিশ্বাস অসাধারণ বৈরাগ্য, অসাধারণ আত্মজয়, অসাধারণ পরসেবা প্রভৃতি সদ্গুণ না দেখিলে বিপথগামী

জগৎ ফিরিবে না। যেমন রোগ কঠিন ও বহু দেশব্যাপী তেমনি ঔষধ ও সুশক্ত এবং প্রবল হওয়া আবশ্যক। যেমন পাপ, উহাকে জয় করিতে তেমনি বৈরাগ্য চাই। বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত, আত্মজয়ের দৃষ্টান্ত কিম্বা বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত কি কেবল এক জন লোকে বদ্ধ থাকিতে পারে? প্রেরিত মহাপুরুষেরা জগতের পরিত্রাণের জন্য অকাতরে আপনাদিগকে বলিদান করিলেন। প্রেরিত প্রচারকেরাও সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী হইয়া উচ্চ ধর্ম্মজীবনের দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। হে গৃহস্থ ব্রাহ্মগণ, তোমরা কি এ সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়াও জগতের পরিত্রাণের জন্য কিছুই করিবে না? বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত কি কেবল মহাপুরুষ ও প্রচারকদিগের মধ্যেই বদ্ধ থাকিবে? ভগবানের কি ইচ্ছা নয় যে গৃহাশ্রমেও বৈরাগ্য প্রতিষ্ঠিত হউক? "কল্যকার জন্য ভাবিও না।" এই উপদেশ কি কেবল অল্প [illegible]জন লোকের জন্য? না। ভগবানের ইচ্ছা কি সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী, কি গৃহস্থ বৈরাগী সকলেই এই নিয়ম পালন করেন। হে ব্রাহ্মগণ, তোমাদিগের ভ্রাতারা দেশের পরিত্রাণের জন্য বৈরাগী হইয়া দেশ দেশান্তরে চলিয়া গেলেন, তোমরা কোন্ প্রাণে ইন্দ্রিয়াসক্ত, বিষয় বাসনার দাস ও সংসারের কীট হইয়া থাকিবে? পর দুঃখে কি কখনও তোমাদের দুঃখ হয় না? দেশের যুবারা কেন উপাসনাশীল হইল না? স্ত্রীরা কেন ব্রহ্মপরায়ণা হইল না? বালক বালিকারা কেন সুনীতি পরায়ণ হইল না, এ সকল সচ্চিন্তা ও জগতের কল্যাণ কামনা কি তোমাদিগের স্বার্থপর মনে কদাপি স্থান পায় না? তোমরা কোন্ প্রভুর সেবা কর? তোমরা কাহার জন্য সমস্ত দিন কার্য্যালয়ে পরিশ্রম কর? আর তোমরা স্বার্থপর বৈরাগ্য বিদ্বেষী হইয়া সংসারের সেবা করিও না। তোমরা দৈনিক পরিশ্রম দ্বারা যত অর্থ অর্জ্জন করিবে তৎসমুদয় সেই সর্ব্বত্যাগী ভগবানের হস্তে অর্পণ করিও। তোমরা আর কদাচ আপনাদিগের ও আপনাদিগের পরিবারের ভরণ পোষণের বিষয় চিন্তা করিয়া মনকে কলঙ্কিত করিও না। নিশ্চিন্ত বৈরাগী হইয়া সম্পূর্ণরূপে ভগবানের উপর নির্ভর কর। ভগবান্ নিজে এই কথা বলিতেছেন;—"কেবল প্রেরিতেরা কল্যকার জন্য ভাবিবে না তাহা নহে, কিন্তু কাহারও কল্যকার জন্য ভাবা উচিত নহে, কেন না আমি প্রতিজনের পিতা এবং প্রতিপালক।" সর্ব্বি-

ধান ভগবানের এই বাক্য সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দিতেছেন। ঈশ্বরের আদেশে নববিধানাশ্রিত সকলেই ঈশা মুসা, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি মহাজনদিগের প্রদর্শিত বৈরাগ্য পথে চলিবে। প্রেরিত প্রচারকেরা সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী হইয়া পূর্ণ বৈরাগ্য পথে চলিতেছেন। অল্পত্যাগী গৃহস্থ ব্রাহ্মেরাও আপনাদিগের উপার্জিত সমস্ত অর্থ ভগবানের হস্তে সমর্পণ করিয়া বৈরাগ্য পথে চলিবেন। প্রত্যেক উপার্জ্জনশীল গৃহস্থ ব্রাহ্ম ভগবানের হস্তে উপার্জ্জিত সমস্ত ধন সমর্পণ করিয়া সংসারাশ্রমে যোগ বৈরাগ্য স্থাপন করিবেন। যেমন সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের পাত্র, সেইরূপ প্রত্যেক ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ বৈরাগীও তাঁহার আশীর্ব্বাদের পাত্র।

সেবকের নিবেদন।

বিষয় এবং বৈরাগ্য।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ২৯ চৈত্র, ১৮০২ শক।

বিষয় এবং বৈরাগ্য দুই দিকে, মধ্যস্থলে গোলাকার পৃথিবী। একবার বিষয় টানিতেছে পৃথিবীকে, আর এক বার বৈরাগ্য টানিতেছে পৃথিবীকে। নিয়ত এই দুয়ের মধ্যে সংগ্রাম চলিতেছে। অনেক দিন যদি পৃথিবী বিষয়ী থাকে আবার বৈরাগ্য প্রবল হইয়া পৃথিবীর উপর আপনার আধিপত্য স্থাপন করে। পৃথিবীতে যতবার বিষয়ীদল প্রবল হইয়াছে ততবার মহা বৈরাগী সকল আসিয়া প্রকাণ্ড বৈরাগ্যের অনল প্রজ্জ্বলিত করিয়া গিয়াছেন। বিষয়াসক্তির মহৌষধ বৈরাগ্য। ঈশা, মুসা শাক্য, চৈতন্য প্রভৃতি প্রধান বৈরাগীগণ বিষয়াসক্ত রুগ্ন পৃথিবীর সুচিকিৎসক। প্রবল বিষয়-রোগ দূর করিবার জন্য সর্ব্বত্যাগী পরম বৈরাগী ঈশ্বরের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া প্রকৃত বৈরাগীগণ স্বর্গ হইতে অবতরণ করেন। প্রধান প্রধান সাধু-গণ ইতিপূর্ব্বে ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিয়া গিয়াছেন যে যখনই পৃথিবীতে ইন্দ্রিয়াসক্তি, পাপ ব্যভিচার প্রবল হইবে তখনই স্বর্গ হইতে মহাবীর বৈরাগীর দল আসিয়া মায়া পাশ ছেদন করিয়া পৃথি-বীকে পাপের বন্ধন হইতে মুক্ত করিবেন। বিষয়ের মহৌষধ বৈরাগ্য। বৈরাগ্য-ঔষধ সেবন ভিন্ন বিষয়-রোগাক্রান্ত পৃথিবীর পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই। ঈশ্বরের পরিত্রাণ দায়িনী কৃপার এমনই আয়োজন যে যখনই পৃথিবীতে বিষয়ের প্রাবল্য হয় তখনই বৈরাগ্যের প্রাদুর্ভাব হয়। যখনই বিষয়-রোগাক্রান্ত পৃথিবী মৃতপ্রায় হয় তখনই স্বর্গ হইতে বৈরাগীদল

আসিয়া রুগ্ন পৃথিবীর চিকিৎসা ও রোগ প্রতীকার আরম্ভ করেন। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ দুর্দ্দশা জানিয়াই রক্ষাকালী, অনন্তকালী, সর্ব্বশক্তিময়ী মহাকালী এই ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। পৃথিবীতে মহাপুরুষদিগের শুভাগমন কেন হয়? এই ঘোর বিষয়াসক্ত পৃথিবীতে সময়ে সময়ে বৈরাগীদল কেন আসেন? পৃথিবীর এত লোক কেন সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া বৈরাগী হন? ব্রহ্মচারী বৈরাগীগণ গৈরিক বস্ত্র ধারণ করেন কেন? ধর্ম্মের জন্য এত কষ্ট সহ্য করেন কেন? সংসারের সুখ সম্পদের নিকট বিদায় লইয়া কষ্টকুটীরে বাস কেন? এ সমুদয় তীব্র কঠোর বৈরাগ্য সাধনের কারণ কি? কারণ কেবল পৃথিবীর বিষয়াসক্তি। পৃথিবীতে যখন বিষয়াসক্তি ষোল আনা হয় তখন তাহা নির্ব্বাণ করিবার জন্য বৈরাগ্যও ষোল আনা চাই। যেমন রোগ তেমনি ঔষধ। বৈরাগ্য কি? হোমের অগ্নি। প্রাচীন যোগী ঋষি ও অগ্নি হোত্রীগণ যেমন অগ্নি জ্বালিয়া নিত্য হোম করিতেন এবং বায়ুশুদ্ধ করিতেন সেইরূপ বৈরাগীগণ আত্ম নিগ্রহ, ইন্দ্রিয় দমন, মন সংযম প্রভৃতি বৈরাগ্যের আগুন জ্বালিয়া পাপাসক্তি ও বিষয় কামনা ভস্মীভূত করেন। প্রেরিত বৈরাগীগণ দেখিতে পান পৃথিবীতে অনেক শতাব্দী হইতে বিষয়াসক্তি উৎকট রোগের আকার ধারণ করিয়াছে, সামান্য বৈরাগ্যে এই রোগের উপশম হইবে না, এই জন্য তাঁহারা একেবারে পূর্ণ বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করেন। বিধাতা পুরুষ যখনই দেখিতে পান যে তাঁহার প্রজা সকল উৎকট বিষয়-রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পড়িতেছে তাহাদিগকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য এক দল সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী প্রস্তুত করিতে থাকেন। যেখানে বার লক্ষ লোক বিষয় বিষ পান করিয়া মরিতেছে সেখানে অন্ততঃ বার জন বৈরাগীর প্রয়োজন। যেখানে পঞ্চাশ লক্ষ লোক বিষয়ী হইয়া মরিতেছে সেখানে অন্যূন পঞ্চাশ জন বৈরাগীর প্রয়োজন। যে পৃথিবীতে কোটি কোটি লোক বিষয়-গরল পান করিয়া মরিতেছে সেখানে রোগ দমন করা দুই এক জন সামান্য কবিরাজের কর্ম্ম নহে। যেখানে বিষয়-রোগ অতি সামান্য সেখানে বরং সামান্য অল্প পরিমাণ বৈরাগ্য সাধনা দ্বারা সেই রোগ দূর হইতে পারে; কিন্তু যেখানে বিষয়াসক্তি অত্যন্ত বিস্তীর্ণ ও সাঙ্ঘাতিক হইয়া

উঠিয়াছে সেখানে সামান্য ঔষধে প্রতীকার সম্ভব নহে। যেমন কঠোর রোগ সেইরূপ উপযুক্ত ঔষধ আবশ্যক। এই জন্য পৃথিবীর উৎকট বিষয়-রোগ দূর করিবার নিমিত্ত প্রধান প্রধান বৈরাগীগণ কেবল সংসার পরি-ত্যাগ করিয়াছেন তাহা নহে; কিন্তু তাঁহারা আপনাদিগের প্রাণ পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন দিয়াছেন। যখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে পৃথিবীর যেরূপ কঠোর সাংঘাতিক রোগ তাহাতে কযেকজন লোক প্রাণ না দিলে মানুষ এই বিষম রোগ হইতে একেবারে রক্ষা পাইবে না তৎক্ষণাৎ তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট আত্ম বলিদান করিলেন। যখন বড় বড় বৈরাগীগণ বিষ-য়াসক্ত কঠোর মনুষ্য মণ্ডলীকে বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত সকল দেখাইতে লাগি লেন তখন পৃথিবী পরাস্ত হইয়া বলিতে লাগিল, "হে বৈরাগী ভ্রাতৃগণ, আমাদিগের জন্য তোমরা অনায়াসে এত কষ্ট সহিলে, তোমাদিগের দুর্ল্লভ প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হইয়াছ। তোমাদের ব্যবহারে আমরা পরাস্ত হইলাম। ভাইগণ, আর আমরা নাস্তিক হইব না, আর অপবিত্র আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকিব না, আর টাকার জন্য উন্মাদ হইব না, আর অসাধু দৃষ্টান্ত দেখাইয়া চারিদিকে ব্যভিচার অধর্ম্ম বৃদ্ধি করিব না, আর তোমাদিগের দয়ার্দ্র কোমল হৃদয়ে ব্যথা দিব না।" ইহা অপেক্ষা কঠোরতর রোগের সময় নিদারুণ পৃথিবী কখন খড়্গ দ্বারা কখন অগ্নি দ্বারা, কখন ক্রুশ দ্বারা অথবা অন্য প্রকারে জগতের হিতৈষী বৈরাগীদিগকে প্রাণে বধ করিয়াছে। দুর্দ্দান্ত পৃথিবী বলিয়াছে "হে বৈরাগীগণ, আমরা তোমাদের ঈশ্বরকে মানি না, আমরা নাস্তিক স্বেচ্ছাচারী হইয়া যাহা খুসী তাহা করিয়াছি এবং ঘোর মোহ নিদ্রায় অচেতন ছিলাম, এমন সময় কোথা হইতে তোমরা আসিয়া নানা প্রকার উপদেশ দ্বারা এবং ব্রহ্ম নাম কীর্ত্তন করিয়া আমা-দিগের নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছ। আমরা আমোদ প্রমোদ ও মদ্য পান করিতে গিয়াছিলাম, তোমাদের দল আমাদিগকে সে সকল আমোদ প্রমোদ করিতে দিল না, তোমরা আমাদের ভয়ানক শত্রু, অতএব তোমাদিগকে এই সংহার করিতেছি।" এই বলিয়া আগুন জ্বালিল, ক্রুশ তুলিল, বাণ ছুড়িল এবং সাধুদিগকে মারিল। এইরূপে দেশে দেশে, যুগে যুগে, নিষ্ঠুর ভীষণাকার জন্তু-প্রকৃতি, দানব সমান বিষয়ীদল নানা প্রকারে সাধু

বৈরাগীদিগকে বধ করিয়াছে। বিষয়াসক্ত মূঢ় মানব অনেক সময় বৈরাগী দিগকে বিনাশ করিয়া পরিশেষে তীব্র অনুতাপ অস্ত্রে আপনার মস্তক আপনি ছেদন করিয়াছে। বৈরাগী না মরিলে পৃথিবীর উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই। অতএব হে প্রেরিত বৈরাগীগণ, পৃথিবীর পরিত্রাণের জন্য তোমরা ঈশ্বরের চরণে আত্ম বলিদান কর। হে নববিধানের বৈরাগীদল, হে নববিধানের সাধকদল, সামান্য বৈরাগ্যে হইবে না, এই সাগর সমান বিষয়াসক্তি সামান্য বৈরাগ্যে কিরূপে তোমরা দূর করিবে? তোমরা এখন বৈরাগী হও যাহাতে সমস্ত হিন্দুস্থান বাসীরা তোমাদিগের বৈরাগ্য দেখিয়া কাঁদিবে এবং বিষয়-রোগমুক্ত হইয়া স্বর্গে চলিয়া যাইবে। হে বন্ধুগণ, যদি তোমরা একেবারে বিষয় সুখের লালসা ছাড়িলে মাতৃ ভূমির পরিত্রাণ হয় তবে আর তোমরা বিলম্ব করিও না। যদি তোমাদের একটী আঙ্গুল কাটিলে এক লক্ষ লোক বাঁচে তবে কোটি কোটি লোককে বাঁচাইবার জন্য তোমাদিগকে কত রক্ত দিতে হইবে একবার ভাবিয়া দেখ। যে পরিমাণে বিষয়-রোগ উৎকট সেই পরিমাণে বৈরাগ্য ও ত্যাগস্বীকার চাই। ইহা অভ্রান্ত গণিত শাস্ত্রের কথা। ইহা ধর্ম্ম সাধনের চমৎকার অঙ্কশাস্ত্র। প্রভু পরমেশ্বর রোগের পরিমাণ বুঝিয়া উপযুক্ত পরিমাণে বৈরাগ্য প্রেরণ করেন। পৃথিবীতে এখন বিষয়-রোগ ভয়ানক প্রবল হইয়াছে, এই সময় পূর্ণ ষোল আনা বৈরাগ্য ভিন্ন জীব উদ্ধারের অন্য উপায় নাই। এই জন্য ভগবান্ তাঁহার সমুদয় বৈরাগীদিগকে সম্মিলিত করিয়া নব বিধানের সঙ্গে প্রেরণ করিলেন। ঈশ্বর প্রাচীন যোগী ঋষিগণ শাক্য, ঈশা, এবং শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি বড় বড় বৈরাগীদিগকে একত্র লইয়া এই নববিধানের জগতে অবতরণ করিলেন। যখন প্রকাণ্ড ধর্ম্মবীরগণ, সর্ব্বোত্তম বৈরাগীগণ সংসারাসক্তির বিরুদ্ধে একত্র হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন তখন রণক্ষেত্রে ভয়ানক কামানের শব্দ হইল। ক্ষীণ হীন বিষয়ীদল এসকল মহা যোদ্ধাদিগের সম্মুখে আর দাঁড়াইতে পারিল না। হে নববিধানবাদীগণ, তোমাদিগের আর ভয় কি? দিগ্বিজয়ী বড় বড় বৈরাগী মহাজনগণ তোমাদিগের সহায়, তাঁহাদিগের বলে বলী হইয়া মেদিনী কাঁপাইয়া হুঙ্কার করিতে করিতে সংসার জয় কর, বিষয়াসক্তি রাক্ষসীকে একেবারে চিরকালের জন্য

সংহার কর। তোমরা নববিধানের লোক। তোমাদিগের বৈরাগ্য এত অধিক প্রবল হইবে যে তাহা দেখিয়া বঙ্গদেশ, ভারতবর্ষ এবং সমস্ত পৃথিবী বিস্ময়াপন্ন হইবে। ভ্রাতৃগণ, এদেশে ভয়ানক বিষয়রোগে সহস্র সহস্র লোক মরিতেছে, এই সময় তোমরা পূর্ণ বৈরাগ্য সাধন করিয়া সম্পূর্ণরূপে বিষয়কে পরাজয় কর। বিষয়রাজ্য একেবারে ছাড়িয়া তোমরা বিষয়াতীত ব্রহ্মরাজ্যের প্রজা হও। দেখ, তোমাদিগের সমক্ষে বিষয়-বাসনা রূপ জ্বর আসিয়া কত শত লোকের প্রাণ বধ করিয়েছে। ভাই ভগিনীদিগের মৃত্যু কিম্বা উৎকট রোগ দেখিয়া কি রূপে তোমরা উদাসীন থাকিবে? বার বার যুগে যুগে বিষয়ী দল পরাস্ত হইয়াছে। কিন্তু আবার ঐ দেখ চারিদিকে বিষয়ীরা প্রবল হইয়াছে। আবার তোমরা স্বর্গের বৈরাগীদিগকে ডাকিয়া বিষয়ী দলের বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ কর। প্রাচীন যোগী ঋষিগণ, শাক্য ঈশা ও চৈতন্য প্রভৃতি প্রমত্ত বৈরাগীদিগকে ডাকিয়া বিষয়াসক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। নির্ব্বাণ, বৈরাগ্য, ক্ষমা, শান্তি, প্রভৃতি দুর্জ্জয় অস্ত্রাদি দ্বারা বিষয়ীদিগকে পরাস্ত করিয়া ঈশ্বরের দিকে টানিয়া আন। এই শতাব্দীতে আবার বিষয়ীরা হুঙ্কার করিতেছে ইহা দেখিয়া নববিধান বলিলেন "আমি সংসার অসুরকে জয় করিবার জন্য পৃথিবীতে চলিলাম।" নববিধান আসিয়া সংসারাসক্তিকে কাঁপাইয়া বজ্রধ্বনিতে বলিলেন "রে দানব, রে রাক্ষস বিষয়, তোর মস্তক আমি ছেদন করিব।" এই বলিয়া নববিধান একেবারে প্রথমেই উপদেশ দিলেন "স্বার্থ নাশ কর, বৈরাগ্যব্রত গ্রহণ কর, অন্ন বস্ত্র চিন্তা করিও না। নিজের জন্য ধন স্পর্শ করা কলঙ্ক মনে করিবে, মরিয়াও যদি যাও কল্যকার জন্য ভাবিবে না।" এই উপদেশ গোলাতে ঈশা সংসারকে মারিয়াছিলেন, নববিধানও এই গোলা ছুড়িতেছেন। হে ব্রাহ্মগণ, তোমরা যদি অল্প২ বৈরাগ্য সাধন দ্বারা ধর্ম্ম এবং বিষয়ের সেবা কর তাহা হইলে তোমরা আপনারাও পরিত্রাণ পাইবে না এবং জগতেরও হিত সাধন করিতে পারিবে না। পূর্ণ বৈরাগ্য সাধন করিতে করিতে অন্ততঃ পাঁচ জন তোমরা মরিয়া যাও, তোমাদের মৃত্যুতে ভারত বাঁচিবে। তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে পারেন যদি দেশ শুদ্ধ লোক বৈরাগী হয় তবে

সংসার রক্ষা কে করিবে? হে ব্রহ্ম ভক্ত বৈরাগী, তোমার এ ভাবনা নহে। ভগবানের চিন্তা ভার তুমি মস্তকে লইও না। তুমি কেবল এই ভাবিবে কৈ পাঁচ জনও ত বৈরাগী হইল না। ভয়ানক বিষয়গরল পান করিয়া লোক গুলি মরিতেছে। তাহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য তোমরা বৈরাগ্যানলে দগ্ধ হও, বুক কাট, রক্ত দাও। যখন তোমরা পরের কল্যাণের জন্য ব্যাকুল হইয়া মরিতে যাইবে তখন দেশের লোকে বলিবে, "এরা আমাদের জন্য মরিতেছে, এস ভাই, আমরা কুপথ পরিত্যাগ করিয়া ইহাদিগের ব্রহ্ম মন্দিরে যাই, ইহাদিগের ধর্ম্ম সাধন করি। আমরা যদি পাপ নাস্তিকতা ছাড়িলে এরা বাঁচে তবে আর কেন আমরা বিষয়ের বিষ খাইব? আমরা বিষয়ের নরকে মরিব, আর এরা বৈরাগ্যের অনলে মরিয়া গৌরবের মুকুট মস্তকে পরিয়া স্বর্গে যাইবে।" এই সকল কথা বলিয়া ঘোর বিষয়ীরাও বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে। অতএব ভ্রাতৃগণ, তোমরা সমুদয় স্বর্গীয় বৈরাগীদিগের ভাব গ্রহণ কর, বৈরাগ্যের কোন লক্ষণ অবজ্ঞা করিও না। তাঁহারা এত বড় মহাত্মা ছিলেন, তাঁহারা যে অকারণে গৈরিক, দণ্ড, কমণ্ডলু, ঝুলি, একতারা প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা কখনই সম্ভব নহে। যে মাটীতে কোন বৈরাগী বৈরাগ্য সাধন করিয়াছেন সেই মাটীকে নমস্কার কর, যে নদীর জলে কোন পুণ্যাত্মা আপনার তনুকে ধৌত করিয়াছেন সেই নদীকে নমস্কার কর। ঐ সকল লক্ষণাক্রান্ত হইলেই যে বৈরাগী হইবে তাহা নহে। ব্যাঘ্র চর্ম্মে বৈরাগ্য নাই, গৈরিক বর্ণ পুণ্যের রং নহে। তথাপি এ সকল লক্ষণকে অবজ্ঞা করা ভক্তের লক্ষণ নহে। মহাপুরুষ ব্যবহৃত সন্ন্যাস-চিহ্ন সকল তোমাদের শ্রদ্ধেয়। তোমরা ভক্তির সহিত ঐ সমুদায়কে বরণ করিবে এবং উহার অসার ভাগ ছাড়িয়া দিয়া বৈরাগ্যের প্রত্যেক চিহ্নের ভিতর হইতে সার রত্ন আদায় করিয়া লইবে। নববিধানের বেদী হইতে এ কথা বলিতে পারি না, এ কথা বলিতেছি না যে তোমরা শস্য অপেক্ষা খোসাকে অধিক আদর কর; কিন্তু এই কথা বলিতেছি পৃথিবীর সমুদয় ক্ষুদ্র বড় বৈরাগীর পদধূলি অন্তরের অন্তরে গ্রহণ কর। হে ব্রহ্মভক্ত, তুমি সেই সাধু বৈরাগীদিগের প্রদর্শিত পথে না চলিলে স্বর্গে যাইতে

পারিবে না। বৈরাগীদিগকে নমস্কার কর। বৈরাগ্যকে ভক্তির সহিত গ্রহণ কর এবং সেই বৈরাগীদিগের রাজা, বৈরাগীদিগের গুরু, পরম বৈরাগী সর্ব্বত্যাগী ঈশ্বরকে সঙ্গে লইয়া সংসারাসক্তি জয় করিয়া সংসারের মধ্যে যোগ বৈরাগ্য স্থাপন করিয়া সপরিবারে, সবান্ধবে বৈরাগীদল হইয়া জগৎকে উদ্ধার কর।

সেবকের নিবেদন।

ভবিষ্যতের সন্তান।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ৬ই বৈশাখ, ১৮০৩ শক।

হে ব্রহ্মভক্ত, তুমি ভূতকালের, না বর্ত্তমানের, না ভবিষ্যতের? তোমার সম্মুখে কালের চাতুরী, কালের বিচিত্র লীলা। এই রাত্রি, এই দিন, এই পুরাতন বৎসর, এই নব বৎসর, এই এক শতাব্দী অতীত হইল, এই আর এক শতাব্দী আরম্ভ হইল। বৎসর আসিতে যেমন তাড়াতাড়ি, যাইবার সময়ও তেমনি তাড়াতাড়ি। কাল দৌড়িয়া আসে, দৌড়িয়া যায়। আমরা কোন্ কালের লোক? আমরা কি বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিব? যে কাল অতীত হইল আমরা তাহার নহি, যে কাল বর্ত্তমান আমরা তাহারও নহি, যে কাল আসিবে আমরা তাহার। কাল দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতেছে, তবে আমরা কাহার উপরে আমাদিগের ভার সমর্পণ করিব? দ্রুতগামী তরল কালের উপর কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। অস্থির বাতাসের উপর অট্টালিকা নির্ম্মাণ কিরূপে সম্ভব? এত যেখানে পরিবর্ত্তন, সময়ের যেখানে কিছুমাত্র স্থিরতা নাই আমরা সেখানে কিরূপে দাঁড়াইব? যাহা ছিল তাহা গেল, যে বৎসর আসিল ইহা নূতন বৎসর। যে পুরাতন বৎসর চলিয়া গেল তাহার উপর তো বিশ্বাস হইতেই পারে না। আর যে নববর্ষ আসিল ইহার উপরেই বা বিশ্বাস কি? বড় ভাই পুরাতন বৎসরকে বিশ্বাস করিতে পারি না, কনিষ্ঠ ভাই নূতন বৎসরকেও বিশ্বাস করিতে পারি না। প্রাচীনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। সদ্যজাত শিশুর উপরেও বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না।

জ্ঞানী ব্রাহ্ম, বাস্তবিক তুমি ভূতের পুত্র নহ, তুমি বর্ত্তমানেরও সন্তান নহ, তুমি ভবিষ্যতের সন্তান। ভূতকাল তোমার জন্মস্থান নহে, ভূতকাল তোমার বাসস্থান নহে, বর্ত্তমান কালও তোমার জন্ম স্থান কিম্বা বাসস্থান নহে। তোমার বাড়ী ভবিষ্যতে। তোমার নববিধান তোমার স্বর্গরাজ্য, তোমার দেবালয়, তোমার সুখী পরিবার, এ সমুদয় ভবিষ্যতে। হে ভবিষ্যতের সন্তান, তোমার সময় এখনও জন্ম গ্রহণ করে নাই। তোমার স্বদেশ কলিকাতা কিম্বা পৃথিবীর কোন স্থান নহে। তোমার জীবন এই শতাব্দীর জীবন নহে। বহু শতাব্দী পরে তোমার শতাব্দী আসিবে। হে ব্রহ্মভক্তগণ, তোমরা কয়জন ভবিষ্যতের প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছ। তোমাদিগের মত ভবিষ্যতদর্শী বিচক্ষণ সুবিজ্ঞ ব্যক্তি কালের স্রোতের উপর, ঋতু পরিবর্ত্তনের উপর আশা ভরসা রাখিবে না। তোমরা যে দেশ বাসী সেখানে কালের খেলা নাই, ঋতু পরিবর্ত্তন নাই, বৎসর শতাব্দীর আরম্ভ শেষ নাই। সেখানে স্রোতস্বতী নদী নাই, সেখানে কেহ জীবন মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয় না। সেই দেশ হইতে কয়েকটী যাত্রী ক্রমাগত হাটিতে হাটিতে কলিকাতা আসিল। তাহাদিগের মুখ ভবিষ্যতের দিকে, স্বর্গের দিকে; তাহারা পশ্চাতে হাটিতেছে। পৃথিবীর লোক তাহাদিগের নাম ধাম জানে না। পৃথিবীর লোক তাহাদিগের ভাষা বুঝিতে পারে না। তাহাদিগের ভাষা সংস্কৃত্ নয়, হিব্রু নয়, গ্রীক নয়, ইংরাজী কি বাঙ্গলাও নহে। তাহাদিগের ভাষা ভবিষ্যতের ভাষা যাহা পৃথিবী এখনও শিখে নাই। হে ভবিষ্যতের সন্তান ব্রহ্মভক্তগণ, তোমাদিগের ভাষার বর্ণমালার ক খ ও এখন পর্য্যন্ত কেহ শেখে নাই। জগৎবাসী সকলে বলিতেছে; "হে বিধান ভাই, তুমি বাঙ্গলা বলিলে না, ইংরাজী বলিলে না, কিরূপে আমরা তোমার ভাষা বুঝিব, আমরা বর্ত্তমানের লোক, তুমি কি ভবিষ্যতের অমৃতসম স্বর্গ রাজ্যের কথা বলিতেছ আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি কত কথা বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে চেষ্টা করিলে, কিন্তু কিছুতেই আমাদিগের বোধগম্য হইল না।" বাস্তবিক নববিধানবাদীদিগের দুর্ব্বোধ কথা শুনিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিতেছে, "ইহারা কি প্রকার মনুষ্য !!" হে ভাবী ব্রহ্মরাজ্যের অধি-

বাসীগণ, তোমরা বিধির খেলা খেলিবার জন্য এই ভবধামে অনেক শতাব্দী পূর্ব্বে আসিয়া পড়িয়াছ। তোমাদিগের জন্ম এক অদ্ভুত রহস্য। কল্যকার জীব অদ্য জন্মে। দশ সহস্র বৎসর পরে যাহারা জন্মিবে তাহারা এখন জন্মিয়াছে। তোমরা যে ক্ষেত্রে কার্য্য করিবে, সেই ক্ষেত্র এখনও প্রস্তুত হয় নাই। বোধ হয় যেন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পথ ভুলিয়া তোমারা এদেশে আসিয়াছ। হে ব্রহ্মভক্তগণ, তোমরা ঈশা, মুসা, শাক্য প্রভৃতি মহাত্মাদিগের নিকটে বসিতে, তোমরা এখানে আসিলে কেন? তোমরা দেশ কালের ব্যবধান বিনাশ করিলে। তোমরা যে দেশের লোক সেই দেশ আর এই দেশের মধ্যে অনেক ব্যবধান, তোমরা যে দেশে থাক সে দেশের সকলই অদ্ভুত। সেখানে কত যোগী-ভক্ত, কত প্রেমিক-বৈরাগী, কত ঋষি-কর্ম্মী, কত প্রেমোন্মত্ত জ্ঞানী বাস করিতেছেন, আর এখানে যে বৈরাগী সে প্রেমিক নহে। যে যোগী সে ভক্ত নহে। যে কর্ম্মী সে জ্ঞানী নহে। এখানে যে গৃহস্থ সে কেবল তাহার আপনার স্ত্রী পুত্রাদি লইয়াই ব্যস্ত, তাহার জীবনে বৈরাগ্যের কোন লক্ষণ দেখা যায় না, এই হতশ্রীদেশে গৃহস্থবৈরাগী নাই। এখানে যে যোগী সে কেবল যোগ ধ্যানেতেই মগ্ন, তাহার জীবনে ভক্তির চিহ্ন দেখা যায় না, অথবা যে ভক্ত সে কেবল ভক্তির ব্যাপার ও নাম কীর্ত্তন লইয়াই ব্যস্ত, তাহাকে কখন যোগ সমাধিতে নিমগ্ন দেখা যায় না; এখানে ভক্ত যোগী নাই। এখানে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ঐক্য নাই। এখানে যদি তোমরা কাহাকেও ও ভাই হিন্দু-বৌদ্ধ, ও ভাই বৌদ্ধ-খৃষ্টান্, ও ভাই খৃষ্টান্ মুসলমান্, ও ভাই চিন্-ইংরেজ, ও ভাই গৃহস্থ-বৈরাগী, ও ভাই যোগীভক্ত কিম্বা ও ভাই কর্ম্মী-জ্ঞানী বলিয়া ডাক কেহই উত্তর দিবে না। এখানে প্রতি জনেই সাম্প্রদায়িক, এখানে প্রত্যেক সম্প্রদায় এবং প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন ক্ষুদ্র ভাবেই সন্তুষ্ট। তুমি যদি বল ওহে মিষ্ট-লবণ সমুদ্র, একটু মিষ্ট জল দেও, সে বলিবে আমি লবণ সমুদ্র, আমি লবণ ভিন্ন আর কিছু দিতে পারি না, যদি মিষ্ট জল চাও তবে মিষ্টরস সরোবরের নিকট যাও। এখানে এক আধারে সকল রস পাওয়া যায় না। এখানে একে অন্যের সংবাদ লয় না। এখানে যোগী ভক্তের সংবাদ লয় না, কর্ম্মী

জ্ঞানীর সংবাদ লয় না, গৃহস্থ বৈরাগীর সংবাদ লয় না, বৈরাগী গৃহস্থের সংবাদ লয় না। এখানে যদি তুমি কাহাকে ওহে বৈরাগী গৃহস্থ বলিয়া সম্বোধন কর তোমাকে সকলে উপহাস করিবে এবং তুমি কি বলিতেছ তোমার কথা কেহই বুঝিতে পারিবে না। যখন তুমি বল কর্ম্মী যোগী, জ্ঞানী ভক্ত, বালক বৃদ্ধ, হিন্দু ইহুদী অথবা ঈশাবাদী বৌদ্ধ তোমার এ সকল কথা পৃথিবী কিছুই বুঝিতে পারে না। পৃথিবী বলে "নববিধানের লোকেরা কি অসম্ভব অসঙ্গত কথা বলে কিছুই বুঝিতে পারি না। তাহারা বলে মনবনে বসিয়া গৃহধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে; প্রমত্ত বৈরাগী হইয়া সংসারে ঈশ্বরের পবিত্র প্রেম পরিবার গঠন করিতে হইবে; যোগ ধ্যানে মগ্ন থাকিয়া ভক্তিভাবে নৃত্য করিতে হইবে। সংসারের ভূমিকে হিমালয়ের উচ্চ শিখর মনে করিতে হইবে। এইরূপ কত অদ্ভুত কথা বলিয়া ইহারা বক্তৃতা করে ও সম্বাদ পত্রাদি লেখে কিছুই বুঝিতে পারি না। ইহাদের পরিধেয় বস্ত্র খানিক গৈরিক, খানিক শাদা ধুতি। ইহাদের এক চক্ষু ভূতকালে, আর এক চক্ষু ভবিষ্যতের দিকে। ইহারা কি খায়? খাইবার সময় পরলোকগত সাধু বৈরাগীদিগকে থালার উপরে খাদ্যের সঙ্গে মিশ্রিত করে। অন্নের মধ্যে ইহারা সাধুদিগের মাংস, এবং জলপাত্রে ইহারা সাধুদিগের রক্ত রাখে। ইহাদের চক্ষু হইতে সর্ব্বদাই প্রেম ধারা পড়ে। ইহারা কোন্ দেশী লোক? ইহারা প্রেরিত মহাত্মা ঈশা, মূসা, সক্রেটিস্, শাক্য, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ করে। ইহারা কে? কাহার দল? ইহাদিগের বন্ধু কে? ইহাদিগের সহায় কে? ইহারা অন্ধকারে চাঁদ গেলে চৌদ্দভুবন ধ্বংশ হইলেও ইহারা আশমানেতে বানায় ঘর। আমরা চক্ষু খুলিয়া যেখানে কিছুই দেখিতে পাই না, ইহারা সেখানে যত সাধুদিগের চাঁদের হাট বসিয়াছে দেখিতে পায়। ভূতকালে ইহাদের ন্যায়লোক দেখিতে পাই না। বর্ত্তমান কালেও ইহাদিগের মত লোক দেখিতে পাই না। ইহারা আকাশের পানে তাকায় আর হাসে। ইহারা এমন ভাবে আপনাদিগের স্কন্ধের উপর হাত রাখে, অথবা বুকের উপর হাত বুলায় যেন কোন সাধুর চরণ ইহাদিগের স্কন্ধে ও বক্ষে স্থাপিত। ইহারা আকা-

শের প্রতি এরূপ ভাবে তাকায় যেন আকাশে ইহাদিগের স্বদেশী কোন আত্মীয় বন্ধু আছে। ইহাদিগের কাণও অদ্ভুত, যখন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নিস্তব্ধ, যখন আমরা একটী শব্দও শুনিতে পাই না, ইহারা হাসিয়া বলে "আহা: স্বর্গের ভ্রাতৃমণ্ডলী কি সুমধুর সঙ্গীত শুনাইতেছেন।" ইহারা কাণ পাতিয়া কি শুনিতেছে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। শুনিতে শুনিতে ইহারা ভাবে মত্ত হইয়া দৌড়িতেছে। এরা এক অদ্ভুত শ্রেণীর লোক। ভূত কালের লোক বলে, এরা আমাদের লোক নহে; বর্ত্তমান্ শতাব্দীর লোক বলে, এরা আমেদের লোক নহে। চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বকালের আর্য্য যোগী ঋষিদিগের সঙ্গে মিলাইয়া দেখি, ইহাদিগের সঙ্গে তেমন মিল দেখিতে পাই না। বাইবেল, কোরাণ, ললিতবিস্তার প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া দেখি, ইহারা কোন্ সম্প্রদায় ভুক্ত, দেখি ইহারা কোন সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। ইহারা পুরাতনও নহে নূতনও নহে, ইহারা কোন বিশেষ জাতিভুক্ত নহে। এরা এদেশের নয়, এ কালের নয়। ইহাদের বাড়ী বিদেশে, ইহারা অন্ততঃ পাঁচ সহস্র বৎসরের পরের লোক। ইহারা কয় জন অগ্রগামী হইয়া এদেশে আসিয়াছে, এরা উজন স্রোতে এখানে আসিয়া পড়িয়াছে। এরা কি প্রকার বিপরীত গতিতে এখানে আসিয়াছে। নববিধানের লোক সম্পর্কে পৃথিবী বিস্ময়াপন্ন হইয়া এরূপ কত কথা বলিতেছে। হে ভবিষ্যতের পুত্রগণ, তোমাদিগকে নববিধানবাদী ব্রাহ্ম বলি, কেননা তোমরা যথার্থ নূতন রাজ্য হইতে আসিয়াছ। তোমরা প্রাচীন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের চারি দলের মধ্যে কোন দলভুক্ত নহ। তোমাদের ভাষার বর্ণমালাও এখানে কেহ জানে না। তোমাদের স্বর্গীয় ভাষা, দেবভাষা, সংস্কৃত-ভাষা শিক্ষা দিবার লোক এখানে কেহ নাই। তোমাদের নূতন ভাব এখানে কেহ বুঝিতে পারে না। ইংরাজী, বাঙ্গালা, গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু প্রভৃতি ভাষা ভিন্ন যে ভাষা আছে তাহা কেহ জানে না। পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন ও বর্ত্তমান কালের শাস্ত্র বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দেন, ভবিষ্যতের শাস্ত্রবিজ্ঞান ইনি জানেন না। হে নববিধান, যখন তুমি আকাশের চন্দ্র, আকাশের পাখী এবং বাগানের গোলাপ ফুলের

সঙ্গে কথোপকথন কর তখন পৃথিবী কিরূপে তোমার ভাষা বুঝিবে এবং তোমাকে পাগল না বলিয়া আর কি বলিবে? পৃথিবীর লোক হাসিয়া বলে, ঐ যে বিধানবাদী ভক্ত, সে ভাতের সঙ্গে কথা কয় এবং বলে কি না ঈশা তাহার ভাতের ভিতরে আছেন। বাস্তবিক পাগল বিধানবাদীকে কে বুঝিবে? হে প্রাণাধিক হৃদয়ের ভাই নববিধান, তুমি কেন আপনাকে বৃথা বুঝাইতে চেষ্টা কর, তোমাকে কেহই এখন বুঝিবে না। তুমি হাতে হাতে ঈশ্বরকে যদি দেখাইয়া দেও তথাপি কেহ দেখিবে না। যাহার মনের ভিতরে প্রাণেশ্বরের অভ্যুদয় হয় নাই সে কিরূপে তোমার কথা বুঝিবে? যখন তুমি বল যে ডাকযোগে আমি বৈকুণ্ঠ হইতে, পরলোক হইতে পত্র পাইয়াছি, তখন পৃথিবীর লোকে বলে এ ব্যক্তি পাগল! ডাক ঘরে বৈকুণ্ঠের চিঠী! হে নববিধান, বহু শতাব্দী পরে পৃথিবীতে তোমার বাড়ী একটু একটু দেখা দিবে। তোমার ঘর বাড়ী দেবলোকে। তোমার জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলেই বৈরাগী। এদেশস্থ নর নারীগণ তোমার ভাই ভগিনী নহে। যখন তোমার কথা তাহারা বুঝে না তখন কিরূপে বলিবে যে তাহারা তোমার জ্ঞাতি কুটুম্ব। কিন্তু হে নববিধানের লোক সকল, তোমরা স্বর্গস্থ মহাজনের মাল লইয়া আসিয়াছ, তোমাদিগকে এখানে তাহা বিক্রীর চেষ্টা করিতে হইবে। ক্রমে তোমাদের দেশের লোক যাতায়াত করিলে পথ পরিষ্কার হইবে। তোমাদের কায তোমরা করিয়া যাও। তোমরা পৃথিবীর নীচ ব্যবহার শিখিও না। এখানকার লোকে যাহাকে ধর্ম্ম বলে, নীতি বলে তাহার সঙ্গে তোমাদের নববিধানকে মিশ্রিত করিও না। তোমাদের আহার বস্ত্র ব্যবহার সমস্ত নববিধানের নূতন ভাব ধারণ করুক। নূতন বৎসর তোমাদের পক্ষে নূতন বৎসর হউক। খুব বৈরাগীর খেলা খেল। এস সকলে মিলিয়া বৈরাগ্যের খেলা খেলি। সেই ত পৃথিবীতে বহু শতাব্দী পরে হাজার হাজার লোক নববিধানবাদী হইবে। এই সময় হইতে সূত্রপাত করি। আগে আমাদিগকে স্বর্গরাজ এই বলিয়া পাঠাইলেন;—"যাও তোমরা দ্রুতবেগে গিয়া এসিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও সাগরের দ্বীপ সমূহকে এই পাঁচ খানি পত্র দাও এবং আমার শুভাশীর্ব্বাদ দিয়া সকলকে জাগ্রত-

হইতে বল। তোমরা পৃথিবীকে বল যে আমরা ভবিষ্যতের নব প্রদেশ হইতে আসিয়াছি। আমাদের জ্ঞাতি বৈরাগী ভক্তগণ সকলে সেখানে। এ সকল কথা বল, কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া নববিধানের অদ্ভুত তত্ত্ব জানিতে চেষ্টা করিবে। ভ্রাতৃগণ, তোমরা এখানকার লোকদের মধ্যে দল বাড়াইতে চেষ্টা কর। এই পৃথিবীর ভূমি তোমাদের নয়, এখানকার ভূমি, এখানকার বৎসর তোমাদের নহে। অতএব এখানকার কিছুতেই আসক্ত হইও না, এখানকার মায়াতে মুগ্ধ হইও না। আপনার দেশের লোককে এখানে ডাকিয়া আনিয়া তাহাদের সঙ্গে আমোদ কর। লোকে তোমাদিগকে আদর করিল না বলিয়া নিরাশ হইও না, পৃথিবী পরে অনুতাপ করিয়া তোমাদিগের বিধান গ্রহণ করিবে এবং এই নববিধান সমুদায় পৃথিবীর ধর্ম্ম হইবে।”
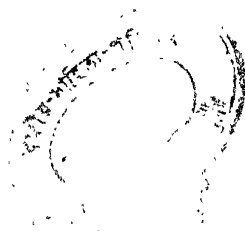
সেবকের নিবেদন।

দেহতত্ত্ব।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ১৩ই বৈশাখ, ১৮০৩ শক।

হে যোগী, তুমি যদি যোগ সাধন করিয়া থাক, তুমি যদি যোগ বুঝিয়া থাক, তবে তুমি কখনও শরীরের প্রতি অবহেলা করিতে পার না। যোগী যোগ বলে পৃথিবী ছাড়িয়া, শরীর ছাড়িয়া, ইন্দ্রিয়াতীত আত্মারাজ্যে প্রবেশ করেন সত্য; কিন্তু তথাপি শরীর তাঁহার পক্ষে অনাদবের বস্তু নহে। কেননা তিনি শরীরের মধ্যে তাঁহার ইষ্টদেবতা ভগবানের আবির্ভাব অনুভব করেন। যোগী শরীরের মধ্যে থাকিয়াও সমুদয় অসার পার্থিব ব্যাপার অতিক্রম করিয়া অশরীরী পরমাত্মার সঙ্গে যোগ স্থাপন করেন। যোগী শরীরকে অবহেলা করেন না। হিন্দুস্থানে প্রাচীন যোগীগণ দেহতত্ত্বজ্ঞ হইয়া রীতিপূর্ব্বক দেহ সাধন করিতেন। হে নববিধানের ব্রহ্ম যোগী, ব্রহ্মসাধক, তুমি যদি তোমার আপনার শরীরের ভিতরে তোমার জীবিতেশ্বরকে না দেখিতে পাও তবে তুমি প্রকৃত যোগী নহ। তোমার প্রাণের হরি তোমার বক্ষস্থলে যোগাসনে বসিয়া আছেন। প্রাণের প্রাণ, বিশ্বপ্রাণ আমাদের জীবনের মূলদেশে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। হে ভক্ত, তোমার বক্ষের নিম্নে জীবন রক্ষার দুইটী প্রধান যন্ত্র স্থিতি করিতেছে; দক্ষিণ দিকে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্র, আর বামে একটী রক্ত সঞ্চালনের যন্ত্র। এই দুইটী যন্ত্রের, কিম্বা দুইটীর মধ্যে একটীর কার্য্যও যদি বন্ধ হয় তবে ক্ষণকাল মধ্যে সমস্ত শারীরিক কার্য্য বন্ধ হইবে। হে যোগী, তুমি তোমার যে প্রাণ সিংহাসনে হরিকে বসাইবে সেই সিংহাসনের

নিয়ে তোমার বুকের মধ্যে এই দুটী যন্ত্র দুইটী স্তম্ভ স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। এই দুটী যন্ত্র তোমার প্রাণ রক্ষার প্রধান উপায়। তুমি যখন হাঁচ, তুমি যখন হাই তোল, তুমি জান না তুমি কি কর। সেইরূপ যখন তুমি উপাসনা কর, যখন তুমি ব্রহ্ম সাধন কর তুমি জান না যে তোমার শরীরের কোন্ কোন্ যন্ত্র বিশেষরূপে তোমার সাহায্য করিতেছে। এ সকল যন্ত্রের সাহায্য ভিন্ন তুমি একটী নিঃশ্বাস ফেলিতে পার না, একটী কথা বলিতে পার না। ঈশ্বরের শক্তিতে তোমার শরীরে তালে তালে নিঃশ্বাস পড়িতেছে এবং রক্ত নাচিতেছে। প্রত্যেক নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তোমার শরীর হরি হরি বলিতেছে, তোমার নিঃশ্বাস বায়ু বন্ধ হইলে তোমার আর হরিনাম উচ্চারণ করিবার ক্ষমতা থাকে না। যেমন তালে তালে নিঃশ্বাস পড়িতেছে ও রক্ত চলিতেছে সেইরূপ তালে তালে যোগীর যোগ সাধন চলিতেছে। যে আপনার নিঃশ্বাস ও রক্তের মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে পারে না তাহাকে কিরূপ বিশ্বাসী যোগী অথবা জ্ঞানী বিজ্ঞানী বলিব? জীবন্ত ঈশ্বর স্বয়ং যন্ত্রী হইয়া, ফুস্‌ফুস্ এবং রক্তাধার এই দুইটী যন্ত্র চালাইতেছেন। যেমন মনের জীবন সেইরূপ শরীরের জীবন সম্পূর্ণরূপে তাঁহার উপর নির্ভর করে। অনন্ত জীবন স্বরূপ ঈশ্বর শরীর মন উভয়ের মূল শক্তি ইহা কোন জ্ঞানী যোগী অস্বীকার করিতে পারেন না। যখন প্রাচীন আর্য্য ঋষির ন্যায় গম্ভীর যোগ ধ্যানে মগ্ন হইয়া বল "হে ঈশ্বর, তুমি আছ।" ইহার সঙ্গে সঙ্গে তোমার সাধনের উপযোগী নিঃশ্বাস এবং রক্তও একবাক্য হইয়া বলে "হে ঈশ্বর, তুমি আছ।" এই যে শরীর মনের সঙ্গে ঐক্য ইহাই এখনকার দেহতত্ত্ব। এই দেহতত্ত্ব নববিধানের যোগের সহায়। নিজের শরীরের মধ্যে এই দুইটী আশ্চর্য্য কলকে সহায় করিয়া তোমরা নববিধানের বিজ্ঞানযোগ সাধন কর। এই দুইটীর উপরে ঈশ্বরের চরণ স্থাপিত। এই দুয়ের ভিতর দিয়া তোমরা ঈশ্বরকে উপলব্ধি কর। এই দুইটী যোগমন্দিরে যাইবার পথ। কি রক্ত নদীর উপর দিয়া, কি নিঃশ্বাস বায়ুর উপর দিয়া যে দিক্ দিয়া যাও সেই যোগেশ সেই প্রাণেশকে দেখিতে পাইবে। একদিকে শোণিত সরোবরে ঈশ্বরের চরণ কমলে গিয়া পৌঁছিবে, আর একদিকে নিঃশ্বাস বায়ুতে উড়তে

উড়িতে ঈশ্বরের পবিত্র যোগনিকেতনে গিয়া উপস্থিত হইবে। একদিকে রক্তনদী আর একদিকে নিঃশ্বাস-পবন। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া এবং রক্ত সঞ্চালন ভিন্ন যেমন শরীরের জীবন থাকে না সেইরূপ প্রেমভক্তির রক্ত এবং পবিত্রতার বায়ু ভিন্ন আত্মার ধর্ম্মজীবন থাকে না। প্রাণের প্রাণ ঈশ্বর স্বয়ংই আত্মার মধ্যে পুণ্যের নিঃশ্বাস এবং প্রেমের রক্ত হইয়া বাস করিতেছেন। যেমন নিঃশ্বাস-বায়ু দ্বারা শরীরের রক্ত পরিষ্কৃত হয়, সেইরূপ ঈশ্বরের পুণ্য-নিঃশ্বাসে সাধকের হৃদয়ের প্রেম রক্ত বিশুদ্ধ হয়। অতএব হে ব্রহ্মসাধক, তুমি আপনার শরীর এবং মনের মধ্যে ঈশ্বরকে অন্বেষণ কর। তুমি বাহিরে ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিয়া প্রবঞ্চিত হইও না। "হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর" বলিয়া তুমি বাহিরের দিকে তাকাইও না; কিন্তু ঈশ্বরকে তোমার প্রাণের মূলে, তোমার অন্তরতম স্থানে দর্শন কর। হে যোগ শিক্ষার্থী, যখন তুমি উপাসনা আরম্ভ কর, তখন তোমার নিজের বক্ষস্থলে হস্ত দিয়া জিজ্ঞাসা করিও "হে নিঃশ্বাস যন্ত্র, হে রক্ত যন্ত্র, তোমরা তোমাদের ঈশ্বরকে দেখাইয়া দেও, তোমাদের মধ্যে একটী ঈশ্বরের প্রেমের নদী আর একটী তাঁহার পুণ্যের উৎস। তোমরা জীবের জীবনরক্ষার যন্ত্র, অতএব তোমরা তোমাদের প্রাণেশ্বরী জননীকে দেখাইয়া দেও। তোমরা অন্তরতম প্রাণস্থ ঈশ্বরকে প্রকাশ করিয়া সুখের উপাসনার পথ দেখাইয়া দেও। যাহারা আপনার নিঃশ্বাস ও রক্তের মধ্যে জীবন্ত ঈশ্বরকে দর্শন করে তাহারাই প্রকৃত মধুর ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্র এবং রক্তাধার যন্ত্র সহায় হইয়া যখন সাধকের নিকট স্বীয় দেহস্থিত ঈশ্বরকে দেখাইয়া দেয় তখন সাধক শীঘ্র শীঘ্র সিদ্ধিলাভ করেন। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা এই দুটী যন্ত্রের মধ্যে ঈশ্বরের প্রেমের লেখা পাঠ করেন। দুঃখী তাহারা তোমাদের মধ্যে যাহারা এখন পর্য্যন্ত এই দুইটী যন্ত্র পড়িলে না। তোমরা আপনার বুকের উপর হাত দিয়া দেহের মধ্যে যে ব্রহ্মমন্দির আছে তাহা দেখিলে না। বক্ষে হস্ত রাখিয়া বল দেখি, "হরি হে এদেহে আছ সদা বর্ত্তমান, নিঃশ্বাসে শোণিতাধারে করে তোমার নাম গান।" কেবল মুখে ঈশ্বর ঈশ্বর বলিলে হইবে না; কিন্তু বিজ্ঞানবিৎ বিশ্বাসী যোগী হইয়া আপনার নিঃশ্বাস ও রক্তের মধ্যে ঈশ্বরের জ্বলন্ত

সত্তা উপলব্ধি করিয়া "সত্তাং" অথবা "হে ঈশ্বর তুমি আছ।" এই কথা উচ্চারণ করিতে হইবে। হে সাধক, তোমার নিজের রক্তনদীর মধ্যে প্রেমের জল, দয়ার জল রহিয়াছে, যতদিন না তুমি সেই জলে স্নান করিয়া ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ করিবে ততদিন তোমার উপাসনা উচ্চ শ্রেণীর মিষ্ট উপাসনা বলিয়া স্বীকার করিব না। তোমার উপাসনা এখনও অতি নীচ প্রকার। উচ্চ উপাসনার তুমি অধিকারী হও নাই। যখন তোমার উপাসনার প্রত্যেক কথা একবার রক্তে ডুবিবে, আবার নিঃশ্বাসে উড়িবে, অর্থাৎ কি নিঃশ্বাসপথে কি রক্তনদীর পথে, উভয় পথেই তুমি জীবন্ত ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিবে, তখন জানিব তুমি উচ্চ শ্রেণীর উপাসক। এই দুই পথ আজ পর্য্যন্ত অনেকেই আবিষ্কার করে নাই। যিনি এই দুই পথ আবিষ্কার করিয়াছেন তিনি অতি সহজে স্বর্গে গমন করেন। তিনি আপনার নিঃশ্বাস ও রক্তের ভিতরে ঈশ্বরকে দেখিতে পান। বাস্তবিক রক্তনদীর একটী একটী ঢেউ ব্রহ্মপাদস্পর্শ করিয়া চলিতেছে। ভক্ত বলেন "রক্ত, তুমি ব্রহ্মপদ ধৌত করিতে করিতে চল; নিঃশ্বাস, তুমি ব্রহ্মকে পক্ষে লইয়া উড়।" ভক্ত আপনার ফুস্‌ফুস্ যন্ত্রের ভিতরে, আপনার রক্ত সঞ্চালনের ক্রিয়ার মধ্যে হরির শব্দ শ্রবণ করেন। তিনি আপনার রক্তের বেগের মধ্যে ঈশ্বরের দয়ার বেগ দেখিতে পান। ঈশ্বরের দয়া নিঃশ্বাস ও রক্তরূপ ধারণ করিয়া জীবের জীবন রক্ষা করিতেছে। ঈশ্বরের শক্তি আমাদিগের শরীরে রক্ত সঞ্চালন করিতেছে এবং নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বায়ু প্রবাহিত করিতেছে। তিনি যদি শক্তি কাড়িয়া লন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস এবং রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। হরিশক্তি বিনা একটী নিঃশ্বাস পড়ে না, এক ফোটা রক্ত চলে না। হে জীব মীন, তুমি হরিকে অতি-ক্রম করিয়া কোথায় যাইবে? তুমি হরিবারি ভিন্ন থাকিতে পার না। তোমার নিঃশ্বাসে হরি, তোমার রক্তে হরি, তোমার অন্তরে হরি, তোমার বাহিরে হরি। অতএব তুমি কদাচ হরিকে ছাড়িয়া থাকিতে চেষ্টা করিও না। হরি আপনার সত্তাজালে তোমাকে ধরিয়া ফেলি-য়াছেন। তোমার সাধ্য নাই যে তুমি হরি হইতে বিচ্ছিন্ন হও। মূঢ়

জীবাত্মা বলিয়াছিল "আমি কোথাও মাকে দেখিতে পাই না।" এই জন্য বিশ্বাস ও বিজ্ঞান একত্র হইয়া তাহার নিজের শরীরের নিঃশ্বাস ও রক্তের মধ্যে তাহার মাকে দেখাইয়া দিয়া তাহাকে শান্তি দিল। ভক্ত ভক্তিনয়ন খুলিয়া আপনার নির্ম্মল রক্ত সরোবরের মধ্যে হরিচরণ কমল ভাসিতেছে দেখিতে পান। তিনি আপনার বুকের রক্তের মধ্যে মার পাদপদ্ম দেখিয়া আনন্দে নৃত্য করেন। তিনি দেখিতে পান তাঁহার মা লক্ষ্মী এক দিকে যেমন নিঃশ্বাস বায়ুতে উড়িতেছেন, তেমনি আবার আর এক দিকে তাঁহার রক্তনদীতে খেলা করিতেছেন। বিশ্বজননী জগদ্ধাত্রী ভক্তের শরীরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইয়া তাহা দ্বারা আপনার পবিত্র অভিপ্রায় সকল সম্পাদন করিতেছেন। এই যে মনুষ্য শরীর ইহা ভগবানের একটী অদ্ভুত কল। ইহার ভিতরে হরি আপনি যন্ত্রী হইয়া কত আশ্চর্য্য ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছেন। হে সাধক, যখন তুমি আপনার শরীর স্পর্শ কর তখন তোমার জানা উচিত যে তুমি ব্রহ্ম-নিকেতন স্পর্শ করিতেছ। এই দেহতত্ত্ব জানিলে ভক্তের ভক্তি বৃদ্ধি এবং যোগীর যোগ বৃদ্ধি হয়। আপনার দেহের মধ্যে হরিকে দেখিয়া ভক্ত ভক্তির অশ্রু বর্ষণ করেন। যেমন শরীরের ভিতরে নিঃশ্বাস ও রক্তের দুইটী চমৎকার ভৌতিক কল রহিয়াছে, আত্মার মধ্যেও ঠিক ইহার অনুরূপ দুইটী অধ্যাত্ম কল রহিয়াছে। যত দেখিবে নিঃশ্বাস, তত বাড়িবে বিশ্বাস, যত দেখিবে রক্ত, তত হইবে ভক্ত। মা লক্ষ্মী পবিত্রতার বায়ু হইয়া একদিকে খুব উচ্চ পর্ব্বতের উপরে উড়িতেছেন, আবার আর এক দিকে রক্তের মধ্যে শক্তিরূপে বাস করিতেছেন। জগজ্জননীর শক্তিতে আমরা অবস্থিতি করিতেছি, বিচরণ করিতেছি, জীবন ধারণ করিতেছি। জননীর রক্তে আমরা জীবিত রহিয়াছি। মার নিঃশ্বাসে আমরা জীবিত, মার রক্তেতে আমরা জীবিত। মার শক্তি ছাড়া আমার কিছুই নাই। যেদিকে তাকাই সেই দিকেই মার শক্তি দেখিতে পাই। অতএব আপনার বুকের ভিতরে সর্ব্বত্র মাকে অন্বেষণ কর। আপনার রক্ত নিঃশ্বাসের মধ্যে স্বর্গের জননীকে দর্শন কর। নিঃশ্বাস এবং রক্তযন্ত্ররূপ দুইটী আর্গান বাজাও, যতই বাজাইবে ততই ইহারা মধুরস্বরে হরিগুণ কীর্ত্তন করিবে। যেমন প্রস্রবণ হইতে

ক্রমাগত জল ঝরে সেইরূপ সর্ব্বশক্তিময়ী জননীর স্নেহ প্রস্রবণ হইতে জীবের দেহ মনের মধ্যে ক্রমাগত শক্তি, সামর্থ্য নিঃসৃত হইতেছে। সেই জননীর স্নেহই নিঃশ্বাস রূপে, রক্তরূপে, জ্ঞান প্রেম পুণ্য ও শান্তিরূপে আমাদিগের দেহ মনকে পরিপূর্ণ করিতেছে। যেমন শরীরের মধ্যে নিঃশ্বাস বায়ু রক্তের মলা কাটিয়া রক্তকে পরিষ্কৃত করে সেইরূপ অাত্মার মধ্যে ঈশ্বরের পবিত্র নিঃশ্বাস জীবের বিকৃত হৃদয়কে সংশোধন করে। ঈশ্বরের পুণ্য সমীরণে জীবের প্রেমরক্ত পরিষ্কৃত হয়। ঈশ্বরের শক্তি হইতে ক্রমাগত পুণ্যের বাতাস আসিয়া সাধকের মনের সমস্ত জঞ্জাল দূর করে। আধ্যাত্মিক শরীরে ক্রমাগত যোগের বাতাস বহিতেছে, ভক্তি নদী চলিতেছে। হে নববিধানের ভক্ত, তুমি বিশ্বাস চক্ষু খুলিয়া দেখ তোমার হৃদয়ের মধ্যে গৌরাঙ্গের ভক্তিনদী চলিতেছে, ঈশা শাক্যের পবিত্র নিঃশ্বাস পড়িতেছে। যেমন তোমার নিঃশ্বাস পড়িতেছে, এবং তোমার রক্তের ঢেউ উঠিতেছে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর তাঁহার সাধুভক্তদিগকে লইয়া তোমার দেহ মন্দিরে লীলা করিতেছেন এবং নৃত্য করিতেছেন। প্রতি নিঃশ্বাসে ও প্রত্যেক রক্তের তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে জীবন্ত ভগবানের আবির্ভাব অনুভব করিয়া নিঃশ্বাস ও রক্ত হইতে কাম, ক্রোধ লোভ প্রভৃতি সমস্ত পাপাসুরকে তাড়াইয়া জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী হইলাম, ভাগবতী তনু লাভ করিলাম। হে জীব, এই রূপে দেহ মধ্যে ভগবানের সঙ্গে যোগ স্থাপন করিলে তোমার অশেষ কল্যাণ হইবে।

ব্রহ্মপ্রেম চির-সরস।

রবিবার ১৮ আষাঢ় ১৭৯৯ শক।

যদি পৌত্তলিক হইতে হয় তবে রাঙ্গা চরণ মানিতেই হইবে। দেবতার চরণ রাঙ্গা নয় যে বলে সে পৌত্তলিক নহে। যদি পুতুল পূজা করিতে হয় তবে তাঁহার রাঙ্গা চরণ পূজা করিলে তৃপ্তি আছে। তাপিত প্রাণকে শীতল করা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কর্ত্তব্য, এই জন্য পৌত্তলিক

স্বর্গীয় দেবতার চরণে রাঙ্গা বর্ণ দেয়। যদি অপৌত্তলিক ব্রাহ্ম হইতে চাও তথাপি ঈশ্বরের নিরাকার শ্রীচরণকে সুধারসে অভিষিক্ত করিতে হইবে। যদি হৃদয়ে অনুভব শক্তি থাকে তবে বলিবে দয়াল প্রভুর যে চরণে আমাদের মস্তক লুণ্ঠিত সেই চরণ শুষ্ক নহে, তাহা প্রেমে রাঙ্গা হইয়াছে। প্রভুর চরণ যে শুষ্ক বলিল সে আর ব্রাহ্ম রহিল না। ভক্তি চক্ষে এমন চরণ দেখিব যাহা হইতে অবিরত কৃপা ও আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। যাঁহারা ঐ চরণের রূপ, কান্তি, সৌন্দর্য্য ভাবিয়াছেন তাঁহারা পাগল হইয়াছেন। ভক্তেরা ঈশ্বরের প্রেমানুরঞ্জিত চরণের শোভা দেখিয়াই ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা আর ঈশ্বরের মুখের দিকে তাকাইতে পারেন না, এই জন্য ভক্তি শাস্ত্রে মুখের বর্ণনা নাই। সমস্ত দেশকে ডাকিয়া তাহার গলায় অমূল্য রত্নহার দিয়া যাইতে পারিব যদি নিরাকার চরণ বক্ষে ধারণ করিতে পারি। "দাঁড়াও একবার বক্ষস্থলে, চরণ ধুই হে চক্ষের জলে, লুটাইয়ে পদতলে সফল করি জীবন।" যিনি এই সকল কথা বলিতে পারেন তিনি জানেন ঈশ্বরের চরণ কেমন সুধাময়। "পিতা, পাপীর বক্ষে তোমার শীতল চরণ স্থাপিত কর।" এই কথায় কত আরাম, এই চরণ কথার কেমন মধুর প্রভাব। চরণ কথা কে বাহির করিল? ঐ চরণের ছায়া লাভ করিয়া যে শীতল হইয়াছে, ঐ চরণের আশ্রয়ে যে নির্ভয় হইয়াছে, ঐ চরণের সৌন্দর্য্যে যাহার প্রাণ মুগ্ধ হইয়াছে সে তাহার বুকে হাত দিয়া দেখিয়াছে তাহার বুকের মধ্যে একটী স্থানে ঐ চরণ রূপ সহস্র ফুল ফুটিয়াছে। ব্রহ্মপদ সংস্পর্শে বহুকালের দগ্ধ প্রাণ শীতল হইয়াছে। "ভক্ত পড়িয়াছেন দেবতার চরণতলে" এই কথাটী এত মনোহর যে এই কথাটী শুনিয়া কত লোক সর্ব্বস্ব ছাড়িল। তাহারা বলিল আমরা এই এক কথা হইতে লক্ষ টাকা বাহির করিব। যখন চরণ কথা শুনিয়া মনুষ্যের এত ভক্তি হইল তখন ঈশ্বরের মুখশ্রী দেখিলে ভক্তের মন কত প্রমত্ত হইবে তাহা ভাবিতে পারা যায় না। 'ক' অক্ষর দর্শন করিতে না করিতেই প্রহ্লাদদিগের, শিশুদিগের এত আহ্লাদ হইল। কিন্তু এমন আহ্লাদের স্রোত এত শীঘ্র বন্ধ হইল কেন? পরিচিত অপরিচিত সমুদয় ভাই ভগিনীদিগকে জিজ্ঞাসা করি এই 'ক' অক্ষর বাহির হইতে না হইতেই সুধা ভোগ বন্ধ হয় কেন? প্রথম অন্ন ব্যঞ্জন পাইতে না পাইতে তোমরা উঠিয়া যাও কেন? প্রেমের ভোজে বসিয়াছ, প্রাণ ভরিয়া পুণ্য শান্তি ভোজন কর, যত পার মহোৎসবের আনন্দ আহার কর। মহোৎসব শেষ না হইতে উঠিয়া যাইও না। তোমাদের হাত ধরিয়া বলি, তোমরা এমন অসৎ দৃষ্টান্ত দেখাইও না। জননী অন্ন পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তোমরা উঠিয়া গেলে তাঁহার মনে আঘাত লাগিবে। ঐ দেখ তোমাদের সমক্ষে দুই শত পাঁচ শত লোক উঠিয়া গেল, সাবধান

কেহ যেন উঠিয়া না যান। মার অনুরোধ রক্ষা কর। জগতের দুঃখ মোচন করিবার জন্য জগজ্জননী নিজ হাতে করিয়া সুধা পরিবেশন করিতেছেন, তোমরা ইহার প্রতিবন্ধক হইও না। যদি বলিতে পারিতে মা সন্তানদিগের দুঃখ দেখিয়া উপাসনারূপ যে সুধা বিলাইতেছেন তাহাতে মিষ্টতা নাই. উপাসনা একটী শুষ্ক ব্যাপার তাহা হইলে তোমাদিগকে এই অনুরোধ করিতাম না। যখন ঈশ্বরের চরণের কথা শুনিয়াই প্রকাণ্ড বীরেরা অবসন্ন হইয়া পড়িয়া যায় তখন পিতার স্বর্গে আরও কত বড় বড় অস্ত্র আছে। ভিতরে থাকিয়া কে বলিতেছেন আরও একবার সময় হইবে। আর একবার স্নেহময়ী জননী আসিবেন। এই কথা শুনিয়া অবধি মনে বড় আশা হইয়াছে! আবার এই দেশে পবিত্র উৎসাহানল জ্বলিয়া উঠিবে। ঈশ্বরের প্রেমেতে লোক মাতিবে। তোমাদের পদানত হইয়া ভিক্ষা চাহিতেছি এই কথা অবিশ্বাস করিও না। সেনাপতি জয় পতাকা উড়াইবেন, অন্ধকার দেশে আবার জ্যোতি বিকীর্ণ হইবে। অধর্ম্মের রজনী অবসানে ধর্ম্মের সুপ্রভাত হইবে। শত্রুদল চূর্ণ প্রায় ;সত্যের রাজ্য, পুণ্যের রাজ্য আগতপ্রায়। প্রেমিক ব্রাহ্মগণ, এই পৃথিবীতে প্রেম ভিন্ন আর কিছুই নাই। যে শব্দ উচ্চারণ করিলে প্রাণ মোহিত হইয়া যায় তাহা কি বস্তু কেহ কি বুঝাইয়া দিতে পার? ভালবাসিয়া মরিয়া যাইব। শত্রুকে ভালবাস, পৃথিবীকে ভালবাস। মনে আছেত সে সকল মহাত্মাদের নাম যাঁহারা পৃথিবীর কল্যাণের নিমিত্ত আপনাদের প্রাণ দিয়া গিয়াছেন? তাঁহারা পৃথিবীকে সোণার মুকুট পরিধান করাইয়া আপনারা কাঁটার মুকুট পরিতেন, পৃথিবীর লোককে সাল পরাইয়া আপনারা ছেঁড়া কাঁথা পরিয়া গাছতলায় থাকিতেন। তাঁহারা রাস্তায় রাস্তায় দয়াল নাম গাইয়া বেড়াইতেন। তাঁহারা সকলেই প্রেমের মানুষ ছিলেন। তাঁহাদের নাম শুনিলেও আশা হয়। এস আমরাও প্রেমের মানুষ হই। আমরা এখনও কেবল প্রেমের 'ক, খ' শিখিতেছি। প্রেমের পূর্ণ প্রস্ফুটিত ভাব কবে হইবে জানি না; কিন্তু কেহই নিরাশ হইও না, স্বর্গের জননী স্বয়ং প্রেমান্ন পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা কর, মা ভাণ্ড র হইতে প্রেমসুধা লইয়া আসিলেন বলে। যখন সেই সুধা পান করিব তখন অপ্রেম অশান্তি একেবারে পলায়ন করিবে। ব্রাহ্মগণ, তোমরা সকলকে ভালবাস, স্বর্গের প্রেমে তোমরা সুখী হইবে এবং দেশ বেঁচে যাবে। মার পরিবেশন কেবল আরম্ভ হইয়াছে। ঈশ্বরের হয়েছে কি? এই প্রথম পূজা আরম্ভ হইয়াছে। এখনও ব্রহ্মপূজার প্রথম বর্ণও ভালরূপে প্রকাশ হয় নাই। ব্রহ্ম পূজা করিয়া জগৎ উদ্ধার হইবে। একটী লোকও মরিবে না। সকলেই বাঁচিয়া যাইবে, প্রতি জনেই পৃথিবী হইতে অনন্ত কালের ধন লইয়া যাইবে।

সেবকের নিবেদন।

পাপাসুর জয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ২০শে বৈশাখ, ১৮০৩ শক।

পাপ কি এ সম্বন্ধে মানুষের অনেক ভ্রম আছে। অধর্ম্ম কি? অন্যায় কি? অশুদ্ধ কাহাকে বলে? ইহা অনেকে বুঝিতে পারে না। যাহা বাহিরে করি তাহা পাপ নহে, যাহা মুখে বলি তাহা পাপ নহে। হস্ত অথবা রসনা পাপের আলয় নহে। পাপ বাহিরে নহে, পাপ অন্তরে। আবার যাহা ভাবিয়াছি, যাহা চিন্তা করিয়াছি, যাহা ইচ্ছা করিয়াছি, যাহা অভ্যাস হইয়াছে তাহাও পাপ নহে। যাহা এত দিন পাপ মনে করিয়াছি তাহা পাপ নহে। এ জীবনে যে কয়েকটী মিথ্যা বলিয়াছি, যে কয়েকটী নরহত্যা করিয়াছি তাহা পাপ নহে। মনের চিন্তাতে, কি আলোচনাতে, কি অভ্যাসেতে পাপ নাই। তবে পাপ কি? ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি যে কোন ইচ্ছা পোষণ করিতে পারি ইহাই আমার প্রকৃত পাপ। এই যে ঈশ্বরের অনভিপ্রেত কার্য্য করিবার ক্ষমতা ও সম্ভাবনা ইহাই পাপের মূল। যে পাপ করিয়াছি তাহা ছোট, যাহা করিতে পারি তাহা বড়। হে মহাপাপী, তুমি নরহত্যা প্রভৃতি যে সকল গুরুতর পাপ করিয়াছ, ভবিষ্যতে তোমার পাপ করিবার ক্ষমতার নিকটে সে সকল শর্ষপ কণার ন্যায় ক্ষুদ্র। অনুতপ্ত পাপী, তুমি আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছ—"এই দেখ আমার জীবনের অমুক অমুক স্থানে এই এই ভয়ানক জঘন্য পাপের ক্ষত সকল রহিয়াছে।" সত্য বটে তোমার গত পাপ সকল ভাবিলে হৃদয় কম্পিত

হয়। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ দেখি তোমার মনের মধ্যে যে পাপের মূল রহিয়াছে তাহা হইতে আরও কত ভয়ানক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাপ বৃক্ষ সকল জন্মিতে পারে। তুমি একবার ভাবিয়া দেখ, পবিত্রতা এবং বৈরাগ্য বিরুদ্ধ তুমি কত রাশি রাশি বিলাসসুখ কামনা করিতে পার; ক্ষমা গুণের বিরুদ্ধে সামান্য কারণে কিম্বা প্রবল শত্রুদিগের উত্তেজনায় কত রাগ প্রকাশ করিতে পার এবং তাহাদিগের প্রতি প্রতিহিংসা করিতে পার; লোভ পরবশ হইয়া অন্যায়রূপে প্রবঞ্চনা করিয়া কত লোকের নিকট হইতে টাকা লইতে পার; অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া আপনাকে কত বড় এবং পৃথিবীকে কত ছোট মনে করিতে পার; এবং পরের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া ঈর্ষানলে কত জ্বলিতে পার। বাস্তবিক তুমি ইচ্ছা করিলে যেরূপ ভয়ানক পাপ করিতে পার, তাহার তুলনায় তুমি যে সকল গুরুতর পাপ করিয়াছ তাহা কিছুই নহে। তুমি সুবিধা পাইয়া পাঁচবার নিষিদ্ধ আমোদ প্রমোদ করিয়াছ, ভবিষ্যতে তুমি পাঁচ শতবার সেই নিষিদ্ধ অপবিত্র সুখ ভোগ করিতে পার। গত জীবনে লোভী হইয়া পাঁচটী টাকা চুরী করিয়াছ, ভবিষ্যতে তুমি পাঁচ শত টাকা চুরী করিতে পার। গত জীবনে প্রতিহিংসা ও ক্রোধে অন্ধ ও উন্মত্ত প্রায় হইয়া একটী নরহত্যা করিয়াছ, ভবিষ্যতে রাগে মত্ত হইয়া শত শত লোকের মস্তক ছেদন করিতে পার। তোমার হৃদয়ের ভিতরে পাপ ধ্যান করিবার লালসা আছে কি না বল। তোমার প্রলোভনে পড়িবার সম্ভাবনা আছে কি না বল। টাকা দেখিলে তাহা গ্রহণ করিবার জন্য তোমার হস্ত চুলকায় কি না? লোভের সামগ্রী সকল দেখিলে তোমার মুখ হইতে জল পড়ে কি না? যদি তুমি এ প্রকার স্থানে থাক যেখানে, তুমি অনায়াসে পাঁচ হাজার টাকা চুরী করিতে পার যেখানে তুমি প্রচুর হস্ত প্রসারণ করিতে পার কি না? যদি পার, যদি সুবিধা পাইলে তোমার চুরী করিবার সম্ভাবনা থাকে তবে তুমি যে লোভী এবং প্রচ্ছন্ন চোর তাহা প্রমাণিত হইল। তোমার বন্ধুর অনিষ্ট হইবে এই আশঙ্কায় তুমি আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে পার তবে প্রমাণিত হইল তোমার ভিতরে অসত্য আছে। মনে কর, একজন তোমার নামে অপবাদ রটনা

করিয়াছে, একজন তোমাকে কটু বলিয়াছে, একজন তোমাকে কঠোরভাবে আঘাত করিয়াছে, একজন গলা টিপিয়া তোমার ছেলেকে বধ করিয়াছে, একজন তোমার স্ত্রীর অপমান করিয়াছে এ সকল লোকের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য কি তোমার অন্তরে ভয়ানক প্রতিহিংসা এবং রাগ উত্তেজিত হয় না, এ সকল লোককে স্মরণ করিবামাত্র কি তোমার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত রক্ত গরম হইয়া উঠে না? যদি হয় তবে সিদ্ধান্ত হইল যে তুমি ক্ষমাশীল নহ, তুমি প্রতিহিংসা দোষে দোষী। কেহ তোমার অপকার করিলে তুমি যদি তাহার অনিষ্ট ইচ্ছা করিতে পার, কেহ তোমার স্ত্রীর নিন্দা করিলে, তুমি যদি তাহার স্ত্রীর অধোগতি কামনা করিতে পার, কেহ তোমার সন্তানদিগকে বিপদগ্রস্ত করিলে, তুমি যদি তাহার সন্তানদিগের মৃত্যু ইচ্ছা করিতে পার তবে জানিবে তুমি ক্ষমাবিবর্জ্জিত, তোমার মনে প্রতিহিংসা অত্যন্ত প্রবল, তোমার মনের ভিতরে রাগের নরক প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। যাহাদিগকে তুমি পছন্দ কর না যদি তাহাদিগের সুখ তুমি সহ্য করিতে না পার, তাহাদিগের গাড়ী ঘোড়া দেখিলে, তাহাদিগের সন্তানের শ্রীবৃদ্ধি ও সুখ স্বচ্ছন্দতা দেখিলে যদি তোমার মনে কষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে তবে তুমি জানিবে তোমার মনের ভিতরে চাপা ঈর্ষানল রহিয়াছে। হে সাধক, তুমি সাহস করিয়া বলিতে পার তোমার টাকার অহঙ্কার নাই, বিদ্যার অহঙ্কার নাই; কিন্তু তোমার কি ধর্ম্মের অহঙ্কার নাই? যখন তুমি কাঙ্গালের বেশে একতারা হাতে করিয়া পথে পথে, দ্বারে দ্বারে ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিয়া বেড়াও তখন যদি লোকে তোমাকে চৈতন্যের ন্যায় ভক্ত বৈরাগী বলে তখন কি তোমার মনে একটু ধর্ম্মের উচ্চ অহঙ্কার উত্তেজিত হইবার সম্ভাবনা নাই? যদি সম্ভাবনা থাকে তবে জানিবে তোমার অহঙ্কার আছে এবং সে অহঙ্কার বিদ্যা ধনের অহঙ্কার অপেক্ষাও জঘন্য। কেননা ধার্ম্মিক হইয়াও যে অহঙ্কারী হয় সে গুরুতর অপরাধে অপরাধী। অমৃতের ভিতরেও গরল? অহঙ্কার বিনাশ করিতে গিয়াও অহঙ্কার? এইরূপে বিচার করিয়া দেখিবে যদি বড় রিপু সম্পর্কে, তোমার প্রলোভনে পড়িবার সম্ভাবনা থাকে তবে জানিবে তোমার মনের ভিতরে কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা

সম্বন্ধে পাপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। যে যত পাপ করিতে পারে তাহার তত পাপ আছে মনে করা উচিত। কেননা পাপ করিবার যত সম্ভাবনা তাহা পাপের পরিমাণ। হে ব্রহ্মভক্ত, তুমি যদি বলিতে পার, যে তোমার জীবনে ব্রহ্মকৃপায় এতদূর পাপ জয় হইয়াছে যে তোমার আর পাপ করিবার সম্ভাবনা নাই, তবে তুমি বিশ্বাস করিতে পার যে তুমি পাপের অতীত হইয়াছে। যদি তুমি সৎসাহসের সহিত বলিতে পার যে তোমার মন এতদূর শুদ্ধ এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়াছে যে কোন প্রকার প্রলোভন তোমাকে বিচলিত করিতে পারে না; তুমি এতদূর ক্ষমাশীল যে শত্রুদিগের ভয়ানক উৎপীড়নেও তোমার ক্রোধ উত্তেজিত হইবার সম্ভাবনা নাই? তুমি এতদূর নির্লোভী যে কোটি কোটি টাকাও তোমার লোভ উদ্দীপন করিতে পারে না; তুমি এতদূর বিনয়ী যে কিছুতেই তোমাকে অহঙ্কারী করিতে পারে না, এবং তুমি এমনই প্রেমিক যে যতই তুমি পরশ্রী দর্শন কর ততই তোমার অন্তরে আহ্লাদ বৃদ্ধি হয়। তাহা হইলে তুমি জানিবে যে ঈশ্বরের কৃপাতে তুমি রাগ লোভ অহঙ্কার ও ঈর্ষার অতীত হইয়াছ। তুমি কল্পনা দ্বারা একবার সমস্ত পাপ ভাব। প্রলোভনে পড়িলে তুমি কত প্রকার অপবিত্র আমোদ প্রমোদ করিতে পার, শত্রুর প্রতি কত নির্যাতন করিতে পার, পরকে প্রবঞ্চনা করিয়া কত অর্থ সংগ্রহ করিতে পার, অনাথ পিতৃ মাতৃহীন শিশু এবং বিধবার দুঃখের প্রতি কত উপেক্ষা করিতে পার, অহঙ্কারী হইয়া অপরকে কত নীচ ও হীন মনে করিয়া অবজ্ঞা করিতে পার, পরশ্রী দেখিয়া কত কাতর হইতে পার, কঠোর স্বার্থপর হইয়া নিরাশ্রয় দুঃখীদিগকে উৎপীড়ন করিয়া আপনার ধন সম্পদ কত বৃদ্ধি করিতে পার। এ সমস্ত এবং অন্যান্য যত প্রকার পাপাচরণ করিবার তোমার সম্ভাবনা আছে তাহা একবার কল্পনা দ্বারা চিন্তা করিয়া দেখ। যদি শাক্যসিংহ এবং মহর্ষি ঈশার ন্যায় সমস্ত পাপ প্রলোভনের বশীভূত আকর স্বরূপ সয়তান একেবারে বিদায় করিয়া দিতে পার তবে তোমার ভয় নাই। কথিত আছে প্রকাণ্ড ধর্ম্মবীর শাক্য সিংহকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিবার জন্য অসুর মারা তাঁহার সম্মুখে নানা প্রকার প্রলোভন উপস্থিত করিয়াছিল, শাক্যসিংহ দুর্জ্জয় ধর্ম্মবল এবং মহাতেজ

প্রকাশ করিয়া সেই অসুরকে পরাস্ত করিলেন। কথিত আছে মারা আপনার প্রলোভন দল সঙ্গে লইয়া বুদ্ধদেবের কাছে গমন করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিল,—"হে সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী, দেখ তোমার কঠোর বৈরাগ্যে তোমার শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তোমার মুখ বিবর্ণ, চল সংসারে, সেখানে তোমাকে নানাপ্রকার বিলাস সুখ দিব।" মারার এ সকল কথা শুনিয়া বুদ্ধদেব হুঙ্কার করিয়া বলিলেন, "তুই দূর হ।" লিখিত আছে দানব সয়তান মহর্ষি ঈশাকে নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইয়াছিল, দুষ্ট সয়তান তাঁহাকে বলিয়াছিল "তুমি যদি ঈশ্বরার্চ্চনা পরিত্যাগ করিয়া আমার ভজনা কর তবে তোমাকে এই সসাগরা পৃথিবীর রাজা করিয়া দিব।" সয়তান তাঁহাকে এইরূপ অনেক প্রলোভন দেখাইয়াছিল; কিন্তু ঈশা প্রবল পরাক্রমের সহিত বলিলেন, "সয়তান্, তুই দূর হও।" শাক্যসিংহের মারা-দমন এবং মহর্ষি ঈশার সয়তান জয়, এ দুটী গল্প নহে। যদিও মারা অথবা সয়তান নামে কোন দৈত্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, তথাপি এই দুটী গল্পের মধ্যে মনুষ্য-স্বভাবের একটী গূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। মারার সঙ্গে যুদ্ধ অথবা সয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ—ইহার অর্থ কি? মারা কি? সয়তান কি? প্রলোভন। সুতরাং প্রলোভন জয় করাই সয়তান জয়। প্রত্যেক স্বর্গ যাত্রীকে এই সয়তান বধ অর্থাৎ প্রলোভন জয় করিতে হইবে। সয়তান অথবা মারা বাহিরের কোন দানব নহে; ইহা মনুষ্যের মনের। কল্পনা। মহাবীর শাক্যসিংহ এবং মহর্ষি ঈশা দুই জনেই বৈরাগ্য গ্রহণ করিবার সময় সম্পূর্ণরূপে এই প্রলোভন জয় করিয়াছিলেন। পাপ প্রলোভনময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের রাজ্যে যাইবার সময় কল্পনা ইহাঁদের উভয়ের নিকটেই সমুদয় পাপকে একত্র করিয়া একটী ভীষণাকার গঠন করিয়া উপস্থিত করিয়াছিল। শাক্য সিংহের সেই গম্ভীর প্রশান্ত নয়ন সেই কল্পিত মারা ও তাহার অনুচর প্রলোভন সকল দর্শন করিল; মহর্ষি ঈশার যোগনেত্র সেই ভীষণাকার সয়তানকে দর্শন করিল। উভয়েই আপন আপন অন্তরস্থ স্বর্গীয় ব্রহ্মতেজ প্রভাবে সেই কল্পিত দৈত্য দ্বয়কে বিনাশ করিলেন। এই দুই প্রধান বৈরাগীর জীবনে এতৎসম্বন্ধে কেমন আশ্চর্য্য সাদৃশ্য!

ঈশার কতকাল পূর্ব্বে শাক্যসিংহ রিপু সংহার করিয়াছিলেন। প্রলোভন জয় না করিলে কেহই স্বর্গীয় জীবন লাভ করিতে পারে না। শাক্যসিংহ এবং ঈশা উভয়েই পৃথিবীকে দেখাইলেন কিরূপ স্বর্গীয় সাহসের সহিত প্রলোভন জয় করিতে হয়। অতএব হে সাধক, তুমি কি কি পাপ করিয়াছ তাহা ভাবিবে না! কিন্তু তুমি কত পরিমাণে এবং কি কি পাপ করিতে পার তাহা ভাবিয়া দেখ। ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য বশতঃ ক্রোধ লোভ, হিংসা, অহঙ্কার স্বার্থপরতা বশতঃ কত পাপ করিতে পার তাহা ভাবিয়া দেখ। তোমার মনের যেরূপ অবস্থা তাহাতে তোমার কি কি প্রলোভনে পড়িবার সম্ভাবনা তাহা চিন্তা করিয়া দেখ। অর্থাৎ যত প্রকার পাপ প্রলোভন তোমার পক্ষে সম্ভব সমুদয়কে কল্পনা দ্বারা সংযোগ করিয়া একটী ভয়ানক আকার দিয়া তোমার সম্মুখে উপস্থিত কর। যখনই দেখিবে তোমার সম্মুখে একটী বিকটাকার দৈত্য দাঁড়াইল, তৎক্ষণাৎ হুঙ্কার করিয়া তাহাকে সংহার করিতে উদ্যত হইবে। বিশ্ববিজয়ী ঈশ্বরের বলে বলী হইয়া এমনই দুর্জ্জয় পরাক্রমের সহিত হুঙ্কার করিবে যে তাহাতে চন্দ্র সূর্য্য কাঁপিবে এবং পর্ব্বত সকল কড় কড় করিয়া উঠিবে। মহাতেজের সহিত বলিবে "রে পাপ সয়তান্, তুই দূর হইয়া চলিয়া যা।" মহর্ষি ঈশা কেমন ভয়ানক জোরের সহিত এই কথা বলিয়া সয়তানকে দূর করিয়া দিলেন; কিন্তু তিনি যে জোরের সহিত বলিলেন আমাদের ন্যায় সহস্র সহস্র অল্প বিশ্বাসীর সমবেত স্বরও সেরূপ সতেজ হয় না। সয়তান আমাদের দুর্ব্বল স্বর বুঝিতে পারে, এইজন্য সয়তান আমাদের নিস্তেজ কথায় চলিয়া না গিয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। ঈশার স্বর শুনিবা মাত্র সয়তান পলায়ন করে; কিন্তু আমরা যদি দুর্ব্বল স্বরে শত শতবার সয়তানকে বলি, "তুই দূর হও।" সয়তান আমাদের কথা গ্রাহ্য করে না, এবং কিছুতেই আমাদের সঙ্গ ছাড়ে না। ঈশার এক কথাতে, এক বাণ নিক্ষেপে সয়তান প্রাণত্যাগ করিল আর কখনও ঈশার কাছে গেল না। শাক্যসিংহ এবং ঈশার হৃদয়স্থ বৈরাগ্যানলে মায়া এবং সয়তান ক্ষণকালের মধ্যে ভস্ম হইয়া গেল। বাস্তবিক ব্রহ্মতেজে তেজস্বী হইয়া হুঙ্কার না করিলে কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, হিংসা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি একেবারে

উন্মূলিত হয় না। যিনি মৃত্যুকে বধ করেন সেই মৃত্যুঞ্জয়ের তেজে তেজস্বী না হইলে কেহই শমন এবং সয়তানকে সংহার করিতে পারে না। যিনি ব্রহ্মতেজবলে একবার সয়তানকে সংহার করেন তাঁহার জীবনে আর সয়তানের দৌরাত্ম্য সম্ভব নহে। অন্তরের জ্বলন্ত বৈরাগ্য ভিন্ন পাপ দৈত্য দগ্ধ হয় না; বাহ্যিক বৈরাগ্যে কিছুই হয় না। কেবল কমণ্ডলু ও গৈরিক বস্ত্র ও উপবাসে কি নরকাগ্নি নির্ব্বাণ হয়? জোরের সহিত, ব্রহ্মতেজের সহিত বলিতে হইবে "রে সয়তান, তুই দূর হ। তোকে এখনই মারিব।" ধর্ম্ম যোদ্ধার বল দেখাইতে হইবে। সয়তান যোদ্ধার রক্তবর্ণ চক্ষু দেখিলে, ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিবে "মহাপ্রভু, ভ্রমবশতঃ আপনার নিকটে আসিয়াছি, আর কখন আপনার নিকটে আসিব না। আমাকে ছাড়িয়া দিন।" হে নববিধানাশ্রিত ব্রাহ্মভক্ত, তুমি ধর্ম্মবীরের ন্যায় সাহস করিয়া বল "ঈশ্বর আমার সহায় হউন, এই আমি সয়তানের বুকের উপর পা রাখিলাম, আর আমি মন্দ লোক হইব না, আর আমি পাপ করিব না।" যাঁহার মনে ব্রহ্মাগ্নি জ্বলিতেছে তিনি কেন সয়তানকে ভয় করিবেন? প্রকাণ্ড ভীষণাকার সয়তান তাঁহার নিকটে একটী ক্ষুদ্র কীট স্বরূপ। তিনি বলেন, "সয়তান, এটা কি? একটা সামান্য ক্ষুদ্র পোকা, টিপিব আর মরিবে, ফুঁ দিব আর উড়িয়া যাইবে।" ঈশা ফুঁ দিয়া বলিলেন, "সয়তান, দূর হ।" আর সয়তান চলিয়া গেল। ঈশার ধর্ম্মবল, এবং সৎসাহস দেখিয়া পাপ সয়তান আত্ম হত্যা করিল। আমরা বলি আমাদের বল নাই তাই সয়তান আমাদিগকে ছাড়ে না। সয়তান বলে শাক্য ও ঈশার তীব্র বাক্য-বাণে আমি বিদ্ধ হইয়াছি, আমার আর সাধ্য নাই, সাহস নাই যে আমি তাঁহাদের নিকট যাইতে পারি। নববিধানের লোকেরা যদি সেই রূপ বলিতে পারেন তবে কি আর সয়তান তাঁহাদিগের নিকট আসিতে পারে? অনুতাপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত ইহা পুরাতন বিধি। ইহাতে কেবল অনুষ্ঠিত বিগত পাপ বিনাশ হয় কিন্তু ভাবী পাপের বারণ হয় না। নূতন বিধিতে পাপ রোগের ঔষধ সৎসাহস। যে সকল পাপ হইতে পারে, ভবিষ্যতে যে সকল প্রলোভন আসিতে

পারে, সমক্ষে যে সকল ভয়ানক দুর্দ্দান্ত পাপ প্রতীক্ষা করিতেছে, সে সকল মনে করিয়া, কল্পনা করিয়া তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রার্থনা দ্বারা ধর্ম্মবল ও সৎসাহস সঞ্চয় করিতে হইবে। এই যে দুই বীর ঈশা ও শাক্য মুনি ইহাঁরা পৃথিবীকে শমন দমন মন্ত্র শিখাইয়া গিয়াছেন। বন্ধুগণ, পাপকে যদি প্রশ্রয় দেও, সাপকে যদি দুগ্ধ দিয়া পোষণ কর, সেই পাপ, সেই সাপ তোমাদিগকে ছাড়িবে না। যখন তোমরা মনে করিতেছ তোমাদের চরিত্রে পাপের লেশমাত্র নাই তখন কল্পনাকে বলিবে "কল্পনা, আমার পক্ষে যত পাপ সম্ভব ডাকিয়া আন।" ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে স্বর্গীয় দুর্জ্জয় বলে যদি এই সমুদায় সম্ভব পাপকে বিদায় করিয়া দিতে পার তাহা হইলে তোমাদের জীবনে প্রবল বেগে ব্রহ্ম কৃপা পবন বহিবে, ধর্ম্মের জয় হইবে এবং স্বর্গ হইতে পুষ্প বৃষ্টি হইবে।

সেবকের নিবেদন।

কপটতার ঔষধ কপটতা।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ২৭শে বৈশাখ, ১৮০৩ শক।

এক প্রকার চিকিৎসাশাস্ত্র আছে তাহাতে যে কারণে রোগ হয় সেই কারণেই রোগের প্রতীকার হয় এই রূপ যুক্তি আছে। সর্ব্বসাধারণের মধ্যেও কথা প্রচলিত আছে, বিষেবিষ ক্ষয় হয়। অতএব পৃথিবীতে যদি পাপমূলক কপটতা রোগ হইয়া থাকে তবে, হে ধর্ম্মচিকিৎসকগণ, তোমরা ধর্ম্মমূলক কপটতা অবলম্বন করিয়া সেই রোগের প্রতীকার কর। পৃথিবীতে কপটতা রোগের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে; এখানে অধার্ম্মিক ধার্ম্মিকের ছদ্মবেশ, ঘোর পাপাসক্ত বৈরাগী সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ, এবং নিতান্ত নির্জীব ও অলস পরিশ্রমীর বেশ গ্রহণ করিয়া আত্মগোপন এবং জন সমাজকে প্রবঞ্চনা করিতেছে। মনের ভিতরে যাহাদের অনেক গরল, মুখে তাহারা মধু মাখিয়াছে। যে তোমার সর্ব্বস্ব হরণ করিবে সে তোমার নিকটে সাধুর বেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; যে তোমাকে নানা প্রকার বিপদ প্রলোভনে ফেলিবে সে তোমার নিকটে নীতি প্রচারকের পদ গ্রহণ করিয়াছে; যে তোমার স্ত্রী পুত্র পরিবারের সর্ব্বনাশ করিতে অভিলাষী সে তোমার নিকটে সাধু যোগীর বেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। উপাসকগণ, বোধ হয়, তোমরা সকলেই জান অসুরশ্রেষ্ঠ রাবণ ভিখারী যোগীর বেশ ধারণ করিয়া সীতাকে হরণ করিয়াছিল। সেইরূপ অনেক দুরাত্মা অসুর এখনও সাধু মহন্তের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া জনসমাজের ধর্ম্ম নষ্ট করিতেছে। পৃথিবীতে এত ভয়ানক কপটতা।

কপটতাশূন্য লোক প্রায় দেখা যায় না। প্রায় সকলেই কোন না কোন প্রকার কপটতায় কলঙ্কিত। ঈশ্বরের প্রতি আমাদিগের বিশ্বাস ভক্তি অল্প, আমাদিগের অন্তরে জীবের প্রতি দয়া অল্প, সুশীলতা অল্প ; কিন্তু লোকের নিকট প্রকাশ করি যেন আমাদিগের কত বিশ্বাস ভক্তি, কত দয়া সুশীলতা। আমাদিগের ভিতরে সদ্গুণ অল্প ; কিন্তু দেখাই অনেক। এই মন্দিরে আমরা যত গুলি লোক আছি ঈশ্বরের চক্ষে আমরা প্রত্যেকেই কপট। আমাদের প্রত্যেকের গুণ প্রকাশ অপেক্ষা অতি অল্প। আশ্চর্য্য এই পৃথিবীতে এমন নির্গুণ লোক কি রূপে গুণসম্পন্ন বলিয়া বিখ্যাত হয়। তুমি ইংরাজী কিছুই জান না, জ্ঞান বিজ্ঞানে তুমি কখনও সুনিপুণ হও নাই, অথচ লোকে তোমাকে খুব বিদ্বান্, জ্ঞানী, পণ্ডিত সুবক্তা বলিয়া সুখ্যাতি করে। কে তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে জিতেন্দ্রিয় ? কে তোমাদের মধ্যে ক্ষমাশীল ? কে তোমাদের মধ্যে বিবেকী বৈরাগী ? কে তোমাদের মধ্যে বিনয়ী ? কে তোমাদের মধ্যে যথার্থ দয়ালু ? তোমাদের মধ্যে কে ষোল আনা কর্ত্তব্য-পরায়ণ ? কে তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরাশ্রিত হইয়া স্ত্রী সন্তানাদির প্রতি যথা কর্ত্তব্য সাধন করেন ? বাস্তবিক আমাদিগের মধ্যে কেহই কোন বিষয়ে সিদ্ধ হন নাই ; কিন্তু সকলেরই ইচ্ছা যে লোকে আমাদিগকে সিদ্ধ বলে। কে ইচ্ছা করে আগে আমরা জ্ঞানী হই, তার পর লোকে আমাদিগকে জ্ঞানী বলুক। আমরা প্রকৃত বিশ্বাসী ভক্ত হই আর না হই আমরা ইচ্ছা করি যে লোকে আমাদিগকে ভক্ত নাম বলুক। আমরা সকলেই ইচ্ছা করি লোকে আমাদিগকে বিশ্বাসী নাম বলুক; কিন্তু "সত্যং" বলিলে মাত্র কি বাস্তবিক আমরা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই ? বস্তুতঃ আমাদিগের অন্তরে যত টুকু বিশ্বাস, বিবেক, বৈরাগ্য এবং ধর্ম্মজ্ঞান আছে, লোককে তাহা অপেক্ষা কি আমরা অধিক দেখাই না ? যদি প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিকদিগের মধ্যেও এত কপটতা থাকে তবে কিরূপে পৃথিবীর পরিত্রাণ হইবে ? দেব দেব মহাদেবের নিকটে কি এমন কোন অস্ত্র নাই যদ্দ্বারা এই পর্ব্বত সমান কপটতা রাশি চূর্ণ হইতে পারে ? হে, ব্রাহ্মগণ, তোমরা বিশ্ব বিজয়ী ব্রহ্মের নিকটে কি এমন কোন ঔষধ শিক্ষা কর নাই, যাহাতে তোমরা এই ভয়ানক কপটতা, রোগ হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার,

করিতে পার ? কি অস্ত্রে, কোন্ বাণে তোমরা এই প্রকাণ্ড পাপ কপটতাকে মারিবে ? মহাদেবের নিকটে মহা অস্ত্র আছে। কপটতারূপ পাপাসুর বিনাশ করিবার জন্য তোমরা সকলে ব্যাকুল হইয়া দেবদেব মহেশ্বরের নিকট গমন কর, তিনি তোমাদিগকে সেই অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিবেন যাহাতে তোমরা নিশ্চয়ই এই অসুর সংহার করিতে পারিবে। বিষ দ্বারা বিষ নষ্ট কর। সেইরূপ কপটতা দ্বারা কপটতা বিনাশ কর; অর্থাৎ যাহারা লোককে দেখাইবার জন্য নানা প্রকার ধর্ম্মের আড়ম্বর এবং কপটাচরণ করে তাহারা তাহাদিগের বিপরীত আচরণ না দেখিলে কোন মতেই পরাস্ত হইবে না। তাহাদিগের অন্তরে প্রকৃত বৈরাগ্য নাই; কিন্তু লোকের নিকটে তাহারা বৈরাগ্যের ছদ্মবেশ ধারণ করে। ইহা অতি নীচ এবং পাপ মূলক কপটতা। ইহার বিপরীত উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম-মূলক কপটতা এই যে—যাঁহার অন্তরে ঈশ্বরের কৃপায় অকৃত্রিম বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়াছে; কিন্তু তাহা লোককে দেখাইবার জন্য ইচ্ছা পোষণ করা দূরে থাকুক বরং তাহা লোকের নিকটে গোপন করিবার জন্য বিলক্ষণ ইচ্ছা জন্মিয়াছে; এবং এই প্রবল ইচ্ছা যে সর্ব্বদর্শী অন্তর্যামী ঈশ্বর কেবল তাহার সাক্ষী হইয়া থাকুন। এই সকল পবিত্র কপটতা দ্বারাই কেবল পাপমূলক কপটতা জয় করা যায়। হে পৃথিবীর সাধু সজ্জনগণ, এই কপটতারূপ পাপাসুর সংহার করিবার জন্য আপনারা এই যুদ্ধক্ষেত্রের অপর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হউন, এই অসুরকে বিনাশ করিবার জন্য আপনারা অব্যর্থ সন্ধানে বাণ নিক্ষেপ করুন, স্বর্গীয় সাহস অবলম্বন করিয়া আপনারা গুপ্ত প্রচ্ছন্ন সদ্গুণ অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া ঐ অসুরকে বধ করুন। আপনাদিগের অন্তরে যে ঈশ্বরপ্রদত্ত জ্বলন্ত বিশ্বাস, বিবেক বৈরাগ্য প্রভৃতি স্বর্গের অমূল্য রত্ন সকল রহিয়াছে তাহা কপট হইয়া পৃথিবীর চক্ষু হইতে গোপন করিয়া রাখুন। পৃথিবীর প্রশংসারূপ বিষাক্ত বায়ু সাধুদিগের স্বর্গীয় পবিত্রতা দূষিত করে। অতএব আপনারা এই দূষিত বায়ু হইতে দূরে অবস্থিতি করুন। কোন মনুষ্যের মলিন চক্ষু যেন আপনাদিগের সাধুতা দেখিতে না পায়। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন ব্রহ্ম মন্দিরের বেদী হইতে কপট হইবার জন্য, আত্মগোপন করিবার জন্য

কেন উপদেশ হইতেছে ? যে বেদী হইতে এতদিন পূর্ব্বে সরলতা-সাধন, যোগ সাধন, ভক্তি সাধন, বিবেক বৈরাগ্য সাধন প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ে উচ্চ উচ্চ নীতি শিক্ষা করিলাম, সেই বেদী হইতে আজ কপটতা সাধনের জন্য কেন অনুরুদ্ধ হইতেছি ? তবে ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব শ্রবণ কর। হে ব্রহ্মসাধকগণ, যখন তোমরা বৈরাগীর বেশে দ্বারে দ্বারে, পথে পথে ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করিতে যাও তোমাদিগের হস্তের একতারা এবং গৈরিক বস্ত্র দর্শনে তোমাদিগকে সাধু বৈরাগী বলিয়া জগতের লোক প্রচুর প্রশংসা করিতে পারে ; কিন্তু সাবধান তোমরা লোকের প্রশংসায় বিচলিত হইও না। বাহ্যিক লক্ষণ দেখিয়া যাহারা প্রশংসা করে তাহাদিগের প্রশংসায় কিছুমাত্র নির্ভর করিও না। ইতিপূর্ব্বে এই বেদী হইতে তোমরা শুনিয়াছ পূর্ব্বকার সাধু বৈরাগীগণ বৈরাগ্যের যে সকল সুলক্ষণ দেখাইয়া গিয়াছেন তোমাদিগের পক্ষে সে সমস্ত আদরণীয় ও অবলম্বনীয়। সুতরাং তোমাদিগকে সময়ে সময়ে প্রয়োজনানুসারে ঝুলি, একতারা গৈরিক বস্ত্র প্রভৃতি গ্রহণ করিতে হইবে ; কিন্তু এ সকল গ্রহণ করিলেই শত শত লোক তোমাদিগকে 'হরিভক্ত বৈরাগী সন্ন্যাসী বলিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি করিবে, এবং তোমাদিগকে এমনই বাড়াইবে ও আদর করিবে যে তোমরা লজ্জিত হইবে। বাস্তবিক পৃথিবীর চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করা অতি সহজ। এক খণ্ড গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিলে কিম্বা একটী উপবাস করিলেই তুমি পৃথিবীর নিকটে যোগী বৈরাগী বলিয়া প্রশংসিত হইতে পার। অতএব হে ভক্তগণ, পৃথিবীর নিকটে তোমাদিগের বৈরাগ্য দেখাইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। পৃথিবীর নিকটে তোমরা প্রচ্ছন্ন থাকিলে তোমাদিগের কোন ক্ষতি নাই। তোমাদিগের পুরস্কার ঈশ্বরের নিকটে। ঈশ্বর তোমাদিগের অন্তর দেখিলেই তোমাদিগের পক্ষে যথেষ্ট। বাহ্যিক বৈরাগ্য লক্ষণ সকল দেখাইয়া কদাচ পৃথিবীর নিকটে সুখ্যাতি লাভ করিতে যেন কাহারও ইচ্ছা না হয় ; বরং পৃথিবীতে বৈরাগ্য অপ্রকাশিত থাকুক প্রত্যেক সরল বৈরাগীর যেন এই রূপ ইচ্ছা হয়। যে পৃথিবীতে অতি সামান্য কৌশলে যোগী বৈরাগী হওয়া যায় সেই পৃথিবীর প্রশংসা লাভ করিতে কি তোমাদিগের ভয় লজ্জা হয় না ? অতএব

তোমরা পৃথিবীর নিকটে আত্মগোপন করিয়া সুখ্যাতি এবং পুরস্কার লাভ করিবার জন্য কেবল ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হও। যাহারা লোকের নিকট প্রশংসা ও সুখ্যাতি অন্বেষণ করে তাহাদিগের মনে অনেক প্রকার বিকার উপস্থিত হয়। নববিধানের বৈরাগীদল, তোমরা সরল অন্তরে পৃথিবীকে জানিতে দেও যে যদিও তোমরা সময়ে সময়ে প্রাচীন বৈরাগীদিগের ন্যায় গৈরিক বস্ত্র পরিধান কর, তথাপি তোমরা তাঁহাদিগের ন্যায় উচ্চ প্রকৃতির বৈরাগী যোগী নও। অতএব যাহাতে লোকে তোমাদিগকে সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী বলিয়া প্রশংসা না করে তজ্জন্য তোমরা গৈরিক বস্ত্রের সঙ্গে এমন কিছু সংযোগ কর যাহা দেখিলে লোকের শ্রদ্ধা হ্রাস হইবে। পৃথিবীর কপট ধূর্ত্তদিগের অন্তরে কাল; কিন্তু সাধুবেশ পরিয়া বাহিরে দেখায় ভাল। হে ব্রহ্মভক্তগণ, তোমাদিগের অন্তরে থাকুক ভাল, বাহিরে লোকে দেখুক কাল। তোমরা প্রাণের ভিতরে অনুরাগ প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখ। তোমরা পৃথিবীকে বল, "হে পৃথিবী, তুমি আর আমাদিগকে ভক্ত যোগী বলিয়া আমাদিগের পায়ে পড়িও না, আর তুমি আমাদিগকে সাধু বিবেকী বৈরাগী বলিয়া বৃথা প্রশংসা করিও না, কেননা আমাদিগের চরিত্রের কত কলঙ্ক এবং কত অসাধুতা রহিয়াছে।" আত্মসংযম এবং চিত্তশুদ্ধির জন্য যদি হে ব্রাহ্মসাধক, তুমি উপবাস করিয়া থাক তবে যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া এমনই ভাবে মুখের অপ্রসন্নতা ঢাকিয়া রাখিবে যেন কেহ না জানিতে পারে যে তুমি উপবাস করিয়াছ। ঈশ্বরের জন্য অথবা ধর্ম্মজীবন লাভের জন্য কষ্ট স্বীকার করিয়া যদি লোকের মনে দয়া উৎপাদন করিবার চেষ্টা কর তবে তুমি ঈশ্বর বিশ্বাসী নহ। হে ভ্রান্ত মানব, তুমি কি তোমার বৈরাগ্য এবং ঈশ্বরানুরাগ প্রদর্শন করিয়া লোকের নিকট পুরস্কার প্রত্যাশা কর? মনুষ্য কি তোমার অন্তরের ভাব বিচার করিতে পারে? মানুষের বিচারে কি ভুল নাই, তাহার প্রশংসায় কি গরল নাই? অতএব লোকের নিকটে কদাচ আপনাকে সাধু বলিয়া পরিচয় দিতে চেষ্টা করিও না। একটু সামান্য বাহিক লক্ষণ দেখিলেই লোকে কাহাকেও শাক্যের ন্যায় বৈরাগী, কাহাকেও ঈশার ন্যায় পাপীর বন্ধু, কাহাকেও গৌরাঙ্গের ন্যায় ভক্ত মনে করে। যাহার

অন্তরে কিছুমাত্র বৈরাগ্য নাই তাহার অঙ্গে এক খণ্ড ক্ষুদ্র গৈরিক বস্ত্র দেখিলে সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী সন্ন্যাসী বলিয়া লোকে তাহার পদধূলি গ্রহণ করে। যাহার পাঁচ পয়সা সম্বল নাই লোকে তাহাকে লক্ষপতি বলে পৃথিবীর এই রীতি। হে ভ্রান্ত মানব, লোকের স্তুতি নিন্দার উপর কিছুমাত্র নির্ভর করিও না। ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য তুমি যে সকল কষ্ট বহন কর তাহা জানাইবার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া দ্বারে দ্বারে বেড়াইও না। উপবাস করিয়া গৃহের মধ্যে বসিয়া থাক যেন লোকে না জানিতে পারে যে তুমি উপবাস করিয়াছ। যাহা ঈশ্বরকে দেখাইবার সামগ্রী তাহা কদাচ লোককে দেখাইবার জন্য ইচ্ছা বা চেষ্টা করিও না। যদি ঈশ্বরের জন্য সর্ব্বত্যাগী অকিঞ্চন হইয়া থাক লোককে তাহা দেখাইবার প্রয়োজন কি? বাস্তবিক বৈরাগ্য কি বাহ্যিক চিহ্ন দ্বারা দেখান যায়? মুখের উপরে কি বৈরাগ্যের রঙ প্রতিফলিত হয়? যদি তুমি সত্য সত্যই ঈশ্বর-পরায়ণ হও তবে কি তোমার শরীর সম্পূর্ণ রূপে তোমার ঈশ্বরভক্তি দেখাইতে পারে? যদি তোমার অন্তরে যথার্থ বৈরাগ্য ও দয়া থাকে, যদি জগতের দুঃখ দেখিয়া তোমার প্রাণ কাটে তবে তাহা তুমি মানুষকে কিরূপে দেখাইবে? জগতের পাপ দূর করিবার জন্য প্রাণবন্ধু ঈশা কত দুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা কি পৃথিবীর কেহ জানে? জরা, রোগ, মৃত্যু, এবং বিষয়-বাসনা প্রভৃতি বিবিধ জ্বালা হইতে মানুষকে উদ্ধার করিবার জন্য বুদ্ধদেব দয়ালু হইয়া আপনার অন্তরে কত কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন তাহা আজ পর্য্যন্ত কেহ জানে না। তাঁহাদিগের বৈরাগ্যের সঙ্গে কি আমাদিগের বৈরাগ্যের তুলনা হইতে পারে? আমরা এক দিন নিজ হস্তে রাঁধিয়া খাইলাম, অথবা এক দিন একটী উপাদের ফল খাইলাম না, অমনি সেই ব্যাপার সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইল এবং চারিদিকে স্ত্রী পুত্র আত্মীয় কুটুম্ব প্রতিবেশী সকলে বলিয়া উঠিল, "ইহাদের কি বৈরাগ্য! ঈশ্বরের প্রতি ইহাদের কি প্রগাঢ় ভক্তি! কি গভীর অনুরাগ! হে ব্রহ্মভক্তগণ, সাবধান এসকল কথায় প্রতারিত হইও না, যখনই এই প্রকার কথা শুনিবে তৎক্ষণাৎ কাণে হাত দিবে, যদি তোমরা পৃথিবীর সুখ্যাতিতে প্রবঞ্চিত হও, তবে তোমাদের অসদৃষ্টান্তে পৃথিবীর অনেক লোক মজিবে; ভবিষ্যৎ বংশের

লোকেরা তোমাদিগের এই সহজ পথ ধরিয়া চারি পয়সার গৈরিক বস্ত্র ব্যবহার করিয়া লোকের নিকট সুখ্যাতি ক্রয় করিবে। তাহারা পৃথিবীর লোককে বলিবে তোমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে গৈরিক ব্যবহার করিতে দেখিয়া বড় শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে আমরাও সেই গৈরিক ব্যবহার করিতেছি, আমাদিগকেও তোমরা সেইরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি দেও। আমাদিগকেও তোমরা শাক্য, ঈশা, চৈতন্যসদৃশ জ্ঞান করিয়া সমাদর কর। এইরূপে বাহ্যিক লক্ষণ অবলম্বন করিয়া ভাবীবংশের লোকেরা অতি সহজে পৃথিবীকে প্রবঞ্চনা করিতে চেষ্টা করিবে, অতএব হে ব্রহ্মভক্ত, তুমি আত্ম সংগোপন কর, তুমি কোন প্রকার বাহ্যিক লক্ষণ দেখাইয়া লোকের প্রশংসা কিম্বা অনুরাগ পাইতে ইচ্ছা করিও না। তোমার যাহা দেখাইবার তাহা কেবল সর্ব্বদর্শী ঈশ্বরকে দেখাইবে। যদি তুমি মানুষের নিকট তোমার ধর্ম্মের পরিচয় দিতে চেষ্টা কর তাহা হইলে তোমার নিজের অনিষ্ট এবং জগতের অনিষ্ট হইবে। ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য, যোগানন্দরস পান করিবার জন্য তুমি কত কঠোর তপস্যা এবং কত কষ্ট স্বীকার করিয়াছ ও কত প্রকার বৈরাগ্যের ব্রত পালন করিয়াছ তাহা মানুষকে বলিয়া তোমার কি লাভ হইবে? মানুষের নিকট বৈরাগী বলিয়া পরিচিত হইবার বাসনা পোষণ করিও না, বরং তোমার বৈরাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে বিলাসের এমন কোন চিহ্ন ধারণ কর, যাহাতে লোকে বলিবে ইহারা শাক্য চৈতন্য প্রভৃতির ন্যায় বৈরাগী নহে, ইহাদিগের তেমন আন্তরিক বৈরাগ্য নাই, ইহাদিগের মনে এখনও বিষয়বাসনা বিলাসকামনা রহিয়াছে। যদিও ইহারা গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিয়াছে সত্য; কিন্তু ইহারা ভদ্রতা ও সভ্যতাও রক্ষা করিতেছে। ইহারা দীনহীন বৈষ্ণব বৈরাগীদিগের ন্যায় অসামাজিক হইতে চায় না, ইহারা শাক্য চৈতন্য প্রভৃতির ন্যায় ধর্ম্মের জন্য সংসার ছাড়িতে প্রস্তুত নহে। এইরূপে বৈরাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু সংসার ধর্ম্মের চিহ্ন রাখিবে। পাত্র অমৃতে পূর্ণ করিবে, কিন্তু তাহার সঙ্গে একটু তিক্ত রাখিবে, তাহা হইলে লোকে তোমাদিগকে প্রাচীন বৈরাগী-দিগের ন্যায় উচ্চ মনে করিবে না, বরং বিষয়ী বলিয়া নিন্দা করিবে।

লোকে তোমাদিগকে সুখ্যাতি দিবে না, কিন্তু ধর্ম্মরাজ ঈশ্বর তোমা-

দিগকে তাঁহার আপনার দরবারের মধ্যে ডাকিয়া দেবতাদিগকে বলিবেন ;—"দেখ আমার এই সাধু পুত্রগণ ভিতরে সরলতা পবিত্রতারূপ স্বর্গীয় হীরক খণ্ড গোপন করিয়া রাখিয়াছে ; কিন্তু বাহিরে ইহারা কত নিন্দা ও নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছে।" হে ভক্তগণ, তোমরা মানুষের সুখ্যাতি অখ্যাতির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না করিয়া কেবল ভগবানের প্রসন্ন মুখ দেখিয়া আপন আপন ধর্ম্ম সাধন করিয়া যাও, তোমাদিগকে আজ না জানুক হাজার হাজার বৎসর পরে পৃথিবী তোমাদিগকে চিনিতে পারিবে। তোমরা প্রাণের ভিতরে ভক্তি বৈরাগ্য প্রভৃতি স্বর্গের আতর গোলাপ লুকাইয়া রাখ, অন্তরে পুণ্য সূর্য্য প্রেমচন্দ্র লুকাইয়া রাখ। কিন্তু ঈশ্বরের এরূপ চমৎকার নিয়ম যে তোমরা যতই কেন এ সকল স্বর্গীয় সামগ্রী ঢাকিয়া রাখিতে যত্ন কর না, ইহারা আপনার বলে আপনারা প্রচারিত হইয়া পড়িবে। তোমরা যে পরিমাণে চাপা দিবে সেই পরিমাণ বেগের সহিত ইহারা বাহির হইবে। সকল প্রকার মেঘ ভেদ করিয়া তোমাদিগের অন্তরের বৈরাগ্য সূর্য্য যথা সময়ে বাহির হইবে, এবং বাহির হইয়া বলিবে যে আমি ঐ সাধুদিগের অন্তরে গোপনে ছিলাম, তাঁহারা বলপূর্ব্বক আমাকে অনুরোধ করিয়া বলিতেন, হে সূর্য্য তুমি গোপনে থাক, দেখা দিও না। এখন তাঁহারা পরলোকে গিয়াছেন তাই আমি প্রকাশিত হইয়াছি। বাস্তবিক হে ভক্তগণ, তোমরা যতই কেন চাপা দেও না তোমাদিগের অন্তরে যদি অকৃত্রিম হরিভক্তি ও বৈরাগ্য থাকে ঈশ্বর তাহা প্রকাশ করিয়া দিবেন এবং তখন পৃথিবী তোমাদিগকে মাথায় লইয়া বলিবে "ইহারাই প্রকৃত সাধু বৈরাগী, কারণ ইহাঁরা এতকাল ইহাঁদিগের সাধুতা ও বৈরাগ্য গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন।" বন্ধুগণ, তোমাদিগের বৈরাগ্য ও হরিভক্তি গোপনে রাখিয়া জন সমাজের মধ্যে থাকিয়া লোকের মনকে আস্তে আস্তে হরণ করিয়া ঈশ্বরের দিকে আকর্ষণ কর। তোমাদিগের গুপ্ত ধর্ম্মবল এবং প্রচ্ছন্ন বৈরাগ্য দ্বারা পৃথিবীর পাপমূলক কপটতাকে জয় কর।

সেবকের নিবেদন।

শব্দব্রহ্ম।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৩ শক।

শব্দব্রহ্মের তত্ত্ব শ্রবণ কর, এই তত্ত্ব সাধন কর। ব্রহ্মমুখের কথা যতক্ষণ না বিনির্গত হয় ততক্ষণ কিছুই সৃষ্ট হয় না, ততক্ষণ ব্রহ্ম সৃষ্টিশালাতে বিহার করেন না; কিন্তু ততক্ষণ তিনি নির্লিপ্ত, স্বতন্ত্র ভাবে আপনার মহিমাতে আপনি বিরাজ করেন। সর্ব্বগুণময় ঈশ্বর সৃষ্টির পূর্ব্বে নির্গুণ ব্রহ্মরূপে আপনার মধ্যে আপনি বাস করিতেন। যতক্ষণ ব্রহ্মের কথা ব্রহ্মের মধ্যে গোপনে রহিল ততক্ষণ সৃষ্টি হইল না, ব্রহ্মাণ্ড রচিত হইল না, চন্দ্র সূর্য্য, সাগর পর্ব্বত জীব জন্তু প্রভৃতি কিছুই সৃষ্ট হইল না। অণ্ডের মধ্যে যেমন ভাবী পক্ষী লুক্কায়িত থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মকথা প্রকাশের পূর্ব্বে ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মবক্ষে লুক্কায়িত ছিল। যে মুহূর্ত্তে ব্রহ্ম কথা বলিলেন, তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইল। ব্রহ্ম বলিলেন 'হও ব্রহ্মাণ্ড'। এই ব্রহ্মবাণী গম্ভীর নিনাদে অনন্ত আকাশকে কাঁপাইল এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে সারি গাঁথা জগতের পর জগৎ, জ্যোতিষ্কের পর জ্যোতিষ্ক, শোভার পর শোভা রচিত হইল এবং উৎকৃষ্ট নিয়ম সকল প্রতিষ্ঠিত হইল। সমুদয় সৃষ্টির মূল কারণ ব্রহ্মকথা। ব্রহ্মবাক্য যতক্ষণ ব্রহ্মমুখে ছিল ততক্ষণ সৃষ্টি হয় নাই। ততক্ষণ সমস্ত সৃষ্টি ব্রহ্ম বক্ষে নিদ্রিত ছিল। তখন কোথায় ছিল চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি? কোথায় ছিলেন ঈশা, মুসা শাক্য, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি সাধুগণ? কোথায় ছিল বেদ বেদান্ত? কোথায় ছিল বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ? তখন কিছুই হয় নাই, এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই ছিল

না। 'না ছিল এ সব কিছু আঁধার ছিল অতি ঘোর দিগন্ত প্রসারী, ইচ্ছা হইল তব ভানু বিরাজিল, জয় জয় মহিমা তোমারি।' ব্রহ্ম কথার অভাবে সমুদয় অপ্রকাশিত ছিল। এই অপ্রকাশের হেতু কি? হেতু এই মাত্র যে তখন ব্রহ্মমুখের শব্দ অথবা সৃজনের ইচ্ছা বাহির হয় নাই। পরে যখনই ব্রহ্মশব্দ বাহির হইল, যখনই ব্রহ্ম বলিলেন 'জগৎ, এস, আলোক, এস' তৎক্ষণাৎ আকাশের ভিতর হইতে প্রকাণ্ড জগৎ উৎপন্ন হইল, নানা দিকে জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইল, দিক্ নিরূপিত হইল। সৃষ্টির পূর্ব্বে এত কাল অসীম আকাশে পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ প্রভৃতি দিক্ ছিল না। সূর্য্য প্রকাশে দিক্ নিরূপিত হইল। যখনই ব্রহ্মবাণী বিনিঃসৃত হয় অমনি সমুদয় প্রয়োজনীয় বিষয়ের উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মবাণী নিঃসরণের পূর্ব্বে যেন সমস্ত কাল নিদ্রায় অচেতন ছিল, কোথাও কোন প্রকার চৈতন্য অথবা জীবনের চিহ্ন ছিল না। যখন ব্রহ্ম হুঙ্কার করিয়া বলিলেন 'ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হও।' তখনই দশ দিকে আশ্চর্য্য জীবনের চিহ্ন সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। ব্রহ্মকথা বিনা কিছুই জন্মে না, কোন বস্তুর প্রকাশ হইতে পারে না। ব্রহ্ম কথা প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তু এবং প্রত্যেক সৃষ্ট জীবের আদিকারণ। এই ব্রহ্মকথা কি? ইহা কোন প্রকার প্রাকৃত শব্দ নহে; কিন্তু ইহা ব্রহ্মের শক্তি, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মপ্রেম, ব্রহ্মের ইচ্ছা। তাঁহার এই গূঢ় শক্তি, জ্ঞান, প্রেম এবং ইচ্ছা প্রভাবে তিনি এই বিচিত্র সৃষ্টি লীলা প্রকাশ করেন। তাঁহার এ সকল গুণ নিত্য, অনাদি অনন্ত। তাঁহার কোন গুণের আদি কিম্বা অন্ত নাই। কেবল দেশ ও কালভেদে নানা প্রকারে এ সকল গুণ প্রকাশিত হয়। এ সকল প্রকাশিত গুণ দেখিয়া কবি, সুলেখক এবং সাধু মহাজনেরা বেদ বেদান্ত, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি রচনা করেন। এ সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রের আদি আছে; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান অথবা ব্রহ্মবেদের আদি নাই। ব্রহ্মবেদ, ব্রহ্মজ্ঞান অনাদি নিত্য। ব্রহ্ম নিজেই বেদ, তাঁহার মুখ হইতে যে জ্ঞানগর্ভ অশব্দ শব্দ উচ্চারিত হয়, সে সকল শব্দ শুনিয়া যাঁহারা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন তাঁহারাই বেদ লিপিকর। যতদিন ব্রহ্মবাণী ব্রহ্ম মুখে থাকে ততদিন বেদ অব্যক্ত অথবা অনিঃসৃত থাকে। ঈশা, মুশা, মহম্মদ, গৌরাঙ্গ, শাক্যসিংহ প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষেরা

পৃথিবীতে আসিবার পূর্ব্বে ব্রহ্মের বক্ষে নিদ্রিত ছিলেন; সুতরাং যদিও তাঁহাদের প্রকাশের আদি আছে; কিন্তু তাঁহারা অনাদি। তাঁহারা এক এক জন ব্রহ্মের যে সকল বিচিত্র স্বরূপ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের অবতরণের আগে কি ব্রহ্মেতে সে সকল গুণ ছিল না? ব্রহ্মের প্রত্যেক স্বরূপ ও গুণ নিত্য, অনাদি ও অনন্ত। সাধু মহাজনেরা আসিয়া সে সকল বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রকাশ করেন। সাধুদিগের অবতরণের এবং ঐ গুণ সমুদায় প্রকাশের আদি আছে; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান কিম্বা ব্রহ্মের অন্যান্য গুণের আদি নাই। ব্যক্তব্রহ্ম বেদ, ব্যক্তব্রহ্ম পুরাণ, ব্যক্তব্রহ্ম বাইবেল, ব্যক্তব্রহ্ম ব্রহ্মের মহর্ষি ও যোগী জীবন। কিন্তু সাধুদিগের অবতরণের পূর্ব্বে তাঁহারা ব্রহ্মের মধ্যে অব্যক্ত ভক্তরূপে এবং অব্যক্ত সাধুগুণ রাশিরূপে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ধর্ম্মগ্রন্থাদি লিখিত হইবার পূর্ব্বে সেই গ্রন্থোক্ত সত্য সকল ব্রহ্মের বক্ষে বীজরূপে, অকথিত বাক্যরূপে স্থিতি করিতেছিল। সুতরাং একদিকে সাধু এবং ধর্ম্ম গ্রন্থাদির আদি আছে এবং আর এক ভাবে আদি নাই। যখন অকথিত কথারূপে, অব্যক্ত সত্যরূপে সাধু এবং ধর্ম্ম গ্রন্থ সকল ব্রহ্মেতে স্থিতি করে তখন তাহাদের আদি নাই। এইজন্য উক্ত হইয়াছে ব্রহ্ম কথা মনুষ্যের আকার ধারণ করিল; কথা ব্রহ্মের সঙ্গে ছিল এবং কথাই ব্রহ্ম। তাঁহার শক্তি, তাঁহার ইচ্ছাই তাঁহার কথা। যাহা কিছু হইয়াছে, যাহা কিছু হইতেছে এবং যাহা কিছু হইবে সমস্ত ব্যাপারের বীজ দৈব শব্দ। ব্রহ্মের কথা ভিন্ন কিছুই হয় না; কিছুই হইতে পারে না। এই যে বঙ্গদেশে বর্ত্তমান শতাব্দীতে নববিধান প্রকাশিত হইতেছে ইহা তাঁহার কথার ফল। এই নববিধান অব্যক্তরূপে তাঁহার বক্ষে গোপনে ছিল। তাঁহারই কথাতে ইহা জীবোদ্ধারের জন্য যথা সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার অনন্ত বক্ষের মধ্যে আরও কত বিধান প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে কে জানে? গম্ভীর বিরাট পুরুষ ব্রহ্মের ভিতরে বড় বড় হিমালয় সমান প্রকাণ্ড কথা, অকূল অতলস্পর্শ সাগরস্বরূপ কথা সকল রহিয়াছে। অনন্ত কাল আমাদের সম্মুখে প্রসারিত, এখনও তাঁহার মুখ হইতে কত কথা বাহির হইবে কে জানে? শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া যাইবে আর ব্রহ্মের মুখ হইতে এক এক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নূতন অপূর্ব্ব কথা

বাহির হইবে। এক এক যুগ চলিয়া যাইবে, আর ব্রহ্মকথাতে এক এক বিধান পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবে। যুগে যুগে এক এক প্রকাণ্ড বীর পুরুষ ব্রহ্মশব্দ হইতে উৎপন্ন হইবে। অনন্ত গুণশালী বিচিত্র ঈশ্বরের কত শক্তি, কত জ্ঞান, কত প্রেম, কত পুণ্য, কত সুখ শান্তি, তাহা কে ভাবিতে পারে? ভবিষ্যতে তিনি কত নূতন লীলা প্রকাশ করিবেন, কত আশ্চর্য্য ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন তাহা কে কল্পনা করিতে পারে? এক এক প্রকাণ্ড ধর্ম্ম বিধান তাঁহার এক এক বিস্ময়কর শক্তির পরিচয় দিতেছে। সর্ব্বশক্তিমানের শক্তিতে অথবা কথাতে এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড বিধৃত রহিয়াছে। তাঁহার কথা, অথবা তাঁহার শক্তি এবং তাঁহাতে কোন প্রভেদ নাই। যিনি কথা, তিনিই শক্তি, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই ভক্তদিগের আরাধিত হরি, তিনিই নববিধানের জননী। হে ভক্তগণ, তোমরা যাঁহাকে ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া কোমল ভাবে জগজ্জননী বলিলে তিনিই অনাদি অনন্ত কথা, তিনিই অশব্দ শব্দ স্বরূপ। ব্রাহ্মসমাজে এত দিন শব্দের মহিমা বিবৃত হয় নাই। এই শব্দ-ব্রহ্মের কাছে আমাদিগকে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইবে। ব্রহ্মের এক শব্দ এই বাহিরের সুবিশাল বিশ্বমন্দির রচনা করিয়াছে, তাঁহার আর এক শব্দ অধ্যাত্ম-জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহারই এক এক গম্ভীর নিনাদে জগতের নাস্তিকতা ও পাপ অন্ধকার দূর করিবার জন্য এক এক ধর্ম্মবিধান রূপ তেজোময় সূর্য্য গঠিত ও প্রকাশিত হইতেছে। যেমন সৃষ্টির পূর্ব্বে চারিদিকে ঘোরান্ধকার ছিল এবং কোথাও কিছু ছিল না, পরে যখনই ব্রহ্ম হুঙ্কার করিয়া বলিলেন "চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহ তারাপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড, এস।" তৎক্ষণাৎ বিস্তীর্ণ ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হইল। সেইরূপ বঙ্গ দেশের মানসিক আকাশ ঘোর অবিদ্যা অধর্ম্ম এবং অসত্যের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। সেই অন্ধকার দূর করিবার জন্য ব্রহ্ম মুখ হইতে গভীর শব্দ নিনাদিত হইল "নববিধান হউক!" আর সেই শব্দে নববিধানের জন্ম হইল। বঙ্গদেশের পাপ দুঃখ এবং ভ্রম কুসংস্কার দেখিয়া স্বয়ং প্রভু ভগবান্ ব্রহ্ম তাঁহার সমস্ত সাধু সন্তানদিগকে সঙ্গে লইয়া নববিধান রূপে প্রকাশিত হইলেন। যেমন প্রবল বায়ু সম্মুখে যাহা কিছু পায় তাহা ভয়ানক রূপে আন্দোলিত করিয়া শোঁ শোঁ করিয়া নক্ষত্র বেগে চলিয়া যায়,

সেইরূপ ব্রহ্মের বিশেষ কৃপাপবন নববিধান রূপে বঙ্গ দেশের মস্তকের উপর দিয়া শোঁ শোঁ। করিয়া চলিয়া যাইতেছে, ইহার বেগে পর্ব্বত সমান বাধা বিঘ্ন সকল চূর্ণ হইয়া যাইতেছে. শত শত বৎসরের সঞ্চিত ভ্রম, কুসংস্কার, কুপ্রথা, অধর্ম্ম, অনাচার, পাপ জঞ্জাল প্রভৃতি একেবারে উড়িয়া যাইতেছে। ইহা সাধারণ ব্যাপার নহে। নববিধান ব্রহ্মের এক প্রকাণ্ড শব্দ। এই প্রকাণ্ড শব্দের মধ্যে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দ লুক্কায়িত রহিয়াছে। এই প্রকাণ্ড নববিধান পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম্মবিধানের সামঞ্জস্য ও সমষ্টি। ইহাতে যোগভক্তি জ্ঞান কর্ম্ম সমুদয় ভাবের সমন্বয় হইয়াছে। যেমন মধুর বীণাযন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন সংযুক্ত তারের সমষ্টি, সেই রূপ এই নববিধান ও নানা প্রকার সুমিষ্ট ব্রহ্ম শব্দের লীলা। ইহাতে বিশ্বগুরুব্রহ্ম তাঁহার শিষ্য সাধকদিগের কর্ণে বিবেক, বৈরাগ্য, যোগ, ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম্ম প্রভৃতি নানা প্রকার মন্ত্র দান করিতেছেন। স্বর্গের গুরু কখনও তাঁহার সাধককে বলিতেছেন "বৎস, তুমি ঐ বৃক্ষতলে বসিয়া তোমার অগ্রজ শাক্য মুনির ন্যায় সকল প্রকার আসক্তি ও বিষয় বাসনা নির্ব্বাণ করিয়া শান্তি ভোগ কর." সেই সাধক-কেই আবার অন্য সময় বলিতেছেন "হে যোগ শিক্ষার্থী, তুমি এখন কিছুকাল ভক্তি সাধন কর, যাহাতে তোমার হৃদয় সরস এবং কোমল হয় তজ্জন্য তুমি বিশেষরূপে যত্ন কর, কেবল নির্ব্বাণ ও বৈরাগ্য সাধন করিলে হইবে না, এতদিন আমার গম্ভীর যোগেশ্বর মূর্ত্তি দেখিলে এখন আমার ভক্তবৎসল প্রেমস্বরূপ দর্শন কর, জগতের প্রতি আমার প্রেম দেখিয়া মোহিত হও, কৃতজ্ঞ হও এবং ভক্তিরসে আর্দ্র হও।" এইরূপে শব্দব্রহ্ম কখনও যোগীকে ভক্ত হইতে বলিতেছেন কখনও ভক্তকে যোগী হইতে বলিতেছেন, কখনও জ্ঞানীকে কর্ম্মী হইতে বলিতেছেন, কখনও কর্ম্মীকে জ্ঞানী হইতে বলিতেছেন এবং এই নববিধানে তিনি বিশেষরূপে প্রতি জনকে আপনার জীবনে যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্ম এই সমুদায়ের সামঞ্জস্য করিতে বলিতেছেন। যাহাদিগের অন্তর্জ্জগৎ শূন্য ছিল ব্রহ্মের এক এক শব্দে তাহাদিগের সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন মনের মধ্যে আশ্চর্য্য সত্যরাজ্য, যোগরাজ্য, প্রেমরাজ্য, পুণ্যরাজ্য এবং শান্তি রাজ্য প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত

হইতে লাগিল। ব্রহ্মের এক এক হুঙ্কার ধ্বনি আসিয়া একদিকে যেমন জীবের কল্পিত পাপরাজ্য এবং সকল প্রকার আসক্তির বন্ধন খণ্ড খণ্ড করে, অন্যদিকে তাহার পরিবর্ত্তে পুণ্যরাজ্য এবং শান্তিরাজ্য দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত করে। ব্রহ্মবাণীর তেজে যখনই সাধকের হৃদয় হইতে ভ্রম ও পাপের অন্ধকার তিরোহিত হইল, তখনই কোটি কোটি স্বর্গের নক্ষত্র তাঁহার পাপপ্রমুক্ত অন্তরে আপনাদিগের দিব্য জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে লাগিল; এবং তখনই সাধক ঈশ্বরের আলোকে অন্তরে শত শত যোগী ঋষিদিগের আশ্রম এবং সাধু ভক্তদিগের প্রেম নিকেতন দেখিতে পাই-লেন। ব্রহ্মবাণীতে এইরূপে জীবের পরিত্রাণ হয়। ব্রহ্মবাণী ভিন্ন জীবোদ্ধারের অন্য উপায় নাই। ব্রহ্মবাণীর মৃত সঞ্জীবনী শক্তিতে অচে-তন মৃতপ্রায় আত্মা নব জীবন লাভ করে, নিতান্ত বিকৃত হৃদয় সংশো-ধিত ও পরিবর্ত্তিত হয়। এই ব্রহ্মবাণী এক এক মহাসাধককে এবং এক এক প্রকাণ্ড জাতিকে অসত্য হইতে সত্যেতে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে, এবং মৃত্যু হইতে অমৃতেতে লইয়া যায়। ব্রহ্মবাণী ভিন্ন স্বর্গে যাইবার, সত্য লোকে যাইবার অন্য পথ নাই। ব্রহ্মের এক এক প্রকাণ্ড হুঙ্কার ধ্বনি আসিয়া নিদ্রিত পাপীকে জাগ্রৎ করে। সেই যে প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, যোহন, দেশে দেশে বলিয়া বেড়াইতেন "অনুতাপ কর, স্বর্গরাজ্য নিকটবর্ত্তী" সেই যোহনের কথার মধ্যে ব্রহ্ম শব্দ লুক্কায়িত ছিল। এখনও সেই একপুরাতনব্রহ্ম প্রত্যেক পাপীকে বলি-তেছেন "অনুতাপ কর।" অনবরত ব্রহ্মের এই শব্দ উচ্চারিত হইতেছে, যখনই পাপী নিদ্রায় অচেতন হয় তখনই সেই শব্দ তাহার মাথার কেশ ধরিয়া তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করে। "পাপী, অনুতাপ কর।" ব্রহ্মের প্রমুখাৎ যখনই পাপী এই কথা শুনিল তখনই তাহার শরীর মন জাগিয়া উঠিল; এবং তাহার অন্তরের গূঢ়তম স্থানে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল, তাহার অন্ধকারময় হৃদয়ের মধ্যে নূতন আলোক, নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। এই যে বিস্তীর্ণ সৃষ্টির ব্যাপার দেখিতেছি ইহা ব্রহ্ম শব্দের কীর্ত্তি। সৃষ্টির আদিতেও এই শব্দ ছিল, এই ঊনবিংশ শতাব্দীতেও এই শব্দ নানা দেশে নানাবিধ ব্যাপার সম্পা-

দন করিতেছে। অতএব হে ব্রহ্মভক্ত, তোমাকে বিনীত ভাবে বলিতেছি, তুমি শব্দকে অবহেলা করিও না, শব্দকে ব্রহ্ম মনে করিয়া শব্দের যথোপযুক্ত সমাদর কর। এই শব্দ হইতে জগৎ জীব, তন্ত্র মন্ত্র, বিধি বিধান, ধন ধান্য, গতি মুক্তি সমস্ত বাহির হইতেছে। ব্রহ্মমুখ হইতে শব্দ বাহির হইল। সেই শব্দ একটী প্রকাণ্ড তেজ রূপে গড়াইতে গড়াইতে অসীম আকাশে বিস্তৃত হইয়া অসংখ্য অগণ্য রাজ্য স্থাপিত করিল, বিচিত্র অদ্ভুত পদার্থ সকল রচনা করিল, নানা প্রকার জীব জন্তু সৃষ্টি করিল, এবং সেই শব্দ এখনও আপনার কার্য্য করিতেছে। সেই শব্দের বিশ্রাম নাই। সেই শব্দ যেমন সকলকে সৃষ্টি করিয়াছে, তেমনি তাহা সকলকে রক্ষা করিতেছে। এই শব্দ যেখানে যাহা আবশ্যক সেখানে তাহাই স্থাপন করিয়াছে। এই শব্দই এখানে সূর্য্য, ওখানে চন্দ্র; এখানে পর্ব্বত ওখানে সমুদ্র; এখানে যোগী, ওখানে ভক্ত; এখানে পুরুষ, ওখানে স্ত্রী; এখানে শাক্য গৌর; ওখানে মুসা ঈশা; এখানে বেদ পুরাণ; ওখানে বাইবেল কোরাণ প্রভৃতি প্রয়োজন অনুসারে প্রয়োজনীয় বস্তু সকল যথাস্থানে স্থাপন করিয়াছে। হে ব্রহ্মশব্দ, ধন্য তুমি! কেন না 'এই বিশ্ব মাঝে, যেথানে যা সাজে, তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ।' একই ব্রহ্মশব্দ অভাব অনুসারে নানা স্থানে ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিচিত্র রূপে প্রকাশিত হইতেছে। এই নিঃশব্দ শব্দ তোমার আমার সকলের কাছে আসিতেছে। এই ব্রহ্মশব্দ জীবের অবস্থা ভেদে কখনও বিশ্ব রাজের মুখবিনিঃসৃত গম্ভীর অনুজ্ঞারূপে, কখন স্নেহময়ী জগজ্জননীর মুখ বিনিঃসৃত সুমিষ্ট বচনরূপে প্রকাশিত হইতেছে। এই শব্দ কাহাকেও গম্ভীর ধ্বনিতে বলিতেছে, "রে মূঢ় পাপাচারী, পাপাসক্তি ছাড়্, অনুতাপ কর্, কুসঙ্গ ছাড়িয়া সৎসঙ্গ কর্, সংসারের দাসত্ব ছাড়িয়া ব্রহ্ম পূজা ব্রহ্ম সেবায় নিযুক্ত হও।" এই শব্দ কাহাকেও বলিতেছে "স্ত্রী পরিবার রাজত্ব ঐশ্বর্য্যসর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া কিছু কাল গহন কাননে বৃক্ষতলে বসিয়া ঘোর তপস্যা ও ধ্যান সমাধি সাধন কর।" এই জীবন্ত শব্দ আর এক জনকে বলিতেছে "হে প্রমত্ত প্রেমিক, গৃহ পরিবার ছাড়িয়া তুমি প্রেমোন্মত্ত হইয়া দেশ দেশান্তরে হরিনাম প্রচার

কর।" এই তেজোময় শব্দ আর এক জনকে বলিতেছে "বৎস, তুমি পিতা মাতা ভাই বন্ধু সকলের স্নেহ বন্ধন ছেদন করিয়া নববিধানের শরণাগত হও।" এই জ্বলন্ত অগ্নিময় শব্দ তোমাকে আমাকে বলিতেছে "ঈশার ন্যায় ব্রহ্মসর্ব্বস্ব হও, শাক্যসিংহের ন্যায় বৈরাগী হও, মহম্মদের ন্যায় দুর্জ্জয় বিশ্বাসী হও, গৌরাঙ্গের ন্যায় প্রমত্ত প্রেমিক হও, প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের ন্যায় যোগ ধ্যানপরায়ণ হও ও জনকের ন্যায় ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হও।" বাস্তবিক যেমন নামেতে ব্রহ্মেতে অভেদ তেমনি শব্দেতে এবং তাঁহাতে অভেদ। যিনি ব্রহ্ম তিনিই শব্দ। তিনি এবং শব্দ এক। ঐ আকাশে যমন মেঘ গর্জ্জন করিতেছে, তেমনি চিদাকাশে নিঃশব্দভাবে ব্রহ্ম ডাকিতেছেন। হে নববিধানের সাধকগণ, ঐ শুন ঘোর বজ্রধ্বনিতে ব্রহ্মশব্দ আসিতেছে, ঐ শব্দ কখন কাহাকে কি বলিবে কেহ জানে না। ঐ শব্দ শুনিয়া জীবন পথে চলিবার জন্য সকলে প্রস্তুত হও। ঐ শব্দানুসারে না চলিলে কেহই স্বর্গের দিকে ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে না। ঐ শব্দ আমাদের প্রতি জনের জীবন দাতা এবং ঐ শব্দ আমাদের প্রত্যেকের অনন্ত জীবনের হেতু। ঐ শব্দ অগ্রাহ্য করিয়া কেহই অমরত্বের অধিকারী হইতে পারে না। এস আমরা সকলে নিজের ইচ্ছা অথবা নিজের কথা পরিহার করিয়া ঐ ব্রহ্ম বাক্যের অনুসরণ করি; নিজের বুদ্ধি ছাড়িয়া ব্রহ্মজ্ঞানালোক দেখিয়া চলি। হে শব্দব্রহ্ম, হে বাণীব্রহ্ম, পৃথিবীতে তোমার জয় হউক! চারিদিকে তোমার রাজ্য বিস্তৃত হউক!

সেবকের নিবেদন।

মন্ত্র এবং ব্রত।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৩ শক।

যে রাজ্যে শব্দপূজা হয়, যে রাজ্যে অশব্দ ঈশ্বর শব্দব্রহ্মরূপে অর্চ্চিত হন সেই রাজ্যে মন্ত্র এবং ব্রতের অত্যন্ত আদর। শব্দকে যাহারা বিদ্রূপ ও পরিহাস করে তাহারা স্বেচ্ছাচারী হইয়া আপন ইচ্ছাতে ধর্ম্মসাধন করে। যেখানে শব্দব্রহ্মের আদর, যেখানে ব্রহ্মশব্দ অথবা ব্রহ্মের আদেশের প্রতি অনুরাগ সেখানে নিয়ম, ব্রত, মন্ত্র এবং সাধন প্রণালীর প্রাদুর্ভাব। যেখানে শব্দশ্রবণ নাই, যেখানে প্রভুর আদেশের প্রতি নির্ভর নাই সেখানে লোকেরা আপন ইচ্ছানুসারে, আপন বুদ্ধিমত আপনাদিগের চরিত্র ও ধর্ম্ম জীবন গঠন করে। তাহারা স্পষ্টরূপে ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পায় না, ঈশ্বরবাণী শুনিতে পায় না, তাহারা মনে করে তাহারা আপনাদিগের ইচ্ছানুযায়ী ধর্ম্মসাধন দ্বারা পবিত্র হইবে ও পরিত্রাণ লাভ করিবে। ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে তাহারা আপনাদিগকে আপনাদিগের পরিত্রাতা পদে প্রতিষ্ঠিত করে। তাহারা ঈশ্বরবাণীর অপেক্ষা করে না। কিন্তু এই জ্ঞান, এই স্বেচ্ছাচার জীবের আধ্যাত্মিক মৃত্যুর কারণ। তোমরা ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছ ব্রহ্মশব্দ যেমন আমাদিগের স্রষ্টা ও জীবন দাতা তেমনই ইহা আমাদিগের অনন্ত জীবনের হেতু। সুতরাং এই ব্রহ্মশব্দ শ্রবণ এবং সাধন ভিন্ন কেহই প্রকৃতরূপে অমৃতত্ব আস্বাদন করিতে পারে না। যাহারা এই ব্রহ্মশব্দ না শুনিয়া আপনার ইচ্ছানুসারে ধর্ম্মসাধন কিম্বা কঠোর তপস্যাও করে তাহারা আত্মার প্রকৃত জীবন ভোগ করিতে

পাবে না। কেননা ব্রহ্মশব্দ সৃষ্ট আত্মার পক্ষে একমাত্র অমৃত এবং পূর্ণ জীবন। যাহারা সেই অমৃত পান করিল না তাহারা কিরূপে প্রকৃত জীবন লাভ করিবে ? অতএব হে মানব, যদি তুমি যথার্থ ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়াছ বিশ্বাস কর তবে তোমার জীবনের প্রত্যেক ক্রিয়াতে দেখাও যে ব্রহ্মশব্দ তোমাকে পরিচালিত করিয়াছে। হইলেই বা তুমি ব্রহ্মজ্ঞানী; কিন্তু তুমি যে ব্রহ্মবাণী দ্বারা পরিচালিত তাহার প্রমাণ কি ? তোমার তন্ত্র, মন্ত্র, বেদ কি ? ঈশ্বর মুখের বাণী কি তোমার বেদ ? না তুমি আপনার বুদ্ধি অনুসারে কতকগুলি শ্লোক রচনা করিয়া বলিতেছ এই আমার ধর্ম্মশাস্ত্র এই আমার তন্ত্র মন্ত্র এই আমার বেদ পুরাণ ? তোমার শাস্ত্রের প্রমাণ কি ? হে ব্রহ্মজ্ঞানাভিমানী, যদি তোমার শাস্ত্র, ব্রহ্মোপাসনা এবং রীতি নীতি, ও আচার ব্যবহার ব্রহ্মশব্দ দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত না হয় তবে তোমার ধর্ম্মকে স্পর্শ করা উচিত নহে। এই নিত্য জীবন্ত ঈশ্বরের নববিধানের সময় তোমার আমার ধর্ম্মকে অথবা মানুষের বুদ্ধিরচিত ধর্ম্মকে আমরা বড় মনে করিতে পারি না। আমরা ব্রহ্মের নিত্য প্রত্যাদেশের পক্ষপাতী, আমরা আদেশ বাদী, আমরা ব্রহ্মশব্দ বিশ্বাসী। যাহাতে ব্রহ্মবাণীর প্রমাণ নাই তাহাকে আমরা কদাচ সত্যধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। যে শব্দ ঘোরান্ধকার মধ্যে বিস্তীর্ণ ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিল, যে শব্দ ডুবরি হইয়া অকূল অতলস্পর্শ অনন্ত আকাশসমুদ্রের ভিতর হইতে চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি মহারত্ন সকল উদ্ধার করিল, যে শব্দ তোমাকে আমাকে এবং সকলকে জীবন, জ্ঞান, পুণ্য শান্তি দান করিতেছে, দেখাও হে ব্রহ্মভক্ত, যে সেই শব্দ তোমাকে আজ প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত তোমার সমুদয় কার্য্যে পরিচালিত করিতেছে। দেখাও যে তোমার সমুদয় চিন্তা, সমুদয় বাক্য, সমুদয় কার্য্য সেই ব্রহ্মশব্দের অনুসরণ করিতেছে। দেখাও যে তোমার উচ্চারিত প্রত্যেক হলবর্ণ ও স্বরবর্ণ ব্রহ্মশব্দ। যেখানে ব্রহ্মশব্দ আসিয়া উপস্থিত সেখানে মানুষ নীরব, সেখানে জীবের মৌনাবলম্বনই ধর্ম্ম। যেখানে ব্রহ্মের ঝড় বহিতেছে সেখানে আর মানুষের বক্তৃতা নাই। স্বয়ং ব্রহ্ম ভক্তের হৃদয় মধ্যে থাকিয়া কথা বলিতেছেন, উপদেশ দিতেছেন, আর সহস্রাধিক শ্রোতা শ্রবণ করিতেছে। প্রণালী কি ? ভক্তের

রসনা। ভক্ত নিজে চুপ স্থির একেবারে নিঃশব্দ থাকেন। হে ব্রহ্মসাধক, তুমি নিজে যত নীরব হইবে ততই তোমার হৃদয় ও রসনাকে যন্ত্র করিয়া ব্রহ্ম কথা কহিবেন। হে বক্তা, যখনই তুমি আপনার মত চালাইতে যাইবে তখনই ব্রহ্মবাণী বন্ধ হইবে। যিনি প্রকৃতরূপে ব্রহ্মশব্দকে জানেন, ব্রহ্মশব্দের আদর করেন, তিনি নিজে একটী ক্ষুদ্র বর্ণও উচ্চারণ করেন না। ব্রহ্মশব্দ হইতেছে, ব্রহ্মঝড় বহিতেছে তাহার ভিতরে যদি কেহ একটী "ক" উচ্চারণ করে তৎক্ষণাৎ সেই ব্রহ্মশব্দস্রোত অবরুদ্ধ হইবে। হে অনুতপ্ত পাপী, ব্রহ্মশব্দ রূপ ঝড় আসিয়া তোমার সমস্ত জীবনের অপবিত্রতা উড়াইয়া লইয়া যাইতেছিল, এমন সময় তুমি হঠাৎ কেন আপনার কথা বলিয়া ফেলিলে, যদি বাঁচিতে চাও তবে মৌনী হইয়া আবার অনুতাপ কর। যখন ব্রহ্ম কথা কহিতে থাকেন তখন কোন ভক্ত নিজে কথা কহেন না, ভক্ত চুপ করিয়া থাকেন। ভক্তের হৃদয়ে যখনই প্রত্যাদেশ বায়ু বহিতে থাকে, ভক্ত তখনই স্বর্গের ইঙ্গিত বুঝিতে পারেন; ব্রহ্মবাণীর বাতাস উঠিল, বক্তার মুখে আর কথা নাই। যখন ব্রহ্মশব্দ রূপ পবন বহিতে লাগিল তখন ভক্ত বলিলেন "হে শব্দ, তব পাদপদ্মে আমার এই রসনা উৎসর্গিত হইল।" যখনই ভক্ত ঈশ্বরের হস্তে আপনার রসনা উৎসর্গ করিলেন তৎক্ষণাৎ মৃত জড় রসনা ভয়ানক দ্রুতগামী অশ্বের ন্যায় দৌড়িতে লাগিল, এবং নূতন নূতন জীবন্ত সত্য সকল বলিতে লাগিল। শব্দব্রহ্ম, চিন্ময়ী বাগ্দেবী সরস্বতী স্বয়ং ভক্তের রসনায় আবির্ভূত। যখন ভক্তের রসনায় ব্রহ্মশব্দ নির্গত হয়, সেই শব্দের তেজ মৃত ব্যক্তিকে নবজীবন দান করে, অসাধুকে সাধু করে। বিকৃত মানব সমাজকে শাসন ও সংশোধন করিবার জন্য ভক্তের মুখ দিয়া ব্রহ্মশব্দ বিনির্গত হয়। এই শব্দকে অবহেলা করিয়া কেহই শান্তি লাভ করিতে পারে না। এই শব্দ যদি ঘোর দ্বিপ্রহর রজনীতে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী রাজাকে বলে, "হে রাজন্, তুমি স্ত্রী পুত্র, এবং সমস্ত রাজ্য ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া এক বৎসর কাল কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হও।" সেই রাজাকে তৎক্ষণাৎ ঐ শব্দের অনুগত হইতে হইবে। ব্রহ্ম শব্দের বিশ্রাম নাই, নিরন্তর ব্রহ্ম মুখ হইতে তাঁহার প্রেমধ্বনি উঠিতেছে, কেবল তাঁহার অনুরাগী ভক্তগণ সেই

ধ্বনি শুনিতে পান। "বাজে ভেরী অনাহত শুনে প্রেমিক যে জন।" প্রেমিকেরা ব্রহ্মের আহ্বান, ব্রহ্মের ডাক অথবা ব্রহ্মবাণী শুনিয়া আপন আপন নির্দ্দিষ্ট জীবন পথে চলিতেছেন। সর্ব্বান্তঃকরণে অনুরাগী না হইলে কেহ এই ব্রহ্মশব্দ শ্রবণ ও সাধন করিতে পারে না। যেমন আকাশে মেঘ ঘনীভূত হইয়া শিলা বৃষ্টি অথবা হিমানী খণ্ডের আকার ধারণ করে, সেইরূপ ব্রহ্মবাণী ভক্তের চিদাকাশে ঘনীভূত হইয়া এক একটী মন্ত্রের আকার ধারণ করে। ব্রহ্ম যে সাধককে তাঁহার সত্ত্বা সাধন ব্রতে ব্রতী করিবেন মনে করেন, তাহার বিশ্বাস কর্ণে তিনি "আমি আছি" এই গম্ভীর মন্ত্র প্রদান করেন। অল্প বিশ্বাসী এবং ক্ষীণ বিবেকী ব্রহ্ম-বাণী শুনিতে পায় না, তাহার নিকটে শব্দের আদর নাই। সে মনে করে শব্দ অথবা মন্ত্রের শক্তিতে বিশ্বাস করা কুসংস্কার। আমরা নববিধানা-শ্রিত হইয়া বলিতেছি শব্দই মুক্তির হেতু। "আমি আছি" যিনি বলিতেছেন তিনি স্বয়ং ব্রহ্ম। "আমি আছি" এই গম্ভীর শব্দ ব্রহ্মমুখ বিনিঃ-সৃত মন্ত্র। ব্রহ্ম মুখের বাণী অথবা ব্রহ্মমুখ-বিনিঃসৃত মন্ত্র নির্জীব দুর্ব্বল মনে জীবন ও বল দান করে, মূঢ় অজ্ঞানাচ্ছন্ন মনে জ্ঞান চৈতন্য দান করে, অপবিত্র অন্তঃকরণে পবিত্রতা আনিয়া দেয় এবং বিষণ্ণ চিত্তকে প্রসন্ন করে। ব্রহ্মপ্রদত্ত মন্ত্র সাধকের বিশ্বাস, বিবেক, বৈরাগ্য, প্রেমভক্তি, ক্ষমা শান্তি বৃদ্ধি করে, নিত্য নব নব ভাব উদ্দীপন করে। সাধকের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রের প্রয়োজন। অনুতাপের অবস্থাতে "পতিতপাবন, অধম তারণ, পাপ সন্তাপ হারণ" ব্রহ্মের এ সকল নামমন্ত্র সাধকের পক্ষে বিশেষ কল্যাণদায়ক; উচ্চতর নির্ম্মলতার অবস্থায় "ভক্ত-চিত্তহারী, ভক্তমনোহরা, সাধু জননী, জগন্মোহিনী জগজ্জননী" এ সকল মন্ত্র বিশেষ প্রীতিকর ও আনন্দ প্রবর্দ্ধক। এইরূপে সাধকের অবস্থা-নুসারে ব্রহ্মের বিভিন্ন স্বরূপ, শব্দ, নাম অথবা মন্ত্র সাধন আবশ্যক। পূর্ণ পরব্রহ্মেতে কোন পরিবর্ত্তন কিম্বা অবস্থান্তর নাই; কিন্তু অপূর্ণ উন্নতি-শীল জীবাত্মাতে নিত্য পরিবর্ত্তন হইতেছে। অপূর্ণ জীব একেবারে পূর্ণ ব্রহ্মকে আয়ত্ত করিতে পারে না, এই জন্য তাহার পক্ষে সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র সাধন প্রয়োজন। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর এই প্রয়োজন জানিয়াই

সাধককে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উপযুক্ত মন্ত্র সকল দান করেন। হে অল্প বিশ্বাসী, তুমি যদি বল যে তুমি শব্দ মন্ত্র কিছুই মান না, যখন যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই কর, তাহা হইলে তুমি ব্রহ্মাধীন নহ, তুমি স্বেচ্ছাচারী। যাহারা বলে স্বাধীন ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে বদ্ধ হইবে কেন তাহারা ঈশ্বরদত্ত স্বাধীনতা এবং ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব জানে না। যাঁহারা প্রকৃত সাধক তাঁহারা শব্দব্রহ্মকে মানেন, তাঁহারা ব্রহ্মশব্দের আদর করেন, ব্রহ্মশব্দ সাধন করেন। "আমি আছি" ব্রহ্ম গম্ভীর ধ্বনিতে যে অনন্তকাল নিরন্তর এই নিঃশব্দ শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন, তাঁহারা কি দিনে কি নিশীথে এই শব্দ শ্রবণ করেন, এই শব্দ সাধন করেন। "আমি আছি" এই নিত্য গম্ভীর ধ্বনি ঈশ্বরের নাম। সাধক এই নাম ধরিয়া ডাকিলেই প্রকৃত ঈশ্বরদর্শন লাভ করেন। ঈশ্বরের কোন নাম এবং কোন শব্দ অর্থ শূন্য নহে। যাঁহার নাম "আমি আছি" তিনিই নববিধানের দয়াসিন্ধু পতিতপাবন বিধাতা, তাঁহারই অপর নাম ভক্তহৃদয় বিহারিণী জগজ্জননী। যেমন ঈশ্বরের এক এক নাম বারম্বার উচ্চারণ ও সাধন করিতে করিতে সেই নামের অন্তর্গত ভাব সাধকের হৃদয়ে উজ্জ্বলতর রূপে প্রকাশিত ও দৃঢ়তররূপে প্রতিষ্ঠিত হয় সেইরূপ, "নববিধান নববিধান" এইরূপ বারম্বার বলিতে বলিতে আমরা নববিধানের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি এবং উহার সুধা পান করিতে পারি। নববিধান শব্দটী পুণ্যপ্রদ। যদিও শব্দ অথবা মন্ত্রের নিজের জীবন নাই; কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যে মন্ত্র সাধন দ্বারা আমরা পরিত্রাণ এবং দিব্য জীবন লাভ করি। প্রত্যেক ব্রহ্মশব্দ অথবা ব্রহ্মমন্ত্রের মধ্যে তাঁহার জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, সুখ শান্তি ঘনীভূত হইয়া স্থিতি করে। কথিত আছে যখন মুসা পর্ব্বত শৃঙ্গের উপরে ব্রহ্মবাণী শ্রবণ করিলেন তখন ঘোর ঘটা করিয়া মেঘসকল আসিয়া চারিদিক্ ভয়ানক অন্ধকারাচ্ছন্ন করিল, এবং বারম্বার বিদ্যুতাগ্নি প্রকাশিত হইতে লাগিল। সেইরূপ যখন সাধকের জীবনে এক একবার ভয়ানক বিপদ পরীক্ষা আসিয়া উপস্থিত হয় তাহার মধ্যে বিপদ্ভঞ্জন হরি সেই বিপন্ন সাধকের কর্ণে এক এক শব্দ অথবা এক এক মন্ত্র উচ্চারণ করেন। সেই মন্ত্রে পাপ যায়, ঘুম ভাঙ্গে। সেই মন্ত্রে সাধকের অশেষ উপকার হয়;

সেই মন্ত্রে দুর্ব্বলতার মধ্যে বল, এবং পাপ দুর্গন্ধের মধ্যে পুণ্যের সৌরভ প্রকাশিত হয়। সেই মন্ত্র সাধন করিলে উজ্জ্বলতররূপে ব্রহ্ম দর্শন এবং মুহুর্মুহু ভক্তির উচ্ছ্বাস হয়। হরিনামের কত গুণ, হরিনাম মন্ত্রের কত মহিমা তোমরা অনেকেই জানিয়াছ। পথে পথে, দ্বারে দ্বারে, হরি হরি, শ্রীহরি, মনোহর হরি, সচ্চিদানন্দ হরি বলিলে মন উন্নত হয়, মৃত সঞ্জীবিত হয়, দুর্ব্বল সবল হয়, অপবিত্র পবিত্র হয়, দুঃখী সুখী হয়, পাড়া মাতিয়া উঠে, বালক বৃদ্ধ যুবা নরনারী সকলে আনন্দিত হয়। মন্ত্রের এত গুণ, ব্রহ্মশব্দের এত মাহাত্ম্য! দৃঢ়তা এবং অধ্যবসায়ের সহিত নির্দ্দিষ্ট কাল ব্রহ্ম আদেশ সাধনই ব্রত। ব্রত বিনা জীবন সুস্থির হইতে পারে না। ব্রত বিনা আজ এই মত ধরিলে কাল ঐ মত ধরিলে, এবং এই রূপে ক্রমশঃ অস্থিরতার মধ্যে চলিলে। স্বেচ্ছাচারীর দর্পচূর্ণ করিবার জন্য ব্রত একান্ত আবশ্যক। সত্যকথনব্রত, বিদ্যাদান ব্রত, দয়াব্রত, পশু সেবা ব্রত, ক্ষমা ব্রত, রিপুসংহার ব্রত, বৈরাগ্য ব্রত, যোগ ব্রত, ভক্তি ব্রত, সেবাব্রত, এ সমস্ত ব্রতই ব্রহ্মবাণী অথবা ব্রহ্মআদেশ। যেমন ব্রহ্মেতে এবং মন্ত্রেতে কোন প্রভেদ নাই, তেমনি ব্রহ্মাতে ও ব্রতেতে কোন প্রভেদ নাই। ব্রহ্মই ব্রত। যিনি আদেশ করেন সেই প্রভু কিম্বা কর্ত্তার সঙ্গে তাঁহার আদেশের কোন প্রভেদ নাই। সেইরূপ ব্রত ও মন্ত্র দাতা গুরু ব্রহ্মের সঙ্গে মন্ত্র ও ব্রতের প্রভেদ নাই। অতএব হে স্বেচ্ছাচারী মানব, তুমি আপনার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া মন্ত্র ও ব্রতের পথ গ্রহণ কর। এই পথ গ্রহণ না করিলে কখন জীবন পবিত্র হইবে না। ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা ও শাসন ব্রতের আকারে উপস্থিত হয়, ব্রতের সমস্ত নিয়ম ব্রহ্মমুখবিনিঃসৃত। হে সাধক, এক সপ্তাহ তুমি এই ব্রত নিয়ম পালন করিবে, ইহার অর্থ এই যে এক সপ্তাহ ব্রহ্মের কৃপা পবন বিশেষরূপে তোমার মস্তকের উপর দিয়া বহিবে। সত্য পালন করিবে, ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে, বিনয়ী ও দয়ার্দ্র হইবে, ঈশ্বরের মহিমা মহীয়ান্ করিবে, রিপু সংহার এবং ইন্দ্রিয় জয় করিবে, বৃহৎ ব্রতধারী হইয়া সংসার জয় করিয়া ব্রহ্মবান্ হইবে, এ সকল আদেশ পূর্ণ প্রত্যেক ব্রত জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় জড়তা আলস্য দূর করে এবং বিকৃত আত্মাকে ও সংশোধিত প্রকৃতিস্থ

করিয়া ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী করে। ব্রহ্মপ্রদত্ত প্রত্যক ব্রত জীবের কল্যাণ প্রদ। অতএব ব্রহ্ম যে শাসনে আমাকে রাখিতে চাহেন আমি সেই শাসনে শাসিত হইব। তিনি আমাকে যে মন্ত্র, যে ব্রত দেন তাহাই আমি সাধন করিব। স্বেচ্ছাচারী নির্ব্বোধ মনুষ্য জানে না ব্রত মন্ত্রের কত গুণ। ব্রহ্মজ্ঞ এবং ব্রহ্মানুগত ব্যক্তি বুঝিতে পারেন কোন্ মন্ত্র তাঁহার পক্ষে কখন আবশ্যক, তিনি বুঝিতে পারেন এই মন্ত্র, এই শাসন আমার জন্য, এই ব্রতের আকারে আমার প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ আদেশ আসিয়াছে। যাঁহারা এইরূপ ব্রত পালন করেন তাঁহারা নানা প্রকার প্রলোভন, ও পাপের ব্যভিচার হইতে মুক্ত থাকিয়া অনায়াসে ভবসাগর পার হইয়া ঈশ্বরের শান্তি নিকেতনে চলিয়া যান। যাহারা মন্ত্র ব্রত মানে না তাহাদের দেবতা মৃত। কেন না যে ঠাকুর কথা কহে না, যে মা কোলে এস বলে না, সে ঠাকুর কি জীবন্ত ঈশ্বর, সে মা কি দয়াময়ী ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী? যে দেবতা সহস্র প্রার্থনারও একটী উত্তর দিতে পারে না, যাহার একটী মন্ত্র দিবারও ক্ষমতা নাই সেটা মৃত নিদ্রিত অপদার্থ। যদি ব্রহ্ম কথা না কহেন, যদি অবস্থানুসারে ব্রহ্ম উপযুক্ত মন্ত্র না দেন তবে হে সাধক, তুমি কি রূপে বাঁচিবে? আমার সঙ্গে যিনি কথা কহেন, যিনি আমার কথার উত্তর দেন, যিনি দুর্ব্বলতার সময় বল দেন, পাপ-বিকারের ঔষধ দেন, দুঃখের সময় সান্ত্বনা এবং প্রাণ ভরিয়া সুখ শান্তি দেন তিনিই আমার বন্ধু তিনিই আমার জীবন দায়িনী মাতা।

সেবকের নিবেদন।

দুই পক্ষী।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৩ শক।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥

বেদান্ত মধ্যে দুই সুন্দর পক্ষীর কথা বোধ হয় অনেকে শুনিয়াছেন। একটী নয়, দুইটী পক্ষী। "দ্বা সুপর্ণা।" অদ্বৈত নয়, দ্বৈত। দুই পক্ষী একত্র হইয়া এক বৃক্ষে স্থিতি করে। দুই পক্ষী পরস্পরের সখা; কিন্তু তাহাদের অবস্থা ভিন্ন। এক পক্ষী সৃষ্ট, আর এক পক্ষী স্রষ্টা; এক পক্ষী ক্ষুদ্র, অপর পক্ষী বৃহৎ ও অনন্ত; এক পক্ষী দয়ার পাত্র, অপর পক্ষী অনন্ত দয়ার সাগর; এক পক্ষী ফল ভোগ করে, অপর পক্ষী ফল-প্রদাতা। এই দুই সুন্দর পক্ষীর কথা অতি সুন্দর, বিজ্ঞান অতি মনোহর। অতএব হে ব্রহ্মভক্তগণ, স্থির হইয়া তোমরা এই দুই সুন্দর পক্ষীর তত্ত্ব শ্রবণ কর। প্রথমে মত শ্রবণ কর, পরে সাধন প্রণালী শুনিবে। হে বিশ্বাসী, তোমার এই দেহ মধ্যে দুইটী পাখী একত্রে সুখে বাস করে। তুমি জ্ঞান দ্বারা এই তত্ত্ব স্বীকার কর। তোমার এই দেহ একটী বৃক্ষ, এই বৃক্ষ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। এই দেহবৃক্ষ সাকার; কিন্তু ইহার ডালে দুটী নিরাকার পক্ষী বসিয়া আছে। বাসগৃহ সাকার; কিন্তু অধিবাসীদ্বয় নিরাকার। হে ভ্রান্ত মনুষ্য, তুমি মনে কর তোমার দেহবৃক্ষে কেবল একাকী তুমি বাস কর; কিন্তু তোমার পার্শ্বে যে অপর একটী বৃহৎ পক্ষী বসিয়া আছে তুমি তাহাকে দেখ না। হে আত্মন্, সর্ব্বদা তুমি

আমি আমি বল কেন? তুমি কি আপনাকে আপনি সৃষ্টি করিয়াছ না আপনাকে আপনি জীবিত রাখিতে পার? তোমার স্রষ্টা এবং তোমার প্রতিপালক যে তোমার পার্শ্বে বসিয়া আছেন। তাঁহার শক্তি ভিন্ন যে তুমি কিছুই করিতে পার না। তবে কেন 'আমি আহার করি, আমি চিন্তা করি, আমি দয়া করি, আমি ধর্ম্মসাধন করি' এ সকল কথা বলিয়া বৃথা অভিমান কর? যখন ঈশ্বর ভিন্ন তুমি নিমেষের জন্যও বাঁচিতে পার না তখন আমির পরিবর্ত্তে আমরা বল না কেন? প্রাচীন যোগী ঋষি এবং শাস্ত্রকারেরা দুই পক্ষীর কথা বলিয়া গিয়াছেন। অতএব হে ব্রহ্মভক্তগণ, তোমরা সকলেই আমির পরিবর্ত্তে আমরা তুমির পরিবর্ত্তে তোমরা তিনির পরিবর্ত্তে তাঁহারা এই ভাষা ব্যবহার কর। এক দেহবৃক্ষ দুটী পাখীর বাসস্থান। প্রত্যেক দেহ পিঞ্জরে যুগল পক্ষী বিহার করিতেছে। আমরা দুটী পাখী, তোমরা দুটী পাখী, তাঁহারা দুটী পাখী। প্রত্যেক নরদেহে প্রত্যেক নারীদেহে দুই আত্মা বাস করিতেছে। একটীর আগে 'জীব' শব্দ অর্থাৎ একটী জীবাত্মা, অপরটীর আগে 'পরম' বিশেষণ অর্থাৎ অপরটী পরমাত্মা। জীবাত্মার কতকগুলি লক্ষণ আছে যাহা পরমাত্মাতে নাই এবং পরমাত্মার অনেকগুলি গুণ আছে, যাহা জীবাত্মাতে নাই। এই জন্য উভয়ের স্বতন্ত্র বিশেষণ হইয়াছে। কিন্তু দুটীই অতি সুন্দর, লাবণ্যযুক্ত, মনোহর। যদিও দুটীর মধ্যে কোনটীরই আকার নাই; কিন্তু নিরাকার হইয়াও উভয়েই অশেষ সৌন্দর্য ও গুণশালী। হে মানব, তুমি যাহাকে আমি বলিতেছ এই আমিকে কাটিলে দুটী সুন্দর পাখী বাহির হইবে; একটী তুমি, অপরটী তোমার স্রষ্টা ও প্রতিপালক স্বয়ং ঈশ্বর। তোমার এই দেহের অধিকারী স্বামী কেবল তুমি নহ। তুমি যাহাকে তোমার দেহ, মন, হৃদয় আত্মা বলিতেছ, সেই দেহ, মন, হৃদয় আত্মার অধিকারী তুমি এবং তোমার ঈশ্বর। প্রত্যেক আমিকে খণ্ড খণ্ড করিলে তাহার ভিতর হইতে এইরূপে দুই আমি বাহির হইবে; এক জীব আমি, আর এক পরম আমি; এক সৃষ্ট আত্মা আর এক স্রষ্টা অথবা পরমাত্মা। এক আমির ভিতরে দুই অতীন্দ্রিয় আত্মা। এক আধারে দুই অদৃশ্য আধেয়। একাধারে, এক গাছে, এক শরীরে এই দুই নিরাকার পক্ষী, দুই সুন্দর আত্মা

নিয়ত বাস করিতেছে। হে মনুষ্য, তোমার দেহবৃক্ষে নিত্য দুই পাখী স্থিতি করিতেছে ; এক পাখী তুমি, আর এক আকাশরূপ বৃহৎপক্ষী অর্থাৎ ব্রহ্মপক্ষী। এই দুই সুন্দর পক্ষীর বিষয় যত ভাবিবে, এই দুই সুন্দর পক্ষীকে যত দেখিবে ততই তুমি দিব্যজ্ঞান লাভ করিবে, ততই তোমার ব্রহ্মজ্ঞান পরিষ্কার হইবে। হে জীব, হে সাধক, যতই তুমি এই কথা ভাবিবে, যতই তুমি এই গূঢ়তত্ত্ব আলোচনা করিবে, যে তুমি এবং ব্রহ্ম পক্ষী এক দেহবৃক্ষে বাস করিতেছ, একত্র কার্য্য করিতেছ, একত্র কথা বলিতেছ, একত্র ভাবিতেছ, একত্র হইয়া জগতে দয়া বিস্তার, এবং ধর্ম্ম প্রচার করিতেছ ততই তুমি উন্নত, শুদ্ধ এবং সুখী হইবে। ব্রহ্মপক্ষী এবং আমি এই আমরা দুই জন একত্র থাকি, একত্র কার্য্য করি, এ চিন্তা স্বর্গীয় চিন্তা, এ চিন্তা নবজীবনের হেতু এবং পরিত্রাণপ্রদ। ব্রহ্মবিশ্বাসী এবং ব্রহ্মভক্ত বলেন যখনই আমি আমার দেহবৃক্ষের দিকে তাকাই তখনই দেখি দুটী স্বর্গের পাখী একত্র বসিয়া আছে ; একটী ছোট, একটী বড়। এই দুই স্বর্গের পক্ষীকে একত্র দেখিলে যথার্থ ব্রহ্মদর্শন হয় এবং ব্রহ্মানন্দ লাভও হয়। হে প্রজ্ঞাবিশিষ্ট তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, যখনই তুমি তোমার দেহবৃক্ষে জীবাত্মাকে দেখিবে তখনই তুমি তাহার অব্যবহিত পার্শ্বে পরমাত্মাকে দেখিতে পাইবে। পরমাত্মা চিরকাল অনশন ব্রতধারী, তিনি আহার করেন না, তিনি মহাযোগী, চিরনিস্তব্ধ, নিত্য ধ্যানশীল ; তাঁহার আলস্য নাই, তিনি নিদ্রা যান না ; অনন্তকালের পক্ষী, স্রষ্টা পক্ষীর কোন প্রকার ভোগবাসনা নাই, তিনি চির বৈরাগী, তিনি পরম বৈরাগী ; কিন্তু সৃষ্ট-পক্ষী স্রষ্টা পক্ষী হইতে নানা প্রকার ফল এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী সকল লাভ করিতেছে, সে সকল ভোগ করিতেছে ; ক্ষুদ্র সৃষ্ট পক্ষী কখনও মনের আনন্দে স্রষ্টাপক্ষীর গুণকীর্ত্তন করিতেছে, কখনও অলস হইতেছে ; কখনও জাগ্রৎভাবে ব্রহ্মধ্যান করিতেছে, কখনও নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িতেছে। হে ব্রহ্মজ্ঞ, তুমি এই যুগল পক্ষীতত্ত্ব স্মরণ করিয়া রাখ। যাহাতে তুমি আমি বলিতেছ এই আমির মধ্যে দুই আমি স্থিতি করিতেছে ; এক ছোট আমি, আর এক বড় আমি ; এক 'জীব' আমি, আর এক 'পরম' আমি। শাস্ত্রেতে এই যুগল পক্ষীর প্রমাণ পাইলে, এবং

দিব্য জ্ঞানে ইহা বুঝিলে। এই নিগূঢ় দ্বৈততত্ত্ব জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করিলে, এখন ইচ্ছা সাধন প্রণালী অবধারণ কর।

আমি দুই, আমার এই দেহবৃক্ষে আমি একাকী বাস করিতেছি না; কিন্তু আমি এবং আমার স্রষ্টা ও প্রতিপালক একত্র বাস করিতেছি,—বারম্বার স্মৃতি ও চিন্তা দ্বারা এই নবজীবন প্রদ সত্য অন্তরে আয়ত্তকর এবং বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক ইহা জীবনে পরিণত কর। কখন আপনাকে ঈশ্বর-বিহীন মনে করিবে না। আমি কর্ত্তা, আমি প্রভু, আমি স্বামী কদাপি মনের মধ্যে এই বিষাক্ত অহঙ্কার পোষণ করিবে না; কিন্তু নিয়মিত সাধন দ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্বমূলাধার, সকলের কর্ত্তা ঈশ্বরকে আপনার মধ্যে দেখিবে। কি শারীরিক কি মানসিক প্রত্যেক ক্রিয়ার মধ্যে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব অনুভব করিবে। যখন তুমি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা এবং রসনা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ এবং আস্বাদন কর, তখন তুমি তোমার প্রত্যেক ইন্দ্রিয় শক্তির মূলে ঈশ্বরের শক্তি উপলব্ধি করিবে। এবং যখন তুমি তোমার মনের শক্তি সকল পরিচালন কর, তন্মধ্যেও তুমি ঈশ্বরের শক্তি দেখিবে। কেননা তাঁহার শক্তি ভিন্ন তুমি একটী সচ্চিন্তা করিতে পার না, একবিন্দু প্রেম অথবা পুণ্যও উপার্জ্জন করিতে পার না। তিনি সকল শক্তির মূল শক্তি। যেমন তিনি ভিন্ন তুমি তোমার হস্তপদ অথবা শরীরের কোন অঙ্গ পরিচালন করিতে পার না, তেমনি তাঁহার শক্তি ভিন্ন তোমার মন চিন্তা করিতে পারে না। এইরূপে দেখিবে তুমি এবং তোমার স্রষ্টা দেহ বৃক্ষ মধ্যে দুশ্ছেদ্য যোগ শৃঙ্খলে বদ্ধ রহিয়াছ। স্রষ্টাকে অতিক্রম করিয়া সৃষ্ট আত্মা কিছুই করিতে পারে না। স্রষ্টা পক্ষী এবং সৃষ্ট পক্ষী দুটী বন্ধু পার্শ্বে পার্শ্বে বসিয়া সর্ব্বদা আমোদ করিতেছে। যখনই ভাবিবে তখনই দেখিবে দুই পাখী দৃঢ়যোগে বদ্ধ হইয়া পরস্পরের সঙ্গে সখ্য বৃদ্ধি করিতেছে। হে বিশ্বাসি, তুমি কখনও আপনাকে ঈশ্বর ছাড়া ভাবিতে পার না। ক্রমাগত বিশ্বাস ভক্তি নয়নে দেখ তোমার সর্ব্বাঙ্গে দুই পক্ষী বেড়াইতেছে। একটী ফল দিতেছেন অপরটী ফল ভোগ করিতেছে; ছোট ছানা পক্ষী বড় স্রষ্টা পক্ষীর পক্ষপুটে আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। এইরূপে নিজ দেহ বৃক্ষের মধ্যে নিয়ত এই দুই সুন্দর

পক্ষীর খেলা না দেখিলে তুমি প্রকৃতরূপে ব্রহ্মজ্ঞানী অথবা ব্রহ্মভক্ত হইতে পার না। এই দুটী পাখী সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে। যখন তুমি একটী সুন্দর গোলাপফুল দর্শন কর, তখন স্রষ্টা পাখী তোমাকে দর্শন করিবার ক্ষমতা দেন এবং তুমি সৃষ্ট পক্ষী তাহা দর্শন কর। আবার যখন তুমি মধুর ব্রহ্ম সঙ্গীত শ্রবণ কর, স্রষ্টা পক্ষী তোমাকে শ্রবণ করিবার শক্তি দেন, তুমি শ্রবণ কর। অথবা যখন তুমি নিজে বিভুগুণ কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ কর, তখন স্রষ্টা পক্ষী তোমার রসনাতে বসিয়া তোমাকে বাক্য উচ্চারণ করিবার শক্তি দেন। আবার যখন তুমি বাহ্যিক ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া নীরব ও নিস্তব্ধ হইয়া মনের মধ্যে ধ্যান চিন্তা করিতে লাগিলে তখন তোমার রসনা হইতে দুটী পাখী ফুড়ুৎ করিয়া উড়িয়া মনের মধ্যে গেল। স্রষ্টা পক্ষী মনের মধ্যে বসিয়া তোমাকে চিন্তা করিবার শক্তি, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবার শক্তি দিতে লাগিল। এই-রূপে মনের প্রত্যেক কার্য্য এবং শরীরের প্রত্যেক কার্য্য ঈশ্বরের শক্তিতে নির্ব্বাহ হয়। ঈশ্বর শক্তিদাতা, জীবাত্মা শক্তি গৃহীতা। হে সৃষ্ট আত্মন্, তোমার অব্যবহিত সন্নিধানে স্রষ্টাপাখী নিত্য বসিয়া আছেন; তিনি তোমার সমস্ত অভাব মোচনের আয়োজন করিয়া দিতেছেন। তোমার চাহিতেও হয় না, তোমার চাহিবার পূর্ব্বে তিনি জানিয়া তোমাকে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করিতেছেন। তোমার শরীরে অন্ন জল ও বল স্বাস্থ্য দিতেছেন এবং তোমার আত্মাতে ধর্ম্ম পুণ্য শান্তি বিধান করিতেছেন। তিনি তোমাকে তাঁহার অজস্র দয়াঋণে বদ্ধ করিতেছেন। এইরূপে দুটী পক্ষীর পরস্পরের সখ্যভাব বৃদ্ধি হইতেছে। যখন দুই জনের সৌহার্দ্দ ঘনীভূত হয় তখন জীবাত্মা পরমাত্মাকে বলেন;— “পরমাত্মন্, আর যে তোমাকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারি না।” পরমাত্মা জীবাত্মাকে বলিলেন “হে ক্ষুদ্র জীবাত্মা, তুমি আমাকে এত ভাল বাস যে তুমি আমা ছাড়া আর কাহাকেও জান না, অতএব আমিও তোমাকে নিত্য আমার চক্ষের ভিতরে রাখিব।” এই রূপে দিন দিন বৎসরে বৎসরেপরস্পরের মধ্যে সোহার্দ্দ বাড়িতে থাকে। অনন্ত প্রেমের আধার পরমাত্মা কদাচ জীবাত্মাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। আবার

যখন উভয়ের মধ্যে সখ্যভাব ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হয় তখন জীবাত্মাও পরমাত্মাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি, তুমিও সাধন দ্বারা পরমাত্মার সঙ্গে তোমার সখ্যভাব এতদূর প্রগাঢ় কর যে তুমি মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার সঙ্গ ছাড়িয়া সুস্থির হইয়া থাকিতে পারিবে না। ক্রমশঃ সাধন করিতে করিতে সেই উচ্চতম অবস্থায় উপস্থিত হও, যেখানে ছোট পাখীটী অনুগত ভৃত্য হইয়া বড় পাখীর ভিতরে চিরাশ্রিত হইয়া থাকিবে এবং বড় পাখী ছোটটীকে আপনার বুকের ভিতরে টানিয়া লইবে। এই পাখীর গল্প মজার গল্প ; দুই সুন্দর পাখীর কথা মনোহর ভাগবত কথা। পরমাত্মা পক্ষী এবং জীবাত্মা পক্ষী উভয়ই অত্যন্ত সুন্দর এবং লাবণ্যযুক্ত, উভয়ে পরস্পরের লাবণ্যে আসক্ত। আবার ছোট পাখীটী যতই বড় পাখীর সৌন্দর্য্যে অনুরক্ত হয় ততই সে নিজে আরও উজ্জ্বলতর ও প্রিয়দর্শন হয়। ছোট পাখীটী যতই বড় পাখীর সৌন্দর্য্যরস পান করে, বড় পাখীর সুস্বর শ্রবণ করে এবং বড় পাখীর সহবাসে থাকে, ততই তাহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়। অতএব হে ভক্ত পক্ষি, তুমি অনলস হইয়া পরমাত্মা পক্ষীর শক্তিতে শক্তিমান্ হও, তাঁহার জ্ঞানে জ্ঞানী হও, তাঁহার প্রেমে প্রেমিক হও, তাঁহার পুণ্যে পুণ্যবান্ হও এবং তাঁহার সুখে সুখী হও। এই মন্দিরে যত নর নারী আছেন প্রত্যেকের দেহবৃক্ষে দুটী পাখী খেলা করিতেছে। আমি পরমার্থতত্ত্ব, যোগতত্ত্ব বলিতেছি, তোমরা শুনিতেছ। আমার মধ্যেও দুই পাখী তোমাদের মধ্যেও দুই পাখী। তোমাদের প্রত্যেকের দেহবৃক্ষের ডালে দুটী পাখী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে ; এক পাখী শুনিতেছে, অপর পাখী শুনিবার শক্তি দিতেছেন। আমি যে বলিতেছি আমার মধ্যেও দুই পাখী খেলা করিতেছে, কার্য্য করিতেছে, এক পাখী বলিবার শক্তি দিতেছেন, অপর পক্ষী বলিতেছে। এই দুই সুন্দর পক্ষীর মিত্রতা ও যোগতত্ত্ব জানিয়া বড় সুখী হইলাম। আহা! কি সুখের কথা, আমি কখনও একাকী নহি, আমার মা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী নিত্য আমার কাছে কাছে রহিয়াছেন। আমি দিবা নিশি অবিশ্রান্ত সেই পূর্ণ প্রেম পক্ষীর পক্ষপুটে প্রতিপালিত, আচ্ছাদিত ও আশ্রিত হইয়া রহিয়াছি। আমি প্রতিদিন প্রেম ভক্তি ফুলে এই প্রেমপক্ষীর পূজা

করিব, এই সুন্দর পরম পক্ষীকে আমার বক্ষে বসাইব, এই পাখীর সুস্বর যুক্ত বেদবাক্য এবং সুমধুর সঙ্গীত শুনিব, এই পাখীর সঙ্গে নিগূঢ় সৌহার্দ্দে সংযুক্ত হইয়া শুদ্ধ ও সুখী হইব। কি গৃহে কি কার্য্যক্ষেত্রে সর্ব্বদা আমি এই পক্ষীর সঙ্গে থাকিব, ইহাঁর সঙ্গে থাকিলে পাপ প্রলোভন অসম্ভব হইবে। মার পক্ষপুটের শোভা দেখিয়া এবং তাঁহার আশ্রয়ে আশ্রিত হইয়া শান্তি সুখ সম্ভোগ করিব। দুই জনে মনের আনন্দে একত্রে গান করিব, পরস্পরের সুস্বর ও সঙ্গীতের বিনিময় হইবে, আমার আর সুখের সীমা থাকিবে না। আমি আমার এই পার্শ্বস্থ, এই অন্তরতম, নিকটতম পরমাত্মা পক্ষীর পূজা ও সেবা করিয়া কৃতার্থ হইব। এই প্রেমপক্ষীর সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইব, অন্য সৌন্দর্য্য আর আমার ভাল লাগিবে না; এই পক্ষীর সুস্বর ছাড়িয়া আর পৃথিবীর লোকের কর্কশ স্বর শুনিতে যাইব না। ইহাঁর সহবাস ছাড়িয়া আর পাপভয় পূর্ণ লোকের সহবাস অন্বেষণ করিব না। পুত্র যেমন পিতা মাতার উপরে নির্ভর করে এবং তাঁহাদিগকে ভালবাসে, সুহৃদ বন্ধু যেমন সুহৃদ বন্ধুকে হৃদয় প্রেম দেয় তেমনি আমরা এই পক্ষীকে পিতামাতা ও পরম সুহৃদ জানিয়া নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইব।

সেবকের নিবেদন।

তিন যুদ্ধ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ২৪জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৩ শক।

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে আচার্য্য, নববিধান প্রতিষ্ঠা হইবার পূর্ব্বে যে তিন মহাযুদ্ধ হইয়াছিল তাহার বিবরণ বলুন এবং তাহা হইতে জগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভগবান্ কি কি মহাসত্য উদ্ধার করিয়াছেন তাহাও পরিষ্কার করিয়া বলুন।" আচার্য্য বলিলেন, অতি সুন্দর প্রশ্ন হইয়াছে। তবে সেই তিন মহাযুদ্ধের কথা শ্রবণ কর এবং বিধাতার প্রেমলীলা রস পান কর। যখন এই দেশে মূর্ত্তিপূজার ভয়ানক প্রাদুর্ভাব ছিল এবং পৌত্তলিকতার অন্ধকার চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়াছিল সেই সময়ে বিধাতা পুরুষ, ভারতবর্ষের ঈশ্বর বিশেষরূপে তাঁহার অতুল মহিমা এবং অশেষ করুণা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি কএকজন মহানুভব ব্যক্তির মনোমধ্যে জ্ঞানের আসনে বসিয়া প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ করিয়াছিলেন। যখন ভারতবর্ষের চারিদিকে নানাপ্রকার দেবদেবীর পূজা হইতেছিল সেই সময়ে সনাতন ব্রহ্ম ভারতবর্ষ এবং সমস্ত জগৎ হইতে সকল প্রকার অসত্য এবং পৌত্তলিকতা দূর করিবার জন্য, কএক-জন ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির মনে তাঁহার অদ্বিতীয়ত্ব প্রকাশ করিলেন। সেই কএকজন ব্রহ্মনিষ্ঠ একেশ্বরবাদী সাহস পূর্ব্বক তুরীভেরী প্রভৃতি রণবাদ্য বাজাইয়া ভারতের আকাশে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই নিশান উড়াই-লেন। তাঁহাদিগের নিকটে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের পরিচয় পাইয়া বঙ্গদেশের এবং ভারতবর্ষের অনেকেই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম এই শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এক দিকে যেমন অদ্বিতীয় ব্রহ্মের

নিশান উড়িল অপর দিকে তেমনি পৌত্তলিকেরা একেশ্বরবাদীদিগকে ভয়ানকরূপে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল কে জানিত কোন্ পক্ষের জয় লাভ হইবে। অল্পবিশ্বাসী সাধারণ লোকেরা মনে করিল যে দিকে লোকসংখ্যা অধিক সেই দিকেরই জয় হইবে; কিন্তু সত্যেরই জয় হইল। সত্য সূর্য্যের উদয়ে অসত্য পৌত্তলিকতার অন্ধকার ক্রমে ক্রমে চলিয়া যাইতে লাগিল। যে দেশ সেই এক পুরাতন সনাতন পরব্রহ্মকে পরিত্যাগ করিয়া, সেই অতীন্দ্রিয়, নির্ব্বিকার, নিরাকার অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে ছাড়িয়া ঘোরতর পৌত্তলিকতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল সেই দেশ আবার অদ্বিতীয় প্রাচীন পরব্রহ্মকে মাথায় করিয়া লইল। দেশ দেশান্তরে একমেবাদ্বিতীয়মের নিশান উড়িতে লাগিল। এক ঈশ্বর আপনার প্রবল পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নানাপ্রকার মূর্ত্তিপূজাকারীদিগের সঙ্গে একেশ্বরবাদীদিগের মধ্যে এই যে মহাযুদ্ধ উহা দেশ উদ্ধারের জন্য, দুঃখী দুঃখিনীদিগের পরিত্রাণ জন্য অদ্বিতীয় ঈশ্বর স্বয়ং ঘটাইলেন। ঈশ্বরের বলে বলী হইয়া, সত্যের বলে বলবান্ হইয়া একেশ্বরবাদীগণ অসত্য পৌত্তলিকতার চূর্ণ বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঈশ্বরের সাহায্যে তাঁহারা বিঘ্ন বিপত্তির সাগর অতিক্রম করিয়া পরিণামে জয় লাভ করিলেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস ও যত্নে চারিদিকে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের নাম ঘোষিত হইতে লাগিল। অপ্রতিহত বিশ্বাসের সহিত তাঁহারা বলিতে লাগিলেন "ঈশ্বর এক, ঈশ্বর দুই নহেন, ঈশ্বর তিন নহেন, ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই, এক ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর হইতে পারে না। যিনি অসংখ্য গুণধারী পরব্রহ্ম, যিনি কোটি কোটি রূপ ধারণ করেন তিনি এক।" প্রথম মহাযুদ্ধে এই আদি সত্য জয় লাভ করিল এবং ভারত ভূমিতে ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। প্রথম যুদ্ধে ঈশ্বর জয়ী হইলেন, এবং তাঁহার অনুগত একেশ্বরবাদীগণ পৌত্তলিক হিন্দু সমাজ হইতে নির্ব্বাসিত হইল। এইরূপে প্রথম যুদ্ধে বিস্তীর্ণ হিন্দু সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, জীবন্ত ঈশ্বরের বলে, সত্যের অনুরোধে, মূর্ত্তিউপাসকদিগের দল পরিত্যাগ করিয়া আমরা একটী ক্ষুদ্র বিশ্বাসী দল সত্যধামের দিকে চলিলাম।

ইহার পর কিছুদিন আমরা কুশলে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলাম, ঈশ্বরের বিশেষ কৃপায় অদ্বিতীয় ব্রহ্মের সমাজ অথবা ব্রহ্মোপাসকদিগের সমাজ অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল।

দ্বিতীয়বার এদেশে রণভেরী বাজিয়া উঠিল। আমাদিগের এই ক্ষুদ্র একেশ্বরবাদীদলের ভিতরে আবার বিভাগ হইল। প্রথম যুদ্ধে প্রকাণ্ড পৌত্তলিক হিন্দু সমাজ হইতে একেশ্বরবাদীগণ বিচ্ছিন্ন হইলেন। এই দ্বিতীয় যুদ্ধে বিবেক-পরায়ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থগণ ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের দল হইতে নির্ব্বাসিত ও বিচ্ছিন্ন হইলেন। প্রথম যুদ্ধ একেশ্বরবাদের যুদ্ধ, দ্বিতীয় যুদ্ধ বিবেকের যুদ্ধ। সঙ্কীর্ণ ভ্রাতৃমণ্ডলীর মধ্যে বিচ্ছেদ উপস্থিত হইল। পুরাতন অভ্যস্ত ভাবের সহিত নূতন নূতন ভাবের বিরোধ হইতে লাগিল। এই ক্ষুদ্র দলের মধ্যে অধিকাংশ কেবল ব্রহ্মজ্ঞান লইয়াই সন্তুষ্ট রহিলেন; কিন্তু কএক জন সেই জ্ঞান জীবনে পরিণত করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং ব্যাকুল হইলেন। তাঁহারা বলিলেন; "কেবল সপ্তাহান্তে একবার সামাজিক ভাবে ব্রহ্মোপাসনা করিলে হইবে না; কিন্তু প্রতিদিনের জীবনে আপন বিশ্বাসানুসারে কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইবে। দৈনিক জীবন ব্রহ্মপাদপদ্মে উৎসর্গ করিতে হইবে। প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা কবিতে হইবে এবং সমস্ত জীবন দ্বারা ঈশ্বরের সেবা করিতে হইবে। ঈশ্বরের অভিপ্রায় অথবা বিবেকের পরামর্শ ভিন্ন কোন কার্য্য করা উচিত নহে; অতি সামান্য বিষয়েও মনুষ্যের ইচ্ছা পূর্ণ হইতে দেওয়া উচিত নহে, জীবনের ক্ষুদ্রতম কার্য্য সকলও বিবেকের অনুমোদিত হওয়া উচিত।" প্রথমোক্ত ব্রহ্মবাদীগণ জীবনপথে এতদূর অগ্রসর হইতে সম্মত হইলেন না, সুতরাং তাঁহারা বিবেকবাদীদিগের বিরোধী হইয়া উঠিলেন এবং অবশেষে বিবেকবাদীদিগকে তাঁহাদের দল হইতে নির্ব্বাসন করিলেন। এই দ্বিতীয় যুদ্ধ ঘোরতর যুদ্ধ। বিধাতা পুরুষ তাঁহার অনন্ত সিংহাসনে বসিয়া এই যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার বিবেকপরায়ণ নব্য যুবাদলের মনে স্বর্গীয় সৎসাহস এবং দুনির্ব্বার উৎসাহানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিতে লাগিলেন। পরিশেষে বিবেক জয়লাভ করিল। বিবেকী ব্রহ্মানুরাগীদল জীবন্ত ভাবে বিবেকের

রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। প্রাচীন ব্রহ্মবাদীগণ ক্রমশঃ শুষ্ক, নির্জীব ও নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন, এবং কঠোর নিয়মতন্ত্র হইয়া জীবন-শূন্য ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে লাগিলেন। প্রথম যুদ্ধে একেশ্বরবাদীগণ প্রকাণ্ড হিন্দুসমাজ ছাড়িয়া চলিয়া আসিলেন। দ্বিতীয় যুদ্ধে বিবেকী ব্রহ্মভক্তগণ ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন। উভয় যুদ্ধেই বিচ্ছেদ হইল; কিন্তু এই বিচ্ছেদ মঙ্গলময়ের মঙ্গলাভিপ্রায়সম্ভূত। বিবেকী ব্রহ্মানুরাগী নব্যদল প্রাচীন দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এই ভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন;—"হে ঈশ্বর, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই আমাদের ইচ্ছা হউক! কি সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, কি গৃহ ধর্ম্মানুষ্ঠান কি দৈনিক রীতি নীতি ও আচার ব্যবহার, সমুদায় বিষয়ে, হে অদ্বিতীয় সর্ব্বাধিকারী মহাপ্রভু পরমেশ্বর, আমাদিগকে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে শক্তি দেও।" এইরূপে দ্বিতীয় যুদ্ধে ভারতের আকাশে ব্রহ্মের ইচ্ছার নিশান উড়িল এবং ব্রাহ্মসমাজে বিবেকের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। নিজের ইচ্ছা অথবা স্বেচ্ছাচার পরিত্যাগ করিয়া বিবেকের অধীন হইয়া চলিতে হইবে, বিষয়সুখভোগলালসা নির্ব্বাণ করিয়া বৈরাগ্য ব্রত পালন করিতে হইবে, এই স্বর্গীয় সুন্দর ছবি দেখাইবার জন্য, এইমত ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্রাহ্মদিগের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রয়োজন হইয়াছিল। এই সংগ্রামে ঈশ্বরকৃপায় তাঁহার অনুগত বিবেকী সন্তানগণ জয়ী হইলেন। প্রাচীন সমাজ হইতে পরিত্যক্ত হইয়া নূতন দল ঈশ্বরাজ্ঞায় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন এবং কিছু কালের মধ্যে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তথায় নিয়মিতরূপে সবান্ধবে ব্রহ্মপূজা করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরের পবিত্র ইচ্ছা ইহাঁদিগের সমস্ত জীবনকে অধিকার করিতে লাগিল; এবং ইহাঁদিগের চরিত্র শাসন করিতে লাগিল। প্রথম যুদ্ধে সত্যের জয় হইল, দ্বিতীয় যুদ্ধে বিবেক অথবা ব্রহ্মের ইচ্ছার জয় হইল।

কিছুকাল পরে তৃতীয় মহাযুদ্ধের রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। আবার সূর্য্যালোকে নানা প্রকার যুদ্ধের অস্ত্র সকল চক্ মক্ করিয়া উঠিল। তৃতীয় মহাযুদ্ধ সমাগত, ইহাতেও ঘোর আন্দোলন হইতে লাগিল। দ্বিতীয় যুদ্ধ

অপেক্ষাও এ যুদ্ধ প্রবলতর। ঈশ্বরের আদেশ অথবা প্রত্যাদেশ ভূমির উপরে এই যুদ্ধ আরম্ভ হইল। একদল প্রত্যাদেশবাদী, অন্য দল প্রত্যাদেশ বিরোধী, এই দুই দল যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইল। সেই পূর্ব্বোক্ত বিবেকী ব্রহ্মভক্তদল বলিলেন; "যাহা বিবেকের আদেশ তাহাই ঈশ্বরের বাণী অথবা ঈশ্বরের ইচ্ছা! নিজের ইচ্ছা সংযত হইলেই ঈশ্বরের আদেশ এবং তাঁহার পবিত্রাত্মার প্রত্যাদেশ শ্রবণ করা যায়।" প্রত্যাদেশ বিরোধীদল ইহাতে সম্মতি দিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলিলেন; "ঈশ্বর আমাদিগকে বুদ্ধি দিয়াছেন তদনুসারে চলিলেই ধর্ম্মসাধন হয়, ঈশ্বর কখনও প্রত্যক্ষ ভাবে আমাদিগের নিকটে তাঁহার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন না, কেহই তাঁহার সাক্ষাৎ আদেশ শুনিতে পায় না।" দুই দলের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল কামানের গোলা উঠিতে লাগিল ও পড়িতে লাগিল, যুদ্ধের ধূম স্তম্ভের আকৃতি ধারণ করিয়া আকাশে উত্থিত হইল। যেমন প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধ ঈশ্বরের ইচ্ছাতে ঘটিয়াছিল, এই তৃতীয় যুদ্ধও সেই মঙ্গলময় বিধাতার অভিপ্রায়েই ঘটিয়াছিল, ইহাতে উন্নতির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে এবং বিশ্বাসীদিগের বিশেষ কল্যাণ ও কুশল হইয়াছে। এই তৃতীয় যুদ্ধ হইতেও জীবের কল্যাণদাতা ভগবান্ তাঁহার এক প্রবল সত্য উদ্ধার করিয়া নববিধানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তৃতীয় যুদ্ধে এই শিক্ষা লাভ হইল যে বিবেকের বাণীকে ব্রহ্মবাণী বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। তৃতীয় যুদ্ধ এই সত্য প্রতিপন্ন করিয়া দিল যে ঈশ্বর তাঁহার প্রেরিত যোগী সাধকদিগের নিকটে প্রত্যক্ষভাবে আদেশ দান করেন; এবং তাঁহাদিগের প্রাণের মধ্যে স্বয়ং প্রাণ ও শক্তিরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যাদিষ্ট করেন। ভক্তাধীন ভগবান্ তাঁহার ভক্তদিগের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং ভক্তদিগের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। কথিত আছে কৃষ্ণ পাণ্ডবসখা নাম ধারণ করিয়া অর্জ্জুনের সারথি হইয়া আপনি রথ চালাইয়াছিলেন। সেইরূপ ভগবান্ স্বয়ং প্রত্যাদেশবাদীদিগের বন্ধু হইয়া আপনি তাঁহার নববিধান রথ চালাইতে লাগিলেন। স্বয়ং প্রভু পরমেশ্বর ভক্তসখা সারথি হইয়া প্রত্যাদেশবাদীদিগকে জয়ী করিলেন। এই ভয়ানক কলিযুগের মধ্যেও ঈশ্বর কথা কহিয়া ভক্তদিগকে

রক্ষা করেন এই সত্য প্রমাণিত হইল। নিরাকার অদৃশ্য ঈশ্বরকে বিশ্বাস ও প্রেম নয়নে দেখা যায়, অশব্দ ঈশ্বরের অভ্রান্তবাণী বিবেক কর্ণে শুনা যায়, নিকটতম অন্তরতম ঈশ্বরকে স্পর্শ করা যায়, এবং তাঁহার সঙ্গে নিত্য প্রত্যাদেশ যোগে যোগী হওয়া যায় এ সকল গুরুতর সত্যতো স্বীকার ও সাধন করিতেই হইবে। যে কলিযোগে সহস্র সহস্র স্বেচ্ছাচারী লোক ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করে না, সেই কলিযুগের মধ্যেই তাঁহার প্রেরিত প্রত্যাদিষ্ট সন্তানগণ প্রার্থনা দ্বারা তাঁহার ইচ্ছা জানিয়া পৃথিবীর পাপ প্রলোভনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জয় লাভ করিতেছেন; তৃতীয় যুদ্ধ উজ্জলতর রূপে এই সত্য প্রকাশ করিলেন। এই তিন যুদ্ধে তিন অমূল্য সত্য লব্ধ হইল। প্রথম যুদ্ধে এক ঈশ্বর আথবা সমস্ত জগতের এক পিতা;—এই সত্য নিষ্পন্ন এবং প্রকাশিত হইল, দ্বিতীয় যুদ্ধে সেই পিতার ইচ্ছাধীন বিবেকী সৎপুত্রের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইল, তৃতীয় যুদ্ধে সাধকদিগের আত্মাতে পবিত্রাত্মার সিংহাসন দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইল। এই তিন যুদ্ধের পরে মহাপ্রভু পরমেশ্বর তাঁহার সাধকদিগকে বলিলেন; "সচ্চিদানন্দের মন্দির প্রতিষ্ঠিত কর।" সৎ, চিৎ, আনন্দ, এই তিন ভাবের সমষ্টি সচ্চিদানন্দ। তিনটী যুদ্ধের পর এই তিনটী সত্য, এই ত্রিভাব অথবা ত্রিনীতিমত প্রকাশিত হইয়া নববিধান সঙ্গঠিত হইল। মঙ্গলময় বিধাতা অতি আশ্চর্য্যরূপে এ সকল ঘটনা ঘটাইলেন। এই তিন যুদ্ধে ক্রমান্বয়ে পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মার জয় হইল। প্রথম যুদ্ধে নিরাকার অদ্বিতীয় ব্রহ্মের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ব্রহ্মবাদীগণ তাঁহার পূজা অর্চ্চনায় নিযুক্ত হইলেন; কিন্তু কিছুকাল পরে সেই ব্রহ্মবাদীদিগের মধ্যে কএক জন বিলক্ষণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে কেবল সপ্তাহান্তে একবার সামাজিক ব্রহ্মোপাসনা করিলে জীবন পবিত্র ও সুখী হয় না, প্রত্যহ বিবেকী অথবা ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন হইয়া জীবনের কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে হইবে। প্রতিদিন সরল হৃদয়ে বলিতে হইবে;—"হে ঈশ্বর, আমার ইচ্ছা নহে; কিন্তু আমার জীবনে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" সেই জেরুসেলাম নগরে স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছাধীন ঈশা যেমন এই কথা বলিতেন ভারতবর্ষের বিবেকী

ব্রহ্মানুরাগীগণও এই কথা বলিতে লাগিলেন। পিতা পুত্রের ইচ্ছাগত মিলন চাই, কেবল পিতার পূজা করিলে হইবে না; কিন্তু সমস্ত হৃদয় প্রাণ দিয়া জীবনে পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইবে। ইচ্ছা যোগ দ্বারা পরমাত্মা পক্ষীর সঙ্গে সৃষ্টাত্মা পক্ষীর সখ্য যোগ করিতে হইবে। এইরূপে এক বিবেকসূত্রে ঈশার প্রাণ বঙ্গবাসী ব্রাহ্মের প্রাণ হইল। দ্বিতীয় যুদ্ধে এই পিতা পুত্রের মিলনতত্ত্ব প্রকাশিত হইল। বাইবেল গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, ঈশ্বরপুত্র ঈশা ঈশ্বরের বাক্য অথবা জ্ঞানের নিঃসরণ। চিৎ শব্দের অর্থ চৈতন্য অথবা সুবুদ্ধি, যে সুবুদ্ধি সৎ পুত্রের মধ্যে অবতীর্ণ। অথবা যে ইচ্ছা ও শক্তি তনয়ের জীবনে সঞ্জীবিত তাহার জয় হইল। কিন্তু ইহাতেও ভাগবৎ পূর্ণ হইল না। এই জন্য তৃতীয় যুদ্ধের প্রয়োজন হইল। সাধক বিবেকী হইয়াও ঈশ্বর হইতে দূরে থাকিতে পারে। সাধককে ঈশ্বরের অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী করিবার জন্য পবিত্রাত্মার আবির্ভাব প্রয়োজনীয়। যখন ঈশ্বরের বিবেকী পুত্রের অন্তরে পবিত্রাত্মার প্রকাশ হয় তখন তিনি ঈশ্বর দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রত্যাদিষ্ট হন, এবং সকল বিষয়ে ঈশ্বরের বাণী অবলম্বন করেন। পবিত্রাত্মা কর্ত্তৃক পরিচালিত না হইলে মানুষ ঈশ্বরের অভ্রান্তবাণী শুনিতে পায় না; এবং শুদ্ধ ও সুখী হইতে পারে না। এই পবিত্রাত্মা সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে সাধকের মনে আনন্দ ও শান্তি সমাগত হয়। খৃষ্টীয় শাস্ত্রে পবিত্রাত্মার অন্যতর একটী নাম আনন্দ দাতা। এই রূপে আমরা প্রাচীন আর্য্য মহাবাক্য সচ্চিদানন্দের মধ্যে খৃষ্টীয় ত্রিদেব মতের ঐক্য দেখিতেছি। প্রথমতঃ 'সৎ' অর্থাৎ একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম যাঁহার আর্য্য নাম উপাধি নাই, যাঁহার একমাত্র নাম "আমিআছি"। অতএব 'সৎ' সর্ব্বপালক ঈশ্বরের পিতৃভাববাচক, 'চিৎ' তাঁহার পুত্রভাববাচক এবং 'আনন্দ' তাঁহার পবিত্রাত্মাপ্রদ শান্তি ও আনন্দ বাচক। সৎ, চিৎ, আনন্দ, অথবা জলন্তব্রহ্ম, পুত্র, পবিত্রাত্মা এই তিনের মিলনে নববিধান প্রতিষ্ঠিত। তিন প্রকাণ্ড যুদ্ধের পরে, এই তিন মহাসত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই তিন সত্যের মিলনে সচ্চিদানন্দের পূর্ণ গৌরব সমুজ্জ্বলিত হইল। হে ব্রহ্মভক্তগণ, তোমরা পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা অথবা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে লাভ করিয়া শুদ্ধ হও, এবং শান্তি ও কুশল লাভ কর।

সেবকের নিবেদন।

ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মা।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৩ শক।

ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মার মধ্যে অনেক প্রভেদ। ব্রহ্ম শব্দের আকার নাই এবং ব্রহ্ম নিজেও আকারবিহীন। ব্রহ্ম শব্দে আকার দিলে ব্রহ্মা হয়। ব্রহ্মা শব্দ যেমন আকার বিশিষ্ট, ব্রহ্মা বস্তুও আকার বিশিষ্ট অর্থাৎ সাকার। এদেশে বহুকাল হইতে অগ্নির দেবতা ব্রহ্মা আকাররূপে পূজিত হইয়া আসিতেছে। ব্রহ্ম নিরাকার নির্ব্বিকার এবং অনাদি ও অনন্ত, ব্রহ্মা সাকার এবং আদি অন্ত বিশিষ্ট। ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মা এই দুইয়ের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নাই, দুই সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন; ব্রহ্ম স্বয়ং স্রষ্টা পুরুষ এবং ব্রহ্মা একটী সৃষ্ট বস্তু। কিন্তু এমন কোন সাধারণ সূত্র কি নাই যদ্দ্বারা এই দুইকে একত্র করা যায়? এই দুইয়ের মধ্যে কি কোন যোগ নাই? ব্রহ্মা কি ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র? ব্রহ্মবিহীন হইয়া কি ব্রহ্মা অবস্থিতি করিতে পারে? ব্রহ্মার ভিতরে কি এমন কোন পরিষ্কৃত পথ নাই যাহা অবলম্বন করিলে ব্রহ্মের নিকটে যাওয়া যায়? বাস্তবিক ব্রহ্মভিন্ন ব্রহ্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ ব্রহ্মা অর্থাৎ অগ্নির মধ্যে যদি ব্রহ্মের আবির্ভাব না অনুভব করিতেন তাহা হইলে হোমের সৃষ্টি হইত না। হে ব্রহ্মজ্ঞ সাধুগণ, পৌত্তলিক অনুষ্ঠান বলিয়া অগ্নিপূজাকে একেবারে অর্থশূন্য মনে করিও না। এই যে নানাদেশে নানাজাতির মধ্যে বহু শতাব্দী হইতে অগ্নিহোত্রীরা অগ্নিকে সমক্ষে রাখিয়া অগ্নির দেবতাকে পূজা করিয়া আসিতেছে ইহার মধ্যে অবশ্যই কোন

নিগূঢ় সত্য নিহিত রহিয়াছে। তোমরা বিজ্ঞান চক্ষে ভ্রম কুসংস্কার ভেদ করিয়া সেই সত্য দর্শন কর। অগ্নিহোত্রব্রত কেন হইল? আগুণ জ্বালিয়া হোম না করিলে কি প্রাচীন সাধকদিগের ধর্ম্ম হইত না? অগ্নিকে কেন তাঁহারা এত সমাদর করিতেন? ঋগ্বেদে অগ্নিস্তব কেন দেখিতে পাই? যে সকল আর্য্য ঋষিগণ অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসক বলিয়া জগতে বিখ্যাত তাঁহাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে জড় অগ্নির উপাসনার উল্লেখ কেন দেখিতে পাওয়া যায়? ইহাতে পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত সভ্য জাতির নিকটে কি আর্য্য মস্তক অবনত হইল না? এই কুসংস্কারের গুরুভার বশতঃ কি আর্য্যমস্তক হইতে জ্ঞানের মুকুট খসিয়া পড়িল না? ঋগেদ, তোমার মধ্যে অগ্নির স্তব আছে বলিয়া কি তুমি এই উনবিংশ শতাব্দীতে সভ্য সমাজে অনাদৃত হইয়াছ? না বিজ্ঞ সমাজে এখন তোমার আদর আরও বাড়িতেছে? হে ঋগ্বেদ, হে হৃদয়ের বন্ধু, হে আর্য্যগুরু, আমাদিগকে তুমি বলিয়া দেও কেন সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ অগ্নিকে সমাদর করিয়া অগ্নির স্তব করিতেন। ঋগ্বেদ বলিলেন, ঋগ্বেদ বলিতেছেন, এবং ঋগ্বেদ আমাদিগের পুত্র পৌত্রদিগকে ও বলিবেন;—"অকারণ অগ্নি পূজা হয় নাই। অগ্নির সঙ্গে ব্রহ্মের যোগ আছে। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং তিনি অগ্নিব্যাপী।" তোমরা সকলেই জান হুতাশনের গ্রাসে সর্ব্ব বস্তু দগ্ধ হয়। এই দহন করিবার শক্তি অগ্নি কাহার নিকটে লাভ করে? যিনি সকল শক্তির মূলশক্তি সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মের নিকটে অগ্নি এই দাহিকা শক্তি লাভ করে। অগ্নির মূল-শক্তি ব্রহ্ম-শক্তি। অগ্নির উপরে জ্বলেন ব্রহ্ম, অগ্নির ভিতরে জ্বলেন ব্রহ্ম। সেই আদ্যাশক্তি অগ্নির ভিতরে বাহিরে আপনার আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রকাশ করেন। আদ্যাশক্তি জগজ্জননী এই অগ্নিশক্তি দ্বারা কত কার্য্য সম্পাদন করিয়া লইতেছেন। এই অগ্নি দ্বারা মনুষ্য সমাজের কত প্রকার উপকার হইতেছে আর্য্য সন্তানেরা তাহা পর্য্যবেক্ষণ এবং আলোচনা করিতেন। তাঁহাদিগের সময়ে পুতুল পূজা অথবা পৌত্তলিকতার প্রাচুর্ভাব হয় নাই। তাঁহারা স্বাভাবিক বস্তু সকলের মধ্যে ঈশ্বরের শক্তি ও অতুল মহিমা দেখিয়া স্বভাবের স্তব স্তুতি অথবা স্বভাব-পূজা করিতেন। স্বভাবের

মধ্যে তাঁহারা ঈশ্বরের অপার জ্ঞান কৌশল ও অসীম মহিমা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতেন। যখন তাঁহারা দেখিতেন এই এক অগ্নি নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়া এবং নানারূপ ধারণ করিয়া নানাপ্রকারে জগতের হিত-সাধন করিতেছে তখন তাঁহারা একেবারে চমৎকৃত এবং কৃতজ্ঞতাভরে অবনত হইয়া এই অগ্নির স্তব করিতেন। তাঁহারা দেখিতেন এই অগ্নি আকাশে প্রচণ্ড সূর্য্যের আকারে জীবের হিতের জন্য পৃথিবীর দশদিকে তেজ ও উত্তাপ বিকীর্ণ করিতেছে, মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের আকার ধারণ করিতেছে। আকাশ হইতে পৃথিবীতে নামিয়া গৃহস্থের বাড়ীতে এই অগ্নি ক্ষুদ্রাকার ধারণ করিয়া খাদ্য দ্রব্য সকল পাক করে, এবং রাত্রে প্রদীপের আকার ধারণ করিয়া গৃহস্থকে অন্ধকার ও নানাপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করে। এই অগ্নি গরিবের কাছে উত্তাপ দানে শীতের কঠোরতা হ্রাস করে; এই অগ্নি চতুর্দ্দিকের বায়ু বিশুদ্ধ করিয়া বিবিধ রোগ এবং পূতি গন্ধ দূর করে। এই অগ্নি প্রাণবন্ধু হইয়া উদাসীন পরিব্রাজক সন্ন্যাসীদিগকে নানাপ্রকার বিপদ ও হিংস্র জন্তু সকল হইতে রক্ষা করে। সর্প, ব্যাঘ্রপূর্ণ অরণ্যের মধ্যে যখন যোগী একাকী ধ্যান সমাধিতে নিযুক্ত হইলেন, তখন ভগবদ্ভক্ত যোগী একবার বিশ্বাস ও নির্ভরপূর্ণনয়নে ব্রহ্মের পানে তাকাইলেন, চারিদিকে হিংস্র জন্তুদিগের তর্জ্জন গর্জ্জনে বন প্রতিধ্বনিত, সেই অবস্থায় অসহায় যোগী ব্রহ্মের দিকে তাকাইয়া রহি-লেন, বিপদভঞ্জন যোগেশ্বর, ভক্তবৎসল ভগবান্ ভগবদ্ভক্তকে বলিলেন "তুমি নিশ্চিন্ত মনে ধ্যান কর, অগ্নি তোমাকে বাঁচাইবে, অগ্নি তোমার যোগাসনের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিয়া তোমার সমুদায় শত্রুদিগকে দূর করিয়া তোমাকে বাঁচাইবে। এই কথা শুনিয়া যোগী শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ করিয়া তাঁহার যোগাসনের চারিদিকে অগ্নি জ্বালাইলেন। জ্বলন্ত অগ্নি প্রবল প্রহরী হইয়া তাঁহার আশ্রমের কুশল রক্ষা করিতে লাগিল। অগ্নির মুখ ব্যাদান দেখিয়া ব্যাঘ্র সর্প প্রভৃতি দুরন্ত হিংস্র জন্তু সকল দূরে চলিয়া গেল। ভয়ানক বিপদসঙ্কুল অরণ্যের মধ্যে অগ্নিই একমাত্র সহায়, সেই বিঘ্নময় স্থানে বিপন্নব্যক্তির পক্ষে অগ্নিই বিপদভঞ্জন হরির একমাত্র প্রতিনিধি। সেই অবস্থায় যোগী

সন্ন্যাসী তপস্বী স্বীয় স্বীয় আশ্রমের চারিদিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া নানা প্রকার বিপদের মুখে ধ্যানস্থ হইয়া অনায়াসে নির্ভয় এবং নিশ্চিন্ত মনে দিন যাপন করেন। অগ্নির এ সকল উপকার দেখিয়া প্রাচীন ঋষিগণ বলিলেন;—" হে অগ্নি, তুমি জীবের পরমোপকারী বন্ধু, তুমি শ্রেষ্ঠ, তুমি মহৎ, তুমি গৃহস্থের গৃহে অন্ন পরিপাক কর, তুমি আকাশে সূর্য্যের আকার ধারণ করিয়া আমাদিগকে আলোক এবং উত্তাপ দান কর, তুমিই মেঘমালার মধ্যে বিদ্যুৎ হইয়া ক্রীড়া কর, তুমিই রাত্রে গৃহে প্রদীপের আলোক হইয়া মনুষ্য সকলকে অন্ধকার ও নানা বিপদ হইতে রক্ষা কর।" জ্ঞানীরা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যখন অগ্নিকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করা হইল, তখন তো অগ্নিকে দেবতা, অথবা একজন পুরুষ বা ব্যক্তি মনে করা হইল। আর্য্যসন্তানেরা অগ্নিকে কেন তুমি বলিয়া সম্বোধন করিলেন? অগ্নি কি দেবতা? যাঁহারা অলঙ্কার শাস্ত্র জানেন তাঁহারা এই প্রশ্নের এক প্রকার মীমাংসা করিতে পারেন। অলঙ্কার শাস্ত্রানুসারে ভাবুক এবং কবিরা জড়বস্তুকেও সময়ে সময়ে ব্যক্তি অথবা পুরুষ বলিয়া সম্বোধন করেন। ঋগ্বেদের সময়ের কবিরা যখন অগ্নির নানা প্রকার উপকারিতা এবং ক্ষমতা দর্শন করিতে লাগিলেন তাঁহারা অগ্নিকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাহার স্তব করিতে লাগিলেন, এবং অনুরাগের সহিত অগ্নির মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ অগ্নিকে দেবতা জ্ঞানে তাহার পূজা ও করিতে লাগিলেন। আমরা অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসক, সুতরাং অগ্নিকে দেবতা বলিলে আমরা তাহার প্রতিবাদ করিব; কিন্তু কবিদিগের ন্যায় অলঙ্কারের অনুরোধে অগ্নিকে তুমি বলিলে আমরা তাহার আপত্তি করিতে পারি না। যাহারা বলে অগ্নি ব্রহ্ম তাহারা ভ্রমান্ধ; আবার যাহারা বলে ব্রহ্মের সঙ্গে অগ্নির কোন যোগ নাই তাহারাও ভ্রমান্ধ। আমাদিগকে এই উভয় ভ্রম পরিত্যাগ করিয়া সত্য পথ অবলম্বন করিতে হইবে। আমরা ভক্তির সহিত সরল অন্তরে স্বীকার করিব, অগ্নির ভিতরে যে শক্তি তাহা ব্রহ্মশক্তি। অগ্নিশক্তির ভিতরে অগ্নির স্রষ্টা ও রক্ষক ব্রহ্ম অধিষ্ঠান করিতেছেন, সেই ব্রহ্ম পুরুষকে আমরা অগ্নি মধ্যে উপলব্ধি করিয়া তুমি বলিয়া সম্বোধন করি। সেই ব্রহ্মপুরুষকে লক্ষ্য

করিয়া আমরা অগ্নির মধ্যস্থ অগ্নির প্রাণ, ব্রহ্মকে তুমি বলিতে পারি। আমরা বলিতে পারি ;—"হে অগ্নি, তোমার ভিতরে জ্বলন্ত ব্রহ্মপুরুষ বসিয়া আছেন।" এই যে তুমি সম্বোধন ইহাতে কল্পনা কিম্বা অলঙ্কার নাই। প্রথম তুমি কবিতার তুমি। অলঙ্কার শাস্ত্র মতে প্রথম ভাবে অগ্নিকে তুমি বলাও অন্যায় নহে। কিন্তু শেষোক্ত ভাবে যে অগ্নিকে তুমি বলা তাহা কল্পনা কিম্বা কবিতা নহে। যখন প্রাচীন আর্য্য সূক্ষ্মদর্শী ব্রহ্মজ্ঞগণ অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক নিরাকার জ্বলন্ত অগ্নিস্বরূপ ব্রহ্মকে দেখিলেন, তখন তাঁহারা সেই অগ্নির অন্তরস্থ ব্রহ্মকে বলিলেন ;—"হে অগ্নির অগ্নি, তুমিই অগ্নির দাহিকা শক্তির মূলশক্তি, তুমিই অগ্নিকে মহৎ ও ক্ষমতাশালী করিয়াছ, অতএব তোমাকে নমস্কার করি।" অগ্নির মধ্যে এই জ্বলন্ত ব্রহ্মকে না দেখিলে আর্য্য সন্তানেরা হোম এবং অগ্নিহোত্র ব্রতাদি অনুষ্ঠান করিয়া অগ্নিকে এত বাড়াইতেন না। প্রজ্ঞাবান্ আর্য্যগণ ব্রহ্মার মধ্যে ব্রহ্মকে না দেখিলে কদাচ ব্রহ্মার এত গৌরব বৃদ্ধি করিতেন না। অনেকে তাঁহাদিগের গূঢ়ভাব বুঝিতে না পারিয়া অগ্নিকেই ব্রহ্ম সমান জ্ঞান করিয়া অগ্নির পূজা করিয়াছে। বিজ্ঞ ব্রহ্মবাদীরা জানেন সেই সর্ব্বমূলাধার সর্ব্বাশ্রয় ব্রহ্মের ক্রোড়েই ব্রহ্মা আশ্রিত, সেই নিত্য অগ্নিময় পরব্রহ্মের হস্তে সাকার অগ্নি বিধৃত। অগ্নি হইতে অগ্নিকর্ত্তা, অগ্নিস্রষ্টা, অগ্নিরক্ষক ব্রহ্মকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তোমরা অনেকেই অগ্নির প্রকাণ্ড বল দেখিয়াছ। যখন অগ্নি দাবানলের আকার ধারণ করিয়া বড় বড় বৃক্ষ সকল ভক্ষণ করে এবং বিস্তীর্ণ অরণ্য সকল ভস্ম করিয়া ফেলে, অথবা অগ্নি যখন সহস্র সহস্র গৃহ অট্টালিকাদি পরিপূর্ণ গ্রাম কিম্বা নগর ভস্ম করিয়া ফেলে তখন অগ্নি এই আশ্চর্য্য ক্ষমতা কাহা হইতে লাভ করে? ব্রহ্মশক্তি ভিন্ন অগ্নির স্বতন্ত্র কোন ক্ষমতা নাই। প্রাচীন আর্য্য হিন্দুগণ অগ্নির মধ্যে ব্রহ্মশক্তির ব্যাপার সকল দেখিয়া অগ্নির এত মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মের পর এখন নববিধান আবির্ভূত হইয়াছে। নববিধানাশ্রিত সাধকেরাও এখন অগ্নির মধ্যে অগ্নির ঈশ্বর ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া, হোমের ভিতরে হোমের ঈশ্বরকে নিরীক্ষণ করিয়া এই সভ্যতম ঊনবিংশ শতাব্দীতে অগ্নি-

হোত্রী হইবেন। যখন আমরা অগ্নি জ্বালিব, তখন ব্রহ্মকে সম্বোধন করিয়া বলিব;—"হে অগ্নির অগ্নি, জ্বলন্ত ঈশ্বর, তুমি আবার অগ্নির মধ্যে আসিয়া আমাদিগকে দর্শন দেও।" "জলে হরি, স্থলে হরি, অনলে অনিলে হরি" এ সকল কথা বলিয়া আমরা সঙ্গীত করি, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আমরা জলে কিম্বা অনলে হরিকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিবার জন্য তেমন কোন সাধন ব্রত অবলম্বন করি নাই। এই নব হোমাগ্নির মধ্যে আমরা জ্বলন্ত অগ্নি স্বরূপ ব্রহ্মকে দর্শন করিতে শিক্ষা করিব। প্রাচীন অগ্নি পূজার দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন অগ্নিকে কেহ ঈশ্বর বলিবে না। পৌত্তলিকদিগের ব্রহ্মাকে ভেদ করিয়া এখন ব্রহ্ম উঠিলেন। ব্রহ্ম স্বয়ং বলিলেন;—"হে ব্রহ্মভক্ত নববিধানবাদীগণ, আমি অগ্নির দেবতা, আমি সেই এক পুরাতন নিরাকার নির্ব্বিকার জ্বলন্ত পুরুষ, অগ্নির মধ্যে তোমরা আমাকে দর্শন করিয়া আমার পূজা করিয়া শুদ্ধ ও সুখী হও।" জ্বলন্ত অনলের ভিতরে জ্বলন্ত ব্রহ্মকে দর্শন কর। ব্রহ্মশক্তিতে অগ্নি এত তেজ দেখাইতেছে। জড় অগ্নির মধ্যে চৈতন্যময় মহাপ্রভু বিরাজ করিতেছেন। পৌত্তলিক চক্ষু জড় ব্রহ্মাকে দেখে, জ্ঞানী ব্রাহ্ম জড় অগ্নির মধ্যে চিন্ময় ব্রহ্মকে দেখেন। চিন্ময় জীবাত্মা জড় বস্তুর আবরণ ভেদ করিয়া তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মক্রোড় অথবা দেবাশ্রয় লাভ করে। যদিও অগ্নি অচেতন বস্তু, কিন্তু তন্মধ্যে জ্বলন্ত পাবন স্বরূপ জাগ্রৎ ঈশ্বর অধিষ্ঠান করিতেছেন। এই জন্য হোম প্রশংসনীয় যে হোমে ব্রহ্মের সঙ্গে ব্রহ্মার যোগ হয়। জীবন মরণে এবং নানা অবস্থায় অগ্নি আমাদিগের উপকারী বন্ধু। মৃত্যুর পর অগ্নি আমাদের শেষ সংকার করে। যখন আত্মা দেহত্যাগ করিয়া চিরকালের জন্য পরলোকে, অমৃতময়ীর শান্তিগৃহে চলিয়া যায় তখন অগ্নি মৃত দেহের সংকার করে। মৃত্যুর পরে তো অগ্নি মৃত দেহের সংকার করিবেই, এখন শরীর থাকিতে থাকিতে শরীরের জীবিতাবস্থায় হোমাগ্নি দ্বারা শরীরের সংকার কর। জ্বলন্ত বৈরাগ্যরূপ প্রচণ্ড হোমাগ্নি জ্বালিয়া তন্মধ্যে ষড় রিপু সহ দেহ দহন কর। হে প্রাচীন অগ্নিহোত্রীগণ, হে প্রাচীন যোগী ঋষিগণ, আমরা হোমাগ্নি দ্বারা আমাদিগের অশুদ্ধ তনু ভস্ম করিয়া ভগবানের কৃপা বলে আবার ভাগবতী তনু লাভ করিতে অভিলাষ করি,

আপনারা সকলে অনুমতি ও সৎ পরামর্শ দিন। আপনারা উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে এবং বিনীত অন্তরে আপনাদিগকে নমস্কার করিয়া এই নববিধানের ব্রহ্মমন্দিরে আধ্যাত্মিক হোমাগ্নি জ্বালিলাম। ইহার মধ্যে আমরা মনের বিবিধ জঞ্জাল ও ষড়রিপু নিক্ষেপ করিব। এই অগ্নির প্রভাবে আমাদিগের মনের ভিতর হইতে সকল প্রকার কুরুচি, কুবাসনা, অবিশ্বাস, নাস্তিকতা সমস্ত দগ্ধ হইয়া ভস্ম হইয়া যাইবে। আমরা বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে এই স্বর্গীয় চিতারোহণ করিয়া পুড়িয়া মরি, পরে মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব তাঁহার মৃতসঞ্জীবনী শক্তি প্রকাশ করিয়া আমাদিগের ভস্মাবশেষ হইতে নূতন দ্বিজাত্মা বাহির করিবেন। আমরা তনুত্যাগ, স্বার্থত্যাগ করিলাম, অগ্নিশিখার নিকটে যখন দয়াময় প্রভু এই সংবাদ পাইবেন তখন স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইবে। আমাদিগের পাপজীবনের মৃত্যু হইয়াছে এই সংবাদ পাইয়া মৃত্যুঞ্জয় বঙ্গদেশে আসিয়া আবার মৃত্যুকে সংহার করিয়া নূতন জীবন বাহির করিবেন। ষড়রিপুময় পুরাতন জীর্ণ শীর্ণ তনু বিনষ্ট না হইলে নূতন ভাগবতী তনু লাভ করা যায় না। হে পুরাতন ব্রাহ্ম, তুমি একবার ব্রহ্মের পুণ্যাগ্নিতে পুড়িয়া না মরিলে নবজীবন লাভ করিয়া তাঁহার কৃপারস আস্বাদন করিতে পারিবে না। অতএব জ্বলন্ত বৈরাগ্যানলরূপ নূতন হোমাগ্নি জ্বালিয়া আপনার কলুষিত শরীর মনকে দহন ও শোধন কর এবং কৃপাসিন্ধু ঈশ্বরের কৃপাবর্ষণে নূতন জীবন লাভ করিয়া নববিধানের মহিমা মহীয়ান্ কর।

সেবকের নিবেদন।

জল সংস্কার।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ৩ আষাঢ় ১৮০৩ শক।

উত্তপ্ত হিন্দুস্থান স্বভাবতঃ স্নানপ্রিয়। যে প্রদেশে সূর্য্যের নাম অগ্নি সে প্রদেশে কোটি কোটি লোক যে নদীর দিকে ধাবিত হইবে ইহা বিচিত্র নহে। যেখানে প্রচণ্ড সূর্য্যের উত্তাপে লোক অস্থির হয় সেখানকার লোকেরা নিশ্চয়ই জলের মহিমা কীর্ত্তন করিবে। যেখানে নিয়ত অগ্নি বর্ষণ হইতেছে সেখানে বারি বর্ষণ কেননা প্রার্থনার বস্তু হইবে। যাহারা প্রখর রৌদ্রে কষ্ট পাইতেছে এবং যাহারা পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ তাহারা জলের মহিমা ও আদর জানে। এই জন্য হিন্দুর বীণা ইন্দ্রের মহিমা অথবা বৃষ্টি-দেবতার গুণ গান করিয়াছে। এই জন্য ঋগ্বেদ বরুণের প্রতি স্তব স্তুতি করিয়াছে। এদেশের লোক চিরকাল প্রকৃতির ভিতরে জলের মহিমা দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছে। নরনারী সকলেই বিলক্ষণরূপে জলের মাহাত্ম্য অবগত আছে। হিন্দুকে আবার স্নান অবগাহন শিক্ষা দিবে কে? যে হিন্দুভ্রাতা রৌদ্রে চির জর্জ্জরিত, এবং নিত্যস্নান অবগাহন ভিন্ন যে হিন্দু সুস্থির থাকিতে পারে না তাহাকে কি আবার জলাভিষেক শিক্ষা দিতে হয়? প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মহর্ষি ঈশা জনের দ্বারা জলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই অভিষেক রীতি যে কেবল য়িহুদী দেশে প্রবর্ত্তিত ও প্রচলিত হইয়াছিল তাহা নহে; ইহা সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন. আর্য্য যোগীঋষিদিগের মধ্যে প্রবর্ত্তিত ছিল। যে সকল হিন্দু গঙ্গা স্নানের এত মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহারা বিলক্ষণরূপে অভিষেকের তত্ত্ব

আনিতেন। এই জলাভিষেকবাসনা হিন্দু হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছাস। অতএব অভিষেক রীতিকে আমরা বিজাতীয় বলিতে পারি না। এই রীতি অন্য দেশ হইতে ভারতবর্ষে আনীত হয় নাই; কিন্তু এই অভিষেক হিন্দুজাতির প্রাচীন রীতি ও দেশাচার। এই পুনরুদ্দীপন দ্বারা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রাচীন সদনুষ্ঠানকে আধুনিক নববিধানে স্থান দান করা হইল। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঈশার পবিত্র জলাভিষেক হইয়াছিল; কিন্তু প্রায় চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঋগ্বেদে পবিত্র জলের স্তব স্তুতি লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। নববিধানবাদীদিগের নিকটে দেশ ভেদ এবং কাল ভেদ নাই, সুতরাং ঋগ্বেদ এবং খ্রীষ্টবেদ উভয়ই নববিধানবাদীদিগের সম্পত্তি। ভারতবর্ষে প্রায় সর্ব্বত্র পবিত্র স্নানবিধি প্রচলিত; যেমন এই দেশে গঙ্গাস্নান পবিত্র অনুষ্ঠান, সেইরূপ পাঞ্জাব ও দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি প্রদেশে সিন্ধু, নর্ম্মদা, গোদাবরী প্রভৃতি নদীতে স্নানও পবিত্র। গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্ম্মদা, সিন্ধু, কাবেরী প্রভৃতি নদী হিন্দুদিগের নিকটে পবিত্র এবং যাঁহারা প্রকৃত হিন্দু তাঁহারা এ সকল নদী স্মরণ ও সাধন করিয়া পবিত্র স্নান দ্বারা আপনাকে শুদ্ধ করেন। ভারতবর্ষে নদীর অভাব নাই, ভারতবর্ষময় নদী। ভারতবর্ষের পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ নদীতে বিভক্ত। সূর্য্যাতপে উত্তপ্ত ভারতবর্ষে রাশি রাশি জলের প্রয়োজন, এই জন্য বিধি নিজেই অনেকগুলি নদী প্রণালীর ভিতর দিয়া ভারতে প্রচুর পরিমাণে জল ঢালিয়া দিতেছেন। এই জন্যই ভারতের আকাশ বর্ষাকালে সর্ব্বদা মেঘে পরিপূর্ণ থাকে। প্রাচীন আর্য্যগণ এই জলের নাম জীবন রাখিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক জল আমাদিগের পরমোপকারী প্রাণের বন্ধু। জল ভিন্ন জীবন ধারণ করা অসম্ভব। এই জল আমাদিগের আহারের সামগ্রী সকল প্রস্তুত করে, এই জল আমাদিগের পিপাসা নিবারণ করে, এই জল আমাদিগের গাত্র প্রক্ষালন করে, এই জলে আমরা স্নান অবগাহন করিয়া শরীর শীতল করি। যে জলের নিকটে আমরা এত উপকার লাভ করি সেই জলের পক্ষপাতী হইয়া তাহার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। হে নববিধানভুক্ত আত্মন্! তুমি দৃঢ়রূপে বিশ্বাস কর যে তোমার ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, তবে তুমি

কোন মুখে বলিবে যে জলে ব্রহ্ম নাই। যে জলের এত গুণ, যে জলের এত মহিমা, যে জলে আমাদিগের দেহ শুদ্ধি, প্রাণরক্ষা, পিপাসা নিবৃত্তি এবং সুচারুরূপে বাণিজ্য ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়, সেই জলকে কি আমরা অবহেলা করিতে পারি? প্রাচীন আর্য্য কবি এবং যোগী ঋষিগণ যখন জলের আশ্চর্য্য ক্ষমতা এবং প্রতাপ দেখিলেন, যখন তাঁহারা দেখিলেন আকাশ হইতে জল বৃষ্টিবিন্দুরূপে উত্তপ্ত ভূমি খণ্ডের উপরে পড়িয়া উর্ব্বরা ভূমিকে সহস্রগুণে উর্ব্বরা করিতেছে, নদী সকলকে বর্দ্ধিত ও প্রবলতর-রূপে বেগবতী করিতেছে, গৃহস্থদিগের তড়াগ, সরোবর, দীর্ঘিকা প্রভৃতি পরিপূর্ণ করিতেছে, নানা প্রকারে প্রজাপুঞ্জের হিতসাধন করিতেছে, তখন তাঁহারা জলকে অত্যন্ত মহৎ মনে করিয়া জলের উপরে দেবত্ব আরোপ করিলেন। তাঁহারা জলের একটী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পনা করিলেন এবং মনে করিতেন সেই দেবতা প্রসন্ন হইয়া বৃষ্টির আকারে গৃহস্থদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। আকাশ হইতে পড়িল বৃষ্টি, হইল ধান্যের সৃষ্টি। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি জানেন, আকাশ হইতে যত ফোঁটা জল পড়িল ততগুলি মোহর পড়িল, বৃষ্টিবিন্দুর আকারে ততগুলি মুক্তা পড়িল। ধান্যবন্ধু বৃষ্টি, ধান্য পোষণ করিয়া পৃথিবীকে প্রচুরধনে ধনী করে। এই বৃষ্টি অথবা জল আমাদিগের দেশে যে কেবল শস্য উৎপাদন করে তাহা নহে, জল আবার আমাদিগকে স্নিগ্ধ করে, আমাদিগের অন্ন প্রস্তুত করে, তৃষ্ণা নিবারণ করে, জঞ্জাল পরিষ্কার করে, গাত্রশুদ্ধি করে। হে বৃষ্টি, তুমি ক্ষুধার অন্ন সৃজন করিলে, আবার পিপাসার জল তুমি বর্ষণ করিলে। জলের কত গুণ এক মুখে বলা যায় না। জল ভিন্ন হিন্দু কোন মতে শুদ্ধ হইতে পারেন না। জল দ্বারা গাত্র শুদ্ধ না করিলে সাত্ত্বিক হিন্দু মনের আনন্দে ব্রহ্মপূজা করিতে পারেন না। ভাল রূপে জল দ্বারা গাত্র প্রক্ষালন না করিলে হিন্দুর শরীরে জড়তা ও মলীনতা অনুভূত উপস্থিত হয়, এই জন্য প্রত্যুষ হইবা মাত্র সহস্র সহস্র হিন্দু নরনারী গঙ্গাস্নান করেন। কি বারাণসি, কি প্রয়াগ, কি কলিকাতার গঙ্গাতীরে যদি প্রাতঃকালে যাও তাহা হইলে দেখিতে পাইবে গঙ্গার উভয় পার্শ্বে সহস্র সহস্র হিন্দু অগাধ ভক্তি এবং মহা আনন্দের সহিত গঙ্গাস্নান করিতেছে। তাহাদিগের কেমন

ভক্তির উচ্ছ্বাস! কত স্তব স্তুতির ধ্বনিতে আকাশ পরিপূর্ণ হয়, এবং প্রাতঃকালে গঙ্গা কেমন আশ্চর্য্য ধর্ম্মস্থানের আকার ধারণ করে! গঙ্গাতীরবাসী, গঙ্গাতীরবাসিনী হিন্দুগণ নিত্য গঙ্গাস্নান করাকে একটী মহাপুণ্যব্রত মনে করেন। হিন্দুশাস্ত্রে গঙ্গার কত মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। গঙ্গাতীরবাসী হিন্দুপরিবারস্থ বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, সকলেই গঙ্গা স্নান করে। প্রকৃত হিন্দু মনে করেন গঙ্গা স্নান দ্বারা যেমন গাত্রশুদ্ধি হয় তেমনি চিত্তশুদ্ধিও হয়। বাস্তবিক জলকে পবিত্র মনে করা হিন্দুর স্বাভাবিক ভাব। সুতরাং জর্ডন নদীতে ঈশার জলাভিষেকের শত শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন হিন্দুগণ জলাভিষেকের পবিত্রতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। কোটি কোটি হিন্দু বিশ্বাস করিতেন গঙ্গা স্নান ভিন্ন যেমন উত্তপ্ত ও মলিন শরীর শীতল এবং নির্ম্মল হয় না সেইরূপ মনের পাপ দুঃখ ও যায় না। তাঁহারা সরলান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন গঙ্গা জলাভিষেকে পাপের আগুন নির্ব্বাণ হয়। এই জন্য হিন্দুশাস্ত্রে অভিষেকের মন্ত্রাদি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু হে ব্রহ্মভক্ত, তুমি জান বাস্তবিক জলেতে এমন কোন গুণ নাই যাহাতে মনের বিকার দূর হইতে পারে, তবে জলাভিষেক দ্বারা কিরূপে পাপ প্রক্ষালিত হইয়া নব জীবনের সঞ্চার হইতে পারে? তোমরা সকলেই জান স্বয়ং ভগবান্ জীবের একমাত্র পরিত্রাতা, তবে জল দ্বারা কিরূপে পরিত্রাণ হইতে পারে? তত্ত্বপরায়ণ ব্রহ্মজ্ঞেরা বলেন "জল দ্বারা গাত্রশুদ্ধি হয়, সত্য দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়।" অতএব অসাধারণ বিশ্বাস ও ভক্তিনয়নে যদি জলের মধ্যে সেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডপতিকে দেখিতে পাও তবে জলাভিষেক দ্বারা নিশ্চয়ই চিত্তশুদ্ধ হইবে। হে ব্রহ্মভক্ত, যদি তুমি প্রতিদিন স্নানের সময় জলের মধ্যে সেই ভক্তহৃদয়-কমলবাসিনী কমলা, জননী লক্ষ্মীদেবী মা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীকে দেখিতে পাও তবে তোমার স্নান কেবল শারীরিক স্নান হইবে না, কিন্তু তোমার স্নান স্বর্গপ্রদ, নবজীবনপ্রদ জলাভিষেক হইবে। সেই জল স্পর্শ করিবার সময় তোমার মনে হইবে যেন তুমি কি এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় পদার্থ স্পর্শ করিতেছ। বাস্তবিক সর্ব্বমঙ্গলা লক্ষ্মী জগদ্ধাত্রী স্বয়ং জলের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। সেই সর্ব্বব্যাপিনী ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীর অমৃত ক্রোড়

জলের মধ্যেও প্রকাশিত রহিয়াছে। বিশ্বাসী হিন্দুগণ গঙ্গার মধ্যে সেই ক্রোড়ের আভাস পাইয়া গঙ্গাকেই মা বলিয়া সম্বোধন করেন। হে ভক্ত, নির্জ্জন পূর্ণিমা রাত্রে যদি কখনও গঙ্গায় বেড়াইয়া থাক তাহা হইলে গঙ্গার আশ্চর্য্য শোভা দেখিয়া অবশ্যই বলিয়া থাকিবে, মা ভুবন-মোহিনী ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী গঙ্গার বক্ষে বসিয়া কি সুন্দর লীলা প্রকাশ করি-তেছেন! ভক্ত দেখিতে পান যেমন এক দিকে আকাশের পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্না গঙ্গার বক্ষে প্রতিবিম্ব হইয়াছে তেমনি সেই অশেষ গুণনিধান হরির মুখ চন্দ্রের মধুর আভা গঙ্গাকে আরও সুশোভিত করিয়াছে। "জলে হরি, স্থলে হরি, অনলে অনিলে হরি।" হে ভক্তগণ, তোমরা নগরে নগরে পথে পথে এই সঙ্গীত করিয়া বেড়াইয়া থাক; কিন্তু তোমরা যথার্থ বল দেখি তোমরা কি বাস্তবিক জলের মধ্যে হরিকে দেখিয়াছ, তোমরা কি নদী বক্ষে কমলের মধ্যে সেই মা লক্ষ্মী মহাদেবীকে দেখিয়াছ? জল সেই বিশ্ব-জননীর প্রেমজলের প্রতিলিপি, জল ব্রহ্মময়। ব্রহ্ম ছাড়া জল থাকিতে পারে না। জলের মধ্যে ব্রহ্মশক্তি, জলের উপরে ব্রহ্মজ্যোতি বিকীর্ণ। বহুকাল পূর্ব্বে উপনিষদে আমরা এই শ্লোক পাঠ করিয়াছি "যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যোবিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।" "যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্ব-সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন।" ইহাতে বিলক্ষণরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে প্রাচীন আর্য্যেরা জলের মধ্যে ব্রহ্মকে দর্শন করিতেন। সুতরাং জর্ডান নদীতে ঈশার জলাভিষেক, এবং গঙ্গানদীতে মুনি ঋষিদিগের স্নান বিধির মিলন হইল। গঙ্গা ও জর্ডান দুই ভগ্নীর মিলন হইল। পূর্ব্বতন হিন্দু ঋষিগণ এবং ইহুদী ঋষি শ্রীষ্ট সকলেই জলের মধ্যে যে হরি বর্ত্তমান এই সত্যের সাক্ষ্যদান করিলেন। পূর্ব্বকার হিন্দুসাধকগণ গঙ্গাতে অবগাহন করিয়া বলি-লেন, জলে ব্রহ্ম; ঈশাও জর্ডন নদীর জলে নামিয়া বলিলেন এই জলে আমার স্বর্গস্থ পিতা এবং তাঁহার পবিত্রাত্মা আবির্ভূত। বর্ত্তমান সময়ের নববিধানভুক্ত ব্রাহ্মেরাও জলাভিষিক্ত হইয়া অভিষেক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সেই সত্যের সাক্ষ্যদান করিতেছেন। হে বিশ্বাসী ব্রাহ্মগণ, তোমরা চিরকাল জলের মাহাত্ম্য ধ্যান কর। যেমন তোমরা জল দ্বারা শরীরকে মলামুক্ত করিবে, তেমনি জলের মধ্যে হরি বর্ত্তমান আছেন এই সত্যে বিশ্বাস করিয়া জলাভিষেকের

সঙ্গে সঙ্গে চিত্তশুদ্ধ করিবে। হরি বিহীন জলে, নিরীশ্বর জলে কখনও তোমরা স্নান করিও না, হরি বিহীন জল কখনও তোমরা পান করিও না। জলাভিষেক মন্ত্র দ্বারা তোমরা জলকে আগে হরিময় করিয়া লইবে, অর্থাৎ জলের মধ্যে হরিকে বর্ত্তমান দেখিবে, পরে সেই শুদ্ধ পবিত্র জলে আপনার শরীর মনকে ধৌত ও পরিষ্কৃত করিবে। প্রতিদিন তোমরা ব্রহ্মজলে স্নান করিবে। তোমরা অবিশ্বাসীদিগের ন্যায় এক দিনও এই গঙ্গা জলকে ঈশ্বর বিহীন সামান্য জল মনে করিও না। ব্রহ্মবিহীন সামান্য জলে এক দিনও তোমরা স্নান করিও না। তোমরা ব্রহ্ম সন্তান, তোমরা দ্বিজ, তোমরা বিপ্র, তোমরা জলমন্ত্রে দীক্ষিত; সুতরাং তোমাদিগের নিত্যস্নান নিত্য পবিত্র অভিষেকে পরিণত হইবে। ঈশ্বর তোমাদিগকে তাঁহার পুণ্যময় মধুময় সরোবরে স্নান করিতে বলিয়াছেন। হিন্দুস্থান নানা প্রকার পাপতাপে দীর্ণশিরা হইয়াছে, এই প্রকার পবিত্র জলাভিষেক ভিন্ন হিন্দুস্থানের পাপ সন্তাপ দূর হইবে না। যখন পাপ সন্তপ্ত হিন্দুস্থান ঈশ্বরের পুণ্য সাগরে, প্রেম সাগরে, জ্ঞান সাগরে, শান্তি সাগরে অভিষিক্ত হইয়া উঠিবে, তখন হিন্দুস্থানের পাপজ্বালা নির্ব্বাণ হইবে। যেমন বাহিরের নির্ম্মল জলে ডুব দিয়া আমাদিগের শরীর পরিষ্কৃত হইয়া উঠে তেমনি আমাদিগের আত্মা ব্রহ্মসমুদ্রে ডুব দিয়া পাপমুক্ত, মলামুক্ত হইয়া উঠে। যথার্থ জলাভিষেক ভিন্ন পবিত্রতা এবং শান্তি নাই। গৃহে পরস্পরের মধ্যে বিবাদ অশান্তি, পরিবারে পরিবারে বিবাদ অশান্তি, গ্রামে গ্রামে বিবাদ, নগরে নগরে বিবাদ, দেশে দেশে বিবাদ, জাতিতে জাতিতে বিবাদ যুদ্ধ কলহ। অতএব সকলে প্রেমতৈল মাখিয়া শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ বলিয়া ব্রহ্মের শান্তি সমুদ্রে অবগাহন কর, পৃথিবীর সমস্ত অশান্তি কলহ নির্ব্বাণ হইবে, এবং ধরাতলে প্রেমরাজ্য শান্তিরাজ্য অবতীর্ণ হইবে। অশান্ত মানবপরিবার প্রশান্ত হইবে। আর কেহই অশান্তি রূপ শুষ্ক মরুভূমিতে থাকিয়া প্রাণ হারাইও না, সকলে মিলিয়া অগাধ অতলস্পর্শ অসীম ব্রহ্মজলে প্রবেশ কর। সেখানে ভক্ত মীন হইয়া ইহকাল পরকালে অপার আনন্দ ও সুখশান্তি সম্ভোগ কর। জলাভিষেক ভিন্ন নবজীবনের সঞ্চার হয় না। হোমাদি দ্বারা পাপে বিকৃত পুরাতন

জীর্ণ শীর্ণ মনুষ্য দগ্ধ হইয়া ভস্মে পরিণত হয়, সেই ভস্মের উপরে যখন ব্রহ্মের কৃপাবারি বর্ষণ হয় তাহার মধ্য হইতে নূতন দ্বিজাত্মা উত্থিত হয়। অনুতাপাগ্নিতে পাপ প্রবৃত্তি সকল ভস্মীভূত হয় পরে ঈশ্বরের কৃপাভিষেক দ্বারা সেই ভস্মীভূত মনুষ্যের ভিতর হইতে দ্বিজাত্মা পুণ্যাত্মা বাহির হয়।

সেবকের নিবেদন।

অবতারবাদ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ১৩ আষাঢ় ১৮০৩ শক।

হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে অবতারবাদ আছে। খ্রীষ্টধর্ম্মের মধ্যেও অবতারবাদ আছে। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক অবতারবাদী। যে ব্রহ্ম ভূমা, মহান্, যিনি আপনার মহিমাতে আপনি পূর্ণভাবে স্থিতি করেন তাঁহাকে মানুষ স্বীকার করিল; কিন্তু তাহাতে মানুষের সকল ক্ষুধা শান্তি হইল না, তাহাতে মনুষ্যস্বভাবের সকল অভাব মোচন হইল না, এই জন্য মানব মণ্ডলী কাতর স্বরে প্রার্থনা করিল;—"হে পরমাত্মন্, হে ভূমা, মহান্ ঈশ্বর, যদি তুমি জগতের নিকটে অপ্রকাশিত এবং অলক্ষিত থাকিবে তবে জীবের পাপ দুঃখ যাইবে কিরূপে? তোমার অদর্শনে যে মানবকুল ভয়ানক মৃত্যু ও পাপগ্রাসে পতিত হইবে, অতএব হে ভগবন্, তুমি অবতীর্ণ হও, তুমি জগতের নিকট সাধুচরিত্র রূপে প্রকাশিত হও।" দুঃখী মানব জাতির এই কাতর প্রার্থনা শুনিয়া জীবের দুঃখহারী ভগবান্ আপনার দয়াকে সঙ্গে লইয়া, প্রেমপক্ষ বিস্তার করিতে করিতে ধরাধামে অবতরণ করিলেন। কিন্তু এই অবতরণ দুই প্রকার। এক ঈশ্বরের নিজের প্রকাশ, দ্বিতীয় তাঁহার পুত্রের প্রকাশ। হিন্দুধর্ম্মে অনেক অবতার, খ্রীষ্টধর্ম্মে একটী অবতার। পূর্ব্বদিকে যে সকল ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত এবং প্রচলিত এবং পশ্চিম দিকে যে সকল ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত ও প্রচলিত, অবতারবাদ সম্পর্কে, তাহাদিগের মধ্যে ভয়ানক বিভিন্নতা দেখা যায়। ঈশ্বরবাদীরা যে ভাবে অবতারবাদী, হিন্দুরা সে ভাবে অবতারবাদী নহেন। অথচ

হিন্দু এবং খ্রীষ্টান উভয়েই বিশ্বাস করেন অবতার ভিন্ন মোক্ষপথ জানা যায় না, জীবের সদ্গতি হয় না, বৈকুণ্ঠ লাভ হয় না। এসিয়া খণ্ডের লক্ষ লক্ষ লোক, ইউরোপ খণ্ডের লক্ষ লক্ষ লোক অবতারবাদী। কিন্তু অবতার কিরূপে হয়? অবতার কি? এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোক ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দান করিবে। কেহ বলিবে ঈশ্বর স্বয়ং রাজা অথবা ফকীর, বৃদ্ধ অথবা গোপাল ইত্যাদি নানা প্রকার রূপ ধারণ করিয়া মনুষ্যের নিকট প্রকাশিত হন। তাহাদিগের মতে জীবের অভাব অনুসারে নিরাকার ঈশ্বর পিতা, মাতা, গুরু, রাজা, প্রভু, বন্ধু, স্বামী ভার্য্যা, তনয় তনয়া প্রভৃতি নানা প্রকার সাকার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন; হিন্দুদিগের এক সম্প্রদায় মতে সৃষ্টির মধ্যে যাহা কিছু আছে সমস্তই ব্রহ্ম। বৃক্ষ লতা, জল, অগ্নি, বায়ু, ফল, পুষ্প, জীব, জন্তু, সমুদয়ই ব্রহ্ম। এ সকল ভ্রান্ত মতের মধ্য হইতে নববিধান মূল সত্য সংগ্রহ করেন। নববিধান বাদীগণ জানেন নিরাকার ঈশ্বর কখনও সাকার হইতে পারেন না, স্রষ্টা কখনও সৃষ্ট হইতে পারেন না, তবে সাকার এবং সৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তিদিগের মধ্যে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত, সর্ব্বমূলাধার ঈশ্বর সকল শক্তির মূলশক্তিরূপে বর্ত্তমান থাকেন। সাকার মনুষ্য কখন ঈশ্বর হইতে পারে না; কিন্তু স্বয়ং ভগবান দেহধারী মনুষ্য হিন্দু পৌত্তলিকদিগের এরূপ বিশ্বাস। মানব শিশুর ক্ষুদ্র তনুর মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মাণ্ডপতি বসিয়া আছেন। শিশুর বাহু, শিশুর চরণ, শিশুর চক্ষু, শিশুর শ্রোত্র, শিশুর সমস্ত অঙ্গ কেবল ঈশ্বরের হস্তরচিত তাহা নহে, ঐ সমুদায় ঈশ্বরের হস্ত পদ। যত শিশু বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ততই স্বয়ং ভগবান্ তাহার সঙ্গে আপনার লীলাসকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যখন তাহার জীবনে লীলা শেষ হইল তখন তাহার শরীর হইতে ভগবানের অন্তর্ধান হইল। হিন্দুরা এইরূপ ঈশ্বরাবতার বিশ্বাস করেন। তাঁহারা বলেন যখনই জগতে অসত্য বা অধর্ম্মের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হয় তখনই ঈশ্বর সেই অসত্য অধর্ম্ম দূর করিবার জন্য এক এক জন অসাধারণ মানুষের আকারে অবতীর্ণ হইয়া আপনার লীলা সকল প্রকাশ করেন। পাপদৈত্য, পাপাসুর, রাবণদানব বধ করিবার জন্য সময়ে সময়ে এরূপ অবতারের প্রয়োজন হয়। অবতারের বাহ্যিক জীবন ঠিক্ মানুষের

মত ; কিন্তু অবতার সাধারণ মনুষ্যের সাধ্যাতীত অলৌকিক ব্যাপার সকল সম্পাদন করিয়া আপনার পরিচয় দান করেন। স্বয়ং ব্রহ্ম অথবা ব্রহ্মখণ্ড মনুষ্য জীবনের মূলে থাকিয়া যখন পৃথিবীতে কার্য্য করেন তখনই অবতারের প্রকাশ হয়। হিন্দুদিগের অবতারবাদ মনুষ্য ও দেবতার সংযোগ নহে। মনুষ্যাকারে যে পূর্ণ পরব্রহ্মের প্রকাশ অথবা লীলা, হিন্দুদিগের মতে তাহাই অবতার। অসীম শক্তিশালী ব্রহ্ম মনুষ্যাকারে স্থিতি করিয়া জীবোদ্ধারের জন্য যে সকল অলৌকিক অসাধারণ ক্রিয়া সম্পন্ন করেন তাহাই অবতারের কার্য্য। যাঁহারা ইহা মানেন না তাঁহারা হিন্দু নহেন। হিন্দু স্থানের অবতারবাদ এইরূপ।

ইউরোপ খণ্ডও অবতারবাদী, কিন্তু ইউরোপের অবতারবাদ হিন্দুস্থানের অবতারবাদের ন্যায় নহে। ইউরোপ খণ্ড মহর্ষি ঈশাকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া স্বীকার করে। জেরুসেলাম এবং সমস্ত পৃথিবী যখন পাপ দুঃখ ভারে কাতর হইয়া ভগবানের নিকট পরিত্রাণ প্রার্থনা করিল তখন ভগবান্ জগতের দুঃখ বিমোচন করিবার জন্য তাঁহার প্রিয়পুত্র ঈশাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন। যেমন আর্য্যজাতি বিশেষ বিশেষ সঙ্কটের সময় ভগবানের অবতারের আশা করিয়াছিল সেইরূপ সমুদয় য়িহুদী জাতিও ঈশ্বরের অবতারের শুভাগমনের জন্য আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়া ছিল। ঈশার জন্ম হওয়াতে য়িহুদীদিগের সেই আশা পূর্ণ হইল। মহর্ষি ঈশা ঈশ্বরের পুত্রভাবের পূর্ণ অবতার। সেই স্বর্গীয় উচ্চ পবিত্র স্বভাব বিশিষ্ট ঈশ্বরের পুত্র ঈশার চরণে সমস্ত পশ্চিম ভূভাগ প্রণত হইল। দুই হাত তুলিয়া আমেরিকা খণ্ড এবং ইউরোপ খণ্ড বলিতেছে; "ঈশাকে স্বয়ং ভগবান্ অর্থাৎ সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অবতার বলিয়া মহীয়ান্ কর। ঈশাকে মানুষ বলিও না, ঈশাকে সামান্য সাধু অথবা ঋষি বলিয়া ক্ষান্ত হইও না, প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জেরুসেলেম নগরের এক জন সামান্য সূত্রধরের পুত্র আপনার গুণে পৃথিবীকে ভয়ানক আন্দোলনে আন্দোলিত করিয়াছিলেন ইহা বিশ্বাস করিও না।। ঈশার প্রাণের ভিতরে থাকিয়া সাক্ষাৎ ঈশ্বর, স্বয়ং ভগবান্ আপনার লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।" তবে হিন্দুস্থানের অবতারের সঙ্গে ইউরোপ

খণ্ডের অবতারের প্রভেদ কি? হিঁন্দুদিগের মতে ভক্তপালন এবং দুষ্ট দমন করিবার জন্য ঈশ্বর স্বয়ং মনুষ্যের আকারে অবতার হন; খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপ খণ্ডের মতে, ঋষি খ্রীষ্ট মধ্যে ঈশ্বর পুত্ররূপে অবতীর্ণ। এ কথা নূতন কথা, ঈশার আবির্ভাবের পূর্ব্বে এ কথা কেহ শুনে নাই। হিন্দুদিগের মতে কৃষ্ণ রাম প্রভৃতি স্বয়ং ব্রহ্ম অথবা সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার; কিন্তু য়িহুদী প্রধান ঈশা স্বয়ং ভগবান্ নহেন, তিনি ভগবানের পুত্র। তবে খ্রীষ্ট জগৎ যে ঈশ্বর এবং ঈশা এক, অথবা স্বর্গীয় পিতা এবং স্বর্গীয় পুত্র অভিন্ন আত্মা এই কথা বলেন ইহার গূঢ় অর্থ আছে। এই কথার মধ্যে মনকে নিবিষ্ট করিয়া ইহার নিম্নস্থ মুক্তা উদ্ধার করিতে হইবে। বাস্তবিক ঈশ্বর এবং ঈশা এক ব্যক্তি নহেন; কিন্তু তাঁহারা দুই ব্যক্তি হইয়াও এক প্রাণ। বাইবেল গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে ব্রহ্মপুত্র ঈশা পৃথিবীতে আসিবার পূর্ব্বে ব্রহ্মবাণীরূপে, অথবা ব্রহ্মকৃপা রূপে ব্রহ্ম বক্ষে লুক্কায়িত ছিলেন। ঈশা ব্রহ্মবাক্য, ঈশা ব্রহ্ম তনয়, সুতরাং ব্রহ্মেতে এবং ঈশাতে প্রভেদ নাই, কেননা সন্তানের স্বভাবে পিতার স্বভাব প্রতিবিম্বিত হয়; তনয়ের মুখে পিতার মুখের লক্ষণ প্রকাশিত হয়। পৃথিবীতেও দেখা যায় সন্তানের মুখে পিতা মাতার মুখের সাদৃশ্য থাকে। সন্তানের মুখে পিতা মাতার মুখের সৌসাদৃশ্য দেখিয়া বুদ্ধিমান্ লোকেরা অনায়াসে বলিয়া দিতে পারেন ইহারা অমুক অমুক ব্যক্তির সন্তান। এই যে পিতা পুত্রের মুখের সাদৃশ্য ইহার মধ্যে গভীর ধর্ম্মতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। ঈশা ঈশ্বরের পুত্র, ঈশার মুখে ঈশ্বরের মুখের লাবণ্য ও লক্ষণ সকল প্রতিবিম্বিত। ঈশা তনয়-জীবনের আদর্শ হইয়া জগতে প্রকাশিত হইলেন, ঈশার প্রকাশে ঈশ্বর তনয়ের মর্য্যাদা প্রকাশিত হইল। জগৎ পুত্রের মুখে পিতার মুখ দেখিতে পাইল। ঈশ্বর ভূমে, মহান্, অনন্ত, বৃহৎ, তাঁহার পুত্র ঈশা ক্ষুদ্র; ঈশ্বর অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, পুণ্য, অনন্ত, দয়া, ক্ষমা ধৈর্য্যের আধার; ঈশা পরিমিত জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, দয়া, ক্ষমা, ধৈর্য্যের আদর্শ অর্থাৎ পুত্রোপযোগী ভাব সমূহের আধার। পুত্রের স্বভাব চরিত্র পিতার স্বভাব চরিত্রের অনুরূপ। পিতা স্বয়ং জন্ম গ্রহণ করেন পুত্রেতে, স্বয়ং পিতা পুত্রেতে বর্ত্তমান। যাঁহারা

জায়াতত্ত্ব জানেন, যাঁহারা জায়া শব্দের প্রকৃত অর্থ জানেন তাঁহারা বলেন মনুষ্য আপনি জায়ার মধ্যে আত্মজ, অর্থাৎ তনয় রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। অতএব পুত্র কেবল পিতার সদৃশ নহেন; কিন্তু এক ভাবে পুত্র আবার পিতা কেন না পিতা স্বয়ং পুত্র রূপে প্রকাশিত হন। পিতা যিনি তিনি স্বয়ং জীবিত থাকেন পুত্রের আকারে। সেই রূপে স্রষ্টা পিতা, জন্মদাতা পিতা পুত্রের আকারে আপনার মহিমা ও অসীম করুণা প্রকাশ করেন। অসীম ব্রহ্মাণ্ডের পিতা স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিলেন পুত্রের আকারে। তবে যিনি সমস্ত বিশ্বের স্রষ্টা তিনিই কি পুত্র? না। পুত্র স্বয়ং পিতা নহেন, কিন্তু পুত্র পিতার ক্ষুদ্র সংস্করণ। পিতা এবং পুত্র দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তি; কিন্তু স্বভাব চরিত্রে অথবা স্বরূপতঃ তাঁহারা এক। পুত্রকে স্রষ্টা ঈশ্বর বলা পৌত্তলিকতা এবং ভয়ানক পাপ। নববিধান বাদী এই পাপে কলঙ্কিত হইতে পারেন না। ঈশ্বর স্রষ্টা, খৃষ্ট তাঁহার সৃষ্ট পুত্র, স্রষ্টা ঈশ্বর স্বয়ম্ভু, সৃষ্ট সন্তান উৎপন্ন। যে বলে খৃষ্ট স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর সে ভয়ানক পৌত্তলিক। খৃষ্ট ঈশ্বরের পুত্র, খৃষ্টের জীবনে তাঁহার স্বর্গস্থ পিতার লক্ষণ সকল বিশেষরূপে প্রতিফলিত, এই জন্য খৃষ্ট বিশেষ রূপে ঈশ্বরের অবতার। খৃষ্ট পিতৃভক্তি ও বাধ্যতার যেরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবী অন্য কাহারও জীবনে দেখে নাই। ব্রহ্মাণ্ডপতি স্বর্গস্থ পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁহার সন্তান মহর্ষি ঈশার যেরূপ গূঢ় প্রাণগত যোগ হইয়াছিল সেরূপ আর কোথাও দেখা যায় না। যতই আমরা ঈশার নিগূঢ় জীবন দেখিতে পাই ততই আমরা তাঁহাকে তাঁহার স্বর্গস্থ পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে এক প্রাণ দেখিয়া বিমোহিত হই। যদি ঈশ্বরের সঙ্গে ঈশার বিভিন্নতা দেখিতাম তাহা হইলে ঈশাকে আমরা বিশেষভাবে ঈশ্বরের অবতার না বলিয়া ঈশাকে আমরা ঈশ্বরের শত্রু বলিতাম। ঈশার মুখে আমরা বিশেষরূপে তাঁহার স্বর্গস্থ পিতা ঈশ্বরের মুখের সৌসাদৃশ্য দেখিতেছি এই জন্যই আমরা তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া সম্মাননা এবং শ্রদ্ধা করিতেছি। ঈশ্বর আপনার মুখের ছাঁচে তাঁহার সন্তানের মুখ গঠন করিয়াছেন। এখানে শারীরিক মুখের কথা বলা হইতেছে না, কেন না ঈশ্বর

নিরাকার এবং নিরবয়ব। ঈশ্বর চিন্ময় আত্মাস্বরূপ, সুতরাং তিনি তাঁহার আত্মার মুখের ছাঁচে অর্থাৎ তাঁহার আত্মার অনুরূপ তাঁহার সন্তানকে সৃজন করিয়াছেন। ঈশ্বর স্বয়ং অনন্ত জীবন এবং সর্ব্বশক্তিমান্; তাঁহার সন্তামকেও তিনি স্বর্গীয় জীবনের অধিকারী এবং নানা শক্তি বিশিষ্ট করিয়া সৃজন করিয়াছেন। ঈশ্বর নিজে। জ্ঞান স্বরূপ; তাঁহার সন্তানকেও তিনি চিন্ময় করিয়া গঠন করিয়াছেন। ঈশ্বর নিজে প্রেম স্বরূপ; তাঁহার সন্তানকেও তিনি প্রেমিক ও ভক্তি মান করিয়াছেন। ঈশ্বর স্বয়ং ধর্ম্মরাজ এবং পুণ্যস্বরূপ; তাঁহার সন্তানকেও তিনি ধর্ম্মশীল করিয়াছেন। ঈশ্বর স্বয়ং আনন্দ স্বরূপ, তিনি নিজে পূর্ণানন্দ এবং নিত্যানন্দ; তাঁহার সন্তানকেও তিনি তাঁহার অসীম সুখশান্তি ও অপার আনন্দের অধিকারী করিয়াছেন। এইরূপে পরমাত্মার এবং জীবাত্মার এক একটী স্বরূপ ও লক্ষণ দেখিলে বিলক্ষণ রূপে বুঝিতে পারা যায় যে ঈশ্বর এবং মনুষ্যের আত্মার সঙ্গে গূঢ় যোগ ও ঐক্য রহিয়াছে। পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার বিশেষ সৌসাদৃশ্য রহিয়ায়ছ। আধ্যাত্মিক স্বভাবের মিলন আছে বলিয়াই মনুষ্যাত্মাকে ঈশ্বরের পুত্র বলা যায়। মনুষ্যাত্মার সঙ্গে যদি পরমাত্মার সৌসাদৃশ্য না থাকিত তাহা হইলে আমরা ঈশ্বরকে মনুষ্যের পিতা না বলিয়া, তাঁহাকে কেবল মনুষ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিতাম। সর্ব্বস্রষ্টা ঈশ্বর, প্রস্তর বৃক্ষ লতা, মৎস্য, পশু, পক্ষী, নদ, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বৎ প্রভৃতি সমুদয় পদার্থেরই স্রষ্টা; কিন্তু তাঁহাকে কেহই এ সকল জড় পদার্থের অথবা আত্মা বিহীন জীবের পিতা বলিয়া সম্বোধন করে না। ঈশ্বর কেবল মনুষ্যের পিতা, কেননা মনুষ্যের আত্মার সঙ্গে তাঁহার আত্মার সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। আর সকল তাঁহার সৃষ্ট; কিন্তু তাঁহা হইতে বিভিন্ন প্রকৃতি; কিন্তু মনুষ্যই তাঁহার প্রকৃতি বিশিষ্ট। মনুষ্যই কেবল ঈশ্বরের সন্তান; কেননা মনুষ্যের স্বভাবে ঈশ্বরের স্বভাব প্রতিবিম্বিত। পৃথিবীতে সর্ব্ব প্রথমে ঈশ্বর তনয় মহর্ষি ঈশা এই তনয়ত্ব মত প্রচার কবেন। প্রত্যেক মনুষ্য ঈশ্বরের তনয় এই স্বর্গীয় সত্য ঈশা আপনার রক্ত ও প্রাণ দিয়া জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুস্থানবাসীরা চিরকাল বলিয়া আসিতেছেন পিতা স্বয়ংই পুত্রেতে জন্ম-

গ্রহণ করেন অর্থাৎ পিতা এবং পুত্রেতে কোন প্রভেদ নাই। এই গূঢ় তত্ত্বানুসারে স্বর্গস্থ পিতা ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার পুত্র ঈশার সঙ্গে এক প্রাণ হইয়া জেরুসেলাম নগরে সমস্ত জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য আপনাকে পুত্রের মধ্যে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর আপনি তাঁহার পুত্রের মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া আপনার মহৎ কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়াছিলেন এই জন্য ঈশ্বর তনয় মহর্ষি ঈশাকে দর্শন করিবার জন্য নানাদিক হইতে লোক সকল আসিয়াছিল। বিশ্বাসী ভক্তগণ ঈশ্বর তনয়কে দেখিয়া বলিলেন; "সত্য সত্যই ঈশ্বর আপনার পুত্রের মুখে, আপনার মুখ আঁকিয়া দিয়াছেন।" পিতা ঈশ্বর অনন্ত জীবন এবং অনন্ত শক্তির আধার; ছোট ছেলে অল্প শক্তি বিশিষ্ট। বড় পিতা অসীম জ্ঞানের আকর; ছোট ছেলে অল্প জ্ঞান বিশিষ্ট। বড় পিতা অসীম প্রেমের সমুদ্র; ছোট ছেলে ক্ষুদ্র প্রেমের নদী। বড় পিতা অনন্ত পুণ্যের সূর্য্য; ছোট ছেলে অল্প পুণ্যের প্রদীপ। অতএব পুত্রকে পিতা বলিও না, জীবকে ভগবান্ বলিও না, অথবা জীবকে ভগবানের অবতারও বলিও না; কিন্তু জীবাত্মাকে ভগবানের পুত্র বল। পিতা পুত্র নহেন, ভগবান ভক্ত নহেন, অথচ পিতা পুত্রে ও ভগবান্ ভক্তে ঐক্য এবং স্বভাব ও প্রেমের অভেদ আছে ইহা মানিলেই প্রকৃত অবতারবাদ মানা হইল। এই পিতা-পুত্রের-ঐক্যবাদ অবতার বাদের যথার্থ অর্থ।

সেবকের নিবেদন।

ভয় এবং প্রেম।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ২০ আষাঢ় ১৮০৩ শক।

পৃথিবীতে যখন প্রেমের আবির্ভাব হয় তখন ভয়ের তিরোভাব হয়। য়িহুদীদিগের ভয়শাস্ত্র যখন শেষ হইল, তখন ঈশার প্রেমশাস্ত্র বিরচিত হইল। যখন ভয়ের পুরাতন বিধান সমাপ্ত হয় তখন প্রেমের নূতন বিধান সমাগত হয়। একদেশে অথবা এক সময়ে ভয় ও প্রেম উভয়ে একত্র পরস্পরের পার্শ্বে বসিয়া রাজ্য শাসন করিতে পারে না। যখন এক জন রাজ্য শাসন করে তখন আর এক জনকে সিংহাসন ত্যাগ করিতেই হইবে। যত দিন ভয়ের রাজ্য তত দিন প্রেম দূরে, এবং যখন প্রেমের রাজ্য আরম্ভ হয় তখন ভয় দূর হয়। প্রেমের ধর্ম্ম সাহসের ধর্ম্ম। ভয়ের ধর্ম্ম ভীরুতা বৃদ্ধি করে। প্রেমের ধর্ম্মে ভীরুতা স্থান পায় না। ভয়ের ধর্ম্মে নিয়মের ভয়, বিধির ভয়, শাসনের ভয়, দণ্ডের ভয়। প্রেমের ধর্ম্মে ভয় নাই, যাঁহারা প্রেমের অধীন তাঁহারা নির্ভয় এবং সাহসী। যত দিন মনুষ্যের অন্তরে প্রেমোদয় না হয় তত দিন সে ভয়ের অধীন। এই জন্যই প্রত্যেক মনুষ্য এবং প্রত্যেক জাতি বাল্যাবস্থায় নানা প্রকার নিয়ম ও ভয়ের দ্বারা শাসিত হয়; পরে যখন বয়োপ্রাপ্ত হয় তখন প্রেমের দ্বারা চালিত হয়। যখন প্রেমের সুন্দর মূর্ত্তি প্রকাশিত হয় তখন ভয়ের ভীষণ আকৃতি সকল পলায়ন করে। প্রতি মনুষ্যের জীবনে কিম্বা প্রত্যেক জাতির জীবনে ক্রমে ক্রমে প্রেমসূর্য্য সমুদিত হইয়া ভয়ের অন্ধকার নাশ করে। যখন প্রেমসূর্য্যের উদয় হয়, যখন সাধকের মনে প্রগল্‌ভা ভক্তির

সঞ্চার হয় তখন আর ভয় থাকিতে পারে না। প্রকৃত ব্রহ্মভক্ত, যথার্থ ঈশ্বর প্রেমিক ভয়ের অতীত। পূর্ণ প্রীতি ভয়কে বিনাশ করে। যাঁহারা পূর্ণপ্রীতি এবং প্রগল্‌ভাভক্তির সহিত প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরের পূজা করেন তাঁহারা নির্ভয়। নববিধান পূর্ণপ্রেমের ধর্ম্ম। নববিধান সূর্য্যের অভ্যুদয়ে ভয়বিভীষিকার ধর্ম্ম চলিয়া গিয়াছে। নববিধানের ঈশ্বর অনন্ত প্রেমের আধার। নববিধানের দেবতা কখনও প্রেমশূন্য হইয়া তাঁহার কোন সন্তানকে পরিত্যাগ কিম্বা অনন্তনরকে নিক্ষেপ করিতে পারেন না। তাঁহার অনেক কুসন্তান আছে; কিন্তু কেহই তাঁহার ত্যাজ্য সন্তান নহে। তিনি স্বয়ং পূর্ণপ্রেম স্বরূপ, তাঁহার প্রেমের বিকার কিম্বা পরিবর্ত্তন নাই। যাঁহারা এই নববিধানের ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন কোন বিপদ দুর্ঘটনা তাঁহাদিগকে নিরাশ করিতে পারে না। যাহারা এই যথার্থ ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিতে পারে না তাহারাই নানাপ্রকার ভয়ে পৌত্তলিকতার আশ্রয় গ্রহণ করে। ব্রহ্মবাদী গুরু বলিলেন;—"হে সাধক, তুমি নিরাকার ব্রহ্মকে ধ্যান কর।" এই উপদেশ শ্রবণ মাত্র দুর্ব্বল সাধক ভয়ে বিকম্পিত হইল এবং নিরাকার ভাবিতে গেলে পাছে অন্ধকার দেখিয়া আরও ভয় পাইতে হয় এই আশঙ্কায় ব্রহ্মজ্ঞানী আচার্য্যের প্রতি বিরক্ত হইয়া, পৌত্তলিকতার শরণাগত হইল, কেন না সাকার পুতুল পূজা এবং সাকার পুতুল ধ্যান করা সহজ। দুর্ব্বল মনুষ্যের পক্ষে নিরাকার ব্রহ্ম ধ্যান অত্যন্ত কঠিন। এই জন্য নিরাকার ব্রহ্মধ্যানের কথা শুনিয়া দুর্ব্বল সাধকেরা পৌত্তলিকতার আশ্রয় গ্রহণ করিল, এবং কাশী, বৃন্দাবন, জগন্নাথক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু দুর্ব্বল সাধকেরা যেমন নিরাকার ব্রহ্মধ্যানের ভয়ে পৌত্তলিকতার আশ্রয় গ্রহণ করিল, তেমনি আবার অপ্রেমিক ভীরু ব্রাহ্মেরা পৌত্তলিকতার ভয়ে পৌত্তলিকতার মধ্যে যে সকল সত্য, পুণ্য, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি স্বর্গীয় ভাব রহিয়াছে সে সমস্তও পরিত্যাগ করিল। এক ভাবে এই প্রথম অবস্থায় ভীরু ব্রাহ্মগণ পৌত্তলিকদিগের অপেক্ষাও নিকৃষ্ট, কেননা ইহাঁরা এক নিরীশ্বর জগৎ কল্পনা করেন, ইহাঁদিগের মতে সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বর নাই; ইহাঁরা বলেন চন্দ্র, সূর্য্য, সাগর পর্ব্বত, পুষ্প লতাদির

মধ্যে ঈশ্বর আছেন মনে করা। কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা। এ সকল ভীরু ব্রাহ্ম বলেন ;—" পৌত্তলিকতা ছাড়, এবং পৌত্তলিকতার মধ্যে সত্য পুণ্য, প্রেম, ভক্তি, ব্রহ্মদর্শন, দৈববাণীশ্রবণ, নৃত্য, গীত, উন্মত্ততা যাহা কিছু আছে সমস্ত ছাড়।" কে এই কথা বলিতেছে ? ভয়। প্রেমিক সাহসী ব্রাহ্মেরা এই ভয়কে ঘৃণা করেন। তাঁহারা ভীরুতা পরিত্যাগ করিয়া পৌত্তলিকদিগের মধ্যেও ঈশ্বরের যে সকল ঐশ্বর্য্য আছে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে এবং ভক্তির সহিত সে সমস্ত গ্রহণ করেন। তাঁহারা সাহসমন্ত্রে দীক্ষিত, তাঁহারা নির্ভয়ে সকল স্থান হইতে ঈশ্বরের ভাব ও সত্য সকল সংগ্রহ করেন। তাঁহারা কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে ঘৃণা করেন না। তাঁহারা বলেন " আমাদিগের ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, তিনি সকল দেশের এবং সকল জাতির ঈশ্বর। তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান্, প্রভৃতি সমুদায় ধর্ম্মাবলম্বীর পিতা, তিনি সর্ব্বঘটে প্রতিষ্ঠিত। তিনি রাম, কৃষ্ণ, খৃষ্ট, চৈতন্য প্রভৃতি সকলের অন্তরাত্মা। তিনি মনুষ্য, পশু, পক্ষী, মৎস্য, কীট প্রভৃতি সমুদয় জীবের জীবন। তিনি নদীর মধ্যে, তিনি বৃক্ষের মধ্যে, তিনি জীবের মধ্যে, তিনি পুতুলের মধ্যে, তিনি সর্ব্ব বস্তুতে বিরাজমান্। প্রেমিক ব্রাহ্মের মুখে এ সকল সাহসের বাক্য শুনিয়া ভীরু দুর্ব্বল ব্রাহ্ম "ভয়ানক পৌত্তলিকতা! ভয়ানক পৌত্তলিকতা!" চীৎকার করিয়া এই কথা বলিতে বলিতে পলায়ন করিল। ভীরু ব্রাহ্ম সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টাকে দেখিতে ভয় করে। অল্প বিশ্বাসী ভীত ব্রাহ্ম সংসারের ঘটনাবলীর মধ্যে মঙ্গলময় বিধাতার হস্ত দেখিতে পায় না। তাহার মতে সংসারে ঈশ্বরের বৈকুণ্ঠ নাই; সাংসারিক কোন ব্যাপারের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক নাই, সংসার ঈশ্বরবিহীন, সংসারে মানুষ আপনি আপনার কর্ত্তা। বাস্তবিক অল্পবিশ্বাসী ভীরু ব্রাহ্ম নাস্তিকের ন্যায় এক নিরীশ্বর জগতে বাস করে। তাহার মতে ব্রহ্মাণ্ডের কোন স্থানে হরি নাই; জলে হরি নাই, স্থলে হরি নাই, অনলে হরি নাই, অনিলে হরি নাই, চন্দ্রে হরি নাই, সূর্য্যে হরি নাই। তাহার অন্ধ অবিশ্বাসী চক্ষে সমস্ত সৃষ্টি হরিশূন্য। সে সর্ব্বদাই পৌত্তলিকতার ভয়ে সশঙ্কিত। যখনই সে দেখিতে পায় যে কেহ কোন সৃষ্ট বস্তুর নিকটে প্রণত হইতেছে তখনই সে ভয়ে অবসন্ন হয়।

সে ভয় এবং দুঃখের সহিত বলে " কেন লোকে গঙ্গার বন্দনা করে? কেন তাহারা স্নানের পর সূর্য্যকে নিরীক্ষণ করিয়া সূর্য্যকে প্রণাম করে? কেন তাহারা বৃক্ষ পূজা করে? শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্য হইয়া জড়পূজা! কি কলঙ্ক!" এ সকল ভাবিতে ভাবিতে ক্ষীণ বিশ্বাসী ব্রাহ্ম ভয়ে অবসন্ন হইয়া পৌত্তলিকতার দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধির নৌকা আরোহণ করিয়া এক কল্পিত ব্রহ্মবিহীন জগতে প্রবেশ করে। সে মনে করে সেখানে পৌত্তলিকতার কোন ভয় নাই। সেখানে একটী বৃক্ষ নাই যাহাতে হরি আছেন, সেখানে একটি নদী নাই যাহাতে হরি আছেন, সেখানে একটী জীব নাই যাহার মধ্যে হরি অবস্থিতি করেন, সেখানকার সমুদয় সৃষ্ট পদার্থ হরিবিহীন। হরি বিহীন দেশ, হরি বিহীন নগর, সেখানে কোন প্রকার পৌত্তলিকতার বিভীষিকা নাই। সেই রাজ্যে বস্তুপূজা নাই, জীবপূজা নাই। অনায়াসে সেখানে নিরাকার ব্রহ্মপূজা করা যায়। অল্প বিশ্বাসী ব্রাহ্ম এই ভাবিয়া পৌত্তলিকতার ভয়ে নাস্তিকতা অথবা মিথ্যা কল্পনার পথ অবলম্বন করে। অল্প বিশ্বাসীর এরূপ অধোগতি দেখিয়া আমরা হাস্য সম্বরণ করিব, না দয়া সম্বরণ করিব? যেখানে ভয়ে পলায়ন সেখানে প্রেম নাই। ভীরু অপ্রেমিক ব্রাহ্ম পৌত্তলিকতার ভয়ে সৃষ্টি হইতে স্রষ্টাকে বিদায় করিয়া দিল, কিন্তু সাহসী প্রেমিক ব্রাহ্ম সৃষ্ট প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে হরির বর্ত্তমানতা অনুভব এবং স্বীকার করেন। সাহসী ব্রাহ্ম বলেন, কেবল একটী অশ্বত্থ অথবা বটবৃক্ষের মধ্যে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে হইবে না; কিন্তু লক্ষ লক্ষ বৃক্ষের মধ্যে সর্ব্বগত হরিকে দেখিতে হইবে। কেবল গঙ্গানদীর মধ্যে জগজ্জননী জগদ্ধাত্রীকে দেখিলে হইবে না; কিন্তু সমুদয় নদীর মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে হইবে। এইরূপে বীর ব্রহ্মজ্ঞানী দ্বারা পৌত্তলিকতার ভয় দূরিত হইল। কারণ পৌত্তলিকতার অর্থ কি? ভূমা মহান্ বিরাট ঈশ্বরকে সঙ্কীর্ণ করিয়া কোন একটী পরিমিত স্থানে বদ্ধ করা, সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরকে কেবল একটী পুতুল কিম্বা একটী বৃক্ষে প্রতিষ্ঠিত মনে করাই পৌত্তলিকতা। কিন্তু হরিময় জগৎ ইহা স্বীকার করিলে আর পৌত্তলিকতার ভয় থাকে না। যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী বলেন, "সমস্ত জগৎ ঈশ্বরের সত্তায় পরিপূর্ণ, এমন কোন সৃষ্ট বস্তু নাই যাহার মধ্যে স্রষ্টা বর্ত্তমান নহেন,

,।

যাহারা জগৎকে ঈশ্বর বিহীন মনে করে তাহারা নাস্তিক।" বাস্তবিক ঈশ্বর-পূর্ণ জগৎকে নিরীশ্বর মনে করা ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড হইতে ব্রহ্মকে বিদায় করিয়া দিয়া তাঁহাকে অন্ধকার শূন্য মধ্যে নিক্ষেপ করা প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে। কিন্তু সংকীর্ণকে বিস্তীর্ণ করা, সকল স্থান হইতে সত্য সংগ্রহ করা, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে এবং সর্ব্বত্র ঈশ্বরের অধিষ্ঠান স্বীকার করা যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্ম। কোন একজন সাধুর পক্ষপাতী হইয়া অপর সাধুগণকে ভণ্ড অথবা প্রবঞ্চক মনে করা ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে; কিন্তু পৃথিবীর সমুদয় সাধুদিগকে গ্রহণ করা, সমুদয় সাধু অবতারের মধ্যে ঈশ্বরের বিচিত্র লীলা ও রূপ গুণ দর্শন করা যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্ম। পৌত্তলিকদিগের মতে কোন একটী বিশেষ বৃক্ষে, কোন একটী বিশেষ নদীর মধ্যে অথবা কোন একজন সাধু অবতারের মধ্যে ঈশ্বর বদ্ধ। প্রকৃত ব্রাহ্ম দিব্য চক্ষে দেখিতে পান শুদ্ধ মুক্ত ব্রহ্ম কোন এক স্থানে বদ্ধ নহেন, তিনি সর্ব্বগত সর্ব্বব্যাপী। হে মুক্তি প্রার্থী সাধকগণ, আগে তোমরা ব্রহ্মকে সঙ্কীর্ণতার বন্ধন হইতে মুক্ত কর, তবেত তোমরা মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। আগে দেবমুক্তি হউক, পরে জীবের মুক্তি। হে ভ্রান্ত জীব, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, বিরাট ব্রহ্মকে কেন তুমি একটী ক্ষুদ্র বট অথবা অশ্বথ গাছের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিলে? যদি মুক্তি চাও এই ভ্রম মিথ্যা দূর কর। মিথ্যা মুক্তি দিতে পারে না, সত্যই কেবল মুক্তি দান করিতে পারে। দিব্যজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মকে মুক্ত করিয়া সমুদয় বৃক্ষের মধ্যে তাঁহাকে দর্শন কর। চক্ষু খুলিয়া দেখ ব্রহ্মময় এই জগৎ, সর্ব্বত্র ব্রহ্ম, তিনি কোন একটী বৃক্ষে কিম্বা কোন একটী স্থানে বদ্ধ নহেন। স্বর্গ হইতে নববিধান অবতীর্ণ হইয়া পৌত্তলিকতার সকল বন্ধন ছেদন করিয়া জগতের নিকট ঈশ্বরকে বন্ধন মুক্ত করিয়া প্রকাশ করিতেছেন। নববিধান বলিতেছেন;—"বেদ, পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ, প্রভৃতি সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্রই সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতেছে।" হরি, ব্রহ্ম, যিহোভা প্রভৃতি সমুদয় নাম সেই এক ঈশ্বরকেই দেখাইয়া দিতেছে। নববিধানের প্রভাবে ঈশ্বর বন্ধনমুক্ত হইলেন। নববিধান উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন, "ঈশ্বর সকল দেশের এবং সকল জাতির দেবতা; তিনি কোন একটী বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায়ে কিম্বা কোন এক দেশে বদ্ধ

নহেন।" পৌত্তলিকদিগের মতে হরি বদ্ধ; নববিধানবাদী ব্রাহ্মের মতে হরি মুক্ত। এক বৃক্ষে হরি, এক গ্রন্থে হরি, এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ে হরি, ইহা পৌত্তলিকতা। সর্ব্বত্র হরি, ইহা নববিধান অথবা প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম। হে ভ্রান্ত মনুষ্য, তুমি কি মনে কর তোমার হুকুমে সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর সমুদয় সাগর ছাড়িয়া কেবল গঙ্গাতে আসিয়া বাস করিবেন? তোমার উপদেশে কি অনন্ত ঈশ্বর তাঁহার অনন্তব্যাপ্তি কাটিবেন? ঈশ্বর কদাচ তাঁহার স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। অতএব কেহ আর পৌত্তলিকতার কলঙ্কে কলঙ্কিত হইও না। হে ভীরু ভ্রান্ত ব্রাহ্ম, তোমাকেও বলি, তুমি কি মনে কর তুমি পাছে পৌত্তলিক হও এই ভয়ে মঙ্গলময় বিধাতা তাঁহার জগৎ সংসার ছাড়িয়া অন্ধকার মধ্যে গিয়া বাস করিবেন? তোমার ভয়ে কি মনুষ্য সমাজ নিরীশ্বর হইবে? ধিক্ তোমার ভয়ে, ধিক্ তোমার মতে! তুমি বিরাট ঈশ্বরকে কাটিয়া খর্ব্ব করিতে চাও! সাবধান সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত ঈশ্বরকে ক্ষুদ্র, পরিমিত, বদ্ধ মনে করিও না, এবং তাঁহাকে তাঁহার সৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র মনে করিও না। ভূমা মহান্ ঈশ্বর কেবল ঈশা, মুসা, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের সঙ্গে বর্ত্তমান থাকিয়া বিচিত্র লীলা করিয়াছেন, এবং অপর কোটি কোটি মনুষ্যের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল না এরূপ মনে করিও না। সত্য ধর্ম্ম, মুক্তির ধর্ম্ম, প্রেমের ধর্ম্ম, সাহসের ধর্ম্ম, প্রত্যেক মনুষ্য জীবনে হরি লীলা প্রদর্শন করে। হরিময় এই জগৎ। তোমার আমার তাঁহার সকলের জীবনে হরি বর্ত্তমান রহিয়াছেন। প্রাণস্বরূপ হরি বিনা কি কেহ বাঁচিতে পারে? বিশ্বাস চক্ষু খুলিয়া দেখি যিনি আমার হরি তিনিই তোমার হরি। তোমার হরি আমার ভিতরে, আমার হরি তোমার ভিতরে। আহার করিতে যাই দেখি অন্নের মধ্যে হরি। জল পান করি, দেখি জলের ঘটীর ভিতরে হরি আপনার পবিত্র আবির্ভাব দ্বারা জলকে উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছেন। যে দিকে তাকাই সেই দিকেই হরি। যে কোন বস্তু অথবা জীবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তাহারই মধ্যে হরিকে দেখিতে পাই। তুমি আমার বাড়ীতে বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, ফল, গো, অশ্ব প্রভৃতির মধ্যে হরিকে দেখিলে, আমিও তোমার বাড়ীতে অন্ন, বস্ত্র, পশু, পক্ষী প্রভৃতির মধ্যে হরিকে দেখিলাম। কোথায়

পৌত্তলিকতা ? নববিধানের নিশান যেদিন উড়িয়াছে সে দিন পৌত্তলিকতার ভয় চলিয়া গিয়াছে। এক সাধুর বক্ষের ভিতরে ছিলেন যে হরি, নববিধানের আবির্ভাবে সকল সাধুর বক্ষের ভিতরে সেই হরি প্রকাশিত। এক গঙ্গা অথবা এক জর্দ্দান নদীতে ছিলেন যে ঈশ্বর, নববিধানের প্রভাবে আজ সেই ঈশ্বরকে সকল নদীতে এবং সমস্ত জলে দেখিতেছি। কি সুখের নববিধান! আমাদের কত সৌভাগ্য! আমরা দেখিতেছি জলে হরি, স্থলে হরি, চন্দ্রে হরি, সূর্য্যে হরি, অনলে অনিলে হরি, হরিময় এই ভূমণ্ডল। ভক্তের চক্ষুরূপ দুই দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে, সেই দুই দ্বার দিয়া দশদিক্ হইতে হরি আসিয়া ভক্তের হৃদয়গৃহে প্রবেশ করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য হরিলীলা! ভক্তের অন্তর বাহির এবং দশদিক হইতে হরিজ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। কি ভয়ানক হরির তেজ! ফাটিল ব্রহ্মাণ্ড ঘর, এবং বিরাট মূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময় হরি বাহির হইলেন, পৌত্তলিকতার মৃত্যু হইল, পবিত্র নববিধান, সত্য ব্রাহ্মধর্ম্ম মহীয়ান্ হইল।

সেবকের নিবেদন।

যোগী অক্ষয় এবং অপার।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ৩ শ্রাবণ, ১৮০৩ শক।

মুনিঃ প্রসন্ন গম্ভীরো দুর্ব্বিগাহ্য দুরত্যয়ঃ। অনন্ত পারোহ্য ক্ষোভ্য স্তিমিতোদ ইবার্ণবঃ॥ শ্রীমদ্ভাবত ১১।৮।৫॥ অস্যার্থঃ। যোগী প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায় স্থির গম্ভীর দুরবগাহ্য অক্ষয় ও অপার এবং তিনি কিছুতেই ক্ষুব্ধ হয়েন না॥

এই মাত্র আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের যে কথা শ্রবণ করিলাম ইহা সত্য। যোগীব্যক্তি সত্য সত্যই সমুদ্রের ন্যায় অক্ষয়, অপার, ও দুরবগাহ্য। কিন্তু এ কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে ঈশ্বর ও মনুষ্যে প্রভেদ রহিল কোথায়? যোগী কিরূপে যোগেশ্বরের তুল্য হইবে? উপাসক কিরূপে উপাস্য দেবতার গুণবিশিষ্ট হইবে? পরিমিত মানুষ কিরূপে অনন্ত দেবতার স্বভাব লাভ করিবে? যোগী যোগসাধন বলে যতই উন্নত ও শ্রেষ্ঠ হউন না, তথাপি তাঁহার বুদ্ধি, ভাব, ধর্ম্ম সকলই ক্ষুদ্র ও পরিমিত। তাঁহার মনের সমুদয় ভাব অন্তবিশিষ্ট। মানুষের ক্ষুদ্র প্রাণ, মন, হৃদয়, আত্মা সকলই সীমাবদ্ধ, মানুষের কিছুই অসীম অথবা পুর্ণ নহে। তবে কেন শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে যোগীব্যক্তি অক্ষয় অপার ও দুরবগাহ্য। অবশ্যই ইহার কোন গূঢ় অর্থ আছে। বাস্তবিক মানুষ যোগী হইলে অক্ষয় ও অপার হয়। জীবাত্মা যখন যোগপ্রভাবে ক্রমে ক্রমে অনন্তের সঙ্গে সংযুক্ত হয় তখন আর তাঁহার অন্ত জ্ঞান থাকে না, তাহার ক্ষুদ্রতা বোধ থাকে না। তখন সে অনন্তের সঙ্গে একাত্মা হইয়া আপনাকে আপনি

অসীম মনে করে, তাহার আর স্বতন্ত্রতাও ক্ষুদ্র বুদ্ধি থাকে না। এই অসীমতা জীবের নহে, ইহা পরমাত্মার। জীব যখন সম্পূর্ণরূপে আত্মবিসর্জ্জন দিয়া পরমাত্মার মধ্যে প্রবিষ্ট হয় তখন সে এই অসীমতা বুঝিতে পারে। যেমন ক্ষুদ্র নদী যতক্ষণ আপনার দুইদিকে তট দেখিতে দেখিতে চলিতেছিল, ততক্ষণ আপনাকে সীমাবদ্ধ জানিতেছিল ; কিন্তু যখন অকূল সাগরে ঝাঁপ দিল, তখন অনন্ত সাগরে মগ্ন হইয়া আর আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করিতে পারিল না ; সেইরূপ ক্ষুদ্র জীবাত্মা যতক্ষণ ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকে ততক্ষণ আপনাকে সীমাবদ্ধ দেখিতে পায় ; কিন্তু যখনই সে অনন্ত ঈশ্বরের মধ্যে ডুবিয়া যায় তখন আর আপনার ক্ষুদ্রত্ব দেখিতে পায় না। ক্ষুদ্র নদীর জল অসীম সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়া আপনাকে অনন্ত ও অকূল মনে করে ; সেইরূপ ক্ষুদ্র জীব যোগবলে ভূমা মহান্ বিরাট ঈশ্বরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে ব্রহ্মময় জ্ঞান করে, আপনার সর্ব্বাঙ্গে এবং সকল শক্তিতে সেই অনন্ত ব্রহ্মকে দেখিতে পায়। বাস্তবিক ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা মনুষ্য এমন অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারে যে অবস্থায় সে আপনাকে অনন্ত ব্রহ্মের অংশ অথবা সন্তান বলিয়া বিশ্বাস করে। হে মনুষ্য, যতক্ষণ তুমি তোমার মধ্যে বদ্ধ থাক ততক্ষণ তোমার শক্তি, ভক্তি, জ্ঞান, প্রাণ, পুণ্য, শান্তি সকলই অল্প এবং অন্তবিশিষ্ট ; কিন্তু যখন তুমি স্বার্থ এবং মায়া বন্ধন ছিন্ন করিয়া অনন্ত সমুদ্রস্বরূপ ঈশ্বরেতে নিমগ্ন হও তখন অনন্ত জীবন, অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, অপার প্রেম এবং অসীম পুণ্য শান্তিতে লীন হইয়া যাও। অনন্তের সঙ্গে যখন ক্ষুদ্রের যোগ হয় তখন আর ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রতা থাকে না। বস্তুতঃ মনুষ্যসন্তান অনন্ত ঈশ্বরের অংশ, এবং অনন্তকাল সেই অনন্ত স্বরূপে আরাম ও সুখ শান্তি সম্ভোগ করিবার জন্য সৃষ্ট। যতদিন সে তাহার সেই অনন্ত স্বরূপ পিতাকে ভুলিয়া থাকে ততদিন সে ক্ষুদ্র নীচ জীবন ধারণ করে ; কিন্তু যখনই তাহার মন জাগ্রৎ হয় এবং অনন্ত ঈশ্বর যে তাহার পিতা ইহা তাহার স্মরণ হয় তখন সে সন্তপ্ত চিত্তে ও কাতর স্বরে বলে ;—"পিতা গো একবার হেরগো আমার, আর সহে না প্রাণে। তোমারি সন্তান হয়ে, রয়েছি কাঙ্গালের প্রায়।" তখন সে তাহার স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র নীচ আমিত্ব পরিত্যাগ করিয়া তাহার পিতার

অসীম মহিমা ও অনন্ত ঐশ্বর্য্য সাগরে ঝাঁপ দিতে ইচ্ছা করে এবং মহাযোগ বলে সেই অনন্ত সাগরে আপনার নিকৃষ্ট আমিত্ব বিলুপ্ত করিতে বাসনা করে। এই পিতা পুত্র রহস্য অতি নিগূঢ় এবং আনন্দজনক। ঈশ্বরের পুত্র পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিলেন, কিন্তু পুত্র পৃথিবীতে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে কি ঈশ্বর একাকী ছিলেন? পুত্র জন্মিবার পূর্ব্বে কি ঈশ্বর পিতৃত্ব বিহীন ছিলেন? অর্থাৎ পুত্র বিনা যখন কেহই পিতা হইতে পারে না তখন ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে পুত্র জন্মিবার পূর্ব্বে ঈশ্বর পিতা ছিলেন না। কিন্তু ঈশ্বর কখনই পুত্রবিহীন ছিলেন না। ঈশ্বর নিত্য পিতা, তিনি অনন্ত কাল পিতা, ঈশ্বরেতে এমন কোন সম্পর্ক নাই যাহার আদি অন্ত আছে। এই ভাবে তাঁহার পুত্রও অনন্ত ও অক্ষয়। কেননা তাঁহার পুত্র পৃথিবীতে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে অব্যক্ত ভাবে তাঁহার বক্ষের মধ্যে বাস করিতেছিলেন। ঈশ্বরের পুত্র পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলেন ইহা সত্য। কিন্তু তিনি কোথা হইতে এবং কিরূপে সৃষ্ট হইলেন? অকস্মাৎ শূন্য হইতে কি ঈশ্বরের পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলেন? সন্তানের কোন উপকরণ ছিল না অথচ হঠাৎ কি সন্তান জন্মিল? অথবা ঈশ্বর কি মৃত্তিকা, প্রস্তর, অথবা অন্য কোন ভৌতিক পদার্থ লইয়া তাঁহার সন্তান গঠন করিলেন? না। শূন্য হইতে সন্তান জন্মে নাই এবং কোন সৃষ্ট জড় কিম্বা চেতন বস্তুর সমষ্টি দ্বারা ঈশ্বর তাঁহার সন্তানকে গঠন করেন নাই। তাঁহার সন্তানের ভাব উপকরণ তাঁহার প্রাণের মধ্যে লুকায়িত ছিল। অপ্রকাশ সন্তান স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের মধ্যে বাস করিতেছিল, অব্যক্ত পুত্র অনাদি অনন্ত পিতার মনের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিল; সুতরাং পিতা হইতে পিতার মূর্ত্তি লইয়া, শক্তি, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, আনন্দ, পিতার এই পাঁচটী স্বরূপ লইয়া পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল। পিতার বক্ষে পুত্র অব্যক্ত ভাবে ছিল। পিতা ডাকিলেন;— "সন্তান আয়।" সন্তান আসিল। পিতার ইচ্ছাতে অপ্রকাশিত সন্তান প্রকাশিত হইল। গর্ভস্থ সন্তান যেরূপ আভ্যন্তরিক নাড়ীদ্বারা জননীর শোণিত গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করে অব্যক্ত সন্তানও সেইরূপ ঈশ্বরের মধ্যে লুকায়িত থাকিয়া ঈশ্বরের জীবনে জীবিত ছিল; কিন্তু যখন

সন্তান পৃথিবীতে প্রকাশিত হইল তখন কি সে পিতা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া স্বাধীন হইল? ঘটিকা যন্ত্র যেমন ঘটিকা যন্ত্রনির্ম্মাতার শক্তি ও সাহায্য ভিন্ন আপনা আপনি চলিতে পারে, ঈশ্বর সন্তানও কি সেইরূপ ঈশ্বরের শক্তি ও সাহায্য ভিন্ন পৃথিবীতে স্বতন্ত্রভাবে আপনা আপনি কার্য্য করিতে পারে? ঈশ্বর এবং তাঁহার সন্তানের সঙ্গে কি ঘটিকাযন্ত্রনির্ম্মাতা ও ঘটিকা যন্ত্রের ন্যায় সম্পর্ক? না। ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁহার সন্তানের এরূপ সম্পর্ক নহে। ঈশ্বর তাঁহার সন্তানের জীবনের জীবন এবং তিনি তাঁহার সন্তানের সকল শক্তির মূল শক্তি। তাঁহার সন্তান তাঁহাকে ছাড়িয়া এক পদ অগ্রসর হইতে পারে না, একটী চিন্তা করিতে পারে না, একটী কার্য্য করিতে পারে না। পিতাকে দূরে রাখ পুত্রের আর অস্তিত্ব থাকিবে না। পৃথিবীর পিতা পুত্রের সম্পর্ক অপেক্ষাও ঈশ্বর ও তাঁহার সন্তানের সম্পর্ক অত্যন্ত নিগূঢ় এবং অখণ্ড প্রাণযোগে সংযুক্ত। যেমন সূর্য্য ও সূর্য্যরশ্মি, সেই রূপ ঈশ্বরও তাঁহার সন্তান। যেমন সূর্য্যাস্ত হইলে আর সূর্য্যের কিরণ থাকে না সেইরূপ পিতার শক্তির তিরোভাব হইলে আর পুত্রের আবির্ভাব থাকে না। পিতার শক্তি ভিন্ন সন্তানের সাধ্য কি যে এক পদ চলেন? পিতার শক্তি ভিন্ন সন্তানের সাধ্য কি যে একটী সচ্চিন্তা পোষণ করেন কিম্বা একটী সৎকার্য্য করেন? যাঁহারা জ্যোতিঃতত্ত্ব শিখিয়াছেন তাঁহারা জানেন জ্যোতির মূল বদ্ধ করিলে বাহিরের সমস্ত জ্যোতি নির্ব্বাণ হইয়া যায়; সূর্য্য অস্তমিত হইলে অমনি পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। তেমনি পিতা তাঁহার শক্তি প্রত্যাহার করিলে পুত্রের আর কোন ক্ষমতা থাকে না। যতক্ষণ আকাশে সূর্য্য উদিত থাকে ততক্ষণ কোটি কোটি ক্রোশ আলোকে উজ্বলিত; কিন্তু যখনই সূর্য্যের সম্পূর্ণ তিরোভাব হয় তখন আর বিন্দুমাত্র আলোক থাকে না। সেইরূপ যতক্ষণ পিতা পুত্রের মধ্যে বর্ত্তমান ততক্ষণ পুত্রের মহা গৌরব এবং উৎসাহ; কিন্তু পিতা হইতে পুত্রকে বিচ্ছিন্ন কর, পুত্র নিতান্ত অপদার্থ এবং মৃতপ্রায়। বাস্তবিক পুত্র বিনা পিতা থাকিতে পারেন না এবং পিতা বিনা পুত্র থাকিতে পারে না। ঈশ্বর এক, পিতৃত্ব এক। পুত্রত্বও এক। ঈশ্বরের এক আদর্শ পুত্র হইতে বহু পুত্র জন্ম গ্রহণ করিতেছে। রক্ত মাংসের পুত্র ঈশ্বরের পুত্র নহে।

ঈশ্বরের পুত্রত্ব কোন বিশেষ জাতির উপরে নির্ভর করে না। তাঁহার এক পুত্র, তাঁহার এক আদর্শ পুত্র। তাঁহার গৃহে হিন্দু পুত্র নাই, বৌদ্ধ পুত্র নাই, ইংরাজ কিম্বা খ্রীষ্টান্ পুত্র নাই, মুসলমান্ পুত্র নাই। তাঁহার পুত্র আত্মা স্বরূপ এবং তাঁহার অনুরূপ। ঈশ্বর নিজে যেমন হিন্দু, খ্রীষ্টান্ মুসলমান্ কিছুই নহেন, সকল প্রকার বাহ্যিক লক্ষণ ও উপাধি বিবর্জ্জিত, তাঁহার আত্মিক সন্তানও সেইরূপ সকল প্রকার বাহ্যিক লক্ষণ ও উপাধি বিবর্জ্জিত। তাঁহার পুত্রের জাতিভেদ, বর্ণভেদ, কিম্বা ধর্ম্মভেদ নাই। সূর্য্য হইতে যেমন সহস্র সহস্র রশ্মি নির্গত হইয়া সহস্রদিক্ আলোকিত করে; কিন্তু সমুদয় রশ্মিই এক পদার্থ; সেইরূপ ঈশ্বরের এক পুত্রভাব হইতে কোটি কোটি পুত্র জন্ম ধারণ করিয়া জগতের অজ্ঞান ও পাপ দুঃখের অন্ধকার দূর করিতেছে। যেমন প্রকাণ্ড জ্বলন্ত অগ্নি হইতে চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ সকল ধাবিত হয় সেইরূপ এক অনন্ত ঈশ্বর হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গের কিম্বা সূর্য্যরশ্মির ন্যায় তাঁহার ছোট ছোট সন্তানেরা জগতের হিত সাধন করিতেছে। সকলেই তাঁহার এক পুত্রভাব প্রকাশ করিতেছে। যেমন সূর্য্যের কিরণ সূর্য্য হইতে নির্গত হইয়া সমস্ত সৌর জগৎকে আলোকিত করে; কিন্তু কিরণ কোটি কোটি যোজন দূরে গিয়াও বলিতে পারে না যে "এখন আমি সূর্য্য হইতে বহুদূরে আসিয়াছি, এখন সূর্য্য না থাকিলেও আমি আমার কার্য্য করিতে পারি।" সেইরূপ ঈশ্বরের সন্তান স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করিয়াও ঈশ্বরবিহীন হইয়া মুহূর্ত্তের জন্যও কিছুই করিতে পারে না। সন্তানের চিন্তা, ভাব, ইচ্ছা, সকলই তাহার পিতা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত এবং ঈশ্বরেরই। যেমন সূর্য্যের কিরণ সূর্য্য হইতে স্বতন্ত্র নহে, সেইরূপ ঈশ্বরের সন্তান অথবা সেই সন্তানের শক্তি; জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, ও শান্তি ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র নহে। সন্তানের সমস্ত সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য তাহার পিতার সম্পত্তি ঐশ্বর্য্য। সন্তানের নিজের কিছুই নাই। যেমন সূর্য্য বলিতে পারে না আমার কিরণ আমার নহে তেমনি ঈশ্বর বলিতে পারেন না আমার সন্তান আমার নহে। সূর্য্য যেমন কিরণ বিনা থাকিতে পারে না তেমনি পিতা পুত্র ছাড়া থাকিতে পারেন না। জগতে যতগুলি সূর্য্য কিরণ বিকীর্ণ হয় সমুদয়

সূর্য্যের মধ্যে থাকে সেইরূপ জগতে যতগুলি ঈশ্বর সন্তান জন্মগ্রহণ করেন তাঁহারা সকলে অব্যক্ত সন্তানরূপে ঈশ্বরের বক্ষে নিদ্রিত থাকেন। শরীর পৃথিবীর প্রণালী অনুসারে ভৌতিক নিয়মে জন্ম গ্রহণ করে; কিন্তু ঈশ্বরের সন্তান ভৌতিক নিয়মানুসারে জন্ম গ্রহণ করেন না। এই জন্য খ্রীষ্ট শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে মেরীতনয় মহর্ষি ঈশা পবিত্রাত্মার সন্তান। ঈশ্বরের শক্তি, ঈশ্বরের জ্ঞান, ঈশ্বরের প্রেম, ঈশ্বরের পুণ্য এবং ঈশ্বরের শান্তি লইয়া সেই নরোত্তম ব্রহ্মকুমার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তোমার মধ্যে, সমুদয় মনুষ্যের মধ্যে সেই কুমারের ভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডের রাজা ঈশ্বরের সন্তানকে বিশেষ অর্থে কুমার বলা যাইতে পারে। কুমার বলিলেই রাজার মহিমা স্মরণ হয়। রাজার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই, রাজভাব নাই অথচ কুমার ইহা হইতে পারে না। রাজকুমার রাজার গৌরব এবং রাজশ্রী ও রাজ প্রতাপের অধিকারী। প্রত্যেক নর নারী ব্রহ্মকুমার এবং ব্রহ্মকুমারী। অর্থাৎ প্রতি জন ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যের অধিকারী এবং অধিকারিণী। ঈশ্বর-সন্তান ঈশ্বরের সমুদয় প্রকৃতি ও শক্তির অধিকারী। ব্রহ্মতনয় ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কিছুই করিতে পারে না। পিতাকে ছাড়িয়া পুত্র বাঁচিতে পারে না। জগৎকর্ত্তাকে ছাড়িয়া জগৎ এক মুহূর্ত্ত থাকিতে পারে না। মনুষ্য শিশু যত দিন স্তন পান করে তত দিন মাতার উপরে নির্ভর করে, যত দিন অক্ষম থাকে তত দিন পিতার উপর নির্ভর করে, যখন বালক বর্দ্ধিত ও বয়োপ্রাপ্ত হইয়া আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে সক্ষম হয় তখন আর সে পিতা মাতার উপর নির্ভর করে না। এ দৃষ্টান্ত ব্রহ্মতনয়ে খাটিবে না। ব্রহ্মের সঙ্গে ব্রহ্মতনয়ের সেরূপ সম্পর্ক নহে। মনুষ্য-শিশু প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া পিতা মাতাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মতনয় কখনও ব্রহ্মকে ছাড়িয়া বাঁচিতে পারে না। যেমন সূর্য্যের কিরণ সূর্য্যের সঙ্গে চিরসংযুক্ত, সেইরূপ ব্রহ্মতনয় ব্রহ্মের সঙ্গে গূঢ় প্রাণ যোগে চির সম্বদ্ধ। যেমন সূর্য্য নাই অথচ সূর্য্যের জ্যোতি আছে ইহা ভাবা যায় না সেইরূপ ব্রহ্ম নাই অথচ ব্রহ্মতনয় আছে ইহা ভাবা যায় না। ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মতনয় সংযুক্ত। ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মতনয়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভাবা যায় না।

যোগেতে এই অভিন্নতা বিশেষরূপে উপলব্ধ হয়। যোগে পিতাপুত্রের ভেদ থাকে না, সেই এক অনন্ত ব্রহ্ম পুত্রকে গ্রাস করিয়া ফেলেন। তখন জলেতে জল, জ্যোতিতে জ্যোতি। যেমন ক্ষুদ্র নদী সমুদ্রে ঝাঁপ দিলে সেই নদীর আর ক্ষুদ্রতা ও স্বতন্ত্রতা থাকে না সেইরূপ ক্ষুদ্র জীবাত্মা। অসীম সমুদ্র স্বরূপ ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইলে তাহার আর ক্ষুদ্রতা ও স্বতন্ত্রতা বোধ থাকে না। তখন সেই যোগী ব্যক্তি অক্ষয়, অপার ও দুবরগাহ্য। যোগী তখন আপনার জীবন স্বরূপ ক্ষুদ্র গঙ্গার শাদা জল দেখিতে পায় না; কিন্তু উর্দ্ধে নিম্নে, অন্তরে বাহিরে ও চারিদিকে অনন্তজীবন স্বরূপ ব্রহ্মসমুদ্রের গাঢ় সুনীলজল দেখিতে পায়। যোগবিহীন অবস্থায় ভেদজ্ঞান থাকে, যোগে সমস্ত একাকার। অতঃলস্পর্শ ব্রহ্মসমুদ্রে মগ্ন হইয়া যোগীর মন অক্ষয়, অপার ও দুরবগাহ্য হয়। হে মনুষ্য, তোমার দেহ ব্রহ্মতনয় নহে। ব্রহ্মতনয় তোমার দেহের মধ্যে আছে সত্য; কিন্তু ব্রহ্মতনয় তোমার দেহের বাহিরও আছে। কেননা ব্রহ্মতনয় জড়দেহে বদ্ধ নহে। দেহ ব্রহ্মতনয়ের বাড়ী নহে; কলিকাতা, ভারতবর্ষ, এসিয়া কিম্বা ইউরোপ অথবা সমস্ত পৃথিবীও ব্রহ্মতনয়ের পূর্ণ বাসগৃহ নহে, ব্রহ্মতনয় এ সকল দেশে আছেন অথচ এ সকল দেশের অতীত। এই শতাব্দী কিম্বা অন্য শতাব্দী ব্রহ্মতনয়ের সমগ্র জীবন নহে। ব্রহ্মতনয় কালাতীত। প্রকৃত ব্রহ্মতনয় কোন দেশে কিম্বা কোন কালে বদ্ধ নহে; ব্রহ্মতনয় অনন্ত ব্রহ্মের মধ্যে বাস করিতেছেন। ব্রহ্ম স্বয়ং তাঁহার বাসগৃহ। যে ব্রহ্মতনয় বিহঙ্গের ন্যায় এই শরীর পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত চিদাকাশ স্বরূপ ব্রহ্মের মধ্যে বিচরণ করে সেই যোগী আত্মাই যথার্থ আমি। হে ব্রাহ্ম, এই ব্রহ্মতনয় তত্ত্ব অতি অদ্ভুত তত্ত্ব, অতি মধুর তত্ত্ব। এই তত্ত্ব সাধন কর, এই তত্ত্বরস আস্বাদন কর, অপার ও বিশুদ্ধ সুখ লাভ করিবে।

সেবকের নিবেদন।

ধর্ম্ম স্বাভাবিক।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার, ১০ ই শ্রাবণ, ১৮০৩ শক।

হে ব্রহ্মভক্ত, তুমি যেরূপ সাধন কর না কেন তুমি কদাচ স্বভাবের বিরোধী হইও না। স্বভাব ঈশ্বরের ভাব, অতএব স্বভাবকে অবহেলা করিও না। ভক্তির সহিত স্বভাবের দেবতাকে পূজা কর। ব্রহ্মপ্রকৃতিকে পূজা কর। স্বভাবের স্রোতে আপনাকে ছাড়িয়া দেও। কেন না স্বভাব ও ব্রহ্মেতে প্রভেদ নাই। প্রকৃতি দেবী ঈশ্বরের শক্তি। স্বভাব শব্দের অর্থ আত্মার ভাব। স্ব শব্দের অর্থ ব্রহ্ম অথবা পরমাত্মা; সুতরাং স্বভাব অর্থ ব্রহ্মের ভাব, ঈশ্বরের ভাব। বাস্তবিক স্বভাব দেবভাব। যিনি স্বভাবের বিরুদ্ধে খড়্গাহস্ত হইলেন তিনি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে খড়্গাহস্ত হইলেন। যিনি স্বভাবের নিয়ম লঙ্ঘন করিতে প্রস্তুত তিনি ঈশ্বরকে কাটিতে উদ্যত। যিনি স্বভাবের বন্ধু তিনি ঈশ্বরের বন্ধু, যিনি স্বভাবের শত্রু তিনি ঈশ্বরের শত্রু। যাহা অস্বাভাবিক তাহা ঈশ্বরের বিরুদ্ধ, যাহা স্বাভাবিক তাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত এবং অনুমোদিত। যে ব্যক্তি স্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থিত সে ঈশ্বরের ধর্ম্ম পথে চলিতেছে, আর যে অস্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থিত সে ধর্ম্মভ্রষ্ট। স্বভাবই ধর্ম্ম, স্বভাব লঙ্ঘন অধর্ম্ম। আত্মার স্বভাব, ধর্ম্ম, পবিত্রতা, স্বর্গ, মুক্তি একই পদার্থ। পক্ষান্তরে স্বভাব হইতে বিচ্যুতি, অথবা আত্মার বিকার, পাপ, নরক একই কথা। অতএব হে প্রকৃত ধর্ম্মার্থী, তুমি স্বাভাবিক ধর্ম্মে ধার্ম্মিক হও। নববিধান স্বভাবের ধর্ম্ম। প্রকৃত নববিধানবাদী স্বভাব

মন্ত্রে দীক্ষিত, স্বভাবের অন্যথাচরণ করা তিনি পাপ মনে করেন। কুটিল, অস্বাভাবিক পথকে নববিধানবাদী ঘৃণা করেন, তিনি সহজে, স্বভাবতঃ তাঁহার সরল হৃদয়ে হরিপাদপদ্ম ধারণ করেন। যদি প্রকৃত ঈশ্বরকে চাও তবে স্বভাবকে অবজ্ঞা করিও না। স্বাভাবিক না হইলে, সহজ মানুষ না হইলে কেহই ঈশ্বরের ভাব বুঝিতে পারে না। অস্বাভাবিক, বিকৃত লোকেরা ঈশ্বর হইতে বহু দূরে। স্বভাব আমাদিগের গুরু। সরলস্বভাব ধ্রুব নারদ প্রভৃতি স্বভাবসিদ্ধ ভক্তগণের নিকট দীক্ষিত হন। হে ঈশ্বরার্থী, তুমি স্বভাবের পথে চলিলে ঈশ্বরকে পাইবে। যদি তুমি স্বভাবের সহজ পথ পরিত্যাগ করিয়া তোমার আপনার বিকৃত কল্পনা অনুসারে কোন প্রকার অস্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রণালী অবলম্বন কর তাহা হইলে তুমি প্রকৃত ঈশ্বরকে পাইবে না। উপাসনার সময় তোমার মুখ ভঙ্গীতে কিম্বা হস্ত, পদ, মস্তকাদি চালনাতে যদি কিছু অস্বাভাবিক থাকে, অথবা তোমার কণ্ঠের স্বর যদি কিঞ্চিন্মাত্র ও বিকৃত হয় তাহা হইলে স্বভাবের ধর্ম্ম নববিধান বলিবেন; "এ ব্যক্তি আমার ছাত্র নহে।" যদি যথার্থ জীবন্ত ঈশ্বরের সাধক হইতে চাও তবে স্বভাব বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে। অস্বাভাবিক সমস্ত পরিত্যাগ করিলে তবে প্রকৃতরূপে ধর্ম্মসাধন আরম্ভ করিতে উপযুক্ত হইবে। অতএব হে সাধনার্থী, সাধনের পূর্ব্বে তোমার শরীর, মন, হৃদয়, আত্মা সমস্ত স্বাভাবিক অবস্থায় আছে কি না পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। সর্ব্ব প্রথমে শরীরকে কোন প্রকার অস্বাভাবিক কৃচ্ছ্র সাধনে নিযুক্ত করিবে না, সাধনের সময় যে ভাবে শরীরকে রাখিলে স্বভাব সন্তুষ্ট হয় সেই ভাবে শরীরকে রাখিবে। যদি কোনভাবে বসিলে শরীরের কষ্ট হয় সে ভাবে বসিবে না। চক্ষু নাসিকা প্রভৃতিকে কোন প্রকার অস্বাভাবিক, উৎকট অবস্থায় অবস্থিত [illegible]তে দিবে না। যে ভাবে মস্তক, হস্ত, পদ, চক্ষু, নাসিকা প্রভৃতি রাখিলে [illegible]নুদ্বেগ ও [illegible] থাকে সেই ভাবে শরীরের অঙ্গ সকল রাখিবে। সর্ব্বতোভাবে স্বভাবের সঙ্গে মিলিয়া ধর্ম্ম সাধন করিবে। অস্বাভাবিক ধর্ম্ম প্রকৃত ধর্ম্ম নহে। প্রকৃতি ঈশ্বরের শক্তি, প্রকৃতি সহজে ঈশ্বরের ইচ্ছা, রুচি, ও অনুরাগ প্রদর্শন করেন, অতএব প্রকৃতিদেবী আমাদিগকে যে

শিক্ষা দান করেন তদনুসারে চলিলেই আমরা প্রকৃত ঈশ্বরকে লাভ করিব এবং আমাদিগের ধর্ম্ম প্রকৃতিমূলক সত্যধর্ম্ম হইবে। যদি প্রকৃতির বিরুদ্ধে, অর্থাৎ ঈশ্বরের শক্তির বিরুদ্ধে আমরা কোন প্রকার কল্পিত ধর্ম্মসাধন করি তাহা হইলে আমাদিগের বিকৃতি ও মৃত্যু হইবে। স্বভাবের বিরোধই বিকার। জীবনের সকল বিষয়ে ও সকল কার্য্যে যদি আমরা বুঝিতে পারি যে আমরা স্বভাবের অধীন অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন রহিয়াছি তাহা হইলে আমাদিগের মনে স্ফূর্ত্তি ও শান্তি থাকে। আর যখনই আমরা স্বভাবভ্রষ্ট হই, যখনই স্বেচ্ছাচারী হইয়া ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন প্রকার অস্বাভাবিক ধর্ম্মব্রত পালনে উদ্যত হই তখন কিছুতেই আমাদিগের মনে স্ফূর্ত্তি ও আনন্দ থাকে না।

ঈশ্বর দর্শন যে এত বড় ব্যাপার ইহা যদি স্বাভাবিক হয় তবেই সাধকের কল্যাণ হয়, ইহা যদি অস্বাভাবিক হয় তবে সাধকের জীবনে অনেক বিপদের আশঙ্কা। ব্রহ্মদর্শনের সময়, ধ্যানের সময় কত লোক মুখকে বিকটাকার করে, চক্ষুকে ঊর্দ্ধদিকে টানিয়া লয় এবং নানা প্রকার ভয়ঙ্কর অঙ্গ ভঙ্গী করে, এবং কেহ কেহ নিঃশ্বাস বন্ধকরে, কিন্তু এ সকল অস্বাভাবিক উপায়ে কদাচ ব্রহ্ম দর্শন হয় না। যেমন সহজে ও স্বাভাবিক নিয়মে শরীরের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন হয় সেইরূপ সহজে ও স্বভাবতঃ যদি জীবাত্মা পরমাত্মাকে দেখিতে পায় সেই দর্শনই যথার্থ ব্রহ্মদর্শন। চক্ষু যেমন সহজে সৃষ্টি ও সৃষ্টির সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়, শ্রোত্র যেমন সহজে বাহিরের শব্দ ও সঙ্গীতাদি শ্রবণ করে, হস্ত যেমন সহজে বাহিরের বস্তুসকল স্পর্শ করে, সেইরূপ অন্তরের বিশ্বাস চক্ষু যখন সহজে ব্রহ্মদর্শন করে, অন্তরের বিবেককর্ণ যখন সহজে ব্রহ্মবাণী শ্রবণ করে, এবং হৃদয়ের ভক্তি হস্ত যখন সহজে ব্রহ্ম পাদপদ্ম স্পর্শ করে, সেই সহজ অবস্থায় দর্শণ, শ্রবণ, স্পর্শ সকলই যথার্থ ও অকৃত্রিম। তখন স্বভাব আপনি বলিয়া দেয় "হাঁ, ঠিক ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মশ্রবণ, ও ব্রহ্মস্পর্শ হইয়াছে।" নতুবা নানাপ্রকার কষ্টে মস্তিষ্ক আলোড়ন এবং চিত্ত বিলোড়ন করিয়া যে ব্রহ্মদর্শন করিবার চেষ্টা তাহা অস্বাভাবিক এবং বিফল। সে কাল্পনিক ব্রহ্মদর্শন, সেই দর্শন হইতে অমৃত উৎপন্ন না হইয়া বরং বিষ এবং মৃত্যু উৎপন্ন হয়। সেই কাল্পনিক ব্রহ্মদর্শন

শত্রুর প্রদত্ত বিষাক্ত ফল। অস্বাভাবিক কিছুই ভাল নহে। যাহারা অস্বাভাবিকরূপে যোগ, ধ্যান অথবা ব্রহ্মদর্শন করিতে চেষ্টা করে তাহারা আত্ম প্রবঞ্চিত হয়। কোন কোন ভ্রান্ত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোকেরা চক্ষু মুদ্রিত ও নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া ব্রহ্মকে এক প্রকার জ্যোতিঃ স্বরূপ কল্পনা করে এবং নানাপ্রকার চমৎকার জ্যোতিঃ দর্শনের গল্প করিয়া জগৎকে আশ্চর্য্য করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু সে সমস্ত দর্শন অসত্যমূলক, সুতরাং তদ্দ্বারা মুক্তি ও অনন্ত জীবন লাভের প্রত্যাশা নাই। যথার্থ ব্রহ্মদর্শন সহজ ও স্বাভাবিক। যেমন চক্ষু খুলিলেই সম্মুখস্থ গোলাপ কিম্বা পদ্ম দেখিতে পাই তেমনই অন্তরের চক্ষু খুলিয়া সহজে সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মকে দেখিয়া বলি "ব্রহ্ম, তুমি আছ।" তখনই যথার্থ ব্রহ্মদর্শন হয়। যুক্তি, তর্ক ও বিচার করিয়া ব্রহ্মের অস্তিত্ব নিষ্পন্ন করা প্রকৃত ব্রহ্ম দর্শন নহে। যখন ব্রহ্মদর্শন হয় তখন তাহা অতি সহজে হয়। এক নিমেষের মধ্যে ব্রহ্ম দর্শন হয়। নতুবা এক বৎসর কিম্বা এক শতাব্দীতেও ব্রহ্মদর্শন হয় না, কেননা ব্রহ্ম কেবল স্বাভাবিক সরল সাধকের নিকটেই আত্ম স্বরূপ প্রকাশ করেন। কুটিল অস্বাভাবিক লোক বহুকাল সহস্র প্রকার কৃচ্ছ্র সাধন করিয়াও তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারে না। ঈশ্বর সরলতার বন্ধু। মহাপাপীও যদি সরল অন্তরে তাঁহাকে ডাকে ঈশ্বর তাহাকে দর্শন দেন, আর ধর্ম্মাড়ম্বর-প্রিয় কুটিল ব্যক্তি যদি লক্ষবার তাঁহাকে ডাকে তথাপি সে তাঁহার দেখা পায় না।

যেমন ঈশ্বর দর্শন সহজ ও স্বাভাবিক সেইরূপ চিত্তশুদ্ধি লাভ করাও সহজ এবং স্বাভাবিক। যখন হইবার তখন এক মিনিটের মধ্যে হৃদয় পরিবর্ত্তিত হয়; আর যাহার সহজে শুদ্ধ হইবার ইচ্ছা না হয় সে বহুকাল নানা প্রকার কঠোর সাধন করিলেও জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে না। যদি তেমন ইচ্ছা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বল হয় এক পলকের মধ্যে রিপু জয় করিতে পারিবে, আর যদি তেমন ইচ্ছা ও সংকল্প না হয় তবে যুক্তি ও বাহ্যিক সাধন দ্বারা দশ বৎসরেও ইন্দ্রিয়দমন করিতে পারিবে না। একবার যদি দুর্জ্জয় ব্রহ্মবলে বলী হইয়া জোরের সহিত বলিতে পার আর মনের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মায়া, অহঙ্কার, হিংসা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি কিছুই পোষণ করিব না,

তখনই এ সকল দুরন্ত রিপু তোমার হৃদয় হইতে পলায়ন করিবে। তখন দেখিবে আর তোমার মনে আসক্তি নাই, রাগ নাই হিংসা নাই এবং শরীরে অন্য কোন প্রকার রিপুর উত্তেজনা ও জ্বালা নাই। এইরূপে যদি পার এক মিনিটে মনসংযম এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিতে পারিবে নতুবা চল্লিশ বৎসরেও পারিবে না। যেমন ইচ্ছা হইলেই পলকের মধ্যে দাঁড়াইতে পার, কিম্বা উপর দিকে হাত তুলিতে পার তেমনই ইচ্ছা হইলেই বিপথ হইতে সুপথে পাপ হইতে পুণ্যের দিকে মনকে ফিরাইতে পার। যেমন শরীর সঞ্চালন সহজ ও স্বাভাবিক তেমনি মন পরিবর্ত্তন সহজ ও স্বাভাবিক। ঐ তোমার সমক্ষে পুষ্প পল্লবে সজ্জিত একটী সুন্দর বৃক্ষ রহিয়াছে, যদি তুমি ইচ্ছা কর পলকের মধ্যে তাহা দেখিতে পাইবে, তাহা দেখিবার জন্য চক্ষু ঘর্ষণ কিম্বা অন্য কোন প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে হইবে না। সহজে শীঘ্রই তাহা দেখিতে পাইবে। এই মন্দিরের মধ্যে যাঁহারা উপস্থিত আছেন তাঁহাদিগের মধ্যে কি কেহ বলিতে পারেন বস্তু দর্শন বহু আয়াস সাধ্য এবং কাল সাপেক্ষ? সকলেই একবাক্যে বলিবেন বস্তু দর্শন অতি সহজ, অনয়াস সিদ্ধ এবং কিছুমাত্র সময়সাপেক্ষ নহে। হে নির্ব্বোধ মন, যদি বাহিরের ও দূরের বস্তু অতি সহজে ও অল্প সময়ের মধ্যে দেখা যায়, তবে যিনি তোমার প্রাণের প্রাণ, যিনি তোমার অন্তরতম, নিকটতম, তাঁহাকে দর্শন করিতে কি তোমার অধিক সময় লাগিবে? ব্রহ্মদর্শন সময়ের অতীত। নিমেষের মধ্যে ব্রহ্মদর্শন হয়। যদি একবার সরলভাবে হরিকে ডাকিতে পারে তবে নিমেষে পাতকী স্বর্গে গিয়া ব্রহ্মদর্শন লাভ করে। "হে ব্রহ্ম পদার্থ, তুমি অত্যন্ত নিকটে আছ, অথচ আমাদিগের বিকৃত মন তোমাকে দেখিতে পাইতেছে না। চক্ষের সম্মুখে তুমি রহিয়াছ অথচ আমরা চক্ষু রগড়াইতেছি। নির্ম্মল স্বচ্ছ স্বভাবকে আমরা বিকৃত ও মলিন করিয়াছি তাই আমাদিগের এই দুর্দ্দশা।" মনের সহজ অবস্থায় ব্রহ্মদর্শন সহজ, আর বিকৃত অবস্থায় ব্রহ্মদর্শন অসম্ভব। যেমন ব্রহ্মদর্শন সহজ ও স্বাভাবিক তেমনই ব্রহ্মবাণী শ্রবণ এবং ব্রহ্ম স্পর্শও সহজ এবং স্বাভাবিক। যেমন শরীরের কাণ পাতিয়া থাকিলেই বাহিরের শব্দ শুনিতে পাই সেইরূপ ভিতরের বিবেক কান

পাতিয়া রাখিলে অতি সহজে আমরা ব্রহ্মবাণী শুনিতে পাই, আর যদি পাপের কুমন্ত্রণা ও কোলাহল শুনিতে শুনিতে বধির হই কিম্বা বিবেক কর্ণকে বদ্ধ রাখি তবে লক্ষ বৎসরেও ব্রহ্মবাণী শ্রবণ হইবে না। নির্ম্মল বিবেক যেমন সহজে ব্রহ্মবাণী শ্রবণ করে, ভক্তিহস্ত তেমনি সহজে ব্রহ্মপাদস্পর্শ করে। অস্বাভাবিক অবস্থায় ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মবাণী শ্রবণ, ব্রহ্মস্পর্শ সকলই অসম্ভব। মন স্বাভাবিক থাকিলে এক পলকের মধ্যে ব্রহ্ম দর্শন, ব্রহ্মশ্রবণ এবং ব্রহ্মস্পর্শ হয়, আর মন বিকৃত থাকিলে চল্লিশ বৎসরেও দর্শন, শ্রবণ স্পর্শ কিছুই হয় না। বাস্তবিক ঈশ্বরের রাজ্যে চল্লিশ বৎসর অপেক্ষা এক শুভ মুহূর্ত্তের মূল্য অধিক। পৃথিবীর চল্লিশ বৎসর অপেক্ষা স্বর্গের এক মিনিট অধিক মূল্যবান্ ইহাতে আর সন্দেহ কি? অনেকেই এই কথা জানেন যে অল্প সময়ের মধ্যে একখানি দীর্ঘ চিঠী লেখা যাইতে পারে; কিন্তু সংক্ষেপে একখানি ভাল পত্র লিখিতে অধিক সময়ের প্রয়োজন। অল্পসময়ে বাহুল্য লেখা হয়; কিন্তু ভাল লেখাতে অধিক সময় লাগে। খুব বুদ্ধি চালনা এবং বিচার করিয়া লিখিতে হইলে অধিক সময়ের আবশ্যক; কিন্তু হৃদয়ের ভাবে চালিত হইয়া লিখিলে অল্প সময়ের মধ্যে ও সহজে ভাল লেখা যায়। সেইরূপ যাহারা বুদ্ধি ও যুক্তি দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপণ করিতে চায় তাহাদিগের অনেক সময়ের প্রয়োজন, কিন্তু যাহারা সরল হৃদয় তাহারা অনায়াসে পলকের মধ্যে ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মশ্রবণ এবং ব্রহ্মস্পর্শ, করে। পৃথিবীর বুদ্ধির লক্ষ বৎসর অপেক্ষা স্বর্গের সরলতার এক পলকের মূল্য অধিক। পৃথিবীর ঘড়ী, কলিযুগের ঘড়ী নরকের সময় রাখিতেছে। এ সকল ঘড়ী স্বর্গের শুভ মুহূর্ত্ত প্রকাশ করিতে পারে না। তুমি শাক্য ও ঈশাকে জিজ্ঞাসা কর পাপ জয় করিতে কত সময় লাগে। তাঁহারা বলিবেন এক মিনিট। দুর্জ্জয় তেজের সহিত ঈশা বলিলেন "দূর হও, সয়তান্" আর এক মিনিটের মধ্যে চির কালের জন্য সয়তান ঈশাকে পরিত্যাগ করিল। সেইরূপ তেজস্বী শাক্য দৈব প্রতাপের সহিত বলিলেন "দূর হও লোভ," আর মার তৎক্ষণাৎ চিরকালের জন্য শাক্যকে পরিত্যাগ করিল। প্রত্যেক সাধু বলিবেন হয় সহজে ও এক মিনিটে রিপু দমন করিবে নতুবা ত্রিশ হাজার বৎসরেও রিপুজয় করিতে পারিবে না। অস্বাভাবিক উপায়ে

প্রকৃতরূপে ব্রহ্মদর্শন কি মনঃ সংযম কিছুই হয় না। স্বভাব লঙ্ঘন করিয়া, ঈশ্বরের ইচ্ছা অতিক্রম করিয়া যদি তুমি আপনি আপনার পরিত্রাণের ভার গ্রহণ কর তাহা হইলে তোমার যত্ন বিফল হইবে। ঈশ্বরাধীন, স্বভাবাধীন হইয়া যদি সাধন কর তবে এক শুভ মুহূর্ত্তে, এক শুভলগ্নে তুমি সিদ্ধ হইবে আর যদি স্বভাবের বিরুদ্ধে তুমি চল্লিশ বৎসর সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া থাক, উপবাস কর, জাগরণ কর, কিম্বা কণ্টক শয্যায় শয়ন কর, অথবা গ্রীষ্মকালে অগ্নির মধ্যে বাস এবং শীতকালে জলের মধ্যে বাস কর কিম্বা উর্দ্ধবাহু হইয়া থাক তথাপি প্রকৃত চিত্তশুদ্ধি এবং ব্রহ্মলাভ করিতে পারিবে না। সহজ স্বাভাবিক সাধনে পলকের মধ্যে সিদ্ধি লাভ করিবে, আর অস্বাভাবিক সাধনে শতবর্ষেও কিছু হইবে না। বিধাতা কি বিলম্বে কার্য্য করেন? না। তিনি একেবারে পলকের মধ্যে মহাব্যাপার সকল সম্পন্ন করেন। তাঁহার বিধি পলকের বিধি। যিনি কালাতীত, তাঁহার সময়ের প্রয়োজন কি? তিনি নিত্য, তিনি যাহা করেন একেবারে করেন। যেমন পলকের মধ্যে বিদ্যুৎ ছুটে তেমনি পলকের মধ্যে সমস্ত বিশ্বময় তাঁহার দয়া ও শক্তি ছুটিতেছে। তিনি এক শতাব্দীতে অমুক জাতির মধ্যে, অন্য শতাব্দীতে আর এক জাতির মধ্যে, অদ্য এই নগরে কল্য ঐ নগরে প্রবেশ করিলেন তাহা নহে। তাঁহার কার্য্যপ্রণালী এরূপ নহে। তিনি অপরিবর্ত্তনীয়, সুতরাং সময়ে তাঁহার পরিবর্ত্তন অসম্ভব। পলকের মধ্যে তিনি ভক্তকে দর্শন দেন, পলকের মধ্যে তিনি পাপীর উদ্ধার করেন। তাঁহার ইঙ্গিতে ভক্ত পলকের মধ্যে ভবসাগর পার হইয়া যায়। পলকের মধ্যে নিত্যানন্দের জাহাজ ভবসাগরের এ পার হইতে ও পারে চলিয়া যায়। যখন মন প্রকৃতিস্থ হয়, যখন মন ব্রহ্মযোগে যোগী হয় তখন পলকের মধ্যে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে স্বর্গের সুধা পান করি। এই পলকতত্ত্ব বড় মধুর তত্ত্ব। পলকেতে ব্রহ্মের সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, কোন কার্য্য সমাধা করিতে ব্রহ্মের চেষ্টা কিম্বা বিলম্ব হয় না। বিদ্যুৎ অপেক্ষাও ব্রহ্মের কৃপা দ্রুতগামিনী। তাড়িতের গতি অপেক্ষাও ব্রহ্মকৃপার গতি ভক্তকে অধিক বিস্মিত করে। এই অর্দ্ধ মিনিট আগে পাপী নরকের গভীরতম স্থানে পতিত ছিল, আর ব্রহ্মকৃপা বলে এখনই সে আনন্দময়ীর চরণে উপস্থিত। স্বর্গের প্রত্যেক

ব্যাপার এইরূপে অতি অল্প সময়ের মধ্যে হয়। পলক অশ্বের উপরে আরোহণ করিয়া ভক্ত নিমেষের মধ্যে স্বর্গে প্রবেশ করিয়া ঈশা যুধিষ্ঠির প্রভৃতির সঙ্গে সম্মিলিত হয়। পলকের মধ্যে ভক্ত সমস্ত স্বর্গ দর্শন করেন, এবং পলকের মধ্যে ভক্ত সমস্ত শ্রীমদ্ভাগবৎ শ্রবণ করেন। এই পলক তত্ত্ব বিশ্বাস কর, কৃতার্থ হইবে। পলকের মধ্যে এ পাপরাজ্য ছাড়িয়া আনন্দময়ী মাকে দেখিতে যাও। মাকে দেখিতে যাইতে দেরি করিও না।

সেবকের নিবেদন।

মহাজন মানব জাতির প্রতিনিধি।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার, ১৭ ই শ্রাবণ, ১৮০৩ শক।

লোকবিশেষে বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ হয় এবং ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান হয়। যাহা সাধারণ মনুষ্যমণ্ডলীসম্পর্কে ভবিষ্যৎ, প্রেরিত প্রত্যাদিষ্ট দ্বিজাত্মাদিগের নিকটে তাহা বর্ত্তমান। তোমরা বারংবার শুনিয়াছ ভবিষ্যদ্বংশ প্রেরিত-দিগের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে। যাঁহারা ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রেরিত মহাপুরুষ নাম লইয়া আসেন তাঁহারা ভবিষ্যতের লোক অর্থাৎ তাঁহারা উন্নত ভবিষ্যদ্বংশের প্রতিনিধি। বহু শতাব্দী পরে যে সকল আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা বিধাতার নিগূঢ় নিয়মানুসারে মহাপুরুষেরা অকালে সে সকল ঘটনা সঙ্ঘটন করেন। রজনীতে সূর্য্যোদয় একটি অসম্ভব এবং অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার; কিন্তু মহাপুরুষের অভ্যুদয়ে বাস্তবিক পৃথিবীর ঘোর অজ্ঞান এবং অধর্ম্মের অন্ধকার রজনীর মধ্যে জ্ঞান ও ধর্ম্মসূর্য্যের উদয় হয়। যখন সমস্ত পৃথিবী ভয়ানক সংসারাসক্তিরূপ শীতে জীর্ণ শীর্ণ, সেই সময় যদি স্বর্গ হইতে কোন বৈরাগী মহাপুরুষ পৃথিবীতে পদার্পণ করেন পৃথিবী তখনই পুণ্যের তেজ এবং বৈরাগ্যের উত্তাপ অনুভব করে। প্রেরিত মহাপুরুষের অভ্যুদয়ে পৃথিবী স্বর্গ এবং মনুষ্য দেবতা হয়। মহাপুরুষেরা পৃথিবীর রথকে শীঘ্র শীঘ্র স্বর্গের দিকে টানিয়া লইয়া যান। শত শত বৎসর পরে, সহস্র সহস্র বৎসর পরে পৃথিবী কিরূপ হইবে মহাপুরুষেরা তাহার পূর্ব্বাভাস দেখাইয়া যান। দুই সহস্র বৎসর পরে পৃথিবী কিরূপ হইবে মহর্ষি ঈশা তাঁহার জীবনে তাহার পূর্ব্বাভাস দেখাইয়া গিয়াছিলেন।

চারিশত বৎসর পরে ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ বঙ্গদেশ কিরূপ হইবে নবদ্বীপে মহাত্মা শ্রীগৌরাঙ্গ তাহার পূর্ব্বাভাস প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে বহু ইংরাজী বিদ্যা অধ্যয়ন এবং ইউরোপীয় সভ্যতা দ্বারা যে সকল সুফল ঘটিতেছে, চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গ তাহার পূর্ব্ব সূচনা করিয়া গিয়াছেন। যে দেশে জাতিভেদের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব ছিল সেখানে উক্ত মহাত্মা তাঁহার প্রগল্‌ভা ভক্তি এবং উদার প্রেম বলে জাতিভেদ উঠাইয়া দিলেন। বাস্তবিক সাধু মহাজনের জীবনে ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান হইয়া যায়। সহস্র সহস্র বৎসর পরে পৃথিবী কিরূপ পবিত্র ও উন্নত হইবে সাধু মহাজনেরা তাহার আদর্শ দেখাইয়া দেন। ভবিষ্যৎ কালে পৃথিবী নিশ্চয়ই স্বর্গ হইবে ইহাকেবল তাঁহারাই দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত প্রচার করেন। তাঁহারাই কেবল স্বর্গীয় উৎসাহের সহিত আশাপূর্ণ হৃদয়ে বিশ্বাসবিহীন নিরাশ পৃথিবীকে বলেন ;—"সম্মুখে স্বর্গরাজ্য, পশ্চাতে চেও না ফিরে।" তাঁহারা নির্জ্জীব অলস পৃথিবীকে দ্রুতবেগে স্বর্গের দিকে টানিয়া লইয়া যান। এই কিছুকাল পূর্ব্বে পৃথিবী বাল্যাবস্থায় ছিল ; কিন্তু যখনই পৃথিবীতে এক জন মহাপুরুষ অভ্যুদিত হইলেন দেখিতে দেখিতে পৃথিবী যৌবনাবস্থা লাভ করিল। পৃথিবীর রথ কিরূপে এত দূর দৌড়িয়া আসিল ? ঘড়ীর কাঁটা এত শীঘ্র কিরূপে স্থানান্তরিত হইল ? বাস্তবিক ঈশ্বর-প্রেরিত প্রত্যাদিষ্ট মহাজন বিদ্যুৎ অপেক্ষাও দ্রুতবেগে মানবহৃদয়কে আন্দোলিত ও সঞ্চালিত করেন। মহাজনদিগের সতেজ আত্মা নির্জ্জীবকে নবজীবন দান করে, নিরুৎসাহকে অগ্নিময় উৎসাহে পূর্ণ করে। যখন এক জন প্রেরিত মহাজন পৃথিবীর বক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া দুর্জ্জয় তেজ এবং অটল বিশ্বাসের সহিত ঈশ্বরের সত্য প্রচার এবং ঈশ্বরের বাক্য উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করেন, তখন সহস্র সহস্র লোক সে সকল কথা শুনিয়া চমকিত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে এবং দ্রুতবেগে স্বর্গের দিকে ধাবিত হয়। শত শত লোক আসিয়া সেই মহাজনমুখবিনির্গত সে সকল অমৃতময় এবং অভ্রান্ত কথা পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া দেশ দেশান্তরে প্রেরণ করে। তাঁহার প্রচারিত নিগূঢ় স্বর্গীয় তত্ত্বকথা প্রচার করিবার জন্য চারিদিকে দূত-সকল প্রেরিত হয়। দূতদিগের মুখে এবং পুস্তকাদি পাঠে ঐ সকল আশু

পরিত্রাণপ্রদ সংবাদ লাভ করিয়া কোটি কোটি নর নারী অতি সহজে এবং স্বভাবতঃ ঈশ্বরের দিকে আকৃষ্ট হয়। সহস্র সহস্র বৎসরেও যাহা হইবার সম্ভাবনা ছিল না মহাপুরুষের শিক্ষা ও যত্নে তিন বৎসরের মধ্যে সে সকল অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। মহাজন দেশ কাল অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ দেশাচার এবং সময়ের স্রোতের বিরুদ্ধে মহাতেজের সহিত ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করেন। দূরস্থ ভবিষ্যৎ মহাজনের জীবনে বর্ত্তমান হয়। মহাজনের আগমনে পৃথিবীর উন্নতির রথ ভয়ানক নক্ষত্র বেগে ছুটিতে থাকে। দুই তিন বৎসরের মধ্যে দুই তিন সহস্র বৎসরের কার্য্য সমাধা হইয়া যায়। মহাপুরুষের তেজ দেখিয়া ভবিষ্যৎ বলে "আমি বর্ত্তমান হইলাম।" দুই সহস্র বৎসরপরে পৃথিবী যাহা বলিবে এক জন মহাজন দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর প্রতিনিধি হইয়া তাহা বলেন। মহাজনের ভবিষ্যদ্বাণী অভ্রান্ত। ঈশ্বর স্বয়ং মহাজনের হৃদয়কে হস্তগত করিয়া জগতের নিকট তাঁহার ভবিষ্যৎ স্বর্গরাজ্যের শোভা প্রকাশিত করেন। মহাজন আপনার চরিত্রে এবং আপনার জীবনে প্রচুর পরিমাণে স্বর্গের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত করেন। মহাজনের আত্মার স্বর্গীয় লাবণ্য দেখিয়া দূতগণ দেশ দেশান্তরে গমন করিয়া বলে; "হে ভাই ভগিনীগণ, আমরা অমুক নগরে এক আশ্চর্য্য মানুষ দেখিয়া আসিলাম, যেমন তাঁহার চরিত্রের উৎকর্ষ, তেমনই তাঁহার আশ্চর্য্য উপদেশ দান করিবার ক্ষমতা; তাঁহার স্বর্গীয় জীবন দেখিয়া সহস্র সহস্র লোক দ্রুত বেগে স্বর্গের দিকে ধাবিত হইতেছে।" বাস্তবিক প্রত্যেক মহাজন স্বর্গের পূর্ব্বাভাস প্রকাশ করেন। পৃথিবী যে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই স্বর্গ হইবে মহাজন আপনার জীবন দ্বারা তাহা সপ্রমাণ করেন। একজন মহাপুরুষ যদি বলেন "এই আমার বৈরাগ্য ও সংসারত্যাগে পৃথিবীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল" বাস্তবিক তাহাই হইল। মহাপুরুষের সে উক্তি মিথ্যা হইতে পারে না। অন্ধ অল্পবিশ্বাসী পৃথিবী হয়ত মহাপুরুষের উক্তি অবিশ্বাস পূর্ব্বক উপহাস করিয়া তাঁহাকে বলে;—"হে সাধুসজ্জন, তুমি বল তোমার বৈরাগ্যে তোমারই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। তোমার প্রায়শ্চিত্তে কি রূপে সমুদায় পৃথিবীর প্রায়শ্চিত্ত হইবে?" কিন্তু বিশ্বাসী ভবিষ্যদ্বংশ এক দিন মহাপুরুষের সেই

উক্তির তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবে। বস্তুতঃ প্রত্যাদিষ্ট হইয়া এক জন মহাপুরুষ যে ক্রিয়া সম্পাদন করেন সমস্ত পৃথিবী তাহার ফলভোগী হয়। এক জন মহাপুরুষ বলিলেন "পৃথিবী তৃষিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে স্বর্গরাজ্য কবে আসিবে ?" সাধু মুখে এই কথা শুনিয়া অল্পবিশ্বাসীরা বলিল ;—"হে সাধু, 'পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য কবে আসিবে ?' এ কথা কেবল তুমিই জিজ্ঞাসা করিতেছ, পৃথিবীর দুর্গতি দেখিয়া তোমারই মনে খেদ হইতেছে ; পৃথিবী বাস্তবিক দুঃখিত হইয়া এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে না।" অল্প বিশ্বাসীরা মহাজনের মহাবাক্য সকলের গূঢ় অর্থ বুঝিতে পারে না ; কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসীরা জানেন মহাজনই পৃথিবী, কেন না তিনি উন্নত মানবমণ্ডলীর প্রতিনিধি। মহাজন ভবিষ্যতের সন্তান। তিনি আজ যাহা বলিলেন পৃথিবী চারি সহস্র, আট সহস্র কিংবা ততোধিক সময় পরে তাহাই বলিবে। মহাজনের পরিণামদর্শী দিব্য চক্ষের নিকটে ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, সুতরাং তিনি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন তাহা পৃথিবীর প্রশ্ন বলিয়া তিনি প্রকাশ করিতে পারেন। যদি এক জন মহাপুরুষ বলেন, পৃথিবীর পাপ দুঃখের জ্বলন্ত অনল নির্ব্বাণ হইল, বিশ্বাস করিতে হইবে যে বাস্তবিক পৃথিবীর জলন্ত অনল নির্ব্বাণ হইবার সূত্রপাত হইল। যখন ধর্ম্মবীর শাক্যসিংহ প্রতিভা লাভ করিয়া দুর্জ্জয় সাহসের সহিত বলিলেন "আজ পৃথিবীর ত্রিতাপ নির্ব্বাণ হইল, আজ পৃথিবীর দুঃখাগ্নিতে শান্তিবারি বর্ষিত হইল।" তখন তিনি বাস্তবিক সমস্ত পৃথিবীর প্রতিনিধি হইয়া ঐ কথা বলিয়াছিলেন। সেইরূপ যখন মহর্ষি ঈশা জর্দ্দান নদীর জলে অবগাহন করিয়া বলিলেন "আজ পৃথিবী স্বর্গের পুণ্য জলে অভিষিক্ত হইয়া নির্ম্মল এবং শীতল হইল, পৃথিবীর সন্তপ্ত প্রাণ জুড়াইল" তখন তিনি সমস্ত মানবমণ্ডলীর প্রতিনিধি হইয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। আবার যখন শ্রীগৌরাঙ্গ ভয়ানক দস্যুতুল্য জগাই মাধাইকে প্রেমালিঙ্গন দিয়া বলিলেন "গঙ্গাজলে স্নান করাইয়া তোদের গলায় হরি নামের মালা দিব," তখন তিনি যে কেবল দুই জন পাপীকে আলিঙ্গন করিলেন তাহা নহে ; কিন্তু তিনি সমস্ত পাপীমণ্ডলীর উপর তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ের প্রেমবারি বর্ষণ করিলেন। শ্রীচৈতন্য বলিলেন "আমি জগাই মাধা-

ইকে আলিঙ্গন করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিলাম।” ক্ষীণ বিশ্বাসী স্বার্থপর লোকেরা বলিল “পৃথিবী বল কেন? দুই জন বল।” বাস্তবিক অপ্রেমিকেরা জানে না যে এক দিন জগাই মাধাইয়ের ন্যায় সমস্ত অবিশ্বাসী পাপিমণ্ডলী স্বর্গীয় উদার প্রেমবলে পরাস্ত হইবে এবং পুণ্যজলে স্নান করিয়া কণ্ঠে হরিনামের মালা পরিবে। বস্তুতঃ প্রত্যেক সাধু মহাজন বিস্তীর্ণ নরমণ্ডলীর প্রতিনিধি। যিনি যে মণ্ডলীর প্রতিনিধি তাঁহার কথা সেই মণ্ডলীর কথা। তোমরা যদি দলবদ্ধ হইয়া রাজসভাতে তোমাদিগের কোন প্রতিনিধিকে প্রেরণ কর সেই প্রতিনিধি তোমাদিগের কথা ভিন্ন আপনার কোন কথা বলিতে অধিকারী নহে। প্রতিনিধির নিজের স্বতন্ত্র কথা নাই। এই প্রতিনিধিনিয়োগের রাজ্যতত্ত্ব ধর্ম্মরাজ্যে প্রয়োগ কর। স্বর্গের প্রতিনিধি, সমস্ত মানবমণ্ডলীর প্রতিনিধি যখন বলিলেন “এই যে আমি স্নান করিলাম ইহাতে পৃথিবীর স্নান হইল, এই যে আমার প্রাণ শীতল হইল, ইহাতে পৃথিবীর প্রাণ জুড়াইল,” তখন তিনি ভবিষ্যৎ পৃথিবী সম্পর্কে এই কথা বলিলেন। ভবিষ্যৎ পৃথিবী তাহার প্রতিনিধির মুখে এই কথা বলিল। আরও বলি যখন কোন মহাপুরুষ বলেন; “আমি আমার স্বর্গস্থ পিতার কাছে প্রকৃত পুত্রত্বের পরিচয় দিয়াছি এবং পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছি, এবং আমার সঙ্গে সমস্ত মানবমণ্ডলী ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়াছে,” তখন তিনি পৃথিবীর প্রতিনিধি হইয়া এই সত্য প্রচার করেন। ইহা আইনের কথা। ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির গৃহে যত দিন সন্তান জন্মে নাই তত দিন কেহই তাঁহার ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হয় নাই। তত দিন গৃহের সকলেরই মনে, বিশেষতঃ স্বামী স্ত্রীর মনে এই খেদ হয় “আহা! কে আমাদিগের এই বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবে?” কিন্তু যখনই সেই বাড়ীতে একটি সন্তান জন্মে তৎক্ষণাৎ সকলের মন আনন্দে পুলকিত হয়, চারিদিকে আনন্দের রোল উঠিতে থাকে এবং আত্মীয় বন্ধুরা শঙ্খধ্বনি প্রভৃতি বিবিধ মঙ্গলাচরণ দ্বারা সকলের নিকট পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তনয়ের জন্ম বিজ্ঞাপন করে। তখন ভয় ভাবনা দুঃখ সন্তাপ তিরোহিত হয়। এত দুঃখ পরিশ্রমে অর্জ্জিত ধন সম্পত্তি ভোগ করিবার লোক

আসিল, এই মনে করিয়া সকলের মনে উল্লাস এবং পিতা মাতার মনে আনন্দের উচ্ছ্বাস হইতে থাকে। পৃথিবীতে মনুষ্যসন্তান তাহার পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। স্বর্গেও ঈশ্বরের সন্তান তাঁহার ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী। আবার পৃথিবীতে যেমন কুসন্তান পিতার সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়, ধর্ম্মসম্বন্ধেও সেইরূপ, যত দিন মনুষ্য নাস্তিক ও ঈশ্বরের অবাধ্য থাকে তত দিন সে স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হইতে পারে না। ইহা সত্য বটে যে ঈশ্বরের অনেক কুসন্তান আছে, কিন্তু তাঁহার একটিও ত্যক্ত সন্তান নাই, তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে মনুষ্য যত দিন কুসন্তান থাকে যদিও তাহাকে ঈশ্বর পরিত্যাগ করেন না, কিন্তু সে ঈশ্বরকে ভোগ করিতে পারে না। কুসন্তানকে আপনার সন্তান বলিয়া স্বীকার করিতে প্রায় সকলেরই লজ্জা ও অপমান বোধ হয়। পৃথিবীর কোন সাধুর কুসন্তানকে যদি তাঁহার সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে আমাদের লজ্জা বোধ হয় তবে ঈশ্বরের কুসন্তানকে, কিরূপে ব্রহ্মপুত্র বলা যাইতে পারে? যিনি পিতার অনুগত তাঁহাকেই যথার্থ সন্তান বলা যাইতে পারে। সাধুর সন্তান যদি স্বেচ্ছাচারী ও অবাধ্য হয় তাহাকে সেই সাধুর সন্তান বলিতে মনে নানাপ্রকার সঙ্কোচ, ভয়, এবং কষ্ট হয় এবং অনেক ইতস্ততঃ করিয়া বলিতে হয়। সাধুর সন্তান অসাধু ইহা সহজে অক্ষুব্ধ হৃদয়ে বলা যায় না। সাধু পিতা এবং অসাধু সন্তান এই দুইয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ, যেমন স্বর্গ ও নরক, আলোক এবং অন্ধকার। নরককে কিরূপে স্বর্গের সন্তান বলা যাইতে পারে? স্বর্গের সন্তান নরক ইহা বলিতে উদ্যত হইলেই যেন বাক্য রোধ হয়। পিতা জ্যোতির্ম্ময়, সন্তান অন্ধকার, ইহা কিরূপে সম্ভব? পুত্রের মধ্যে যদি পিতার কোন লক্ষণ না থাকে তাহাকে কিরূপে পুত্র বলা যাইতে পারে? সেইরূপ যিনি ঈশ্বরের অনুরূপ, ঈশ্বরের ন্যায়, ঈশ্বরের মত, তাঁহাকেই ঈশ্বর সন্তান বলা যাইতে পারে। যাঁহার মধ্যে জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা, এবং শান্তি প্রভৃতি ঈশ্বরের স্বরূপ ও লক্ষণ গুলি আছে তাঁহাকেই ঈশ্বরসন্তান বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। যাঁহার মধ্যে যত পরিমাণে ঈশ্বরের এই স্বভাব, লক্ষণ গুলি আছে তিনি তত পরিমাণে ঈশ্বরের সন্তান অর্থাৎ ঈশ্বরের

স্বর্গরাজ্যের অধিকারী। স্বর্গস্থ পিতার যত টাকা কড়ি অথবা ধন ঐশ্বর্য্য আছে এমন আর কাহারও নাই। ঈশ্বরের সঙ্গে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান ধনাঢ্য কিংবা অতুল ঐশ্বর্য্যশালী সম্রাটের ও তুলনা হয় না। এমন ঈশ্বরকে যিনি পিতা বলিয়া ডাকিতে পারেন তাঁহার কত সৌভাগ্য! "মরি কি সুখের সম্বন্ধ যিনি মহান্ অনন্ত দেখেন পুত্রভাবে মলিন মানবে, ভাবিলে হৃদয় হয় পুলকিত। অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হয়ে, ক্ষুদ্র কীট মানবে দেখেন চাহিয়ে, মরি কি আশ্চর্য্য ভাইরে।" যে বাটীতে এমন ঈশ্বরের পুত্র জন্মে সেই বাটীর কত সৌভাগ্য। স্বর্গরাজ্যের অধিকারী একটি ব্রহ্মসন্তান জন্মিল ইহাতে সাধুদিগের মনে মহানন্দ। প্রকৃত ব্রহ্মসন্তান কি? অনন্ত জ্ঞানের এক বিন্দু জ্ঞান, অনন্ত প্রেমের এক বিন্দু প্রেম, অনন্ত পুণ্যের এক বিন্দু পুণ্য, অনন্ত সুখের এক বিন্দু সুখ। যদি ধরাতলে স্বর্গস্থ ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে চাও তবে ব্রহ্মপুত্রকে দর্শন কর। এত বড় ঈশ্বর যাহার পিতা, ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী যাহার মা তাহার আবার ভয় ভাবনা কি? কে বলিতে পারেন "পবন, আমার কুমার কুমারীকে বাতাস কর। চন্দ্র, সূর্য্য, আমার কুমার কুমারীকে আলোক দেও। নদ, নদী, সমুদ্র, তোমরা আমার কুমার কুমারীর পদ ধৌত কর?" যিনি এমন করুণার সাগর ও প্রতাপান্বিত রাজা, যাঁহার রাজ্যের সীমা নাই কে না তাঁহার সুসন্তান হইতে ইচ্ছা করিবে? কে ইচ্ছা পূর্ব্বক এত বড় রাজ্যাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে? ঈশ্বরের সুসন্তানই তাঁহার রাজ্যের অধিকারী। ইউরোপ এসিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি ভূখণ্ড এবং সমস্ত পৃথিবীর কে অধিকারী হইবে? কেহ কেহ বলে জোর যার মুলুক তার। রুসিয়া যদি সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ হয় রুসিয়া সমস্ত পৃথিবীর অধিকারী হইবে। কিন্তু ইহা নিতান্ত অসার কথা। কেন না প্রকৃত ব্রহ্মপুত্র ভিন্ন অন্য কেহই ব্রহ্মরাজ্যের অধিকারী হইতে পারেনা। যে দিন প্রকৃত ব্রহ্মতনয়ের জন্ম হইল সে দিন পৃথিবীর আহ্লাদ হইল, কেন না পৃথিবীর যথার্থ স্বামী এবং অধিকারী জন্মগ্রহণ করিল। ঈশ্বরের সাধু পুত্র তাঁহার সমস্ত রাজ্যের অধিকারী, এবং যিনি সমস্ত পৃথিবীর অধিকারী তিনিই আবার পৃথিবীর প্রতিনিধি। ঈশ্বর তাঁহার সাধু-

পুত্র, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পৃথিবীর অধিকার দিলেন। ঈশ্বর তাঁহার বড় পুত্রের মস্তকে হস্ত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন;—"তুমি আমার সমস্ত রাজ্য গ্রহণ কর। তুমি তোমার কনিষ্ঠদিগকে ইহার অধিকারী করিও।" যখন আমাদিগের প্রতিনিধি এক জন সাধু পুত্র পিতার স্বর্গ রাজ্যের অধিকারী হইলেন তাঁহার সঙ্গে আমরাও স্বর্গের অধিকারী হইলাম। স্বর্গে আমাদিগের অধিকার জন্মিয়াছে সত্য; কিন্তু এখনও আমাদের স্বর্গভোগ হয় নাই, ভবিষ্যতে হইবে। এখনও আমরা বালক। যখন বালকত্ব যাইবে তখন আমরা ভোগাধিকারী হইব।" কিন্তু পৃথিবীতে স্বর্গ আসিয়াছে। আমাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা স্বর্গ হস্তগত করিয়া ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদিগকে খুব আশা দিতেছেন। যখন এক জন ভাই যথার্থ পুত্রত্বের পরিচয় দিয়া পিতার সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন, তখন আমরা সকলেই সেই সম্পত্তির অধিকারী হইব। ঈশা, শ্রীগৌরাঙ্গ, শুকদেব, নারদ, শাক্য, মুসা, প্রভৃতি আমাদিগের জন্য বহু পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা স্বর্গ হইতে পৃথিবীকে পিতার ধন আনিয়া সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, আমরা যথা কালে সেই ধনের ভোগাধিকারী হইব। সাধুদিগের নিকটে ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, এই জন্য তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন "ধন্য পৃথিবী, কেন না পৃথিবী স্বর্গের ধন সম্পত্তির অধিকারী হইল!" আমরা জন্মে ঈশ্বরসন্তান, কিন্তু এখনও স্বভাবে ঈশ্বরসন্তান হই নাই, যখন স্বভাব চরিত্রে তাঁহার উপযুক্ত সুসন্তান হইব, যখন দ্বিজ হইব, তখন মঙ্গলময়ী আনন্দময়ী মাকে ভাল বাসিয়া তাঁহার স্বর্গরাজ্যের ভোগাধিকার লাভ করিব।

সেবকের নিবেদন।

স্বর্গীয় উদ্বাহ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার, ৩১ এ শ্রাবণ, ১৮০৩ শক।

আমাদিগের নিকৃষ্ট নীচ জীবনে যাহা কিছু হয় তাহার উপমা, তাহার উচ্চতম আদর্শ আমরা আমাদিগের আধ্যাত্মিক জীবনে দেখিতে পাই। শরীর এবং আত্মা অথবা পশু এবং দেবতার মধ্যে সাদৃশ্য আছে, ইহা হয়ত অনেকেই বিশ্বাস করিবেন না; কিন্তু গভীর ভাবে আলোচনা করিলেই সকলেই ইহা সত্য বলিয়া মানিবেন। চক্ষু দেখে কেন? ভবিষ্যতে আত্মা দেখিবে এই জন্য। শরীরের চক্ষু সৃষ্টির সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমোহিত হয়; আত্মার উজ্জ্বল বিশ্বাস চক্ষু স্রষ্টার অরূপ রূপ দেখিয়া বিমুগ্ধ হয়। কর্ণ শুনে কেন? ভবিষ্যতে আত্মার বিবেক কর্ণ ঈশ্বরের আদেশ শুনিবে এই জন্য। হস্ত ধরে কেন? ইহার গূঢ় অর্থ এই যে যখন বাহিরের দুটী হাত অবসন্ন হইয়া পড়িবে তখন আত্মার ভিতর হইতে ভক্তি হস্ত বাহির হইয়া ব্রহ্মচরণ ধারণ করিবে। পা চলে কেন? পশুও চলে। মনুষ্যের শরীরে দুটী চরণ সংলগ্ন হইল কেন? অবশ্যই ইহার কোন গূঢ়তর অর্থ আছে। শরীরে যেমন গতি শক্তি দিয়াছেন, বিধাতা আত্মার মধ্যেও গতি শক্তি নিহিত রাখিয়াছেন, সেই গতি শক্তি দ্বারা আত্মা সতেজে "থাকব না আর এ পাপ রাজ্যে ব্রহ্মলোকে যাব চলে" এই কথা বলিতে বলিতে দুর্দ্দশা ও অন্ধকারের রাজ্য ছাড়িয়া দিব্যধামে চলিয়া যাইবে। পশু ও আহার পান করে, আমরা ও আহার পান করি; কিন্তু পশু ও আমাদিগের মধ্যে কি কোন প্রভেদ নাই? ঈশ্বরের এই গূঢ় অভিপ্রায় যে আহার পান দ্বারা

যেমন আমরা শরীরকে সবল পুষ্ট ও কান্তিযুক্ত করি, তেমনি আমরা পুণ্যান্ন ভোজন এবং হরি নাম রস আস্বাদন করিয়া আত্মাকে সতেজ হৃষ্টপুষ্ট ও সুন্দর করিয়া তুলিব। ভবিষ্যতে আত্মার মধ্যে যে সকল ইন্দ্রিয় প্রকাশিত হইয়া কার্য্য করিবে এখন শরীরের মধ্যে তাহারই অনুরূপ ইন্দ্রিয় সকল সংযোজিত হইয়াছে। উচ্চতর নিরাকার রাজ্যের দিকে লইয়া যাইবার জন্য অথবা মনুষ্যকে পরলোকের নিমিত্ত প্রস্তুত করিবার জন্য তাহার শরীরের মধ্যে বিবিধ ইন্দ্রিয় সকল সংলগ্ন করা হইয়াছে। এ সকল শারীরিক ইন্দ্রিয় দ্বারা যেমন সৃষ্ট জগতের নানা প্রকার গুণ গ্রহণ করা যায় আত্মার ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা স্রষ্টার গূঢ়তম তত্ত্ব সকল আবিষ্কৃত হয়। যেমন আত্মার মধ্যে শারীরিক দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ প্রভৃতি ক্রিয়ার সাদৃশ্য আছে তেমনি মনুষ্যের বাহ্যিক উদ্বাহ ক্রিয়ার সঙ্গে তাহার আন্তরিক উদ্বাহেরও মিলন আছে। প্রকৃত উদ্বাহের অভিপ্রায়, ভাব, কর্ত্তব্য, ব্রত সমুদয় পৃথিবীতে পরিসমাপ্ত হয় না। পৃথিবীর উদ্বাহ একটী সোপান মাত্র। এই সোপান অবলম্বন করিয়া অসংখ্য নরনারী অনন্ত রাজ্যের সঙ্গে যোগ সংস্থাপন করে। যাহারা শরীরকে বিবাহ করে তাহারা বিবাহের গূঢ়তর তত্ত্ব জানে না। যাহারা কেবল শারীরিক অথবা সাংসারিক সুখ ভোগের জন্য উদ্বাহ শৃঙ্খলে বদ্ধ হয় তাহারা বিবাহের যথার্থ সুখ অনুভব করিতে পারে না। যে সকল নর নারী বিবাহ যোগে মিলিত হইয়া অতি নীচ ভাবে জীবনক্ষেত্রে বিচরণ করে তাহারা বিবাহের স্বর্গীয় আদর্শ এবং আমোদ জানে না। প্রকৃত বিবাহ আত্মায় আত্মায় যোগ। বিবাহের অর্থ পূরণ। পূর্ব্বে যাহা অর্দ্ধ অর্দ্ধ ছিল বিবাহ দ্বারা সেই দুই অর্দ্ধ একত্র হইয়া পূর্ণ হয়। দুই কখন এক হয় না। যাহা অর্দ্ধ ছিল তাহা অপরার্দ্ধের সঙ্গে একত্র হইলে এক হয়। দাম্পত্যপ্রণয়ে যে স্বামী স্ত্রীর বন্ধন হয় তাহা দুই জনের ঐক্য নহে। দুই জনের ঐক্যকে পৃথিবীতে বন্ধুতা বলে। পিতা পুত্রের ঐক্য, দুই সহোদরের ঐক্য কিম্বা দুই বন্ধুর ঐক্য ইহার সঙ্গে স্বামী স্ত্রীর ঐক্যের অনেক প্রভেদ। উদ্বাহ বন্ধন সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। উদ্বাহ বন্ধনে স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের মিলন এত গূঢ় ও গাঢ় হয় যে আর কোথাও তাহার তুলনা নাই। অন্যান্য সকল মিলন অপেক্ষা উদ্বাহের মিলন উৎ-

কৃষ্টতর। যথার্থ উদ্বাহের মিলন উৎকৃষ্টতম। যেখানে স্বার্থত্যাগ করিয়া দুইজন পরস্পরকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করে সেখানে আমরা স্বর্গের শোভা দর্শন করি ইহা সত্য। যেখানে স্নেহময়ী জননী আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়া নানা প্রকার দুঃখ যন্ত্রণা বহন করিয়া সন্তান পালন করেন সেখানেও আমরা স্বর্গের সৌন্দর্য্য দর্শন করি। যে কোন স্থানে আমরা নিঃস্বার্থ বন্ধুতা অথবা নিষ্কাম স্নেহ দেখিতে পাই সেখানে আমরা স্বর্গের পূর্ব্বাভাস দেখিয়া পুলকিত হই, কিন্তু বন্ধুতা ও অপত্য স্নেহ অপেক্ষাও উদ্বাহজনিত বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রেম গাঢ়তর। বন্ধুতা অথবা অপত্য-স্নেহে দুই জনের ঐক্য হয়; কিন্তু বিবাহে অর্দ্ধ অর্দ্ধ মিলিত হইয়া এক হয়। এই অর্দ্ধে অর্দ্ধে মিলন অতি নিগূঢ় রহস্য। নরপ্রকৃতি অর্দ্ধ নারীপ্রকৃতি অর্দ্ধ এই দুই অর্দ্ধ একত্র হইলে এক হয়। যতক্ষণ এই দুই অর্দ্ধ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকে ততক্ষণ প্রত্যেক অর্দ্ধ অপূর্ণ থাকে। যখন এই দুই একত্র হইয়া এক হয় তখন তাহারা পূর্ণ হয়। যখনই ঈশ্বর অর্দ্ধ সৃজন করিলেন তখনই সেই অর্দ্ধের মধ্যে ঈশ্বর এরূপ প্রকৃতি দিলেন যে সেই অর্দ্ধ তাহার অপরার্দ্ধকে খুঁজিয়া বাহির করিবেই করিবে। যেমন পৃথিবী আপন স্বভাববশতঃ সূর্য্যের চারি দিকে ঘুরিবেই ঘুরিবে, তেমনি স্বধর্ম্মগুণে অর্দ্ধ নর প্রকৃতি আপনার অপরার্দ্ধ নারী প্রকৃতিকে খুঁজিয়া বাহির করিবেই করিবে। যতক্ষণ অর্দ্ধ অর্দ্ধ থাকে ততক্ষণ সেই অর্দ্ধ সর্ব্বদা জিজ্ঞাসা করে আমার অপরার্দ্ধ কৈ? স্ত্রী ভাবে আমার স্বামী কৈ? পুরুষ ভাবে আমার স্ত্রী কৈ? পুরুষ বলে আমি কাহাকে স্ত্রী বলিব, স্ত্রী বলে আমি কাহাকে স্বামী বলিব। পুরুষ প্রকৃতি ঈশ্বরকে অন্বেষণ করে। এক অর্দ্ধ যতক্ষণ না তাহার অপরার্দ্ধকে পায় ততক্ষণ সে এইরূপ চিন্তায় নিযুক্ত থাকে। তোমরা মনে কর নরনারীর উদ্বাহের জন্য অনেক ঘটকের প্রয়োজন; কিন্তু গভীর ভাবে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারিবে নর নারীর আপন আপন অন্তরস্থ স্বভাবই তাহাদিগের বিবাহের প্রধান ঘটক। কোন্ দেশের লোককে, কোন্ প্রকৃতির পুরুষকে স্বামী বলিয়া বরণ করিবে, কোন দেশের নারীকে, কি প্রকৃতির নারীকে পত্নী বলিয়া বরণ করিবে। ইহা কাহাকেও শিক্ষা দিতে হয় না। নরনারী আপন আপন স্বভাবানুসারে পরস্পরকে বরণ করে সময়ের পূর্ণতা

হইলেই এক অর্দ্ধ অপরার্দ্ধকে খুঁজিয়া লয়। মনের প্রস্ফুটিত অবস্থায় আত্মা আপনার স্বামী কি আপনার স্ত্রীকে চিনিয়া লয়। এক অর্দ্ধ যখন প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া আমোদ প্রমোদ করে তখন সে বলে আমার এই আমোদ প্রমোদের এক জন অংশী চাই। সে তাহার হৃদয়ের বাগান-বাড়ী সাজাইয়া প্রতীক্ষা করিতে থাকে কখন্ অপরার্দ্ধ আসিয়া তাহার বাড়ী অধিকার করিবে এবং তাহার আমোদ প্রমোদের ভাগী হইবে। পুরুষ সহধর্ম্মিণী এবং স্ত্রী ধর্ম্মপতি অন্বেষণ করে। প্রত্যেকেই বলে "আমি ধর্ম্মসাধনের এক জন সহায় চাই, যোগাসনে বসিয়া যখন আমি পরমেশ্বরকে দীনবন্ধু বলিয়া ডাকিব তখন আমার সেই অপ-রার্দ্ধও আমার সঙ্গে মিলিয়া তাঁহাকে দীনবন্ধু বলিয়া ডাকিবে।" কেহ কেহ বলে বিবাহ বিধাতার নির্ব্বন্ধ। কাহার সঙ্গে কাহার বিবাহ হইবে ইহা বিধাতা পূর্ব্বেই তাহাদিগের কপালে লিখিয়া রাখেন। যাহা ভবি-তব্য তাহা ঘটিবেই ঘটিবে। বাস্তবিক এ বিধান এক ভাবে কপালে লেখা আছে আর একভাবে কপালে লেখা নাই। অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বজ্ঞ বিধাতা কাহার সঙ্গে কাহার বিবাহ পক্ষ ততাহা পূর্ব্বেই তাহাদের প্রবৃত্তিতে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন; কিন্তু তিনি কাহারও কপালে সংস্কৃত গ্রীক্, লাটিন্ অথবা অন্য কোন ভাষায় পাত্র পাত্রীর ন ম লিখিয়া দেননাই। তাঁহা-রই ইঙ্গিতে, তাঁহারই নিয়মে এক অর্দ্ধ অপরার্দ্ধকে খুঁজিয়া লয়। যখন এক অর্দ্ধ অপরার্দ্ধের সঙ্গে মিলিত হইয়া এক মন, একাত্মা এবং এক প্রাণ হয় তখন স্বর্গে শঙ্খধ্বনি হয় এবং প্রেম ভেরী বাজে। উদ্বাহবন্ধনে এইরূপে দুই অর্দ্ধ একাত্মা হওয়াই প্রকৃত বিবাহ। এই বিবাহে যাহা পূর্ব্বে বিধা-তার লেখা ছিল তাহা পূর্ণ হয়, বিধাতার অভিপ্রায় সম্পন্ন হয়। যাহারা বিবাহকে সামান্য সাংসারিক অথবা শারীরিক ব্যাপার মনে করে তাহারা প্রকৃত বিবাহতত্ত্ব জানে না। শরীরের চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি যেমন আত্মার ব্রহ্ম দর্শন ব্রহ্মবাণী শ্রবণ, ব্রহ্মস্পর্শ, এবং আত্মার গতিশক্তি প্রভৃতির অনুরূপ সেইরূপ বিবাহ অথবা নরনারীর মিলন জীবাত্মা এবং পরমাত্মার যোগের অনুরূপ। পৃথিবীতে যেমন নর নারীর বিবাহ হই-তেছে স্বর্গে সেইরূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ হইতেছে। এক দিন

ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী যোগেশ্বরের সঙ্গে প্রত্যেক আত্মার বিবাহ হইবে বলিয়া পৃথিবীতে কোটি কোটি বিবাহ হইতেছে। সামান্য পশু যেমন আর একটী পশুর সঙ্গে থাকে নর নারীর বিবাহ সেরূপ নহে। নিকৃষ্ট জীব এবং পশুদিগের মধ্যে প্রণয় আছে তাহা কে অস্বীকার করিবে? পাখীর প্রতি পাখীর প্রণয় আছে, জন্তুর প্রতি জন্তুর প্রণয় আছে; কিন্তু সেই প্রণয়ের সহিত দাম্পত্য প্রেমের তুলনা হইতে পারে না। স্বামী স্ত্রীর বিশুদ্ধ প্রণয় চিরস্থায়ী, এবং যোগী ও যোগেশ্বরের প্রেমের অনুরূপ। বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রণয় স্বর্গের পূর্ব্বাভাস প্রদর্শন করে। শত সহস্র বৎসর পরে ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্মার যে সম্বন্ধ হইবে, স্বামী স্ত্রীর পবিত্র প্রণয় সেই সম্বন্ধের পরিচয় দেয়। পৃথিবীতে পুরুষ যেমন আমার স্ত্রী কৈ? স্ত্রী যেমন আমার স্বামী কৈ? এই বলিয়া ব্যাকুল হয়; সেইরূপ জীবাত্মাও এক দিন পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া পাগলের ন্যায় বলিবে, আমার প্রাণপতি কৈ? আমার প্রাণেশ্বর কৈ? আমার প্রাণকান্ত হৃদয়রঞ্জন কৈ? বাস্তবিক উন্নত পরিপক্ক অবস্থায় বিবাহের জন্য আত্মা পাগল হয়। পরমাত্মার জন্য ব্যাকুলিত আত্মা উন্মাদের ন্যায় বলে অবিবাহিত অবস্থায় কিরূপে জীবন ধারণ করিব? আমার একতারা, ধর্ম্মগ্রন্থ, গৈরিক বসন প্রভৃতি সকলই আমার নিকটে আছে; কিন্তু আমার প্রাণেশ কৈ? কবে তাঁহার সঙ্গে বিরলে বসিয়া যোগানন্দ রস পান করিব? কবে তিনি আমি একাসনে বসিয়া প্রেমালাপ করিব? কবে মিশে নদী জলধিতে হবে একাকার? বাস্তবিক স্বর্গপতি, সর্ব্বপতি, বিশ্বপতি, প্রাণপতি ঈশ্বরের সঙ্গে গূঢ় প্রাণগত যোগ স্থাপিত না হইলে জীবাত্মা কিছুতেই প্রকৃত সুখ শান্তি লাভ করিতে পারে না। জীবাত্মা তাঁহাকেই বিবাহ করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। সেই পরম সুন্দর প্রেমময় হরি প্রত্যেক জীবাত্মার বর। তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিলেই জীবের সুখ। তাঁহার মত প্রাণের সুহৃৎ ও সর্ব্বসুখ দাতা আর কেহ নাই। তিনিই পূর্ণ সুখ। অতএব সকলে সেই সত্য শিব সুন্দর, সেই শ্রেষ্ঠতম বর, সেই ভুবনমোহন পরম সুন্দর হরিকে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হও। সেই সচ্চিদানন্দ পুরুষ, স্ত্রীজাতি এবং পুরুষজাতি উভয়ের পতি এবং উভয়জাতির পূজনীয় ও সেবনীয়

দেবতা। তাঁহার সঙ্গে বিবাহ রূপ গূঢ় প্রেম যোগ না হইলে কেহই নিত্য সুখের অধিকারী হইতে পারে না। হে জীব, নিকৃষ্ট শরীরের বিবাহকে স্বর্গীয় বিবাহে পরিণত কর। উৎকৃষ্টতম বিবাহের পথ; শ্রেষ্ঠতম যোগের পথ অবলম্বন কর। নীচ ঐহিক সুখলালসা নির্ব্বাণ করিয়া সেই পূর্ণানন্দ নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সঙ্গে মহাযোগ নিত্যযোগ সাধন কর। এমন সর্ব্বোৎকৃষ্ট, পরম সুন্দর মৃত্যুঞ্জয় বর বর্ত্তমান থাকিতে কেন নিকৃষ্ট মরণশীল পাত্রে অনুরক্ত হইবে? স্বামী স্ত্রীকে বলুন,—"হে ধর্ম্মপত্নি, আমার হৃদয় তোমার হউক!" স্ত্রী স্বামীকে বলুন;—"হে ধর্ম্মপতি, আমার হৃদয় তোমার হউক!" আবার স্বামী স্ত্রী উভয়ে সম্মিলিত হইয়া বলুন;—"আমাদের উভয়ের হৃদয় ঈশ্বরের হউক!" এই রূপে নর নারী উভয়ে ব্রহ্মবরকে পতিত্বে বরণ করিয়া নিত্য সুখ ভোগ করুন।

হিমালয় শিখরে আচার্য্যের দৈনিক প্রার্থনার সারাংশ।

হে পরম পিতা, হে দীননাথ, যোগের এই সুন্দর ছবি যেন সত্য হয়। মনুষ্যের পৃথিবীতে আসা যে জন্য তাহা যেন বিফল না হয়। জীবনের সর্ব্বোচ্চ অবস্থা সকল যেন কল্পনাতে থাকিয়া না যায়। হে ঈশ্বর নর নারী যখন সপরিবারে মিলিত হইয়া পর্ব্বতোপরি তোমার সুন্দর মূর্ত্তি দেখিবে, মন প্রাণ তোমাকে সঁপিয়া দিবে তখনি এখানে আসা সার্থক হইবে। নিম্নভূমিতে তোমার দাস দাসী হইয়া তাহারা তোমার কার্য্য করিবে, তোমার সেবা করিবে, আর উচ্চভূমিতে যোগে মগ্ন হইয়া তোমার ভিতর প্রবেশ করিবে, ইহা যখন হইবে তখনই জীবন সফল হইবে। আদর্শ পরিবার কল্পনা করিলাম এই জন্য, যে ঐ আদর্শ জীবনে পরিণত করিতে পারিব। মন প্রাণ জয় করিয়া সপরিবারে সবান্ধবে এই পর্ব্বতে অধিবাস করিব ইহা অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা আর কি হইতে পারে? এক সুখের পরিবার হইবে, দশটি সুখের পরিবার হইবে, এ সমুদয় কল্পনা মনের ভিতর সর্ব্বদা আন্দোলিত হইতেছে। কবে ছবি সত্য হইবে, কল্পনা জীবন

ভূমিতে স্থান পাইবে, ছবির ভিতর প্রাণ প্রবেশ করিবে ? প্রথমে মনোমধ্যে সর্ব্বোচ্চ আদর্শ কল্পনা করিলাম, দেখিলাম বৈকুণ্ঠধামে নর নারী ভক্তি এবং যোগে পূর্ণ হইয়া ঋষি যোগীদিগের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া ব্রহ্ম জ্যোতি মধ্যে ব্রহ্মনাম গান করিতেছে। নীচ সংসার পরাজয় করিয়া সকলে অতি উচ্চ ভাবে সমাধির অবস্থায় জীবন কাটাইতেছে। দেখিয়া মন নৃত্য করিতে লাগিল, বলিল ঐ কৈলাসকে জীবনে আনিব, ঐ পবিত্র মনোহর আশ্রম, ঐ প্রেম ধাম, ঐ স্বর্গধাম, ঐ ঋষিসভা, ঐ পরলোক রাজ্য জীবনে আনিব। পরমেশ্বর তুমি সত্য। তবে এ কল্পনাও সত্য। তুমি বলিতেছ এই আদর্শের ন্যায় হও, আমি প্রত্যেকের মানস পটে ছবি আঁকিয়া দিয়াছি ; এই রূপে জীবনকে গঠিত কর। বন্ধু বান্ধব পরিবার লইয়া নূতন ধর্ম্ম বিধান পূর্ণ কর। মাথার উপর নব বিধানের নিশান উড়িতেছে, নীচে ব্রহ্মসাধক মণ্ডলী। আর কেন নিদ্রায় অচেতন থাকিব ? আমাদের প্রভু ত মৃতপুতুল নয়। আমরা উঠিয়া দাঁড়াই, ভেরী বাজুক, স্বর্গ পৃথিবীতে আসুক, দেবলোক নরলোকে আসুক। হায়! ব্রাহ্ম চিরকাল ছবি দেখিয়া কাটাইল, কত কাল আর কল্পনাশয্যায় শয়ন করিয়া স্বপ্ন দেখিবে ? পিতা বল পাহাড়ে আছত ? এখানে বন্ধু বান্ধব পরিবার লইয়া হরিনাম গান করিবার স্থান আছে ? তবে বল সত্য সাধন করি। তুমি বিরাট মূর্ত্তি ধরিয়া পর্ব্বতের উপর দাঁড়াও। জাগাও সকলকে, স্বামী স্ত্রী সকলকে জাগাও। বল সকলে মিলিয়া হিমালয় শিখরে বসিয়া ব্রহ্মনাম গান করিয়া নববিধান পূর্ণ করি। হে মহাদেব তুমি সর্ব্বোচ্চ কৈলাসে বোস, আর আমরা সকলে সপরিবারে সবান্ধবে এক একটি ছোট পাহাড়ে বসি। হে বিশ্বেশ্বর তুমি কৃপা করিয়া সকলকে তোমার পদতলে বসাও। বজ্রধ্বনিতে কথা কও। পৃথিবী জাগুক। জয় জীবন্ত দেবতার জয়! আমরা কেবল জড়ের মত ঘুমাইতেছি, জীবন্ত পরমেশ্বর, এ ভাবে থাকিতে দিও না। সকলকে ডাক যেন জীবন্ত যোগ সাধন করিয়া আমরা জীবনকে সার্থক করিতে পারি। তুমি আশীর্ব্বাদ কর।

সেবকের নিবেদন।

ধর্ম্মরাজ্যের সীমা নির্ণয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার, ২১ এ ভাদ্র, ১৮০৩ শক।

ঈশ্বর যাহাদিগকে সত্যান্বেষণের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাদিগের নিকট আমার আজ একটি প্রস্তাব আছে। সত্য এবং অসত্যের মধ্যে একটী সীমা আছে; সেই সীমা লইয়া চির দিন বিবাদ হইয়াছে, হইতেছে, ও হইবে। সত্যরাজ্যের যথার্থ সীমা নির্ণয় করিয়া বিবাদের মূলোৎপাটন করা আবশ্যক। ধর্ম্মরাজ্যের বিস্তার কত দূর, রাজ্যবাসী অনেকের তাহা জানা নাই। ধর্ম্মরাজ্যে আছি, ইহা অনেকেই জানেন কিন্তু পূর্ব্ব পশ্চিমে উত্তর দক্ষিণে সীমা কত দূর তাহা অল্প লোকেই অবধারণ করিয়া থাকেন। সীমা জানা অত্যন্ত আবশ্যক। কে না নিজের বাটীর সীমা জানে? কোন্ প্রজা না ভূমির সীমা ঠিক করিয়া রাখে? রাজা জমীদার প্রভৃতি সকলেই জমীর সীমা চিহ্নিত করিয়া রাখেন। এ সম্বন্ধে বিবাদ অনিষ্টের কারণ। এই সীমা লইয়া প্রতিবেশিগণের সহিত বিবাদ হইতে পারে। ধর্ম্মরাজ্যের সীমার শেষ যেখানে, সেই খানে অসত্য ও অধর্ম্ম। সীমার এক চুল বাহির হইলে অসত্যের ভিতর, পাপ হ্রদের ভিতর পতিত হইতে হয়। এক চুল ধর্ম্ম-রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিলেই যেখানে জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িক প্রভেদ, পাপের অত্যাচার, সেই খানে গিয়া উপস্থিত হইতে হয়। ষড়রিপু সেখানে ছয় রাজা হইয়া প্রজাদিগকে অনবরত অতিশয় কষ্ট দিতেছে। আমাদের এক অঙ্গুলি ভূমি তাহাদের হস্তগত হইলে যে কত কষ্ট হইবে, তাহা বলা যায় না। পাছে অসত্য, অন্ধকার ও ভ্রমের হস্তে পড়িতে হয়, পাছে বিদেশে

পাঁচ জন দানব আমাদিগকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করে, এই ভয়ে আমাদিগের হৃৎকম্প হয়। আমাদিগকে সতত সাবধান থাকিতে হইবে। আমাদিগের ভূমির এক খণ্ডও অপরকে দিব না। আমাদিগের রাজার আদেশ আছে, এক খণ্ড ভূমিও পরাধিকারে যাইতে দিবে না। রাজ্যের কুশলভঙ্গ যাহাতে না হয়, সে জন্য দুরন্ত প্রবোচনাকারীদিগকে দূরে রাখিতে হইবে। যাহারা সত্যের শত্রু, তাহারা বলে বা কৌশলে আমাদিগের ভূমি হস্তগত করিবার চেষ্টা করে। বল প্রকাশ করিয়া যখন কৃতার্থ না হয়, তখন কৌশল প্রকাশ করিয়া থাকে। এ প্রদেশের জমীর মূল্য ইহার লক্ষ ভাগের এক ভাগের তুল্যও নহে। এখানকার ভূমি সাত রাজার ধন। ইহা হস্তগত করিবার মানসে কেহ কেহ তোমাদিগকে ফাঁকি দিবার জন্য কয়েকটি মত প্রকাশ করিবে। সেই সকল মত শুনিতে মিষ্ট, সরল ও মনোহর। সেই প্রকার মত প্রকাশ করিয়া তোমাদিগের মন হরণ ও সম্পত্তি হরণ করিবার চেষ্টা করিবে। তোমাদিগকে সাবধান করিবার জন্য এক্ষণে তোমাদিগের নিকট এই প্রস্তাব, সীমা অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইবার জন্য কয়েকটি লোককে চিহ্নিত কর। তাঁহারা যোগের সীমা নির্দ্ধারণ করিবেন, ভক্তির সীমা নির্দ্ধারণ করিবেন, অসাম্প্রদায়িক প্রেমের সীমা নির্দ্ধারণ করিবেন। তাঁহারা দেখিবেন, কোন্ কোন্ পথে কত দূর পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। এই সকল বহুমূল্য তত্ত্বভূমির চারি সীমা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এজন্য লোক মনোনীত করিয়া তাঁহা-দিগের উপর বিশেষ বিশেষ ভার দিয়া চারি দিকে ত্বরায় প্রেরণ করিতে হইবে। কোন্ দিকে কত ভূমি আছে, কোন্ সাগরে কত দ্বীপ আছে, ভূগোলশাস্ত্রে এ সকল লেখা আছে। জল স্থলের পরিমাণ যত দূর অনুসন্ধান দ্বারা ঠিক করা হইয়াছে, তাহা ভূগোলে জানা যায়। আবার কোন্ ভূমিতে কিরূপ জীব জন্তু ও উদ্ভিদ জন্মে ও কোন্ দেশের লোক কিরূপ, তাহাদিগের আচার ব্যবহারই বা কিরূপ সকলই তাহাতে অবগত হওয়া যায়। তথাপি দেখ, জ্ঞানীদিগের কৌতূহল তৃপ্ত হইল না। সাগর মহাসাগরে যাত্রা করিয়া ভূখণ্ডসকল আবিষ্কার করিবার জন্য কত যাহাজ প্রেরিত হইতেছে। ভূমি আবিষ্কার জন্য কত উপযুক্ত লোকদিগকে পাঠান হইতেছে। উত্তর মহাসাগরের অজ্ঞাত প্রদেশে

এমন কোন ভূমি আছে কি না, দেখিয়া আইস, যেখানকার কথা ভূগোলে লিখিত হয় নাই, সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নাই। যাও, যথোপযুক্ত লোক জন সঙ্গে লইয়া যাও; ছয় মাস বা এক বৎসরের উপযোগী খাদ্যসামগ্রী লইয়া যাও। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগকে সঙ্গে লও; প্রয়োজনীয় যন্ত্রসকল সঙ্গে লও। এই প্রকার অনুজ্ঞা বাহির হইল। ভূগোলের উন্নতির জন্য যে সকল সভা ভার গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা এই প্রকারে দলে দলে লোক প্রেরণ করিতেছে। খুলিল জাহাজ; সকলেই কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে জাহাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। কি সংবাদ আনিবে কেহই তাহা জানে না। হয়ত সাগরের মধ্যে লোকগুলি মরিবে। তথাপি তাহারা চলিল, মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিবার জন্যই হয়ত চলিল। অজ্ঞানান্ধকার ভেদ করিয়া বিজ্ঞানের রাজ্য আবিষ্কার করিবার জন্য চলিল। পৃথিবীর ভূমি যে কত দূর বিস্তীর্ণ, তাহা এখনও বুঝিতে পারা যায় নাই। এমন অনেক স্থল আছে, যাহার সহিত কোন যোগ সাধনে এখনও আমরা সক্ষম হই নাই; এজন্য আবিষ্কারের বার বার চেষ্টা হইতেছে। মধ্য আফ্রিকার উষ্ণ প্রদেশে কত লোক প্রেরিত হয়। আফ্রিকার মধ্য স্থল কি চিরকালই অন্ধকারে আবৃত থাকিবে? পর্ব্বতের উচ্চ শিখরসকলও আবিষ্কৃত হইতেছে। ধর্ম্ম রাজ্যে এইরূপ হওয়া আবশ্যক। জ্ঞানের উষ্ণ প্রদেশে, ভক্তির শীতল রাজ্যে, যোগগিরির উচ্চতম স্থানে কত দূর সাধকেরা গমন করিতে পারেন এবং কোন্ সীমা অতিক্রম করিলে আর বাসযোগ্য ভূমি পাওয়া যায় না তন্নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। গ্রীন্লণ্ডের উত্তরে ভয়ানক শীতের মধ্যে আরও দেশ আছে কি না, তাহাও নির্দ্ধারণের জন্য কত চেষ্টা হইতেছে। উহা দ্বীপ কি উপদ্বীপ আমাদিগের জানা উচিত। মনুষ্য আবাসের উত্তর সীমা আমাদিগের জানা উচিত, কোথায় অত্যন্ত অসহ্য শীত, লোক নাই, লোক থাকিতে পারে না, জীব জন্তু একটিও দেখা যায় না। যোগে যদি আত্মা নিস্পন্দ হয়, তবে যে কত দূর পর্য্যন্ত গেলে লইবে না, তাহা ঠিক করিয়া জানিতে হইবে। যোগে কি আত্মা অবসন্ন হইয়া যায়? নিশ্বাস কি আবদ্ধ হয়? যোগের দ্বারা শরীরের কি কিছু অনিষ্ট হয়? কত

দূর পর্য্যন্ত যোগের রাজ্যে যাওয়া যায়। যাও যোগের উচ্চতর শিখরে যাও। কত দূরের পর আর যোগ নাই, আর যোগ হইতে পারে না; তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখ। কেহ বলে, এই গিরি পর্যন্ত যোগ হইতে পারে, আর নয়। ইহার উপর কোন ঋষি কখন গমন করেন নাই। ইহার উপর উঠিলেই উচ্চ আকাশে নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া মানুষ মরিয়া যায়। নববিধানসঙ্গত যোগবলে কত দূর উর্দ্ধে যাওয়া যায়, বিধানবাদীর যোগসাধনের সীমা কত দূর পর্য্যন্ত? ভক্তি সাধনের সীমাও ঠিক করিয়া রাখিতে হইবে। এতটা প্রেমে কাঁদিলে বাঁচিব, ইহার অধিক হইলেই মরিব। দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত নৃত্য করিলে ঠিক। তিন ঘণ্টা নৃত্য করিলে যে হইবে না, ইহা কে বলিল? ভক্তির উত্তর সাগরে কত দূর সাধকেরা যাইতে পারেন এবং উহার শেষ সীমা কোথায় তাহা নির্দ্ধারণ কর। অর্দ্ধ ঘণ্টা ধ্যান করিলে সভ্যতা বলিবে "যথেষ্ট, আর অধিক হইলে সভ্যতার সহিত বিরোধ হইবে। প্রাচীনকালের মূর্খেরা পাঁচ সাত ঘণ্টা ধ্যান করিত। এখনকার সময়ে তাহা আর উচিত বলিয়া বোধ হয় না।" বাস্তবিক কি পাঁচ সাত ঘণ্টা ধ্যান করিলে ভ্রম ও অন্ধকারে পড়িতে হয়? সত্যরাজ্যের সীমা অতিক্রম করিলেই মিথ্যা রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়, অন্ধকারের মধ্যে পড়িতে হয়, মিথ্যাবাদীদিগের সঙ্গে গণ্য হইতে হয়। পাঁচ সাত ঘণ্টা ধ্যান করিয়া দেখ, সত্যের সীমা আরও বিস্তৃত কি না। কোন্ খানে কল্পনা কোন্ খানে ধ্যানের আরম্ভ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখ। ধ্যান ও ব্রহ্মদর্শন এক দিকে, অনুমান ও ছায়া দর্শন অপর দিকে, ইহার মধ্যে যে রেখা আছে তাহা ঠিক কর। সদাচার ও সদনুষ্ঠানের সীমা কত দূর, জ্ঞানের সীমা কত দূর, তাহা ভাল করিয়া জান। আমরা বলি ঈশ্বরকে জানা যায়, এক জন বলিবে জানা যায় না; আর এক জন বলিবে কতক জানা যায়, কতক জানা যায় না। যত দূর জানা যায় তাহা কি জানা হইয়াছে? এক জন বলিল, সত্যসূর্য্যের কাছে গেলে মরিবে। কত কাছে যাওয়া যায়, তাহা দেখা আবশ্যক। শীত দেশে উচ্চ পাহাড়ে আরোহণ নিষিদ্ধ। তবে কি পাহাড়ের কাছে

আর যাইব না? তবে কি শীত দেশে একেবারে যাওয়া হইবে না? এত ভয়? এত ভয় ভাল নহে। এখনো কত শিখিতে হইবে! বিধানের শ্রীমদ্ভাগবতের কি শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পড়া হইয়াছে? চারি বেদ কি সম্পূর্ণ হইয়াছে? যোগপর্ব্বতের উচ্চতম স্থানে কি গিয়াছিলে? যত দূর যাইবার তত দূর কি গিয়াছিলে? নিশ্চিন্ত রহিয়াছ কেন? ব্রাহ্মদিগের এখন নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, আরও কত ধর্ম্মলাভ করিবার অবশিষ্ট আছে? আরও কত ঘণ্টা নিমীলিত নয়নে ধ্যান করিতে পার, তোমরা জান না। আগে পাঁচ মিনিট ধ্যানই যথেষ্ট বোধ করিতে; অর্দ্ধ ঘণ্টা হইল এক ঘণ্টাও হইল; সমস্ত দিন উৎসব হইল। এখন বলি, আরও, আরও যোগের উচ্চ শিখরে অধিরোহণ করা যায়। ধর্ম্মরাজ্যে আরও শত শত দেশ আছে যাহার নাম গন্ধও আমাদের নিকট আসে নাই। উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থান আছে; প্রশস্ত হইতে প্রশস্ততর স্থান আছে, গভীর হইতে গভীরতর স্থান আছে। তোমাদের মধ্যে সুদক্ষ সুনিপুণ যাঁহারা তাঁহারা সত্য লাভ করিবার জন্য সাধন আরম্ভ করুন; অল্পবিশ্বাসী ও ভীরুদিগের বিশ্বাসোৎপাদন করুন। চারিদিকে দেখিয়া আসিয়া সংবাদ দিন. নববিধানবাদী আত্মরক্ষা করিয়া কত ঘণ্টা ও কিরূপে ব্রহ্মযোগসাধনে অতিবাহিত করিতে পারেন। কত ঘণ্টা সাধন করিলে কোন বিশৃঙ্খলা হয় না, শরীর ঠিক থাকে, মন ঠিক থাকে, হৃদয় ঠিক থাকে, আত্মা ঠিক থাকে। যখনই দেখিবে, ঠিক নাই, তখনই বুঝিতে হইবে, সীমার ওদিকে গিয়াছ। অমনি ফিরিবে, বলিবে, সীমার বাহিরে যাইব না। যদি দেখ, নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া গেল, শরীরে রোগ সঞ্চার হইল, স্বাস্থ্য নষ্ট হইল, মুহুর্মুহু মূর্চ্ছা হইতে লাগিল, বুঝিবে শত্রুরাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছ। অমনি ধর্ম্মরাজ্যে ফিরিবে। এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা তিন ঘণ্টা ধ্যান করিয়া একেবারে ঠিক সীমা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিবে। ঠিক করিয়া ফেলিবে, যে, যথার্থ ব্রহ্মবাদী ঐত সময় যোগাসনে বসিয়া উৎকৃষ্টরূপে ব্রহ্মযোগ সাধন করিতে পারেন। নির্ণয় করিবে, কি ভাবে চলিলে জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা ও আত্মার সমস্ত সদ্ভাব রক্ষা পায়। পাঠসম্বন্ধেও নিরূপণ করিবে ব্রহ্মরাজ্যে কত দূর পাঠাভ্যাস করা যায়। যে জ্ঞানে বিশ্বাস নষ্ট হয়

সে জ্ঞান জ্ঞান নহে। সে জ্ঞান আমাদের নয়। বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করিব, অথচ দেখিব প্রেম মরিল না। যদি দেখি পড়িতে পড়িতে প্রেম চলিয়া গেল, পুস্তকের কীট হইয়া পড়িলাম, বুঝিতে হইবে, শত্রুরাজ্যে পড়িয়াছি। তেমনি আমরা কর্ম্মসম্বন্ধেও সীমা নির্ণয় করিব। কত কর্ম্ম করিতে পার? শুনিয়াছি, কার্য্যালয়ে পাঁচ ঘণ্টা, সাত ঘণ্টা লোকে পরিশ্রম করে। ব্রহ্মবিশ্বাসী কি আরও পারেন? পার যদি দেখাও। প্রাতঃকাল হইতে পরিশ্রম কর, মধ্যাহ্নে পরিশ্রম কর, রাত্রি পর্য্যন্ত পরিশ্রম কর। সারা দিন খাটিয়া কার্য্যালয় হইতে আসিয়া মৃদঙ্গ বাজাও। ভক্তির সহিত কীর্ত্তন কর। তোমরা হয়তো বলিবে শরীর এখন ভক্তিভার বহন করিতে পারে না। কি? ভক্তি ভার? নিশ্চয় তবে তোমরা ধর্ম্মের রাজ্য অতিক্রম করিয়াছ। মৃদঙ্গে কি ভার আছে? ভক্তিকে তুমি ভার বল? তুমি তবে ব্রহ্মরাজ্যে পরিশ্রম কর নাই। সংসারের চরণে তুমি আত্মসমর্পণ করিয়াছ। ঈশ্বরচরণে তুমিত আত্মসমর্পণ কর নাই। ব্রহ্মরাজ্যে যদি পরিশ্রম করিতে, হরিনাম করিতে, ভার বোধ হইত না; হাসিতে হাসিতে হরিনাম করিতে। কর্ম্ম করিলে কি মন নিরানন্দ হয়? না আরও আনন্দ হয়, শরীর আরও সতেজ হয়। পরিশ্রম কি জন্য? শরীর মনের বল ও তেজ রক্ষার জন্য। এই কথা শুনিয়া আবার অনেকে বলিতে পারেন, তবে আর দুই ঘণ্টার অধিক পরিশ্রম করিব না। নববিধানে জানিয়াছি, অধিক পরিশ্রম করিয়া উপাসনার ভাব, ভক্তির ভাব হারাইলে বড় অন্যায় হয়। এই বলিয়া যে কেহ ধর্ম্মের ভূমি সঙ্কীর্ণ করিতে যাইবেন, তাহা হইবে না। যেখানে দশ সহস্র লোকের স্থান আছে, সে স্থানকে তুমি দুই শত লোকের উপযুক্ত মনে করিবে? তুমি ব্রহ্মরাজ্যকে সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিবে? বল, আরও পরিশ্রম করা যায়। কিয়ৎ কাল সাধকেরা এক বার দেখিয়া আসুন; পরে বলুন, ব্রাহ্ম হইয়া এত পরিশ্রম করা যায় কি না? বলুন, এত অধিক যোগ ভক্তি সাধন করা যায়, এত শারীরিক পরিশ্রম করা যাইতে পারে। কত অধিক যোগসাধনে ও শারীরিক পরিশ্রমে মনুষ্যহৃদয় নির্ম্মল ও আনন্দিত রাখা যায়, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেন। এক এক দল, এক এক প্রদেশে

বাহির হইয়া চলিয়া যাউন। আমাদের সকলের শুভাশীর্ব্বাদ ও শুভকামনা লইয়া উৎসাহের সহিত পূর্ব্ব পশ্চিমে, উত্তর দক্ষিণে চলিয়া যাউন। ফিরিয়া আসিয়া প্রেম, ভক্তি, যোগ প্রভৃতির তত্ত্বসকল বলিবেন। আমরা তাহা শুনিয়া আমাদের সাধনের পরিমাণ বাড়াইব। যদি জানিতে পারি, যোগ পাহাড়ের অমুক স্থান, ভক্তিনদীর অমুক অংশ আমাদের অবিদিত রহিয়াছে, সংবাদ দিলেই আমরা কৌতূহলপরায়ণ হইয়া দৌড়িব। সকলে সেই সকল স্থান দেখিবার জন্য একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিব। পাঁচ ক্রোশ দূরে যোগের পাহাড় রহিয়াছে। বড় বড় ভক্তির উদ্যান রহিয়াছে আমরা কিছুই দেখি নাই। অতি উৎকৃষ্ট স্থান; আমরা তাহার নিকটে গিয়া হয়ত ফিরিয়া আসিয়াছি। এমন সকল স্থান আমরা দেখিতে পাইব। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা অগ্রে দেখিয়া আসিবেন। নানাস্থান হইতে নানা জাতীয় পুষ্প আনয়ন করিবেন। সাগর মহাসাগর প্রভৃতি হইতে নানাবিধ রত্ন বহুমূল্য রত্ন আনিয়া দেখাইবেন। ভক্তিকানন হইতে, প্রমোদ উদ্যান হইতে মধু আনিবেন। আমরাও পরে কৌতূহলপূর্ণ হৃদয়ে সেই দিকে গমন করিব। কি আশ্চর্য্য! কি দুঃখের বিষয়! সীমা জানি না বলিয়া সঙ্কীর্ণ স্থানে বদ্ধ হইয়া থাকি। একটি মৃদঙ্গ আমি যথেষ্ট মনে করি, পাঁচ জনে পাঁচটী কেন বাজাইলাম না? পাঁচ ঘণ্টা অনবরত ধ্যান করা যায়, আমি কেন করিলাম না? রে নির্ব্বোধ মন! সীমা জান না বলিয়া দক্ষিণে এক হস্ত, বামে এক হস্ত স্থান লইয়াই বুঝি সাধন করিয়া সময়াতিপাত করিতেছ? পাঁচ মিনিট ধ্যান হইলেই খুব হইল, মনে করিতেছ? ঐ একটু স্থানেই কি চির দিন বদ্ধ থাকিবে? সঙ্কীর্ণ ভূমির মধ্যেই বিচরণ করিবে? এত বড় ব্রহ্মরাজ্য। তুমি ইহাকে ছোট মনে কর? এবার মোহ শৃঙ্খল ছিন্ন হইয়া যাউক। অজ্ঞান অন্ধকার তিরোহিত হইয়া যাউক। স্বাধীন হইয়া যোগ পাহাড়ের উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে আরোহণ করিতে হইবে। কত দূর যোগে উন্নত হওয়া যায়, কত দূর ভক্তিতে মগ্ন হওয়া যায়, কত অধিক পরিশ্রম করা যাইতে পারে, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। ধর্ম্মরাজ্যের সীমা নির্ণয় করিবার জন্য এক দল লোক বাহির হইয়া পড়। সত্য ও অসত্যের মধ্যে যেখানে রেখা আছে, ধর্ম্ম ও

অধর্ম্মের মধ্যে যেখানে প্রভেদ চিহ্ন আছে, তাহা আবিষ্কার করিবার জন্য প্রবৃত্ত হও। সীমার বাহিরে গেলে মহাবিপদ। অতএব ব্রহ্মদেশ কত দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত তাহা অবধারণ করিয়া সাধারণকে জানাইতে হইবে। যাঁহারা জানাইবেন ও যাঁহারা জানিবেন, তাঁহারা সকলেই ধন্য হইবেন। এই ক্ষেত্রে যাঁহারা ঈশ্বরাদিষ্ট হইয়া গমন করিবেন, তাঁহারা গভীর সাধনে প্রবৃত্ত হউন, এবং ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে ও আমাদের শুভকামনায় চারিদিকের নূতন নূতন রাজ্য আবিষ্কার করিয়া আনন্দ সমাচার বিস্তার করুন।

সেবকের নিবেদন।

পার্ব্বতী বিদায়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার, ১১ই আশ্বিন, ১৮০৩ শক।

পার্ব্বতি! তুমি কি এখন আমাদিগকে ছাড়িয়া স্বামীর আলয়ে গমন করিবে? অদ্য রজনী অবসান হইলে দশমীর সমাগমে বঙ্গদেশে এই গম্ভীর প্রশ্ন উত্থিত হইবে; বঙ্গার নর নারীর চক্ষু হইতে বারিধারা পতিত হইবে। আদরের দুর্গাকে তিন দিবস তিন রাত্রি যথোচিত ভক্তি সম্মান প্রদান করিয়া অবশেষে বিদায় করিয়া দিতে হইবে। আনন্দের উৎসব, হে বঙ্গদেশ! প্রায় শেষ হইল। আনন্দের বাজার ভগ্নপ্রায়। যাহার দুর্গা, সেই লইয়া যাইবে; তোমার শাস্ত্রেই বলিতেছে। কেবল তিন রাত্রি উৎসব, চতুর্থ রাত্রি কি ভয়ানক! সেই বেদী শূন্য হইবে; সেই গৃহস্থের বাটী আনন্দবিহীন হইয়া পড়িবে। বিচ্ছেদ! বিচ্ছেদ!! বিচ্ছেদ!!! কাল এই মহাবাক্য তিন বার উচ্চারণ করিতে করিতে উড়িয়া গেল। বাস্তবিক সংসারে কেবলই বিচ্ছেদ, কিছুই স্থায়ী নহে। তিন রাত্রির পর আর কিছুই থাকে না। সম্পদ থাকে না; ধন থাকে না; স্ত্রী পুত্র পরিবারও থাকে না, ঈশ্বরও কি থাকেন না? তোমার আদরের ঈশ্বর যিনি, তিনিও কি থাকেন না? তিনিও কি চলিয়া যান? যান কোথায়? পিত্রালয় হইতে শ্বশুরালয়ে? দুর্ভাগ্য বঙ্গবাসী গালে হাত দিয়া কাঁদিবে। ধন আসে, ধন যায়; সম্পদ আসে, সম্পদ যায়; তিন রাত্রির পর মদের সুখ, পাপের সুখ, ইন্দ্রিয়ের সুখ চলিয়া যায়। তিন রাত্রির পর সাংসারিক বিলাস মজা কিছুই রহিল না। কেহই রহিল না।

ঈশ্বরও কি সেই দলে পড়িলেন? মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত হইব যাঁহার কৃপায়, তিনিও কি মৃত্যুর অধীন হইলেন? এই যে দেবী ঠাকুর দালান সুশোভিত করিয়া ছিলেন, এই চলিয়া গেলেন! ভয়ানক অন্ধকার! বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়া আর কি দালানের পানে কেহ তাকাইতে পারে? চক্ষু কি আর ও দিকে রাখা যায়? কিন্তু নগরের ঘরে ঘরে এই ব্যাপার। দুর্গাকে হারাইয়া দেশ শোক, সন্তাপ ও বিচ্ছেদ জ্বালায় আবার এক বৎসরের জন্য অধীর হইল! বঙ্গদেশবাসী আপনার ঘরে বসিয়া জিজ্ঞাসা করে, এ সকল স্বপ্ন না সত্য? ভ্রম না যথার্থ? এ কি অনুমান, ভ্রান্তি মনকে মিথ্যা কষ্ট দিতেছে, না সত্য সত্যই হৃদয়ের পরমাত্মা পাখী উড়িয়া গেল? স্ত্রী যায় স্বামীর বাড়ীতে; বউ যায় বাপের বাড়ীতে; দেবীরও কি মানুষের ন্যায় ব্যবহার? দেবীও কি বৎসরান্তে স্বামীকে ছাড়িয়া পিত্রালয় যান ও পিত্রালয় ছাড়িয়া স্বামীর আলয়ে গমন করেন? দেবীর আবার নিজের ও পরের আলয় কি? তাঁহার আবার পতিগৃহ পিতৃগৃহ কি? দেবী কি আসেন যান? দেবীসম্বন্ধে কি এ সকল লৌকিক আচার খাটে? যেখানে দেবত্ব, সেখানে সর্ব্বব্যাপিত্বের ভাব। সেখানে বিচ্ছেদ কি? আসা যাওয়া কি? শান্ত হও, বঙ্গদেশ! শান্তচিত্ত হইয়া অনুধাবন কর। কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া গূঢ় রহস্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হও। মহাদেবের ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্না হইয়াছেন যে সতী, মহাদেবের স্বরূপ হইতে স্বতন্ত্র পৃথক হইয়াছেন যে দেবী, তিনি বঙ্গদেশে আরাধিত হইবার জন্য আসিয়াছেন। শ্বশুরধাম পরিত্যাগ করিয়া আপন ধামে, স্বধামে আগমন করিয়াছেন। সতীর প্রকৃত বাসস্থান পতির কাছে। মহেশ্বরের সহিত প্রকৃতির বিবাহ যোগ। যথা মহেশ্বর, তথা দেবী। এই ত স্বভাব বলে, আমাদিগের সহজ বুদ্ধি বলে। কিন্তু প্রকৃতি কেবল মহেশ্বরের সহিত থাকিলে আমাদিগকে কৈলাস যাত্রা করিতে হয়। মহাদেব বাস করেন কৈলাসে, যোগধামে। এখান হইতে কৈলাসে যাইতে হইবে? পথপ্রদর্শক নাই, নেতা নাই, পাণ্ডা নাই। সেখানকার লোক আসিয়া যে এখানে হইতে যাত্রী লইয়া যায়, এরূপ ত শুনি নাই। বৃন্দাবনের লোক এখানে আসে; কাশীর পাণ্ডা এখানে দেখিতে পাওয়া যায়; শ্রীক্ষেত্রের

পাণ্ডারাও পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবার জন্য চারি দিকে বেড়ায়। নেতার হাত ধরিয়া জগন্নাথক্ষেত্রেও যাওয়া যায়, শ্রীবৃন্দাবনেও যাওয়া যায়। অন্যান্য তীর্থভ্রমণের জন্য সমুদয় সুযোগ আছে। কিন্তু কৈলাস হইতে কে আসে? বঙ্গদেশের ই‌তিহাসপাঠক! বল কখন কি কেহ তথা হইতে আসিয়াছে? মহাদেবের নিকট লইয়া যাইবার জন্য পথপ্রদর্শক কে আসে? সেখানে কি যাত্রিদল যায়, না সন্ন্যাসীরা একা একা যায়? পাহাড় অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। অনেক উর্দ্ধে উঠিতে হইবে। বড় দুর্গম স্থান! কৈলাসধাম, নির্জ্জনসাধনের স্থান, যোগীদের তপস্যার স্থান। বঙ্গদেশ সেখানে কিরূপে যাইবে? বঙ্গদেশ তথায় যাইতে পারে না যাইতে চায় ও না। যদি বঙ্গদেশ যাইতে পারিল না, মহাদেব বলিলেন, যাও পার্ব্বতি! তুমি বঙ্গদেশে যাও। কঠোর সন্ন্যাসী যোগেশ্বর বসিয়া রহিলেন, তাঁহার কোমল প্রকৃতি বঙ্গে আরাধিত হইতে আসিলেন। অখণ্ড ব্রহ্ম চিন্তাতে দুই খণ্ড হইলেন। যোগী এবং সতী; সতী এবং যোগী। কাহাকে চায় বঙ্গদেশ? ঘোর সন্ন্যাসী হইবার যদি ইচ্ছা থাকিত, সন্ন্যাসধর্ম্মের আদর্শ মহেশ্বরকে প্রাপ্ত হইবার জন্য বঙ্গবাসিগণ কৈলাসে গমন করিত। এখানে? এখানে চায়, মহাদেবের ভার্য্যাকে, মহাদেবের সুলভ অংশকে। গৌরী, পার্ব্বতী, দুর্গা, দুর্গতিনাশিনীকে। দুর্গতিনাশক? না; মহেশ্বরী, সতী, দুর্গতিনাশিনীকে সকলে চায়, অন্ধকারনাশিনী, শমনবিনাশিনী, স্ত্রীপ্রকৃতি, প্রেমদায়িনী, কোমলাঙ্গী, কঠোরাঙ্গ নয়। ভক্তি চাই, সন্ন্যাস নয়। গৃহস্থের বাড়ীর বালক বালিকা যাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিবে, তিনি আসুন, বাবা বলিয়া পাহাড়ের উপর চীৎকার করিয়া যাঁহাকে সন্ন্যাসীরা ডাকে সে দেবতা নয়। দেব নয়, দেবী। বঙ্গদেশ এই নিবেদন করিল; স্বর্গ বলিলেন, তাহাই হউক। দেবী কোথায় আসিলেন? যাঁহার সহিত উদ্বাহযোগে আবদ্ধ, তাঁহাকে ছাড়িয়া পৃথিবীতে আরাধিত হইবার জন্য আসিলেন। কৈলাস কি? স্বর্গ। সেখানে বাস করেন দেব দেবীতে; দেবী দেবেতে। দেব যিনি, তিনিই দেবী; অবিভক্ত নিত্যকালের একেশ্বরী। স্বর্গে যিনি এক, পৃথিবীতে তিনি ভিন্ন হইলেন। চৈত্র মাসে গৃহস্থের বাড়ীতে কে সন্ন্যাস

ব্রত গ্রহণ করিতে চায়? যেখানে সাংসারিক সম্বন্ধ আছে, মায়া মমতা আছে, সেখানে সন্ন্যাসীর রাজাকে কে অভ্যর্থনা করে? সন্ন্যাসী যদি গৃহস্থের বাড়ীতে ঢোকেন, যেমন দুর্গার আগমনে শঙ্খধ্বনি হয় সেরূপ হইবে না। কি হইবে? শঙ্খধ্বনির পরিবর্ত্তে সন্তানদিগের ক্রন্দনধ্বনি। মহাদেব যদি আগমন করেন, মহাদেবকে দ্বারের ভিতরে এক পা, দ্বারের বাহিরে আর এক পা রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়; কেহ ঘরে ডাকে না। কুলবালারা তাঁহাকে আদর করিতে পারেন না। যিনি ধ্যানে অচেতনপ্রায়; যাঁর চক্ষু যোগেতে ঢুলু ঢুলু; বৈরাগ্য যাঁহার সর্ব্বাঙ্গে, বাঘছাল যাঁহার পরিধেয় বস্ত্র, সে লোককে গৃহস্থের পরিবার কিরূপে আদর করিবে? তাই বঙ্গদেশ বলিল, মা দুর্গে! তুমি এস; সন্তান সহিত এস। সেই দেবীর নিকট ক্রন্দন করিল, নিবেদন করিল। দেবী তথাস্তু বলিয়া অবতীর্ণ হইলেন। কুশলবিহীন অশান্ত নিরানন্দ বঙ্গদেশ শান্তি ও আনন্দে পূর্ণ এবং সমুজ্জ্বলিত হইল। পাপভারাক্রান্ত পৃথিবীর ক্রন্দন থামিল। মহাদেবের অর্দ্ধভাব হাসিতে হাসিতে উপস্থিত হইল। শোন, রহস্য আরও শোন। জগতে তাঁহার আবির্ভাব কিরূপ? পৃথিবীতে থাকেন পার্ব্বতী, কৈলাসে থাকেন স্বামী। কিন্তু সতীর প্রাণ সদা সেখানে, যেখানে স্বামী অর্দ্ধাঙ্গ; শরীর কেবল পিত্রালয়ে। সতী যখন পিত্রালয়ে যান, তাঁহার শরীর সেখানে যায়, প্রাণ স্বামীর নিকটে পড়িয়া থাকে। আমরা ব্রহ্মমন্দিরে বসিয়া যে দুর্গার পূজা করি, সে কোন দুর্গা? সে কি কল্পনার দুর্গা? না। প্রকৃতিপূজাই প্রকৃত দুর্গাপূজা। মহেশ্বরের শক্তিপ্রকাশ পূজা। ব্রহ্মকে পর্ব্বতবাসী নির্জ্জন সন্ন্যাসী পূজা করেন। শক্তির আরাধনা সর্ব্বত্র দেখা যায়। ব্রহ্ম প্রকৃতিতে প্রকাশবান্। হে ঈশ্বর! তোমার প্রকৃতি কোথায়? পর্ব্বতে, নদীতে, বৃক্ষে, গৃহের সকল বস্তুতে। হে ঈশ্বর! তোমার প্রকৃতি কোথায়? আমার ভিতরে, মনোমধ্যে, আমার বাহিরে, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে। প্রকৃতি ব্রহ্মেতে অব্যক্ত ছিলেন, সৃষ্টিতে প্রকাশিত হইলেন। জগতে প্রকৃতির আবির্ভাব, জগতেই প্রকৃতির আরাধনা। পূজা হয় স্বর্গে, না পৃথিবীতে? বিশ্বেশ্বরের শক্তি কোথায়? কেন, পৃথিবীতে। মহিমা কোথায়? কেন,

পৃথিবীতে। বাসস্থান পৃথিবীতে। অতএব পৃথিবীতে থাকিয়া আমরা শক্তির আরাধনা করিতে পারি। মহেশ্বরের শক্তি উদ্যানে, আকাশে, গ্রহ তারা নক্ষত্র মধ্যে। বিশ্বপিতার শক্তি, বিশ্বমাতার শক্তি বিশ্বেতে; সৃষ্টিতে, সমুদয় জগতে। অতএব এখানেই ব্রহ্মপ্রকৃতির পূজা করিবে। যিনি স্বর্গে তাঁহার শক্তি জগতে, অতএব গৃহমধ্যে তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। হিমালয়ে তাঁহার সঙ্গে যোগ সাধন কর; আবার সংসারে, সৃষ্টি মধ্যে তাঁহার শক্তি ও মহিমা পূজা কর। জগন্মধ্যে তিনি সর্ব্বদা অর্চ্চনীয়া। কিন্তু কেহ কেহ তাঁহাকে কেবল তিন রাত্রি জগতে অধিষ্ঠান করিতে দেয়। বঙ্গদেশে ঘোষের বাড়ী মিত্রের বাড়ীতে যে পূজা হয়, তাহা অল্পকাল স্থায়ী। তিন দিন পূজা করিয়া বঙ্গবাসী বলিল, আমি তিন রাত্রি দিলাম ঈশ্বরকে, চতুর্থ রাত্রি আর দিতে পারি না। আমরা অধিক কাল কাহাকেও গৃহে রাখিতে পারি না। সংসারের ধন মানকে ত রাখিতে পারিই না, ভালকে রাখিতে চেষ্টা করিয়াও রাখিতে পারি না! দেবীপূজা, দেবীর আরাধনা, অনেক হইল, আর পারা যায় না; তিন দিনের পরিশ্রমে শরীর অবসন্ন হইয়াছে, মন দুর্ব্বল হইয়াছে, হৃদয় ক্লগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। আজ ভগবতী মাকে বিদায় করিয়া দিতেই হইবে। মা কি ছেলের নিকট বিদায় লইতে পারেন? যিনি জননীরূপে প্রকাশিত হইলেন, তিনি কি আবার চলিয়া যান? সন্তানকে ছাড়িয়া মা কি অন্যত্র গমন করেন? সকল মায়া মমতা কাটাইয়া যদি তিনি চলিয়া যান, তাহা হইলে সন্তানের কি হইবে? মাতৃবিচ্ছেদে কে সন্তান পালন করিবে? সন্তান ছাড়িয়া মা যাইতে পারেন না। আমরাও যদি ইচ্ছা করি মাকে ছাড়িতে তিনি কদাপি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না, করিতে পারেন না। সতীত্ব প্রেম শক্তি সমুদয় ব্রহ্মের ভিতর; সে সকল আবার পৃথিবীতে। তোমার বাটীতে হে বঙ্গবাসি! তুমি কি দুর্গাপূজার দশমী করিতে চাও? নববিধান বলেন ব্রহ্মপূজায় কেবলই সপ্তমী, কেবলই অষ্টমী, কেবলই নবমী, দশমী আর নাই।

পিত্রালয়ের তত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিয়া লও। বিশ্বছাড়া বিশ্বমাতা, বিশ্বছাড়া বিশ্বপিতা থাকিতে পারেন না, হইতে পারেন না। শক্তি

ছাড়া অগ্নি, শক্তি ছাড়া জল, শক্তি ছাড়া স্ত্রী পুত্র পরিবার কল্পনা কর, কল্পনা হইল না। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহার প্রতিবাদ করিবে। বিজ্ঞানবিৎ-পণ্ডিতেরা ইংলণ্ড হইতে চীৎকার করিয়া বলিবে, শক্তি ছাড়া কিছুই থাকিতে পারে না। শক্তিই বিশ্বের প্রাণ। সেই শক্তি যদি যায়, যেমন ভগবতী পৃথিবী ছাড়িয়া কৈলাসাভিমুখে চলিয়া যাইবেন, তৎক্ষণাৎ গৃহ বাড়ী ব্রহ্মাণ্ড সমস্ত ধ্বংস হইবে। শক্তিছাড়া জগৎ ভাবা যায় না। মা ছাড়া সন্তান! এ নিষ্ঠুর কল্পনার ছবি আঁকিও না। স্বদেশবাসী তোমরা ক্রন্দন কর, আমরা ক্রন্দন করিব না। আমরা যে পূজা করি, তাহাতে দশমী নাই। আমাদের যে প্রতিমা, তাহা সৃষ্টির মধ্যে চির-প্রতিষ্ঠিত। চন্দ্রের মুখে, পৃথিবীতে, আকাশে, জল স্থলে সর্ব্বত্র প্রকাশিত। কিছুতেই যে এই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত ছবি মুছিয়া ফেলা যায় না। আমরা কি অনুমান দ্বারা এই দেবীকে আঁকিয়াছি? না, ইনি অনুমানের দেবী নন। আমাদের সত্য দেবীকে সদ্রূপে উজ্জ্বলরূপে দশ দিকে দেখিতেছি। খুব চক্ষুকে মার্জ্জনা কর, পরিষ্কার কর, সত্য কি অনুমান পরীক্ষা দ্বারা এখনি বুঝিবে। আমাদের দেবী ত কিছুতেই অন্তর্হিত হন না। সূক্ষ্ম দৃষ্টির সম্মুখে ছোট প্রতিমা, স্থূল দৃষ্টির সম্মুখে বড় প্রতিমা। সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর আমাদের সেই দেবীর প্রকাশ, আবার প্রকাণ্ড হইতে প্রকাণ্ডতর তাঁহার প্রকাশ। এই নিরাকারা দেবীকে পূজা কর, হে বঙ্গদেশ। পরাৎপর পর ব্রহ্মের মধ্যে তাঁহার যে প্রকৃতি আছে সেই চিন্ময়ী সেই শক্তিরূপিণী দুর্গতিনাশিনী দেবীর পূজা আরম্ভ কর, এবং চিরস্থায়ী আনন্দে দেশকে পরিপূর্ণ কর।

হে প্রেমসিন্ধু! হে মহাদেব! আমরা ক্ষুদ্র দেবতার পূজা করি না। হে মহেশ্বর! হে সাধকের ধন! তোমার কোমল প্রকৃতি আমাদিগের নিকট প্রকাশিত কর। তুমি মহেশ্বরীরূপে দর্শন দাও। তিন রাত্রির পূজার নিয়ম আমাদিগের নাই। পাঁচ বৎসর পাঁচ শতাব্দী পূজা করিলেও তোমার পূজার নিবৃত্তি হয় না। তোমাকে আমরা বিসর্জ্জন দিতে পারি না। তোমাকে বিদায় দেওয়া? এরূপ নিদারুণ বাক্য আমরা সহ্য করিতে পারি না। আমরা তোমাকে যাইতে দিতে পারি না। যাইতে দিব না, যাইতে

দিব না। এবার মহেশ্বরী পূজার অত্যন্ত ধূমধাম। কে তোমাকে এবার যাইতে দিবে? মহেশ্বরীরূপে মাতঃ চির প্রকাশিত থাক; পার্ব্বতীমূর্ত্তি ধরিয়া ভক্তের চিত্তরঞ্জন কর। দুইয়েতেই আমরা আছি। আমরা নববিধানবাদী, যোগেতে আছি, ভক্তিতেও আছি। হে মহাদেব! তুমি এসেছ? তবে বস, বাঘছালের উপর বস। মা এসেছ? মা দুর্গে! বস। আমরা দুঃখী বঙ্গবাসী, আমাদিগের প্রাণ কেমন করিয়া তিন দিনের পর তোমাকে বিদায় করিয়া দিবে? গৃহস্থের বাড়ী ছাড়িয়া যাইলে বাড়ী যে তোমার জন্য ক্রন্দনে পরিপূর্ণ হইবে। ছেলেদের সকলকে ফেলে তুমি কি মা! সত্য সত্যই চলিয়া যাইবে? তুমি যে মা, তুমি যে মহেশ্বরী। মা কে মা বলিয়া, তিন দিন মাত্র ডাকিয়া ত সুখ হয় না, তুমি ত তাহা জান। মানুষ কি এত উন্নত হইল যে, তিন রাত্রির পর আর তোমাকে প্রয়োজন নাই? কোন হিন্দু কি এমন আছে, যে তিন রাত্রিতেই তাহার সুখের শেষ হইল? মা! একথা ঠিক নয়। তিন দিবসের ভজন সাধনে সুখ হইল না, দয়াময়! আর তিন দিবস। তিন দিনে হইল না; আর তিন দিন। হিন্দুকে একথা বলিতে হইবে। কাল যখন অসার মৃণ্ময় প্রতিমা স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইবে, তখন সবাই কাঁদিবে। মা! আমাদের ঘরে ফিরে আয়, আবার ফুল দিয়ে পূজা করি। আবার নামিয়া আয় মা, আমরা আবার নৈবিদ্য সাজাই, আবার সপরিবারে সবান্ধবে আমোদ করি। বঙ্গদেশকে অন্ধকার করিয়া কোথায় যাস? 'ওরে তোরা নিয়ে যাস্‌নে, আমার সোণার মাকে তোরা নিয়ে যাস্‌নে' কোন্ সরল হৃদয় বাল্যস্বভাব হিন্দু না এইরূপ বলিবে? এরূপ বলা স্বাভাবিক। প্রতিমা যদি জাগ্রৎ সৎ হইত তাহা হইলে সকলেই উঁহাকে ধরিতে যাইত। প্রতিমা ত শুনে না, ফেরে না। বঙ্গদেশ কাঁদিল, আহা! কেহ শুনিল না। নিষ্ঠুর মাটীর দেবতা সকলকে কাঁদাইয়া চলিয়া গেল। নিত্যানন্দদায়িনী মা, আমরা তোমাকে অনন্তকাল পূজা করিব। আমরা কি বলিতে পারি, তুমি যাও? আমরা ব্রহ্মেতে ব্রহ্মের প্রকৃতি, ব্রহ্মের প্রকৃতিতে ব্রহ্মকে দর্শন করি। আমরা ব্রহ্মেতে ব্রহ্মসন্তানগণকেও প্রাপ্ত হই। আমাদের বিচ্ছেদের ভয় নাই। মা আনন্দময়ি নিস্তারিণি! আমরা তোমার কাছে বসিয়াছি। এই

স্থানেই কৈলাস। যেখানে মহেশ্বর ও তাঁহার প্রকৃতি মহাদেবী সেই কৈলাস। এখানে কেবলই সপ্তমী। দশমী যে ব্রাহ্মসমাজে হয়, কি হইতে পারে, একথা আমরা মানি না। আজ তাই ভাই ভগিনীদের জন্য বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিতেছি, সমুদয় বঙ্গবাসীকে বুঝাইয়া দাও, দুর্গা কে? দুর্গা কি? দুর্গা কোথায়? মা ধন যিনি, তাঁহার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় না। মা দয়াময়ি! আমরা যেন বলি, ভ্রান্ত বঙ্গবাসীভাই! মার কাছে আয়, মার কাছে আয়; মার হাত ধর, মার পায়ে পড়; ও পথ ছাড়, এ পথ ধর; নিত্যানন্দের পথ ধর। হে মঙ্গলময়ী জননি! আশীর্ব্বাদ কর, আমরা এমন ভাবে যেন জীবন কাটাইতে পারি যাহাতে দেশে চিন্ময়ী নিরাকারা সত্তা দেবীর পূজা প্রতিষ্ঠিত হয়। মা দয়াময়ি! দয়া করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

সেবকের নিবেদন।

যিনি ব্রহ্ম তিনি হরি।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার, ৩ রা আশ্বিন, ১৮০৩ শক।

বেদ এবং পুরাণে এত প্রভেদ যে মনে হয়, বেদের ঈশ্বর ভিন্ন এবং পুরাণের ঈশ্বর ভিন্ন। বেদের মধ্যে অবতার নাই, রাম নাই কৃষ্ণ নাই। পুরাণ কেবল অবতারদিগের লীলা লইয়াই ব্যস্ত। যখন বেদের মধ্যে প্রবেশ করি, তখন আধুনিক পৌরাণিক ধর্ম্মের কিছু মাত্র পূর্ব্বাভাস তাহাতে দেখিতে পাই না। যখন পুরাণের মধ্যে প্রবিষ্ট হই, তখন ঋষিদিগের আরাধিত পরাৎপর পরব্রহ্মকে পাওয়া যায় না; ব্রহ্ম পদার্থকে দেখা যায় না। প্রাচীন কালের আর্য্যধর্ম্ম ব্রহ্মকে লইয়া বসিয়া রহিলেন, অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম। আধুনিক ধর্ম্ম বিষ্ণুর বিবিধ অবতারের লীলা মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন। প্রাচীন ব্রহ্ম ও আধুনিক হরি, ভারতকে যেন দুই পথ দেখাইয়া দিলেন। এক জন বনের দিকে, পর্ব্বতের দিকে, নির্জ্জন নদীতটে, বিজন গহনে, গিরিগহ্বরে। আর এক জন তীর্থস্থানে, ভক্তমণ্ডলীতে, শ্রীবৃন্দাবনে, জগন্নাথক্ষেত্রে, সাধু ভক্ত পরিবার মধ্যে। ব্রহ্মকে লইয়া কেহ কেহ নির্জ্জনতা আশ্রয় করিলেন; বিরলে তাঁহার সাধন ভজন করিয়া যোগীর পদ প্রাপ্ত হইলেন। কেহ কেহ হরিলীলা শ্রবণ করিয়া ও শ্রবণ করাইয়া প্রেম ভক্তির সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত হইলেন। এই দুই পথ আপাততঃ পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আমরা ব্রহ্ম ও হরি উভয়েরই পক্ষপাত। ব্রহ্ম ধন আমাদিগের ধন; হরি ধনও আমাদিগের ধন। ব্রহ্মকে আমরা মিষ্ট বলি, ব্রহ্মের ন্যায় মিষ্ট আর কিছুই নাই। হরি অপেক্ষাও কিছুই মিষ্ট-

তর নাই। ব্রহ্মের ন্যায় ঈশ্বর পাওয়া যায় না; হরির ন্যায় দেবতা কেহ কখন কল্পনা করিতে পারে না। ব্রহ্ম অপেক্ষা বড় কেহই নহে; হরি অপেক্ষা সকলেই ছোট। ব্রহ্ম নাম শুনিলে যোগীর আত্মা উড়িতে যায়, হরি নাম শুনিলে ভক্তের হৃদয় নাচে। ব্রহ্ম বড় না হরি বড়? কেহ কেহ ব্রহ্মকে বড় বলিলেন; কেহ কেহ হরিকে বড় বলিলেন। নববিধান বলেন, হরি যিনি ব্রহ্মও তিনি। বেদের ঈশ্বর আর পুরাণের ঈশ্বর ভিন্ন নয়। বৈদিক যোগীরা যাঁহাকে আকাশে মহাকাশে স্থির ভাবে বিরাজিত দর্শন করিলেন, পৌরাণিক ভক্তেরা তাঁহাকেই সংসারের নিম্ন ভূমিতে অবলোকন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। ঋষিরা যাঁহাকে নিমীলিত নয়নে যোগধ্যানে অনুভব করিলেন, ভক্তেরা মৃদঙ্গ করতালি বাজাইয়া, নৃত্য করিয়া আনন্দে আনন্দিত হইয়া হরি পদারবিন্দ পূজা করিলেন; তাঁহার পদতলে পড়িয়া সুখী হইলেন। ঋষির ব্রহ্ম ও ভক্তের হরি, দুইয়ের মধ্যে কাহাকে বড় করিব? বড় করিব কি! দুই সমান যদি নববিধানে প্রাণের কাঁটা স্থির হইয়া থাকে, তবে ব্রহ্ম ও হরির সন্ধিস্থল আমরা পাইয়াছি। ব্রহ্ম এবং হরিকে আমরা এক করিয়াছি। আমরা এক করিয়াছি কেন বলিলাম? একই ছিল। দৃষ্টিভেদে ও সাধনভেদে বেদ এবং পুরাণের ভেদ হইয়াছিল। সাধন যখন অভেদ হইল, জ্ঞান যখন অভেদ হইল, বুদ্ধি যখন অভেদ হইল, তখন আর বেদ পুরাণে প্রভেদ রহিল না। ব্রহ্মের ভিতর আমাদের হরি, হরির ভিতর আমাদের প্রাণের সহিত ব্রহ্ম। আমরা যে বলি, "হরিঃ ওঁ"। ওঁকারের সহিত আমাদের "হরি" সংযুক্ত। মনোমোহন হরিকে "হরি ওঁ" বলিয়া আমরা পুলকসাগরে মগ্ন হই। আমরা বলি যেই হরি সেই ব্রহ্ম, যেই ব্রহ্ম সেই হরি। ব্রহ্মের ভিতর হরিদর্শন। একথা কি মিথ্যা? মিথ্যা হইলে পবিত্রবেদী হইতে কি একথা বলিতাম, যখন ঈশ্বর উদ্ধার করেন, তখন তিনি হরি; যখন বিবিধ ভাবের মধ্যে খেলা করেন তখন হরি। আবার সেই হরি দেব দেব মহাদেব, চিরমৌনী, বাক্যবিহীন, কর্ম্মবিহীন, আকাশস্থিত, অচল, অটল, অনাদি, অনন্ত ব্রহ্ম। যদি কবি হইতাম, তবে কল্পনা সহকারে তাহা কাদিয়া বর্ণনা করিতাম; যদি চিত্রকর হইতাম, তবে ইহা

চিত্র করিতাম। কিরূপে? এক দিকে নিস্তব্ধ মহান্ আকাশের দেবতা বর্ত্তমান, আর এক দিকে লীলাকর্ত্তা দয়াময় করুণাময় স্বরূপে রসিক হইয়া জগতের পাবন হইয়া পাপী উদ্ধার করিতেছেন। আমরা ত অবতার হরিকে মানি না। দেহধারী, রূপধারী, চঞ্চলস্বভাব, মানবচরিত্রবিশিষ্ট হরিকে আমরা ত মানি না, পূজা করি না। কিন্তু যথার্থ হরিকে মানি; যিনি হরিঃ ওঁ তাঁহাকে মানি। যখন সপ্তস্বর মিলাইয়া "হরিঃ ওঁ" বলি, তখন যে হরিকে বর্ত্তমান দেখি তিনি ব্রহ্ম, তিনি সর্ব্বদেবময়, তিনি শ্রীমদ্ভাগবতে, তিনি বেদান্তে। যিনি ঋষির ভ্রূর মধ্যে, তিনিই ভক্তের বক্ষের ভিতর। যিনি যোগীর নিমীলিত নয়নে, তিনিই ভক্তের উন্মুক্ত চক্ষে। যাঁহাকে যোগী নয়ন বন্ধ করিয়া দর্শন করেন, ভক্ত তাঁহাকে উন্মীলিত নয়নে দেখিয়া নৃত্য করেন। তবে যদি বল, হরি এদেশে সাকার রূপে ভগবদ্ভক্তদিগের দ্বারা অর্চ্চিত ও আরাধিত হইয়াছেন, তবে শ্রবণ কর, হিন্দুস্থান! শ্রবণ কর। প্রণব স্বরূপ ওঁকারের মধ্যে এদেশে হরি ছিলেন। তুমি প্রাচীন হরিকে বিসর্জ্জন করিয়া আধুনিক হরিকে কেন লও? কেবল যোগচক্ষে ভক্তিচক্ষেই হরিদর্শন হয়। চর্ম্মচক্ষে তাঁহাকে দেখা যায় না। হরি অত্যন্ত প্রাচীন আর্য্যজাতির কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়া সকল শ্রেণীর হিন্দুদিগের পরমারাধ্য হইয়াছেন। বৈষ্ণবের চরণে আমাদের নমস্কার; ঋষির চরণেও কোটি কোটি নমস্কার। যাঁহারা হরির কথা বলেন, তাঁহাদিগকেই আমরা আদর করি, সম্মান করি; প্রভুর দাস বলিয়া মান্য করি। ঋষিও ভক্ত, যোগীও বৈষ্ণব, উভয়েরই কাছে গিয়া বলি, পদধূলি দাও। যেদিন দুইয়ের পদধূলি মিশ্রিত হইবে, সেই দিন ভারতের পরিত্রাণ যদি বৈষ্ণবের হরিকে ছাড়িয়া কেবল বেদান্তের ব্রহ্মকে লও তবে অনেক অনিষ্ট হইবে; সকলে শুষ্কহৃদয় হইয়া পড়িবে। এখনকার হরিভক্তির সঙ্গে সুক্ষে বৈদান্তিক ব্রহ্মযোগকে একত্র মিলিত কর। যোগভক্তির যখন সুম্মিলন হইল, হরিব্রহ্ম যখন অভেদ হইলেন, তখন বঙ্গবাসীর সৌভাগ্যের দিন উদিত, ভারতবাসীর সুখের দিন নিকটস্থ হইল। তখন বলিব ব্রহ্মমন্দির সংস্থাপন সফল হইল; নববিধান পূর্ণ হইল। ব্রহ্মই হরি, তিনিই মা, লীলাকর্ত্তা ও লীলাকর্ত্রী। আমরা যে

বেদান্তের ব্রহ্মকেই হরি বলি। নতুবা ওঁকারের সঙ্গে হরি কেন? ওঁ যে ব্রহ্ম নাম; সাধণের উৎকৃষ্ট তম শব্দ ওঁ যে বেদের শ্রেষ্ঠ অক্ষর; ওঁ যে ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্ব; ওঁ যে হিন্দুস্থানের মাথার মাণিক। ওঁ শব্দের ন্যায় আর শব্দ নাই। ওঁ শব্দের ভিতরে যেমন নিরাকার ভূমা ব্রহ্ম এমন আর কোন শব্দে নাই। প্রথম অক্ষর ওঙ্কার ব্রহ্ম এবং হরি একই। যখনই ওঁকার সহকারে বলি, হরি হরি হরি হরি, তখন সেই নির্ম্মল নিরাকার ব্রহ্মকে দেখিতে পাই। সেই সৎস্বরূপ নির্ম্মল ব্রহ্মকে হরি বলি কেন? হরি বলিলে সুখ হয়। এই যে হরিনামটি, ইহাতে গুড় মিছরি সুধা যত প্রকার মিষ্ট রস আছে সমুদয় একত্র মিশ্রিত। হরিনাম শুনিয়া ভক্তেরা মোহিত হইয়া মূর্চ্ছিত হন; হরিনাম শুনিবা মাত্র কত ভক্তের দশাপ্রাপ্তি হয়। হরি নাম যেন সুধাপূর্ণ সোণার কলস। হরিনাম কাণে প্রবেশ করিবা মাত্র মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত শীতল হইয়া যায়। বৈশাখ মাসে শীতল জলে অবগাহন করিলে যেমন সুখ হয়, ঠিক সেইরূপ সুখানুভব হয় হরিনামসলিলে অবগাহন করিলে, অত্যুক্তি নহে। হরিনামে এমনই মজা! হরিনাম এমনই সরস! ঐ যে অক্ষর দুইটি, ঐ যে শব্দটি, উহা প্রেমামৃতে থই থই করিতেছে। লক্ষ লক্ষ ভক্ত নিমগ্ন হও, প্রাণ শীতল হইবে, ঠিক যেন স্নান করিয়া উঠিবে। আমরা কি এমনই আত্মপ্রবঞ্চিত, আমরা কি এমনই মূর্খ, যে পিতা প্রপিতামহ পিতামহ যে হরিনামকে আদর করিয়াছিলেন, আমরা সেই হরিনামকে ছাড়িয়া দিব? প্রপিতামহের বহুপূর্ব্বে ঋষিরা প্রণবস্বরূপ ওঙ্কারের সহিত হরির আরাধনা করিতেন। হরি নাম ভারতের পুরাতন মধু। পুরাতন মধু, মিষ্টতম মধু। ইহা কি আমরা ছাড়িতে পারি? এ মধু ছাড়িলে নববিধান চলে না, উপাসনা শুষ্ক হয়। হরি নামে কি বিরক্ত হওয়া যায়? হরিনামবিহীন ধর্ম্ম, নীরস ধর্ম্ম। সুধাসরোবর ফেলিয়া বালুকারাশির উপর বসিয়া তুমি কি ধ্যান করিতে যাইবে? হরি যে রস পান করাইয়াছেন, আমরাতাহাতে কখনই হরিকে ছাড়িতে পারি না। হরিকে লইয়া যে কি করিব, ঠিক পাই না। ব্রহ্মের সময় একটা ঠিক ছিল। এ হরির সময় কিছুই ঠিক নাই। হাতে করি, বুকে ধরি, মুখে রাখি মাথায় রাখি, কি যে করিব, তথাপি ঠিক পাই না।

দিন নাই ক্ষণ নাই, মাস নাই, বৎসর নাই, উৎসবের পর উৎসব, তার উপর মহোৎসব হইল, হরিকে লইয়া তবু আবার যে কি করিব, তাহার ঠিক পাই না। ভবিষ্যৎ তাহা জানে, বর্ত্তমান তাহা বলিতে পারে না। হরি নাম করিতেছি বলিয়া যে কত সুখ হইতেছে, দশ বৎসর চীৎকার করিয়া বক্তৃতা করিলেও সে সুখের বর্ণনা শেষ হয় না। কেমন আত্মা তুমিত সাক্ষী। হরিনামে যে কত সুখ, তাহার সাক্ষ্য দিতে হইবে। হে আত্মন্! সাক্ষ্য দাও। যখন বলি প্রেমময় হরি, তখন সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হয়, চক্ষু হইতে প্রেমের জল পতিত হয়। পৃথিবী আছে কি গিয়াছে, জানা যায় না। স্বর্গ কি আসিল নাকি, এই মনে হয়। হরিনামে যে কি হয়, তাহা হরি জানেন। হরিদাস জানে, হরিদাসী জানে, আর কেহই জানে না। এই এক শব্দে ভক্তের প্রাণ পাগল হইয়া যায়। যাই " হ " তার পর " রি " ভক্তের মুখে উচ্চারিত হয়, মুখের পানে তাকাইয়া দেখি, তার শরীর গলিয়া গিয়াছে। মানুষ যে, নরাধম যে, সে ও যেন প্রেমের পুতুল হইয়াছে। কি ছিল, আর কি হইল? হরিকে পাইয়া কত সুখ! এক দিকে নিরাকার আর এক দিকে প্রেমলীলা। এত কালের পর কাশী আর বৃন্দাবন এক তীর্থ হইল। যদি সাকারবাদী থাকিতাম, কাশীধামে যাইতাম যোগসাধন করিবার জন্য শ্রীবৃন্দাবনে যাইতাম প্রেম ভক্তি লাভের জন্য। কাশীধাম যোগ ধাম; বৃন্দাবন প্রেমধাম। এখন নববিধানবাদী হইয়া হৃদয়ের এক ভাগকে বলিয়াছি, তুমি হও কাশী, অপর ভাগকে বলিয়াছি, তুমি হও বৃন্দাবন। আমি যত কাল বাঁচিব, অন্তরে কাশী বৃন্দাবন এই তীর্থদ্বয় একত্র করিয়া রাখিব। এই নববিধানের মধুর ভাব কি তুমি গ্রহণ করিবে না? যোগ ভক্তির মিলন কি করিবে না? ইন্দ্রিয়সুখের বশীভূত হইলে, টাকাতে কত মোহ জানিলে, হে বিভ্রান্ত জীব? কিন্তু এ তত্ত্বসুধা পান করিলে না? হরিব্রহ্ম ও ব্রহ্মহরি· ঊনবিংশ শতাব্দীর যে এই মন্ত্র পিতামহ বলিতেন, ব্রহ্ম ব্রহ্ম, পিতা বলিতেন, হরি হরি। আমি বলিতেছি, হরি ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হরি, হরি ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হরি। আমি যোগাসনে বসি, যোগাসন হয় প্রেমাসন; প্রেমাসনে বসি, প্রেমাসন হয় যোগাসন। সন্ন্যাসী বৈষ্ণব এক হইয়া গেল। যে সন্ন্যাসী ছিল, সেই বৈষ্ণব হইল; যে বৈষ্ণব ছিল, সেই সন্ন্যাসী হইল।

ভক্ত যে ছিল, সে হইল যোগী, যোগী ভক্ত হইল। আমরা অর্দ্ধেক সন্ন্যাসীর পথে, অর্দ্ধেক বৈষ্ণবের পথে, আমরা অর্দ্ধ ভাগ বেদান্ত সাধন করি; অপরার্দ্ধ শ্রীমদ্ভাগবত সাধন করে। আমার অঙ্গের এক দিকে লেখা ব্রহ্ম, অপর দিকে লেখা হরি। এক চক্ষে ব্রহ্মতেজ, অপর চক্ষে হরি প্রেম। মুখে এক বার বলি ব্রহ্ম, আর এক বার বলি হরি। এক কাণে শুনি যোগেশ্বরের নাম, পরব্রহ্মের নাম। অপর কর্ণে শুনি, প্রেমময়, দয়াময়, চিরসুন্দর হরির নাম। আমার দুই হস্তে দুই ধন। ব্রহ্মনাম এক হস্তে হরিনাম অপর হস্তে যদি এমন অবস্থা আমার হয়। আমার ন্যায় সুখী আর কে আছে? যোগের সাগর প্রেমের খনি আমার কাছে। হে নব-বিধানবাদী ব্রহ্মসাধক হরিকিঙ্কর! হরিনাম ব্রহ্মনাম লইয়া সুখী হও। হরি ব্রহ্ম, হরি ব্রহ্ম বলিয়া সুখী হও। দিবানিশি হরিনাম কর। হরিনাম অপরকে শ্রবণ করাও। ব্রহ্ম হরি, হরি ব্রহ্ম বলিতে বলিতে হরিরস সাগরে ডুবিয়া যাও। সুখের পর সুখ। তার পর সুখ হইবে। কত যে সুখ, তাহা বলা যায় না। বল সকলে, হরিপদপ্রান্তে থাকে যেন এই কিঙ্করের মন! এই বিনীত নিবেদন।

কমলকুটীরে আচার্য্যের দৈনিক প্রার্থনার সারাংশ।

হে দয়াময়! আমাদের কাছে হরিনামের মহিমা তুমি আরো প্রকাশ কর। দিবসের প্রথমে হরি, শেষে হরি; জীবনের প্রথমে হরি, শেষে হরি; সব কাজের প্রথমে হরি, শেষে হরি; এইরূপে সমুদায় কাজ হরি বন্ধনে বাঁধ। হরি ছাড়া থাক না, শোর না, কোন কাজ করিব না। হে জগন্নাথ, অনেক দিকে দৃষ্টি রাখিলে কেমন করিয়া তোমায় পাইব? বৃদ্ধ বয়সে যেন পাঁচদিকে দৃষ্টি না যায়। এখন আমাদের দৃষ্টি যেন একদিকেই স্থির থাকে। পরমেশ্বর, আর কেন আমাদের জীবন চারিদিকে বিভক্ত হয়? বৃদ্ধের একমাত্র সম্বল হরি। বৃদ্ধের জপমালা কেবল হরিমালা। বৃদ্ধের জমিদারী কেবল

হরির কাগজ পত্র। বৃদ্ধের খাওয়া দাওয়া কেবল হরি অন্ন, হরি রস। যদি এই হরি-জীবন কাহারও দেখিতে পাই তাহাহইলে তাহাকে বলি ভক্ত, জগদীশ্বর, আমাদের যৌবন বৃদ্ধাবস্থা সব হরিতে। প্রাতঃকাল সায়ংকাল সব হরিতে। হরিগত প্রাণ হউক। চক্ষে রাখ হরি, বক্ষে রাখ হরি। মাথায় রাখ হরি, কর্ণে রাখ হরি। হরি নামামৃত মুখে ঢালিয়া দাও। খানিকটা হরিকে মাথার মুকুট করিয়া দাও। খানিকটা কণ্ঠের হারকরিয়া দাও। তাহলে বলিব হরি আমার অঙ্গের ভূষণ; "জগচ্চন্দ্র হার পরেছি, ভূষণ বাকি কি আছে রে?" কাজ কর্ম্ম কি ছাড়িয়া দিব? না। সকলেতে হরি মাখিয়ে নেব। কেবল পুঁথিতে শাস্ত্রে হরি থাকিলে হইবে না। সেত জমাট হরি। জীবনে হরিনাম রস ছড়াছড়ি করিতেহইবে। নাম সার জীবন ভূমিতে ছড়াইতে হয়। ধন খরচ করিতে হয়। তাই হাতে রহিলনা হরি, বুদ্ধিতে বদ্ধ থাকিল না চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। আহা কি মিষ্ট নাম? এনাম রসে গোলা, অমৃতে গোলা, সুধায় গোলা। সেই রস নিত্যনিরঞ্জন দয়া করে আমাদিগকে দাও। ঘরময় বাড়ীময় হরি ছড়াছড়ি। দয়াল হরি, তোমার কাছে আর কি প্রত্যাশা করিব? সব হরিনামের রাঙ্গা রঙ্গে লালকরিয়া দাও। আর কিছু অপবিত্র থাকিবে না। দয়াময় পরমেশ্বর সংসারটাকে হরিতে মাখামাখি কর। আকাশময়, শরীরময়, বিশ্বময় হরি। হরি দয়া করে নামে ভক্তি দাও, নামে মুক্তি দাও। হরি বলে খাই, হরি বলে শুই, হরি বলে বেড়াই, হরি বলে জীবন ধরি, হরি বলে প্রাণত্যাগ করি। হরিনামের ভিতর বদ্ধ করিয়া রাখ। হে পাপ হরণ, যদি এজন্য তোমার নাম হরি হয়ে থাকে তবে মনের পাপ তাপ হর, হে হরি! হর অন্ধকার। হর পাপাচার। হর বাসনা। হর কামনা। হর স্বার্থ। হরিয়া চিত্ত বিষাদ হৃদয়ে পুণ্যশান্তি দাও। হরি নামে সকল পাপ তাপ যাইবে, চক্ষে আনন্দ ধারা বহিবে। হে কৃপাময়ী, হে মঙ্গলময়ী দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন হরি বর্ণে, হরিরূপে, হরিনামে ডুবিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হইতে পারি। তোমার চরণে এই প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সেবকের নিবেদন।

তীর্থচতুষ্টয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার, ১ লা কার্ত্তিক, ১৮০৩ শক।

কোন বিচক্ষণ তত্ত্বপ্রিয় পরিব্রাজক চারি তীর্থ ভ্রমণ করিয়া তথায় কি কি দেখিলেন তদ্‌বৃত্তান্ত বলি, শ্রবণ কর। এই চারি তীর্থ পৃথিবীতে সর্ব্বাদৃত আশ্চর্য্য তীর্থ। ইহার প্রত্যেকটি দেখা আবশ্যক, নতুবা জ্ঞান ভক্তি চরিতার্থ হইবে না, ঘরে বসিয়া থাকিলে বিবিধ ভ্রান্তিতে ক্লেশ পাইতে হইবে, এই ভাবিয়া পরিব্রাজক স্থির করিলেন, সমুদয় নিজ চক্ষে দেখিব, নিজ কর্ণে শুনিব, বিবিধ তীর্থ সন্দর্শন করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্মের পন্থা অবধারণ করিব; ভ্রমণ দ্বারা ভগবানের কীর্ত্তিকলাপ দর্শন করিলে হৃদয়ে পুণ্য শান্তি সঞ্চিত হইবে; তীর্থভ্রমণে নিশ্চয়ই মোক্ষফল লাভ হইবে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কাহারও সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া পরিব্রাজক গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। প্রথমেই অতি নিকটবর্ত্তী দেহ-তীর্থ। তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কেবলই কর্ম্মকাণ্ডের প্রাদুর্ভাব। হস্ত পদ কর্ম্মে ব্যস্ত; চক্ষু কর্ণ কর্ম্মে ব্যস্ত। প্রাতঃকালে কর্ম্ম, মধ্যাহ্নে কর্ম্ম, অপরাহ্নে কর্ম্ম, রজনীতে কর্ম্ম। এই কর্ম্ম যে আবার কত প্রকার তাহা গণনা করা যায় না। হিন্দুর আচার ব্যবহার দেখিলেই জানা যায়, বাহ্যলক্ষণে মুসলমানকে চিনিতে পারা যায়, খ্রীষ্টবাদীকে সহজেই মুসলমান হইতে পৃথক করা যায়, বৌদ্ধকেও অন্য তিন সম্প্রদায়ের বহির্ভূত বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বৈশেষিক লক্ষণ আছে। উহার দ্বারা এক সম্প্রদায়কে অপর সম্প্রদায় হইতে প্রভেদ করা যায়। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের

লোকে আপন আপন বাহ্যিক লক্ষণ দেখাইয়া সকলকে আহ্বান ও আকর্ষণ করিতেছে। দেহতীর্থে, কেবলই ক্রিয়াকলাপ, কেবলই বিধি নিয়ম কেবল, কার্য্যের আড়ম্বর, দেহতীর্থ কেবলই বলিতেছে, আইস, আমার নিকটে আইস। মোক্ষধামে যদি যাইবে, এই রূপে ব্রতাদি গ্রহণ কর, এই রূপে যাগ যজ্ঞ অনুষ্ঠান কর। এই গৃহ ধর্ম্ম, এই বনবাসীর ধর্ম্ম, এই ব্রহ্মচারীর লক্ষণ, এই নির্ব্বাণের লক্ষণ। এই রূপে হোম করিতে হয়, এই রূপে জলাভিষেক করিতে হয়। এই এই মন্ত্র উচ্চারণ করা আবশ্যক, এই রূপে শরীরকে নিগ্রহ করা উচিত; এই প্রণালিতে ঈশ্বরের পূজা করিতে হয়। সকলেরই বিভিন্ন লক্ষণ, বিভিন্ন আচার ব্যবহার। এ সকলই মায়া। দেহ যদি মায়া হইল, অসার হইল, তবে যাবতীয় কর্ম্মকাণ্ড কেবল মায়ার খেলা। তন্মধ্যে শান্তি কুশল নাই। চারিদিকে পরিব্রাজককে লইয়া টানাটানি। কর্ম্মকাণ্ডের ভয়ানক ভিড়ের মধ্যে তিনি প্রাণরক্ষায় অসমর্থ; স্থির হইয়া বিবেচনা করিবেন কি রূপে? কোন্ কর্ম্মে ধাবিত হইবেন, কোন ব্রত গ্রহণ করিবেন, তাহা নিয়ম করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য। এত কর্ম্ম! শরীরটা কলের মত এক বার এ দিক, এক বার ও দিক ঘুরিতেছে। এ তীর্থে কেবল কর্ম্মের উপরে পরিত্রাণ নির্ভর করে। আত্মার কল্যাণ নির্ভর করিতেছে সাত্ত্বিক আহারের উপর কিংবা বৈরাগ্য বস্ত্রের উপর। কেবল বাহ্য লক্ষণেই ধর্ম্ম স্থাপিত। হস্ত যদি এই কাজ করে, মানুষ বৈকুণ্ঠে চলিল; মুখ যদি এই শব্দ উচ্চারণ করে, তবেই তাহার পরিত্রাণ। কর্ম্মকাণ্ডের ভিড়ে অবসন্ন হইয়া পথিক চলিলেন, দ্বিতীয় তীর্থে। দেহ তীর্থের পার্শ্বেই মন তীর্থ। এখানে কোন প্রকার শারীরিক ভাব নাই, কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভাব তদ্রূপই। সেই ঈশাবাদী, সেই মহম্মদবাদী, সেই হিন্দু, সেই বৌদ্ধ, সেই শিখ। সমুদায় সম্প্রদায়ের মধ্যে কেবলই কলহ বিবাদ, মতে মতে বিবাদ, গ্রন্থে গ্রন্থে বিরোধ। এখানে বুদ্ধি সর্ব্বদাই ব্যস্ত রহিয়াছে। দেহতীর্থে হাত যেমন, এখানে বুদ্ধি তেমনই সর্ব্বপ্রধান। বুদ্ধি কত মত উদ্ভাবন করিতেছে, কত মত প্রচার করিতেছে। এখানে রাশি রাশি পুস্তক; রাশি রাশি সিদ্ধান্ত। নানা সম্প্রদায়ের নানা শাস্ত্র। এ সম্প্রদায়ের বেদ, ও সম্প্র

দায়ের কোরাণ। যেমন কলহ বিবাদ প্রথম তীর্থে, তেমনি কলহ বিবাদ দ্বিতীয় তীর্থে। এই মন তীর্থের ভিতর কত বিবাদ! কার মত ভাল, কার মত মন্দ? ললিতবিস্তার মহৎ কি বাইবেল মহৎ? কোরাণ বড় কি বেদ বড়? কেবল এই সকল কথা লইয়া তুমুল সংগ্রাম। সমস্ত নিরাকার রাজ্য বটে, সাকার বাহ্যাড়ম্বর কিছুই নাই; কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা ন্যূনতর নহে। দেহতীর্থে হস্তসঞ্চালন যেমন দেখা যাইত, এখানে তেমন নাই, বটে, কিন্তু বিদ্যা ও বুদ্ধি ঠিক সেইরূপ ব্যবহার করিতেছে। বুদ্ধি কেবল এক এক মত প্রচার করিতেছে, আর কতকগুলি মত খণ্ডন করিতেছে। পরিব্রাজক দেখিলেন, সকলেই আপনাপন ধর্ম্মে অপরকে টানিবার জন্য ব্যস্ত; আপনাপন মতে অপরকে দীক্ষিত করিবার জন্য চেষ্টিত। মতই সর্ব্বস্ব হইয়া উঠিয়াছে। এইটি মানিলে স্বর্গ, এটি না মানিলে নরক, কেবল এই যুক্তি। আমার মত ভাল, তোমার মতে দোষ আছে, আমার গ্রন্থ ভাল তোমার গ্রন্থে ভুল আছে, এইরূপ পরিনিন্দা লইয়া সকলে ব্যস্ত। শত্রু যেমন বৈরনির্যাতন করিয়া বিনাশ করিবার চেষ্টা করে, তেমনই এক ধর্ম্মসম্প্রদায় আর এক ধর্ম্মসম্প্রদায়কে বিনাশ করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতেছে। এ তীর্থে কি মনুষ্য সুখী হইতে পারে? বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি বলিতেছে, এখানে মিলনের সম্ভাবনা নাই। দেহতীর্থে যেমন সকলের হস্ত ভিন্ন ভিন্ন দিকে, এখানে সকলের বুদ্ধি তেমনই ভিন্ন ভিন্ন দিকে ঘুরিতেছে। বুদ্ধিতে মঙ্গলের পথ মিলিল না; বিচারে কুশলের সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয় তীর্থ পরিত্যাগ করিয়া সেই তত্ত্বান্বেষী তৃতীয় তীর্থে প্রবেশ করিল। সেখানে কিছু কিছু কুশলের বাতাস বহিতেছে। সেটি হৃদয়তীর্থ। মন তীর্থের পার্শ্বেই ইহা অবস্থিত। এই তীর্থ অতি সুবিস্তৃত, এখানে সংকীর্ণতা নাই। দেহ মন যেমন সংকীর্ণ তীর্থ, ইহা সেরূপ নহে। এখানে প্রেম সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছে। ভাবিতে ভাবিতে, দেখিতে দেখিতে এখানকার উচ্চতর গভীরতর প্রেমের ব্যাপারের মধ্যে পরিব্রাজক প্রবেশ করিলেন। সেখানে আত্মপর যে নাই, এমন নহে আপনার ধর্ম্ম, অন্যের ধর্ম্ম আপনার সম্প্রদায়, অন্যের সম্প্রদায় এরূপ প্রভেদ আছে। স্বজাতীয়, বিজাতীয়ের ভিন্নতা সেখানেও আছে। কিন্তু প্রেম সেই দেশের

রাজা। তিনি এমন সুব্যবস্থা করিয়াছেন যে সহস্র প্রকার মতভেদ থাকিলেও এক জন অপরকে ভাল বাসিতে পারে। এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়স্থ লোকের সেবা করিয়া সুখানুভব করিয়া থাকে। এক দেশের লোক দয়ার্দ্র হইয়া অপর দেশীয় ব্যক্তির দুঃখ মোচন করে। দেশভেদে জাতিভেদে প্রণয়ের ব্যাঘাত হয় না। মতসম্বন্ধে যে যত দূরস্থ ও বিরোধী হউক না কেন হৃদয়ের পক্ষে সকলেই ভ্রাতা ও ভগিনী। প্রেমের এইরূপ মিলনবিধি। ধর্ম্ম কেবল এরাক্যে ভাল বাসা। পরম পিতাকে ভালবাসা; এবং ভ্রাতাকে ভাল বাসা। চারি দিকে নানা সম্প্রদায়। তাহাদের বিবাদ বিসংবাদ সত্ত্বেও হৃদয় এমনই কোমল যে, উহা স্বভাবতঃ সকলকে ভাই বলিয়া ডাকিতেছে। হিন্দু যিনি তিনি ক্রিয়া কর্ম্মে মুসলমান প্রভৃতিকে বিজাতীয় মনে করেন, বিধর্ম্মী জ্ঞান করেন। কিন্তু যাই তিনি উচ্চ ছাদের উপর দাঁড়াইয়া চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, বিভিন্ন মত ও ক্রিয়া সকল অবলোকন করিলেন, অমনি তাঁহার হৃদয় উন্মুক্ত হইল, সর্ব্ব জীবে প্রেম ছড়াইয়া পড়িল। তিনি বলিলেন, "হইলই বা বিরোধী, হইলই বা ভিন্ন সম্প্রদায়; সকলকে ভাই বলিয়া, ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া ভাল বাসিব, ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে দয়া করিব, কেবল হিন্দুকে কেন? যবনকে মুসলমানকেও আলিঙ্গন করিব। কেন না ঈশ্বরের দ্বারে উচ্চনীচ নাই"। বুদ্ধি বলে উচ্চ নীচ আছে, কর্ম্মকাণ্ডও বলে লোক মধ্যে শুদ্ধ অশুদ্ধের প্রভেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু যখন প্রেম উথলিল, হৃদয়তীর্থ প্রেমে ভাসিল, তখন প্রভেদসেতু উল্লঙ্ঘন করিয়া শান্তি জল বিস্তৃত হইল। তর্ক কর, বিচার কর, কর্ম্মকাণ্ড লইয়া; আপনার মত ঠিক রাখ, অপরের বিরুদ্ধ মতের প্রতিবাদ কর, কিন্তু আবার ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে সকলকে ভাল বাস। হৃদয়তীর্থে কেবলই ভাল বাসা। পথিক ভাবিলেন এ কোথায় আসিলাম? এই দেখিলাম, বুদ্ধি শাস্ত্র লইয়া ঘোরতর বিচার করিতেছে, ভয়ানক বিবাদ চলিতেছে, এ আবার কোথায় আসিয়া পড়িলাম? এত দলাদলির ভিতরেও প্রেম! যে যেরূপ বিচার করে করুক, যেরূপ অনুষ্ঠান করিতে চায় করুক, কিন্তু মার সন্তান হইলেই ভাই, এখানে কেবল এই যুক্তি। ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে সকলকে ভাল

বাসাই এখানকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। প্রেমের সুশীতল বায়ু সেবন করিতে করিতে পরিব্রাজক অবশেষে চতুর্থ তীর্থে প্রবেশ করিলেন। এটির নাম আত্মা তীর্থ। এখানে কেবল সুশীতল সমীরণ নয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সুমিষ্ট পুষ্পসৌরভ হৃদয় মন প্রাণকে আমোদিত করিতেছে। তীর্থ-ভ্রমণের ক্লেশ দূর হইবে, এই আশা করিয়া তিনি আত্মা তীর্থে শান্ত ভাবে একটি মনোহর বিজন স্থানে বসিলেন। দেহরাজ্যে কর্ম্মের গোলমাল; এস্থান হইতে তাহা বহু দূরে। মন তীর্থে বুদ্ধির আন্দোলন এবং বহু বিচার ও বিবাদ। সেখানকার শব্দ দূরতা বশতঃ এখান হইতে অতি অল্প শোনা যায়, বিবাদ বিসংবাদ রহিত যে হৃদয় তীর্থ, যেখানে কেবলই প্রেম, তাহাও নিতান্ত নিম্নে। এখানে তীর্থবাসীদিগের দিব্য চক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়াছে, যাঁহারা এখানে বাস করিব বলিয়া স্থিরসংকল্প হইয়াছেন, তাঁহা-দিগের নিকট সেই প্রাচীন কথা নূতন অর্থ ধারণ করিয়াছে। কোন্ প্রাচীন কথা? মায়া। তাঁহারা শুনিয়াছিলেন এ জগতে সকলই মায়া। অন্ন মায়া, জল মায়া, বায়ু মায়া, ধনসম্পত্তি সকলই মায়া, এই পর্য্যন্ত বলিয়া মায়াবাদীরা নিরস্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু মায়ার রাজ্য আরও বিস্তৃত। সংসার ত মায়া, জল অগ্নি ত মায়া, ঈশা মুসার যে প্রভেদ তাহাও মায়া; শ্রীগৌরাঙ্গ ও গৌতম, কবির ও নানকের যে প্রভেদ তাহাও মায়া। এক জন ধনী, এক জন দরিদ্র, এ সব কল্পনা। কেহ ধনী নহে, কেহ দরিদ্র নহে। ইহার লক্ষ টাকা আছে, ইহার এক পয়সা আছে, ইহাও মায়ার খেলা। লক্ষ টাকা আন, জ্ঞানীরা উহাকে তৃণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া দিবেন। যাহাকে রজ্জু মনে কর তাহা সর্প হইতে পারে, যাহাকে সর্প বল, তাহা রজ্জু হইতে পারে। যাহাকে বলিতেছ টাকা, তাহা মাটি হইতে পারে, যাহাকে মাটি বলিতেছ, তাহা টাকা হইতে পারে। পৃথিবীতে রাজপ্রাসাদে বাস, ধনীর ঐশ্বর্য্য, সকলই মায়ার কথা। বৃক্ষতলে যে বসিয়া থাকে আর রাজপ্রাসাদে যে বাস করে দুইয়ের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা মায়ার ব্যাপার। যে বৃক্ষতলে থাকে, সে সুখী হইতে পারে, যে রাজ-প্রাসাদে বাস করে, সে হয় ত দুঃখের আগুনে জ্বলিতেছে। তবে এই যে ধনশীলতা ও দারিদ্র্য, ধনাঢ্য হওয়া ও পথের কাঙ্গালী ও ভিখারী

হওয়া, এ কেবল মায়া। সুশোভন শরীর সোণার অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, এসব মায়ার খেলা। এই আছে, এই নাই। ধন মান এই আছে, এই নাই। এই সকল যদি মায়া হইল, তবে হিন্দু মুসলমানে, শাক্ত বৈষ্ণবে, দণ্ডী গৃহীতে যে প্রভেদ, তাহাও মায়া না হইবে কেন ? কেন আর বল, বেদবাদী, পুরাণ-বাদী; বিষ্ণুবাদী, শক্তিবাদী; ইনি শক্তির উপাসক, উনি ভক্তির উপাসক। যিনি ঈশা, তিনিই মুসা; অভেদ শাস্ত্র শ্রবণ কর। ক্রিয়াতে হিন্দু, হিন্দু; ক্রিয়াতে যবন, যবন। হিন্দু মুসলমানে, খ্রীষ্টবাদী ও মহম্মদবাদীতে অনেক মতভেদ, মনে হয় কিছুতে মিল হইবে না। যত ক্ষণ চক্ষু কর্ণ দেখিবে, শুনিবে, কর্ম্মকাণ্ড লইয়া থাকিবে, হস্ত পদ ধরিবে ও চলিবে, তত ক্ষণ প্রভেদ থাকি-বেই থাকিবে। উপরে উঠ, দ্বিতীয় তলে বুদ্ধির ঘরে যাও, তখনও ভেদাভেদ জ্ঞান। যত ক্ষণ বুদ্ধির তর্ক ও বিচার আছে, তত ক্ষণ ভেদ জ্ঞান যাইবে না। তৃতীয় তলে উঠ; সেখানে ঐ কোলাহল ক্রমে শান্ত হইতেছে। চতুর্থ তলে উঠ, সেখানে সকলই নিস্তব্ধ, কেবল অভেদজ্ঞান। যে হিন্দু সেই খ্রীষ্টবাদী; যে কৃষ্ণ ধর্ম্ম, সেই খ্রীষ্টধর্ম্ম; যে শঙ্করাচার্য্য, সেই যাজ্ঞবল্ক্য; যে বেদ, সেই পুরাণ; যে পূর্ব্ব, সেই পশ্চিম; যে স্বদেশী লোক, সেই বিদেশী লোক; যে বিদেশী, সেই স্বদেশী। কর্ম্মকাণ্ডে ভিন্নতা। তাই এধর্ম্মে যে ধার্ম্মিক, সে ও ধর্ম্মে ধার্ম্মিক নহে। যেমন বস্ত্রের ভিন্নতা, তেমনি বর্ণের ভিন্নতা তেমনি সাম্প্রদায়িক ভিন্নতা সকলই অসার। যেমন বর্ণেতে কৃষ্ণ-বর্ণ ও শ্বেতবর্ণ, তেমনই জানিবে, কাহারও কাল বুদ্ধি, কাহারও শ্বেত বুদ্ধি। বর্ণের ভিন্নতা কে মানে ? অসার মতের প্রভেদ কে মানে ? সূক্ষ্মদর্শী লোকে বলে কৃষ্ণ খ্রীষ্ট বেদ পুরাণ এ সমুদায় বিভিন্নতার নিম্নে ঐক্য আছে। সমস্ত তীর্থ অতিক্রম করিয়া যখন আত্মা সমাধির অবস্থায় ডুবিল, ওঙ্কার ধরিয়া ব্রহ্মে বাণ নিক্ষেপ করিল, ব্রহ্মেতে আত্মা প্রবিষ্ট হইল, তখন অভে-দজ্ঞান। সকল দিকে তখন ব্রহ্ম দর্শন; সেই বৈষ্ণব ধর্ম্ম, সেই ভক্তি, সেই প্রেম, তখন চারিদিকে অভেদ ভাবে বিস্তৃত রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। স্থূল জ্ঞান হৃদয়ে কমিল, আত্মাতে একেবারে বিলুপ্ত হইল। যোগা-সনে বসিয়া যদি দেখ, দেখিবে, ধর্ম্মে ধর্ম্মে মূলগত বিবাদ নাই; বেদ পুরাণে বিবাদ নাই, খ্রীষ্ট বিধানের সহিত হিন্দু ধর্ম্মের বিবাদ নাই। আত্মা

রাজ্যে যাঁহারা বাস করেন, বিবাদের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা বলেন, কি আশ্চর্য্য ? ঈশার সঙ্গে গৌরাঙ্গের বিবাদ ? কিসে কিসে বিবাদ হয় ? অভেদ যেখানে, সেখানে কিরূপে বিবাদ হইবে ? সমুদায় সত্যই এক। নব বিধানরূপ নূতন শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন, ভেদবুদ্ধি অসার। পুরাতন শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছিলেন, ব্রহ্ম আর পৃথিবী অভেদ, সকল ভেদজ্ঞানই মায়া; তেমনই নূতন শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন, সমুদায় সাম্প্রদায়িক ভেদজ্ঞান মায়ার খেলা। ব্রহ্ম যেমন অদ্বিতীয়, ধর্ম্মও অদ্বিতীয় এবং শাস্ত্র তন্ত্র সাধু মহাত্মাও অদ্বিতীয়। সমুদায় ঋষিতে অভেদ, প্রেরিতে প্রেরিতে অভেদ, মহাপুরুষে মহাপুরুষে অভেদ; ইহাঁদের মধ্যে বিরোধ নাই, সংগ্রাম নাই, পৃথিবীতে দেশ বিশেষে ঋষি প্রেমিক মুনি যোগী সংখ্যায় অনেক কিন্তু সমুদায় অভেদ ও এক। সমুদায় বেদ বেদান্ত এক শাস্ত্র, এক ভিন্ন আর দ্বিতীয় নাই। ধর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছি, "একমেবাদ্বিতীয়ং" বলিয়া, এবং চিরদিন সাধন করিব "একমেবাদ্বিতীয়ং" বলিয়া। কর্ম্মকাণ্ডের ভিতর থাকাতে মায়ার জন্য ভেদ জ্ঞান ছিল; এখন সকলে এক হও। ভেদদৃষ্টি করিব না, ভেদ সৃষ্টি করিব না, ভেদবুদ্ধির পথে চলিব না। তিন তীর্থ অতিক্রম করিয়া চতুর্থ তীর্থে যাইবই যাইব; এবং ঈশ্বরপ্রসাদে নিশ্চয়ই তথায় মোক্ষ ও শান্তি লাভ করিব।

হে দয়াসিন্ধু! হে করুণাময়! কল্পনার অতীত তুমি, ভেদাভেদের অতীত তুমি, তোমার চরণ ধরিয়া কাঁদিতেছি। পৃথিবীর অনেক বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছ, এখন এই মিনতি করি, ধর্ম্মরাজ্যে শান্তির পথ দেখাইয়া দাও। নৌকা ডুবিতেছে; পাপে পরিপূর্ণ; দুষ্প্রবৃত্তিবায়ুতে আন্দোলিত হইয়া জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে। এ সময় তোমায় ডাকিতেছি, হরি, কোথায় রহিলে ? এ মতের তরঙ্গে মারা যাই, এ সময়ে তুমি রক্ষা কর। অনেক লোকে সাম্প্রদায়িক তর্কে মরিতেছে। এই জন্য ঠাকুর! কাঙ্গালদিগের পরিত্রাণের জন্য তোমায় জানাইতেছি, সকল প্রকার ভ্রান্তি ও ভেদবুদ্ধি হইতে রক্ষা কর। দেহতীর্থে কর্ম্মকাণ্ড, মন তীর্থে জ্ঞানকাণ্ড, হৃদয়তীর্থে কোলাহলশান্তি ও নিবৃত্তির আরম্ভ। কিন্তু আত্মা তীর্থে যোগী ভিন্ন আর কেহই তত্ শান্তি লাভ করিতে পারে না। সকল তীর্থ দেখা হইল, শান্তি কোথাও পাওয়া গেল না। না বৃন্দাবনে, না কাশীতে, না গয়াতে। শাক্য যখন বিবাদ করেন শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে, পৃথিবীতে তখন শান্তি পাইব না। শান্তি পাইব পৃথিবীর অতীত স্থানে,

আত্মাতে; যেথানে কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ড কিছুই নাই, যেথানে কেবলই যোগ। দেখিব সেখানে এক সাধুকে অপর সাধুর বক্ষে। দেখিব, সকল মনুষ্য একজাতীয়। দিব্য চক্ষু দাও, হে ঈশ্বর অভেদ দর্শন করিয়া চরিতার্থ হই। দয়াময়, ব্রাহ্মদের মধ্যেও নানা গোলযোগ নানা বিবাদ হইয়াছে। ইচ্ছা হয় তোমাকে লইয়া এমন কোন নিভৃত স্থানে বসি যেথানে কোন গোল মাল, বাগ্‌বিতণ্ডা নাই, কোন ভেদাভেদ নাই। শুনিয়াছি, জগন্নাথের নিকটে থাকিলে সমুদ্রের শব্দ শোনা যায় না। হে কৃপাসিন্ধু! হে জগৎ-পতি জগন্নাথ! আত্মাতীর্থে যখন বসিব, সমাধি মন্দিরে বসিয়া যখন তোমার মুখশ্রী দেখিব, তখন প্রেমেতে যোগেতে সব একাকার হইয়া যাইবে। দুরন্ত বিচারসমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গের শব্দ শোনা যাইবে না। একেবারে শান্তি রাজ্য প্রচার কর, মা। বহুকাল হইতে ধর্ম্মের নামে তোমার নামে নানাপ্রকার অশান্তি প্রচারিত হইতেছে। বারণ করিতে পার কেবল তুমি, হে জগজ্জননি. তুমিই কেবল এ সকল বারণ করিতে পার। মাতঃ! কৃপা করিয়া শান্তিরাজ্য প্রচার কর। সকল ধর্ম্ম এক হউক, সকল প্রকার গৃহবিচ্ছেদ চলিয়া যাউক। সকল সম্প্রদায় একবার হরিচরণতলে নৃত্য করুক। বুঝি এ আশা দুরাশা! লোকে বলে, ধর্ম্মে ধর্ম্মে এত কলহ বিবাদ ইহা কি যায়? দয়াময়! দেহে বুদ্ধিতে, কার্য্যে যদিও ভেদা-ভেদ ও বিবাদ থাকে, যেন যোগেতে সকলে অভেদদর্শন করিতে পারে। যোগে সকল এক কর। যোগেশ্বর! তোমাকে সকলের মধ্যে দর্শন করি, তোমাতে অপর সকলকে অবলোকন করি। দেখি " মিশে নদী জলধিতে হয় একাকার "। আমি তোমাতে; জগৎ শুদ্ধ তোমাতে। এই অভেদ জ্ঞানে জ্ঞানী হইব। আমরা পুলকিত হইয়া বলিব, ভেদাভেদ নাই; জাতীয় বিজাতীয় নাই; কলহ বিবাদ নাই। শান্তি হইল, শান্তি হইল, যুদ্ধক্ষেত্র বন্ধ হইল; হে দয়াময়! কবে একথা পৃথিবী বলিবে? কবে আনন্দে সবাই মিলিয়া নৃত্য করিব? আশার কথা শুনিয়াছি। নূতন শঙ্করাচার্য্য শ্রীনববিধান সার অভেদতত্ত্ব প্রচার করিবেন। ইহাঁকে ক্ষমতা দাও, প্রভুত্ব দাও। ইনিই সর্ব্ব ধর্ম্মের সমন্বয় করিবেন; সকল সাধুকে এক করিবেন। মা কল্যাণদায়িনি! তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক। সর্ব্বদেবময় হরি যে তুমি, তোমার চরণতলে আমরা এক হইয়া বসিব। আমাদিগের এক শাস্ত্র, এক জাতি, এক হরি তুমি। শ্রীহরি! সর্ব্বদেবময় হরি! হরিনাম রসে মাতিয়া সকলকে আলিঙ্গন করিব। ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া তোমার চারি দিকে সবাই মিলিয়া নৃত্য করিব। হে কৃপাময়ি! আত্মার ভিতরে সকলে যেন এক হইয়া যাইতে পারি, পুণ্য ও আনন্দে যেন উন্মত্ত হইতে পারি, দেবি! দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশী-র্ব্বাদ কর।

সেবকের নিবেদন।

মহাজনের অলৌকিক নির্ভর।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার, ২০ এ ভাদ্র, ১৮০৩ শক।

যাহা লৌকিক তাহা লৌকিক এবং যাহা অলৌকিক তাহাও লৌকিক। যাহা সাধারণরূপে চলিতেছে তাহাও নিয়মে হয়, যাহা সময়ে, সময়ে অসাধারণরূপে ঘটিতেছে তাহাও ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত নিয়মাধীন। পৃথিবীর যে সকল ব্যাপার অলৌকিক বলিয়া পরিগণিত তৎসমুদয়ও লৌকিক নিয়ম দ্বারা নিষ্পন্ন করা যায়। বাস্তবিক নিয়মের অতীত কোন ঘটনা হয় না, হইতে পারে না; অথচ লৌকিক অলৌকিক দুইই স্বীকার করিতে হইবে। মহাজনদিগের পক্ষে অলৌকিক ব্যাপার আবশ্যক। অলৌকিক ব্যাপার ভিন্ন সামান্য লক্ষণে মহাজনের সত্য প্রতিপন্ন করা যায় না। পৃথিবী মহাজনের জীবনে অলৌকিক তেজ ও ক্ষমতা দেখিতে চায়। সামান্য সাক্ষ্যদানে মহাজন পৃথিবীর নিকট গৃহীত হন না। পৃথিবী বলে যদি তুমি মহাজন বলিয়া পরিচিত হইতে যাও তবে এক খণ্ড রুটী লইয়া শতাধিক লোককে খাওয়াইতে হইবে, এবং এক বিন্দু জলে সহস্রাধিক লোকের তৃষ্ণা নিবারণ করিতে হইবে। এ সকল কিংবা এ প্রকার কোন অলৌকিক ক্রিয়া করিতে না পারিলে লোকে তোমাকে মহাজন বলিয়া গ্রহণ করিবে না। মহাজন অথবা অসাধারণ লোক হইলেই সাধারণ লোকের অতীত অলৌকিক কোন্ ক্ষমতা দেখাইতে হইবে। হে প্রেরিত মহাজন, তুমি সামান্য ক্রিয়া দেখাইয়া নিশ্চিন্ত হইও না। অসামান্য লক্ষণ ভিন্ন কেহই পৃথিবীতে অসাধারণ লোক কিংবা মহাজন বলিয়া গৃহীত হন নাই।

যদি সাধারণ লোকের দুষ্প্রাপ্য শ্রদ্ধা ও সম্মান চাও তবে অসাধারণ বিশ্বাস, নির্ভর ও তেজ দেখাইতে হইবে। যদি আপনাকে ঈশ্বরের বিশেষ চিহ্নিত লোক বলিয়া পরিচয় দিতে চাও তবে আপনার জীবনে অলৌকিক বল অর্থাৎ লোকাতীত দৈববলের চিহ্ন দেখাইতে হইবে। বাস্তবিক আমাদিগের জীবনে যদি স্পষ্টরূপে ঈশ্বরের শক্তি না দেখিতে পাই তবে আমরা যে অপর সাধারণ লোক অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থায় অবস্থিত তাহা কিরূপে বিশ্বাস করিব? পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক মহাজনসম্পর্কে এই একটী অলৌকিক ক্রিয়া লেখা আছে যে, যেখানে অকাশ, শূন্য, কিছুই নাই সেখানে তিনি তাঁহার এবং তাঁহার বন্ধুদিগের খাদ্য পাইয়াছিলেন। মহাজনেরা মুক্তকণ্ঠে পৃথিবীকে এই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন;—"কেহ কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না।" "সর্ব্বাগ্রে তোমরা স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, পরে তোমাদিগের যাহা যাহা প্রয়োজনীয় সে সমস্ত তোমাদিগকে দেওয়া হইবে।" "তোমরা কেবল ধর্ম্ম চিন্তা করিবে অর্থাৎ কিরূপে তোমাদের স্বর্গস্থ প্রভুর ইচ্ছা পালন করিবে কেবল সেই বিষয়ে মনোযোগী হইবে, তোমাদিগের প্রভু স্বয়ং তোমাদিগের সকল অভাব মোচন করিবেন।" মহাজনেরা যদি আপনাদিগের জীবনের শক্ত ভূমির উপরে পরীক্ষা দ্বারা এই সত্য অনুভব না করিতেন, তাঁহারা যদি আপনারা প্রভুর কর্ম্মক্ষেত্রে কার্য্য করিয়াও ক্ষুধা তৃষ্ণায় কষ্ট পাইতেন, তাহা হইলে কখন তাঁহারা পৃথিবীকে এই উপদেশ দিতেন না। মহাজনেরা আপন আপন জীবনে এবং শিষ্য প্রশিষ্যাদিগের জীবনে এই সত্যের এত প্রমাণ পাইয়াছিলেন যে তাহাতে তাঁহারা দুর্জ্জয় বিশ্বাসের সহিত জগৎকে বলিয়া গিয়াছেন যে;—"যে কেহ ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে এবং সর্ব্বাগ্রে স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ করে, ঈশ্বর স্বয়ং তাহার ধন ধান্য হন।" মহাজনদিগের এই কথা তাঁহাদিগের অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিতেছে। মহাজনেরা যদি অটল বিশ্বাসের সহিত এই কথা বলিতে না পারিতেন তাহা হইলে জগতে আজ ঈশা, মুসা, শ্রীগৌরাঙ্গ, প্রভৃতি মহাজনদিগের এত কীর্ত্তি থাকিত না। পৃথিবী কেন মহাজনদিগকে ঈশ্বর প্রেরিত বলিবে? এবম্প্রকার উচ্চ বিশেষণ তাঁহাদিগকে কেন দিবে? তাঁহারা দেখাইয়াছিলেন তাঁহারা আকাশ ও

বায়ুকে অন্ন করিতে পারেন। বিপদ্‌ভঞ্জন ভগবান্ মহাজনদিগকে বলেন, "যেখানে দেখিবে কিছুই খাদ্য সামগ্রী নাই, সেখানে তোমরা সহস্র সহস্র লোকের আহার যোগাইতে পারিবে তোমাদিগকে এই অলৌকিক শক্তি দেওয়া হইল।" এই অলৌকিক বল একজন মহাপুরুষের মধ্যে বদ্ধ নহে, দেখিতে পাওয়া যায় পৃথিবীর প্রায় সকল মহাপুরুষেরাই এই অলৌকিক বল সম্পন্ন হন। মহাজনদিগের এই বলপ্রভাবে সমূহ বিপদের ভিতরে পড়িয়াও তাঁহাদিগের শিষ্য প্রশিষ্যেরা রক্ষা পাইয়াছেন। বাস্তবিক ঈশ্বর যাঁহাদিগের সহায় তাঁহাদিগের কিছুতেই ভয় নাই। তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে অকিঞ্চন ও নিঃসম্বল হইয়াও পরমধনে ধনী। ঈশ্বরের জন্য যাঁহারা সর্ব্বস্বত্যাগ করেন ঈশ্বর তাঁহাদিগকে সকল প্রকার আপদ বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য যাঁহাদিগের টাকা ছিল তাঁহারা টাকা ফেলিয়া দিলেন, অন্নের যত প্রকার উপায় ছিল সমুদয় পরিত্যাগ করিলেন, আর যাঁহাদের টাকা ছিল না তাঁহারা বলিলেন,—"আমাদের সখা চড়াই পক্ষীকে আমাদিগের দয়াময় স্রষ্টা খাইতে দেন, আমরা তাঁহার ভক্তদাস আমাদিগকে কি তিনি পরিত্যাগ করিবেন?" বাস্তবিক যাঁহারা ঈশ্বরের জন্য সর্ব্বত্যাগী হন, সমস্ত পৃথিবী তাঁহাদিগের উত্তরাধিকার হয়, তাঁহাদিগের কোন অভাব থাকে না। কথিত আছে পূর্ব্বতন যোগী ঋষি এবং সন্ন্যাসী তপস্বিগণ পর্ব্বতশিখরে অথবা গভীর অরণ্য মধ্যে বসিয়া যোগ তপস্যা করিতেন, আকাশ হইতে তাঁহাদিগের জন্য খাদ্য বর্ষণ হইত। ব্রহ্মমন্দিরের বেদী হইতে তোমাদিগকে সে সকল অযথার্থ অলৌকিক ক্রিয়া বিশ্বাস করিতে বলা হইতেছে না। প্রকৃত মহাজনেরা সে সকল বাহ্যিক অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া আপনাদিগের অলৌকিকতা প্রমাণ করেন না। পাঁচখানি রুটী দিয়া পাঁচ হাজার লোককে খাওয়াইয়া কিম্বা জলের উপর দিয়া চলিয়া গিয়া সামান্য লোকসকলকে চমকিত করিয়া তাহাদিগের শ্রদ্ধা উদ্দীপন করা মহাজনদিগের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু তাঁহারা অন্ন চিন্তা না করিয়াও অন্ন লাভ করেন, ইহাই তাঁহাদিগের অলৌকিক ক্ষমতা। তাঁহারা কৃষিকর্ম্ম করেন না, অথবা অর্থোপার্জ্জনের জন্য অন্য কোন

ব্যবসায় অবলম্বন করেন না; অথচ তাঁহাদিগের জীবন রক্ষার জন্য ধন ধান্য আসে কিরূপে? তাঁহারা লোকের কাছে গিয়া ভিক্ষা করেন না অথচ তাঁহাদিগের জন্য অন্ন বস্ত্র আসে কিরূপে? এই নিগূঢ় তত্ত্ব যদি তুমি বুঝিতে, কিংবা যদি আমি বুঝিতাম, তাহা হইলে আমরা মহাজনদিগকে এত আদর করিতাম না। আমরা যেমন বিষয় কর্ম্ম করিয়া দশ পাঁচ টাকা অর্জ্জন করিয়া আনি, ঈশা মুসা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি মহাজনেরা যদি সেরূপ করিতেন তাঁহাদিগকে আমরা মহাজন বলিতাম না। যদি তাঁহারা সাধারণ লোকদিগের ন্যায় অর্থোপার্জ্জন করিতেন তাহা হইলে আমরা বলিতাম "ঈশা মুসার ধর্ম্মভাব আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল সত্য বটে; কিন্তু তাঁহারাও সাধারণ লোকদিগের ন্যায় সামান সামান্য উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন।" কিন্তু বাস্তবিক মহাজনগণ সাধারণ লোকদিগের শ্রেণীর বহির্ভূত। সাধারণ লোকেরা বলে আমরা এইরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিব, মহাজনেরা বলেন এ সকল অবিশ্বাস ও নাস্তিকতার ব্যবহার। সাধারণ লোকেরা বলে আমরা যদি চাকরী করিয়া টাকা না আনি তবে আমাদিগের স্ত্রী পুত্রাদির অন্ন বস্ত্র কোথা হইতে আসিবে? এ সকল কথা শুনিয়া মহাজনেরা তাহাদিগকে কলঙ্কিত নাস্তিক মনে করেন। সাধারণ লোকদিগের পক্ষে ঈশ্বরাবমাননা যেমন পাপ, মহাজনদিগের পক্ষে কল্যকার জন্য চিন্তা করা তেমনই অধর্ম্ম। তাঁহারা কল্যকার জন্য ভাবিতেন না এই জন্য তাঁহারা সর্ব্বদা পাখীর ন্যায় প্রফুল্ল থাকিতেন। ঈশ্বরের অঙ্গীকার ও দয়ার উপরে কদাচ তাঁহাদিগের সন্দেহ হইত না। যাহারা ঈশ্বরের প্রেমে অবিশ্বাস করে তাহারা নাস্তিক শ্রেণীভুক্ত। ভক্ত মহাজনদিগের হস্তে ঈশ্বর তাঁহার সমস্ত ভাণ্ডারের চাবি দান করেন। তাঁহাদিগের আর ভয় ভাবনা থাকিবে কেন? পাহাড়ের উপরে যোগী বসিয়া যোগ ধ্যান করিতেছেন, লোকালয় হইতে বহু দূরে গঙ্গাতীরে বসিয়া ভক্ত ভক্তি সাধন করিতেছেন, কে তাঁহাদিগকে অন্ন দেয়? পাখীদিগকে জিজ্ঞাসা কর। যিনি আকাশের পক্ষিসকলকে আহার দেন, যিনি জলের মৎস্যসকলের প্রাণ রক্ষা করেন, যিনি অরণ্যের পশুসকলকে তাহাদিগের উপযুক্ত খাদ্য দেন তিনিই তাঁহার

সর্ব্বত্যাগী যোগী সন্ন্যাসীদিগকে আহার দান করেন। ঈশ্বর তাঁহার প্রেরিত মহাজনদিগকে বলেন; "তোমরা যদি সামান্য বিষয়ী ও কৃষকদিগের মত ধন ধান্য অর্জন কর তাহা হইলে আমার নাম ডুবিবে। তোমরা অসাধারণ প্রণালীতে তোমাদিগের অন্ন ও অপরাপর প্রয়োজনীয় বস্ত্র সকল লাভ করিবে; তোমরা প্রস্তর আঘাত করিবে আর প্রস্তরের ভিতর হইতে জল বাহির হইবে, তোমরা আকাশের গানে তাকাইবে আর আকাশ হইতে তোমাদিগের জন্য খাদ্য আসিবে; তোমরা কেবল আমার দিকে তাকাইয়া থাকিবে এবং আমার ইচ্ছা পালন করিবে, তাহা হইলে তোমরা দেখিতে পাইবে, আমি স্বয়ং তোমাদিগের সকল অভাব মোচন করিতেছি। তোমরা যদি তোমাদিগের আত্মীয় বন্ধু কি খাইবে এই ভাবনায় ভীত হও, তাহা হইলে পলকের মধ্যে পৃথিবী ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইবে, বিশ্বাস নির্ভর চলিয়া যাইবে এবং সত্যসূর্য্য অস্তমিত হইবে। তোমরা পৃথিবীকে অলৌকিক বিশ্বাস ও নির্ভরের দৃষ্টান্ত দেখাইবে।" যাঁহারা ঈশ্বরের দাস, যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করেন তাঁহারা আপনাদিগের অন্ন বস্ত্রের জন্য চিন্তিত হইবেন না। ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহাদিগের জীবিকার ভার গ্রহণ করেন। ঈশ্বর নিজে পৃথিবীর মনে তাঁহার সাধু ভক্তদিগের সেবা করিবার জন্য ইচ্ছা ও ভাব উত্তেজিত করেন। সাধুর নামে সকলের শরীর রোমাঞ্চিত হয়। এই যে আমরা এই দুষ্ট পৃথিবীর মধ্যেও ভক্তের প্রতি এত আদর দেখিতে পাই ইহা কেবল সাক্ষাৎ ঈশ্বরের লীলা। সাধুর অন্নসংস্থান নাই, সাধুর গাত্রে বস্ত্র নাই, ইহা দেখিলে পৃথিবীর মনে কষ্ট হয়। পৃথিবীর বড় বড় ধনী রাজারা পর্য্যন্ত মান অপমান চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরপ্রেরিত ব্রহ্মচারীদিগের সেবায় নিযুক্ত হন। পরমহংসের সেবায় নিযুক্ত হইলে পৃথিবী আপনাকে পবিত্র মনে করে। এক দিকে যেমন ভগবান্ ভক্তদিগকে কেবল তাঁহার পূজা ও দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছেন, অন্য দিকে আবার পৃথিবীতে তাঁহাদিগের সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এক দিকে ঈশ্বর ভক্তদিগকে বলিলেন;—"সাবধান তোমরা কল্যকার জন্য ভাবিও না, তোমরা কি খাইবে, কি পরিবে, এই চিন্তা করিও না, তোমরা কেবল কিরূপে পৃথিবীতে আমার স্বর্গরাজ্যস্থাপন করিবে

এই চিন্তা কর।" অন্যদিকে তিনি পৃথিবীকে এই বলিয়া দিলেন; "হে পৃথিবীর লোকসকল, তোমরা আমার ভক্তদিগের সেবা কর, তাঁহাদিগের জীবন রক্ষার উপায়সকল সর্ব্বদা ভাব।" এই রূপে ঈশ্বরের ব্যবস্থাতে এক দিকের অভাব আর এক দিকের ভাব দ্বারা সামঞ্জস্য হয়। সাধু ভক্তগণ আপনাদিগের জন্য চিন্তা না করিয়া উচ্চতম বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন, অন্যদিকে পৃথিবী তাঁহাদিগের জন্য চিন্তা করিয়া সাধুসেবার পবিত্র দৃষ্টান্ত দেখায়। ধন্য ঈশ্বর! যিনি দেশে দেশে যুগে যুগে এ সকল অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছেন! যে ভগবানের শরণ লয় তার কি দুঃখ হয়। ভগবান্ বলিতেছেন;—"ভক্ত আমার বন্ধু, ভক্তকে দেখিলে আমার আনন্দ হয়, আমার ভক্ত অন্নাভাবে মরিবে ইহা কি আমার সহ্য হয়। আমি আমার ভক্তের জীবিকার উপায় করিয়া দিবই দিব। যে আমার হাতে তার দেহ আমি তাহাকে রক্ষা করিবই করিব।" বাস্তবিক করুণাময়ী ভক্তবৎসলা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী মা তাঁহার শরণাগত ভক্তকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। তিনি কত দূর দূরান্তর দেশীয় লোকের মনে ভক্তের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা উদ্দীপন করিয়া দিতেছেন।

আচার্য্যের প্রার্থনার সার।

বুধবার ২৪ চৈত্র, ১৭৯৭ শক।

পিতা, তুমিই যে টাকা, অন্ন, সর্ব্বস্ব, এই মত স্বর্গ হইতে সুকন বাহির হইয়াছে; কিন্তু এখনও পৃথিবীতে আসে নাই। তুমি উপাস্য, তুমিই টাকা। তবে তুমিই যদি প্রতিদিনের অন্ন বস্ত্র এবং টাকা কড়ী হও, তবে আর কেন সংসারকে ভয় করিব? ভক্ত বল, যোগী বল, আচার্য্য বল, প্রচারক বল, কেহই বাঁচিবে না, হে ঈশ্বর, তুমি যদি টাকা না হও। যত দিন সংসার এবং ধর্ম্ম দুইটি বস্তু থাকিবে তত দিন সকলের মৃত্যু। যদি জগৎকে উদ্ধার করিতে চাও, এই দুই খানিকে একখানি করিতে

হইবে। ভক্তের আবার টাকা কি? ভক্তের নিকট তোমা ছাড়া এমন কি পদার্থ আছে যাহার নাম টাকা? যদি প্রাণের ভিতর যথার্থ ভক্তি থাকে তোমাকেই টাকা করিতে হইবে। তোমা ছাড়া টাকা আছে কখনই বিশ্বাস করিব না। এখন তুমি টাকা না হইলে আর চলে না। গরিবের একটি আবদার রাখ। জগদীশ, তুমিত সকল রূপই ধরেছ, এখন তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার ঐ পাদ-পদ্ম টাকশাল থেকে রোজ টাকা গড়ে নি। তুমি গরিবদের সিন্দুকের ভিতরের টাকা হও, সকাল বেলার অন্ন হও, রাত্রের অন্ন হও, নতুবা একবার তোমার প্রতি আবার টাকার প্রতি মন রাখিয়া বাঁচিতে পারি না। প্রাণকে এক জায়গায় রাখিয়া নিশ্চিন্ত হই। হে ঈশ্বর, তোমাকে লইয়া দিন কাটাই। এই ধনলোভী স্বার্থপর মস্তকের উপর তোমরা শ্রীচরণ স্থাপন কর, ঐ শ্রীচরণ প্রসাদে এবার ঢের টাকা উপার্জ্জন করিব। রূপা, সোণার অভাব থাকিবে না, প্রাণ কাঁদে মোর টাকার জন্য আর এই কথা বলিব না, তোমার ঐ শ্রীচরণ কল্পতরু মূলে বসিয়া ধনলোভ চরিতার্থ করিব। হে দারিদ্র্যভঞ্জন, দরিদ্রপালক, তুমিই আমাদের জীবন, তুমিই আমাদের জীবন রক্ষক, তোমাকে ভক্তিভাবে প্রণাম করি।

সেবকের নিবেদন।

প্রত্যাদিষ্ট।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার, ১লা পৌষ, ১৮০০ শক।

যে সকল বস্তু এই পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল বস্তুর সংসারে ক্রয় বিক্রয় হইতেছে। এসকলের মধ্যে ও স্বর্গের কিছু কিছু দ্রব্য আছে। এই সংসারে স্বর্গীয় এবং পার্থিব বস্তু সকল মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিরা এই দুয়ের প্রভেদ বুঝিতে পারেন। তাঁহারা বলিতে পারেন কোনটি স্বর্গীয় এবং কোন্‌টি পৃথিবীর। লক্ষণ দেখিয়া চেনা যায় কোন্‌টি স্বর্গীয়, এবং কোন্‌টি পার্থিব। পৃথিবীর বস্তুত মলিন আছেই, কিন্তু আপাত অনেক মলিন বস্তুর মধ্যেও স্বর্গীয় পদার্থ লুক্কায়িত থাকে। অনেক মানুষ আছে যাহারা মানুষ, আবার অনেক মানুষ আছেন যাঁহাদের ভিতরের প্রকৃতি দেবতার প্রকৃতি। পৃথিবীতে অনেক বুদ্ধিমান্‌ আছে যাহাদের বুদ্ধি পৃথিবীর বুদ্ধি, আবার এখানে এমন লোকও আছেন যাঁহাদিগের চক্ষু কর্ণ স্বর্গে উৎপন্ন স্বর্গে গঠিত। চক্ষু কাহার না আছে? কিন্তু কে স্বর্গের শোভা দেখিতে পায়? কাণ কাহার না আছে, কিন্তু কয়জন লোকের কর্ণ স্বর্গের শব্দ শুনিতে পায়? এই পৃথিবীতে স্বর্গের পুস্তক এবং মনুষ্যরচিত পুস্তকও রাশি রাশি আছে। আমাদের সমক্ষে স্বর্গীয়, পার্থিব দুইই রহিয়াছে; কিন্তু এমন বিচক্ষণ চক্ষু কাহার যে দুগ্ধ এবং জল পৃথক্‌ করিতে পারে? অথচ পার্থিব হইতে স্বর্গীয় বস্তু বাছিয়া লইতেই হইবে। পার্থিব পুস্তকের মধ্যে অনেক ভাল ভাল পুস্তক আছে বলিয়া সমুদয়কে মনুষ্যের রচিত মনে করা উচিত নহে। কোন্‌ পুস্তকে কাহার

নাম অঙ্কিত আছে তাহা দেখিতে হইবে। ধন রত্ন বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতি সমুদায়ই পৃথিবীতে মিশ্রিত ভাবে স্থিত, কিন্তু তাহার মধ্যেও পার্থিব ও স্বর্গীয় বিভাগ আছে। মনুষ্যসম্বন্ধেও এইরূপ। ধার্ম্মিক সংসারী স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আসেন। ঈশ্বরের ভাব, ঈশ্বরের সত্য, ঈশ্বরের নিঃশ্বাস, ঈশ্বরের ক্ষমা, ঈশ্বরের উৎসাহ, মনুষ্যের আকার ধরিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়, নিগূঢ়তত্ত্বদর্শীরা এ সকল দেখিয়া আমোদ করেন। এই সমক্ষে দেখ টাকা কড়ী ধন রত্ন মনুষ্য কত কি আছে। যাঁহারা বিচক্ষণ ভক্ত তাঁহারা বলিলেন, এই ধন রত্ন ঈশ্বরের, ঐ সম্পদ ঐশ্বর্য্য পৃথিবীর; এই পাঁচটী লোক স্বর্গের চিহ্নিত লোক, ঐ পাঁচ লক্ষ পৃথিবীর লোক। অনেক জিনিষ আছে যাহা পৃথিবীতে উপার্জ্জন করা যায়, যেমন টাকা বিদ্যা; কিন্তু এমনও অনেক জিনিষ আছে যাহা কেবল ঈশ্বরেরই নিকট পাওয়া যায়; যেমন ঈশ্বরের নিঃশ্বাস। ইহা পৃথিবীর কোন স্থানে কিংবা কোন মনুষ্যের নিকট পাওয়া যায় না। মানুষ জন্মে কোথায়? মাতৃগর্ভে। কিন্তু যখনই স্বর্গীয় পুরুষের জন্ম হয়, তখনই ঈশ্বর তাঁহার রক্তের মধ্যে স্বর্গের ভাব দিয়া তাঁহাকে গঠন করেন। দশটি স্বর্গের কার্য্য সমাধা করিবার জন্য পৃথিবীতে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহাকে দেখিয়া জননী কৃতার্থ হন এবং পৃথিবী ধন্য হয়। তিনি জন্মসন্ন্যাসী, প্রেরিত ঋষি, তিনি জগতের আদরের গোপাল, তিনি প্রেরিত শিশু, তাঁহাকে দেখিয়া পৃথিবী বলিল আমাদের গুরু আসিয়াছেন, পৃথিবী তাঁহার গুরুত্ব বুঝিল। তাঁহার জিহ্বাই বেদ, তাঁহার জীবনই শাস্ত্র। তিনি জন্ম সাধক, তিনি জন্ম-যোগী। তাঁহার এক একটী কথা শুনিয়া লোকে বলিবে ইহাঁর এক একটী কথা স্বর্গের অভ্রান্ত দেববাণী। এই এক শ্রেণীর লোকের কথা। ইহাঁদিগের সমস্ত জীবনই সত্যপূর্ণ। পৃথিবীতে, ইহাঁদিগের সংখ্যা অতি অল্প। ইহাঁদিগকে ছাড়িয়া পরে এমন এক শ্রেণীতে আসিলাম যাঁহাদিগের জীবনে দুই আনা সত্য লাভ করা যায়। জন্ম সাধুর জীবনে ষোল আনা পূর্ণ সত্য লাভ করা যায়, এই শ্রেণীর লোকের নিকট দুই আনা প্রত্যাদেশ লাভ করা যায়। ব্রাহ্ম স্বর্গের কোন পদার্থ অবহেলা করিতে পারেন না। অতএব যাঁহাদিগের জীবনে কেবল দুই আনা সত্য,

আমরা তাঁহাদিগের জীবন হইতেও স্বর্গের ফুল গুলি তুলিয়া লইব। ব্রাহ্ম বাগানের মালী হইয়া জন্মিয়াছেন। তিনি কেবল নানা স্থান হইতে স্বর্গের ফুল গুলি তুলিয়া মালা গাঁথিবেন। কোন কোন বৃক্ষে দুই একটি ফুল ফুটিয়াছে বলিয়া ব্রাহ্ম মালী তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। বিচার করিবার তাঁহার অধিকার নাই। অল্প হউক অধিক হউক সকল বৃক্ষ হইতেই তাঁহাকে স্বর্গের ফুল তুলিয়া লইতে হইবে। অতি সামান্য লোকের জীবনেও যদি একটি স্বর্গের ফুল ফুটিয়া থাকে আদরের সহিত তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। ঘোর অন্ধকার মধ্যে একটি লোকের কপালে ধক্ ধক্ করিয়া স্বর্গের একটী অগ্নিশিখা জ্বলিতেছে। ব্রাহ্ম সেই তেজের নিকট আপনার মস্তক নত করিলেন। একটি লোক তাহার সমস্ত জীবনে একটি স্বর্গের কথা বলিল তাহাতেই সে ধন্য হইল। একটি সামান্য লোক ঈশ্বর প্রেরিত এক জন সাধুকে বলিল;—"তুমি ঈশ্বরের পুত্র তোমাকে দেখিয়া আমার পরিত্রাণ এবং স্বর্গরাজ্যের আশা হইল।" এই কথা স্বর্গের কথা। মনে কর সেই ব্যক্তি তাহার সমস্ত জীবনের মধ্যে আর একটীও স্বর্গের কথা বলে নাই; কিন্তু তথাপি তাহার এই একটী কথাকেই স্বর্গের অমূল্য রত্ন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আর এক জন লোক দৈবাৎ তাহার শত্রুর প্রতি মধুর ব্যবহার করিল, হয়ত সে নিজেই বুঝিতে পারিল না কেন সে এরূপ অনুষ্ঠান করিল। সে বুঝিতে পারুক আর না পারুক শত্রুর প্রতি তাহার এই প্রেম ব্যবহার স্বর্গের ব্যাপার। চারি দিকে পার্থিব ব্যাপার; কিন্তু এই দুইটি জিনিষ স্বর্গের। ঈশ্বরের প্রত্যাদেশে যাঁহারা প্রত্যাদিষ্ট, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ হইতে যাঁহারা নিয়োগপত্র লইয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা পৃথিবীর রাশি রাশি বস্তুর মধ্য হইতে স্বর্গের বস্তু বাছিয়া লইতে পারেন। তাঁহারা লক্ষণ দেখিয়া স্বর্গীয় পদার্থ চিনিতে পারেন। যাহারা প্রত্যাদেশ পায় না তাহারা ঈশ্বর, এবং মূল সত্যের গৌরব বুঝিতে পারে না। তাহারা অনেক সময় সত্যকে মিথ্যা মনে করে এবং মিথ্যাকে সত্য মনে করে। পৃথিবীতে যে শ্রেণীর লোক যিনি, তাঁহাকে সেই শ্রেণীর লোক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। প্রত্যাদেশের পরিমাণ অনুসারে মনুষ্যমণ্ডলীকে শ্রেণীবদ্ধ করা কল্পনার

কার্য্য নহে, ইহাতে বিজ্ঞান আছে। যেমন ঈশ্বর আছেন সত্য, তেমনই ঈশ্বরের নিঃশ্বাস, সত্য, উৎসাহ ইত্যাদি মনুষ্যের আত্মা এবং বাহু মধ্যে আসে ইহাও সত্য। আমরা অনেক বৎসর হইতে ইহার প্রমাণ পাইয়া আসিতেছি। আমরা দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত ইহার সাক্ষ্য দান করিব, এবং আমরা যতই বৃদ্ধ হইতে থাকিব, ততই আমাদিগের এই বিশ্বাস ঘনতর হইতে থাকিবে। আমাদের মধ্যে এমন সকল লোক আছেন যাঁহাদিগের হৃদয় মনের মধ্যে ঈশ্বর অবতীর্ণ। যাঁহাদিগের চরিত্র মধ্যে আমরা ঈশ্বরের ভাব বুঝিতে পারি। এই কথা দ্বারা কেহ এরূপ মনে করিও না যে ঈশ্বর কেবল আমাদের কএক জনের মধ্যেই অবতীর্ণ, আর সাধারণ লোকেরা ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নরকে বাস করিতেছে; তাহারা আর ঈশ্বরের কোন সত্য কিংবা ভাব লাভ করিতে পারে না। ইহা অত্যন্ত জঘন্য মিথ্যা, ইহা ঘৃণিত অনৃত বাক্য। যাঁহার ভিতরে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বায়ু ঘুরিতেছে তিনি যে সকল বিষয়েই প্রত্যাদিষ্ট হন, ইহা মিথ্যা কথা। যিনি এক মাসে প্রত্যাদেশ পাইয়াছেন তিনি যে সকল মাসেই প্রত্যাদেশ পাইবেন ইহা সত্য কথা নহে। অথবা যিনি এক বিষয়ে প্রত্যাদেশ পান তিনি যে সকল বিষয়েই প্রত্যাদেশ লাভ করেন ইহা মিথ্যা। যিনি ক্ষমা বিষয়ে প্রত্যাদেশ পান তিনি হয়ত অন্য বিষয়ে প্রত্যাদেশ পান না। সরল সাধকেরা কখনও মিথ্যা বলেন না। তাঁহারা কখন কি বিষয়ে প্রত্যাদেশ পান এবং কখন কি বিষয়ে প্রত্যাদেশ পান না সকলই অকপট ভাবে স্বীকার করেন, আপনারাই বলেন। যাঁহারা প্রত্যাদিষ্ট, লক্ষণ দেখিতেই তাঁহাদিগকে চেনা যায়। যাঁহারা ঈশ্বরের নিয়োগপত্র পাইয়া কার্য্য করেন তাঁহাদিগের কপালে ধক্ ধক্ করিয়া স্বর্গের জ্যোতি জ্বলিতে থাকে। তাঁহারা আপনারাই বলেন এই এই বিশেষ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। আদেশ পাইলেই কার্য্য ভার লইতে হয়। তুমি মুখে বলিতেছ, প্রত্যাদেশ পাইয়াছ, অথচ তুমি যদি সেই আদিষ্ট কার্য্য না কর তুমি প্রবঞ্চক। তুমি স্বীকার করিতেছ, মনুষ্যচরিত্র গঠন করিতে তুমি এই সংসারে আসিয়াছ। তোমার স্পর্শমাত্র কঠোর মন বিগলিত হয়, পাপাসক্ত চিত্ত ঈশ্বরের দিকে পরিবর্ত্তিত হয়

এবং অতি সহজে চরিত্র গঠিত হয়, যদি এইরূপ না হয় তুমি প্রবঞ্চক। ঈশ্বর এক এক জনকে এক একটি বিশেষ কার্য্য ভার দিয়া এই পৃথিবীতে আনিয়াছেন। প্রত্যেকে তাহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিলেই তাহার নিজের এবং জগতের পরিত্রাণ হয়। তুমি ক্ষমা দ্বারা তোমার শত্রুদিগকে পরাস্ত করিতে আসিয়াছ, আর কিছু করিতে পার আর না পার, তুমি জগতে কেবল ক্ষমার দৃষ্টান্ত রাখিয়া যাও, ইহাতেই জগৎ উদ্ধার হইবে। তুমি জন্ম-উদাসীন, ফকীর হইয়া পৃথিবীতে জন্মিয়াছ, ঈশ্বর হইতে ফকিরী ভাব পাইয়াছ, তুমি জগৎকে কেবল সেই লক্ষণ দেখাইয়া যাও, তাহাতেই জগতের পরিত্রাণ হইবে, তোমার অন্য লক্ষণ দেখাইবার প্রয়োজন নাই। অতএব কার্য্যের জন্য অহঙ্কার এবং ঈর্ষা পোষণ করিয়া পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করিও না। তোমার পাঁচখানি কার্য্য আছে, আমার না হয় দুই খানি কাজ আছে, তাহাতে আমার দুঃখের বিষয় কি? এবং তোমারই বা গৌরবের বিষয় কি? ঈশ্বর যাহাকে যাহা করিতে বলিয়াছেন তাহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট। ঈশ্বরের আদেশে যিনি গান বাঁধিতে আসিয়াছেন তাঁহার বাদ্যে হস্ত দিবার প্রয়োজন কি? যিনি ক্ষমাচন্দ্র প্রকাশ করিতে আসিয়াছেন তিনি যেন বিনয় অথবা সাহসের দৃষ্টান্ত দেখাইতে চেষ্টা না করেন। যিনি বিনয়ী হইতে আসিয়াছেন তিনি যেন স্বর্গের আর কোন লক্ষণ দেখাইতে অহঙ্কার না করেন। অহঙ্কারশূন্য হইয়া আপন আপন নিয়োগপত্র দেখিয়া কার্য্য করিয়া চলিয়া যাও। কেহই অনধিকার চেষ্টা করিও না। যিনি যে কার্য্যের জন্য প্রেরিত তিনি যেন কেবল সেই কার্য্যই করেন, সেই কার্য্যসম্পর্কে তাঁহার যত দূর আবশ্যক তিনি প্রত্যাদেশ অথবা ঈশ্বর-নিঃশ্বাস পাইবেন, এবং পৃথিবীও সেই বিষয়ে তাঁহার অনুকূল হইয়া তাঁহার প্রয়োজনীয় সমুদয় দ্রব্য আনিয়া দিবে। অতএব কেহই আপনার অধিকার ছাড়িয়া অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিও না। ঈশ্বর যাঁহাকে যে স্থানে রাখিয়াছেন, তিনি যেন সেই স্থানেই বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে, সকলের কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে। যিনি স্বর্গের নিগূঢ় তত্ত্বসকল লিখিতে জন্মিয়াছেন, তিনি ক্রমাগত লিখিতে থাকুন; যিনি সঙ্গীত করিতে জন্মিয়াছেন, তিনি ক্রমাগত

সঙ্গীতের উন্নতি করিতে থাকুন, তাঁহারা প্রতিজনেই আপন আপন কার্য্যে স্বর্গ হইতে সাহায্য লাভ করিবেন এবং পৃথিবীও তাঁহাদিগকে সকল প্রকার আয়োজন করিয়া দিবে। যাঁহারা শিশু, যুবা অথবা নারী চরিত্র গঠন করিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা আপন আপন বিষয়ে স্বর্গ হইতে নূতন নূতন প্রত্যাদেশ লাভ করিবেন। যাঁহারা পাপী জগতের মধ্যে পুণ্য বিতরণ করিতে আসিয়াছেন তাঁহাদিগের হস্তে স্বর্গ হইতে রন্ধন করা পুণ্যের অন্ন সকল আসিবে। অতএব আচার্য্যগণ, প্রচারকগণ, তোমরা ঈশ্বরপ্রদত্ত আপন আপন হৃদয় এবং জীবনের উপযুক্ততা অনুসারে প্রতি জন কেবল তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য কর তাহা হইলে চারি দিকে কল্যাণের উৎসসকল উৎসারিত হইবে।

শুক্রবার বৈশাখ, ১০ ই ১৭৯৮ শক।

[ভক্তিশিক্ষার্থিকে বস্ত্রাদি দান।]

হে দয়াময় ঈশ্বর, তুমি স্বহস্তে যাঁহাদিগকে উচ্চ পদস্থ করিয়াছ তাঁহাদিগকে চক্ষু দেখিল না, কেবল তাঁহাদের শরীর দেখিল তাই পরস্পরের প্রতি নির্য্যাতন। মনুষ্যের কাছে বসা কি শক্ত ব্যাপার! যাঁহারা তোমার নাম উচ্চারণ করেন তাঁহাদিগের অগৌরব করিবার ইচ্ছা করা কি ভয়ানক অপরাধ! তোমার সন্তানেরা আমার প্রভু, সেই প্রভুদের চরণতলে আমার আসন বিস্তার করিতে দাও। তাঁহারা ব্রাহ্মণ, আমি শুদ্র। তাঁহারা শুদ্রের সেবা গ্রহণ করেন ইহা আমরা গৌরব বলিয়া বিশ্বাস করিব। হে শুদ্রের পিতা, হে ব্রাহ্মণের পিতা, যাহাতে ভক্তির সহিত দান করিতে পারি তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর। যথার্থ বিনয় দাও। বাহিরের ব্যাপার গুলি যদি কপট হয় তবেত আমি গেলাম। আমি দীন, আমি দুঃখী, আমি শুদ্র, শুদ্রের যত দূর বিনয়াচারী হইতে হয় তাহাই কর। উপদেশ দিবার ভার আমাকে দিলে, প্রভুদিগকে ব্রাহ্মণ দিগকে আমি শুদ্র হইয়া উপদেশ দিব,

তুমি আমার গলায় বিনয়ের বস্ত্র দাও। সুন্দর বিনয় ভূষণ আমি যেন সর্ব্বদা গলায় রাখিতে পারি। এত বড় লোকদের সঙ্গে যেন আমি যেমন তেমন ব্যবহার না করি। আমি দোষ গুণের বিচার করিব না। আমি তাঁহাদিগের মধ্যে কেবল তোমার অংশ দেখিব। ব্রাহ্মণের সেবা করিব আমি, কি স্পর্দ্ধা শুদ্রের? তোমার অনুগ্রহে তোমার সন্তানদিগকে শ্রদ্ধা করিব। ভ্রাতৃপ্রণয় চাহিনা, আমি কি আমার প্রভুদিগের সমান যে আমি তাঁহাদিগকে ভাল বাসিতে যাইব? আমি যদি তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা না করি আমার পরিত্রাণ হইবে না। প্রাণের যথার্থ শ্রদ্ধার সহিত তাঁহা-দের সেবা করিলে আমার পুণ্য হইবে। ভক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে যথো-চিত শ্রদ্ধাভক্তি দিলে শুদ্রের হৃদয় পবিত্র হইবে। মনুষ্যের হৃদয়ে তুমি বাস কর ইহা জানিয়া ভাই ভগিনীদিগকে শ্রদ্ধা করিব। অত্যন্ত বিনীত দাস হইয়া ব্রত পালন করিব। হে অধমবৎসল, সকলে মিলিত হইয়া ভক্তির সহিত তোমার শ্রীচরণে আমরা প্রণাম করি।

সেবকের নিবেদন।

দ্বিবিধনাস্তিকতা।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার, ২৭ এ আশ্বিন, ১৮০৩ শক।

অবিশ্বাসীদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ঈশ্বরকে যাহারা অবিশ্বাস করে, তাহারা প্রথম শ্রেণীর অবিশ্বাসী; যাহারা ঈশ্বর-বাণী অবিশ্বাস করে, তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর অবিশ্বাসী। চলিত ভাষায় বলিতে হইলে বলা যায়, যাহারা ঈশ্বরকে না মানে তাহারা নাস্তিক; শাস্ত্রকে যাহারা না মানে তাহারাও নাস্তিক। যদি কেহ ঈশ্বরকে মানিয়া শাস্ত্রে অবিশ্বাস করে তাহা হইলে সকল দেশে তাহাকে নাস্তিক বলে। ইহার কি কোন অর্থ নাই? আমি ঈশ্বরকে মানিব, তাঁহাকে ধ্যান করিব, তাঁহার গুণ গান করিব। তাঁহার শাস্ত্র নাই বা মানিলাম, ইহাতে কি দোষ? কি অপরাধ? ব্রহ্মের যাবতীয় স্বরূপ এক এক করিয়া মানিব; ব্রহ্মের সমুদয় লক্ষণ বেদ বেদান্ত সহকারে প্রতিপন্ন কর, আমি অনায়াসে সায় দিব, কিন্তু শাস্ত্র মানিব না। কেবল ব্রহ্মকে মানিয়া কি বিশ্বাসীদের দলে স্থান পাইতে পারি না? পৃথিবী কেন আমাকে বিশ্বাসী বলে না? প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত সকলে ঘৃণার অঙ্গুলি, অবজ্ঞার অঙ্গুলি ও দয়ার অঙ্গুলি আমার প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া কেন বলে, দেখ দেখ, ঐ নাস্তিক যায় দেখ। শাস্ত্র না মানিলে কি নাস্তিক হইতে হয়? ঈশ্বরের সঙ্গে শাস্ত্রের কি যোগ আছে? যেমন মানুষের সঙ্গে মানুষের মুখের যোগ, তেমনই ব্রহ্মকে বিশ্বাস করার সঙ্গে ব্রহ্মের আদেশে বিশ্বাস করার যোগ। ঈশ্বরের আদেশ, অনন্তবেদ। ঐ বেদ না মানিলে সকলেই তোমাকে নাস্তিক বলিবে। এই ব্রহ্মমন্দিরও

তোমাকে নাস্তিক বলিতে ছাড়িবে না। আমাদের ধর্ম্মেও তুমি নাস্তিক বলিয়া পরিগণিত হইবে। তুমি বলিবে, ইহার কারণ জানিতে চাই। কারণ জানিতে চাও? তবে শ্রবণ কর। যে বলিল, ঈশ্বর নাই, সে মতে নাস্তিক, বিশ্বাসে নাস্তিক। যে বলিল, ঈশ্বর আছেন, কিন্তু তিনি কথা কন না, নিরাকার বলিয়া তিনি কোন আদেশ করেন না, সে ব্যক্তি ব্যবহারে নাস্তিক, কার্য্যে নাস্তিক। পণ্ডিতগণ, বিচার কর, অধিক অনিষ্টকারী কোন শ্রেণীর নাস্তিক? যে বলিল, ঈশ্বর নাই, সকলেই তাহাকে দেখিয়া সাবধান হইবে। সাপ আসিল, বলিয়া দ্বার রুদ্ধ করিবে, গৃহস্থ পুত্র কন্যাগণকে সাবধান করিবে। সেই যে ভয়ানক হিংস্র জন্তু ব্যাঘ্রতুল্য নাস্তিক, সে যখন আগমন করে, বোধ হয়, স্বয়ং মৃত্যু যেন নগরে প্রবেশ করিতেছে। সকলে 'সাবধান! সাবধান!' বলিতে থাকে। উহাতে গৃহস্থ যথা সময়ে সতর্ক হয় ও লোকরক্ষা হয়। নাস্তিক যখন নগরে প্রবেশ করে, স্বয়ং মৃত্যু যেন নাস্তিকের আকার ধারণ করিয়া প্রবিষ্ট হয়। ঐ রাজধানীতে নাস্তিক এক দল প্রবেশ করিতেছে, শুনিবামাত্র লোকে যাহাতে উহারা প্রবেশ করিতে না পারে এরূপ উপায় অবলম্বন করিবে। প্রথম শ্রেণীর নাস্তিকদিগকে যত ভয় করি, তদপেক্ষা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাস্তিকদিগকে অধিক ভয় করি। প্রথম শ্রেণীর নাস্তিকেরা মুখে নাকি স্বীকার করে, ঈশ্বর মানি না, কথায় না কি বলে, ঈশ্বর নাই, এই জন্য ধর্ম্মসমাজকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিতে পারে না। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাস্তিক এত ভয়ানক কেন? কেন না, যে এই শ্রেণীর নাস্তিক, সে বলে, আমি ব্রাহ্ম আমি ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিত, আমি ব্রহ্মবাদী, আমি ব্রহ্মবিশ্বাসী, ব্রহ্মযোগী; আমি ঈশ্বরকে ডাকি, তাঁহার নাম কীর্ত্তনও করি, ব্রহ্মনাম আমার রসনাতে লাগিয়া রহিয়াছে। যেখানে যাই, লোকে ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া সমাদর করে। এই যে লোক, ভয়ানক প্রবঞ্চক। ঈশ্বর বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরবাণী বিশ্বাস না করিলে কি দোষ? দোষ এই, যে ঈশ্বরকে মানে, ঈশ্বর যাহা বলেন তাহা সে মানে না। ঈশ্বর কি আদেশ করিতে পারেন না? তিনি কি কথা কন না? শাস্ত্র কি হইতে পারে না? পিতা মাতাকে মান্য কর, সত্য বল, এমন সব বিষয়েও কি তাঁহার আদেশ নাই? ভাত খাও ক্ষুধার সময়; জল পান কর তৃষ্ণা হইলে, ইহা কি তিনি

বলেন না? বিদ্যা শিক্ষা কর, একথা কি ঈশ্বরের আদেশ নয়? প্রতিদিন উপাসনা কর, এ বিধির কি দলিল নাই? কেহ কি সাক্ষ্য দিতে পারে না যে ইহা স্বকর্ণে শুনিয়াছি? তবে কর কেন? আমাদের জ্ঞানে উচিত বোধ হয় বলিয়া। অন্যথা এক সীমা হইতে দেশের আর এক সীমা পর্য্যন্ত সকলকে জিজ্ঞাসা কর, কেহই বলিবে না, ইহা তাঁর অভিপ্রেত। এইটা করা ঈশ্বরের অভিপ্রেত, ইহা কেহই বলিতে পারে না। ঈশ্বর বাণী কি শোনা যায়? কি ভয়ানক ব্রহ্মজ্ঞ তুমি? তুমি খাও কেন? তুমি ধর্ম্ম সাধন কর কেন? গরিবকে কেন টাকা দাও? ক্ষুধিতকে কেন অন্ন দাও? পথিককে ঘরে লইয়া গিয়া সমাদর কেন কর? ঈশ্বর বলেন নাই, নিশ্চয় জান? নিশ্চয় জানি। তবে এ সকল কর কেন? আমার করা ভাল বোধ হয় তাই করি। তবে যাহা তোমার ভাল বলিয়া বোধ হয়, তুমি তাহার উপর নির্ভর করিয়াছ। তোমার বুদ্ধি তোমার পরিত্রাণের নেতা হইয়াছে, তুমিই তোমার মুক্তির সোপান হইয়াছ? তুমি কপট ধূর্ত্ত। তুমি ঈশ্বরকে জ্ঞানে বিশ্বাস কর, ব্যবহারে, ঈশ্বর না থাকিলে যেমন লোকে করে, তুমি ঠিক তেমনই কর। তুমি সন্তানের মস্তক যে কাটিবে না, তার প্রমাণ কি? তুমি যে অনায়াসে তাহা করিতে পার। না, আমি তাহা পারি না, কেন না আমার মনে হয় উহা ভাল কর্ম্ম নয়। তোমার যা মনে হয়, তাহাই তোমার শাস্ত্র? তাহাই তোমার মুক্তি? তোমার বুদ্ধি কি বেদ? নাস্তিক কি বলে? নাস্তিক, তুমি কি বল? আমিও ঠিক ঐ কথা বলি। ঈশ্বর কি বলিয়াছেন, কি না বলিয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত তাহার নিশ্চয় হয় নাই। কিছু কি ঠিক করিয়া বলা যায়? ঈশ্বরবাণী আবার কি? তবে এ উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কি? প্রভেদ এই যে এক জন বিদ্যালয়ে পড়িয়া বুদ্ধিকে কথঞ্চিৎ মার্জ্জিত করিয়াছে, আর এক জন বুদ্ধিকে তেমন মার্জ্জিত করে নাই। একজন মুখে নাস্তিক আর একজন কার্য্যে নাস্তিক। এক জনের যুক্তি কিছু মাত্র নাই যে ধর্ম্মকে প্রমাণিত করিবে, আর এক জন আপন হস্তে আপনার পরিত্রাণ সাধন করিতে উদ্যত। ঈশ্বর যে মানে না সেও নাস্তিক, শাস্ত্র যে মানে না সে ও নাস্তিক। শাস্ত্র যে মানে না, আমরা তাহাকে মানি না; তাহার ভ্রষ্টাচার আমরা অনুমোদন করি না।

ঈশ্বরকে মানা অপেক্ষা ঈশ্বরবাণী মানা আবশ্যক। ঈশ্বর মানিয়া ঈশ্বরের বাণী অস্বীকার করা কিরূপ? ঈশ্বরকে অর্দ্ধেক গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধেক অস্বীকার করা যেরূপ। ব্যবহারে যদি নাস্তিক হয়, কার্য্যে যদি নাস্তিক হয়, তবে তাহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাস্তিকের দলে গণ্য করিতে হইবে। বর্ত্তমান বংশ তাহাকে মর্য্যাদা দিতে পারে, কিন্তু যে বংশ আসিতেছে, সে বংশ কখনই মর্য্যাদা দিবে না, তাহারা ঘৃণা করিবে, প্রচ্ছন্ন নাস্তিককে সূক্ষ্মরূপে বিচারিত হইতে হইবে। পৃথিবী বলিবে, মুখে ইহারা ঈশ্বরকে অস্বীকার করে নাই বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ নাস্তিকতা অবলম্বন করিয়াছে।

ঈশ্বর আছেন, তাহার প্রমাণ কি? ঈশ্বরবাণীই তাহার প্রমাণ। ব্রহ্ম হইতে বেদ বড়, লোকে বলিয়া থাকে। ইহার গূঢ় অর্থ আছে। ব্রহ্ম যদি না বলেন, 'আমি আছি,' আমি মানিব না। তিনি আগে কথা কন, 'আমি আছি। আমি আছি' বলেন, পরে তাঁহাকে বিশ্বাস করি। না বলিলে কি বিশ্বাস করিতে পারিতাম? না কথা কহিলে কি বিশ্বাস করা যায়? শব পড়িয়া রহিয়াছে। সে 'আমি আছি' বলে না, বলিতে পারে না। সেই জন্যই মনুষ্যাকৃতি থাকিলেও তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারি না। জাগ্রৎ জীবন্ত ব্রহ্ম আছেন যেমন বলিব, তেমনই বলিব, তিনি কথা কন; তিনি বলেন, 'আমি আছি।' যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে কি লেখা আছে? ঈশ্বর-সত্বা বিশ্বাসের মূলে তাঁহার 'আমি আছি' এই বাণী। 'আমি আছি' এই কথার মধ্যে যে বেদ, ইহা ঋক যজু সাম অথর্ব্ব বেদ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। সর্ব্ব প্রথমে এই 'আমি আছি' বেদ ব্রহ্ম মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল। যেমনই ব্রহ্মাণ্ডপতি ব্রহ্মাণ্ডকে চমকিত করিয়া, আকাশকে বিকম্পিত করিয়া 'আমি আছি, আমি আছি' বলিলেন, অমনি তাঁহার উপাসনা হইল, স্তব স্তুতি পঠিত হইতে লাগিল, সংগীত সহকারে চারি দিকে অর্চ্চনা আরম্ভ হইল। 'আমি আছি' শব্দ যখন বন্ধ ছিল, তখন বেদের প্রথম পৃষ্ঠাও রচিত হয় নাই। যাই ব্রহ্ম 'আমি আছি' বলিলেন, অমনি পূজা হইল, হরিসংকীর্ত্তন হইল। তবে ঈশ্বর বড়, না ঈশ্বরবাণী বড়? আমি বলি, ঈশ্বর অপেক্ষা ঈশ্বরবাণী বড়। আমাদিগের নিকট ঈশ্বরবাণীর আদর

অধিক। কেন না এই বাণীই আমাদিগকে ঈশ্বরের নিকট লইয়া যাইবে। পথ বড় না ঘর বড়? পথের আদর করিলে ঘরে যাওয়া যায়। আমি যে বলিব, ঈশ্বর আছেন, আগে আমার ঈশ্বরবাণী শ্রবণ করা আবশ্যক। পর্ব্বতের মধ্যে ব্রহ্ম, সাগরের মধ্যে ব্রহ্ম; দক্ষিণে বামে, ঊর্দ্ধে অধোতে ব্রহ্ম বর্ত্তমান থাকিয়া 'আছি আছি' এই বেদ বাক্য, এই প্রাচীন কথা উচ্চারণ করিতেছেন। যাই জীব শুনিতে পাইলেন, শরীর কম্পিত হইয়া উঠিল। যদি তুমি বল, ব্রহ্মকে মান, কিন্তু তাঁহার কথা শোন নাই, তবে আমি জানি না, তুমি কোন্ শ্রেণীর লোক। এই গেল প্রথম কথা। পরে আমি জিজ্ঞাসা করি, হে মানব! তুমি আহার কর, কিসের জন্য? ক্ষুধা শব্দের অর্থ কি? দেহগুরু, জগদ্গুরু ক্ষুধার ভিতর দিয়া আদেশ করিতেছেন 'আহার কর!' প্রথম পরিচ্ছেদে যিনি 'আমি আছি আমি আছি' বলেন, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি 'তুমি খাও, তুমি যাও, তুমি কাজ কর,' বলিয়া কথা কন। এই যে ক্ষুধার সময় আহার করিয়া আমরা শরীরকে স্বচ্ছন্দে রাখি, ইহা কোথা হইতে আসিল? যদি তিনি না বলিতেন, ক্ষুধা কি আসিত? বল, খাইব না। এমন আদেশ আসিল যে, খাইতেই হইবে। তুমি অনুভব করিতেছ, এমন শক্তি আছে, যাহা বলপূর্ব্বক খাওয়াইয়া থাকে। ক্ষুধা সহজ নয়। রাজা অপেক্ষা ক্ষুধা বড়। ক্ষুধা গুরু পরম গুরু। ক্ষুধাকে জগতের গুরু বলি কেন? বারংবার বলিব। ইহার মধ্যে এমন এক খানি বেদ আছে যে কোন ক্রমেই ইহাকে অবজ্ঞা করিতে পারি না। বরং ঋগ্বেদে ভ্রম বাহির করিতে পারি, কিন্তু ক্ষুধাবেদ অভ্রান্তবেদ। ক্ষুধার অবস্থায় আহার দ্বারা শরীরকে রক্ষা করিবে, ঈশ্বরের ইহা আদেশ। কে পুস্তক পড়িয়া অন্ন খায়? সামান্য সামান্য বিষয়ে যখন আদেশ হয়, তখন বড় বিষয়ে কি হয় না? পূজা কর, ইহা কি ঈশ্বর বলেন না? তুমি কি বল ঈশ্বরের কথা বলিবার শক্তি নাই? বাহির হও নাস্তিক। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রচ্ছন্ন নাস্তিক রূপে তুমি অবস্থান করিতেছ, নর নারীর প্রাণনাশ করিবে? তুমি বল ঈশ্বরবাণীর যুক্তি নাই, প্রমাণ নাই? প্রকাণ্ড বজ্রধ্বনির ন্যায় গম্ভীর স্বরে তিনি বলিতেছেন, শরীর পোষণের জন্য আহার কর, আত্মা রক্ষার জন্য উপাসনা কর। কাহার কথা? সৃষ্টিকর্ত্তাকে মানাও যেমন, সৃষ্টি

কর্ত্তার আদেশ মানাও তেমনি। দুই সমান। ঈশ্বর আছেন বলাও যেমন, তিনি কথা কন স্বীকার করাও তেমনি। এ দুই বিচ্ছিন্ন কর, বিচ্ছিন্ন করিয়া বল, আমি ঈশ্বরের উপাসনা করি, ভাল বোধ হয় বলিয়া অথবা অমুক বন্ধু বলিয়াছেন বলিয়া; আমি তোমার কথায় সায় দিব না, লোকের কথায় উপাসনা করিব না। উপাসনা করিব মানুষের কথায়? মানুষ এখন যাহাকে ভাল বলে, দুই ঘণ্টা পরে যদি তাহাকে মন্দ বলে? তুমি নিজের বুদ্ধিতে ভাল লাগে বলিয়া উপাসনা কর? অহঙ্কারী মানব! তুমি পর্ব্বতকে রাখিতেছ, চুলের উপর! ঘর বাঁধিতেছ, ঘরের পত্তন ভূমি নাই! আকাশে পর্ব্বত স্থাপন। গোড়াতে ঈশ্বরবাণী নাই, ফল লইয়া আমোদ করিতেছ, মূলের দিকে দৃষ্টি নাই! কি ভয়ানক ব্যাপার! ঈশ্বরবাণী না মানা কি ভয়ানক! কাল সকাল হইতে না হইতে ব্রহ্মযোগ, ব্রহ্মভক্তি, ব্রহ্মবিশ্বাস, সকলে মিলিয়া নগরকীর্ত্তন, সকলই চলিয়া যাইতে পারে। সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার দূর হয়, হয়ত কতকগুলি লোকের কথায় তুমি মনে করিতে পার সে সকলও তেমনি তিরোহিত হইল। অহঙ্কার করিও না; বলিও না, কাপড় পরি, আহার করি গরিবকে টাকা দিই সংস্কার বশতঃ। ভাল লাগে বলিয়া তুমি হরি নাম কর? অন্য সব ব্যাপারের তোমার প্রমাণ আছে, কেবল এই ঈশ্বরবাণীর প্রমাণ তুমি পাও না? তোমার পুত্রের মস্তক যে তুমি কাটিবে না, তাহা কে বলিল? অবস্থায় পড়িলে তোমার সম্বন্ধে এ সব কিছুই আশ্চর্য্য নয়। তোমার সমস্ত জীবনটা নাস্তিক। তোমার গৃহ ভিত্তিশূন্য। যখন বৃষ্টি পড়িবে, পত্তনভূমি আন্দোলিত হইবে, ঝুপ ঝাপ করিয়া প্রকাণ্ড বাড়ী পড়িয়া যাইবে। বৃক্ষতলে বসিয়া তুমি ফলরাশি দেখিতেছ, কিন্তু অবিশ্বাসের প্রচ্ছন্ন কীট যে সব কাটিয়া ফেলিল, দেখিলে না? দেখ, গোড়া একেবারে কাটিয়া শূন্য করিল। মড়্ মড়্ করিয়া পড়িল বৃহৎ তরু। কোথায় ফল, কোথায় ছায়া? সেই জন্যই বিনীত ভাবে অনুরোধ করিতেছি, এখনও দিন আছে, সাবধান হও। শমন নিকটে, এখনও আসে নাই। ঈশ্বরবাণী শ্রবণ কর। ঈশ্বরবাণীতে অবিশ্বাস করিও না। ইহা অবিশ্বাস করিয়া কেহ বাঁচে নাই। কেবল ঈশ্বরবিশ্বাস করিলে চলিবে না। যে বলে, ঈশ্বরের বাণী মানি না, সে ব্যক্তি অনেক

অন্যায় কর্ম্ম করিতে পারে। তুমি বুদ্ধিকে গুরু করিবে? সেই পুরাতন গুরু অহঙ্কারী বুদ্ধি, তাহাকে ছাড়িবে না? ঈশ্বর যাহা বলিবেন, তুমি তাহা শুনিবে না? আমি কি তোমাকে চিনি না? তুমি বেদ উড়াইলে, শাস্ত্র উড়াইলে; আপনাকে আপনি পরিত্রাতা করিলে। পাছে তোমার পুরাতন দুষ্ট বুদ্ধি মারা যায়, পাছে তোমার অহংভাব চলিয়া যায়, পাছে ঈশ্বর চরণে আত্ম বিসর্জ্জন করিতে হয়, এই ভয়ে তুমি ঈশ্বরবাণী মানিতে চাও না। আচ্ছা, দেশের বেদ, আধুনিক পুরাণ তুমি মান না, দৈববাণী, বিবেক-বাণী, যোগের অবস্থায় যাহা আত্মার মধ্যে নিনাদিত হয়, গম্ভীর ভাবে উচ্চারিত সেই শব্দকে কেন মান না? শব্দই যে ব্রহ্ম। শব্দ নাই, অথচ ব্রহ্ম এ কি কথা? যে ঈশ্বর কথা কয় না, সেত কল্পনা। তোমার মনের অহঙ্কার কি ঈশ্বর? অহঙ্কারের নাম তুমি ঈশ্বর রাখিয়াছ। যথার্থ ঈশ্বর কে? যিনি বলেন উঠ, বস, খাও, পড়, ধ্যান কর, একতারা বাজাও এই নির্জ্জন স্থানে বসিয়া সাধন কর; শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ কর, উৎকৃষ্ট শ্লোকসকল চিন্তা কর, সাধুদের দৃষ্টান্ত অবলম্বন কর। যাঁর মুখে এ সব কথা, তিনিই ব্রহ্ম। যে কথা কয় না, সেত ভূত প্রেত। আমাদিগের ব্রহ্ম কি ভূত প্রেত? ঐ দেখ, ঐ দেখ, কথা কহিল না, প্রেতত্ব সিদ্ধ হইল, ভূত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। ব্রহ্ম কথা কন, ব্রহ্ম ভূত ও প্রেত নহেন। নিঃশব্দতার মধ্যে তিনি উপদেশ দেন। অবাক্ হইয়া তিনি কথা কন। যাহারা অর্দ্ধেক ব্রহ্ম মানে, তাহাদের হস্ত হইতে ঈশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করুন। ব্যবহারে যাহারা নাস্তিক, তাহা-দিগের হস্ত হইতে যেন আমরা নিয়ত রক্ষা পাই। প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতাকে আমরা বড় ভয় করি। এ নাস্তিকতাকে দূর করিয়া দাও। মান, এখনই মান, ঈশ্বর বাণী মান। ঈশ্বরের নিকট উপদেশ শ্রবণ কর। নীতি উপদেশ সকল ঈশ্বর প্রমুখাৎ শ্রবণ কর। বল, যাহা তিনি বলিবেন, তাহাই করিব। যে আসনে বসিয়াছ সে আসন হইতে উঠিবে না, যত ক্ষণ না তিনি আদেশ করিবেন। কোন কার্য্য তাঁহার আদেশ ব্যতীত করিবে না। তুমি মনুষ্য, একটী তৃণ নাড়িবার তোমার অধিকার নাই। যত ক্ষণ না মহাপ্রভু বলি-বেন, যত ক্ষণ না কোন আদেশ করিবেন, তত ক্ষণ কিছুই করা হইতে পারে না। যদি ঈশ্বর না আদেশ করেন, পাঁচ বৎসর এই স্থানে বসিয়া থাকিতে

হইলেও থাকিবে। তিনি বলিবেন খাও, তবে আমি খাইব। খাওয়াও ঈশ্বরের অভিপ্রায় বুঝিয়া সমাধা করিব। তিনি না বলিলে সংসারের কোন কার্য্য করিতে পারিব না। কে যায় কার্য্যালয়ে, ঈশ্বরের আদেশ ব্যতীত? যে টাকা উপার্জ্জন করে, ঈশ্বরের আদেশ ব্যতীত, ঈশ্বরাদেশ না পাইয়া যে কাজ করিতে যায়, সে নাস্তিক। এক পয়সা যে ঈশ্বরের অনভিপ্রায়ে উপার্জ্জন করে, সে নাস্তিক। কে যায় বিদ্যালয়ে উপাধি লইবার জন্য ঈশ্বরের আদেশ ব্যতীত? ঈশ্বরাদেশ না শুনিয়া বিদ্যালয়ে যায় যে যুবা সে নাস্তিক। ব্রহ্মমন্দিরে রবিবারে রবিবারে ঈশ্বরের আজ্ঞা না শুনিয়া যে ব্যক্তি আগমন করে, সে নাস্তিক। এই সকল নাস্তিক কি পূর্ব্বাঞ্চলে কি পশ্চিমাঞ্চলে সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই নাস্তিকতার আগুন যেন জীবকে দগ্ধ না করে, এই হৃদয়ের প্রার্থনা।

সেবকের নিবেদন।

ঈশ্বরের ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার, ৮ই কার্ত্তিক, ১৮০৩ শক।

ঈশ্বরের বাহ্যিক লক্ষণ ও লীলা বিভিন্ন ভাব ধারণ করে কিন্তু যিনি অনন্ত তিনি সদা অপরিবর্ত্তনীয় থাকেন। অনন্ত অপরিবর্ত্তনীয় থাকিয়াও তাঁহার ক্রিয়া অনুষ্ঠান এবং লীলাকে সর্ব্বতোভাবে বিচিত্র করেন। তাঁহার স্বরূপ এবং আখ্যা এক থাকিয়াও ভিন্নতা দেখায়। যদিও অনন্তের ভিতরে ব্রহ্ম প্রকৃতি আছে, সময়ে তাহা প্রকাশ পায়, এ জন্য অনেক পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্ম যিনি তিনি নির্গুণ, অটল, অচল, অপরিবর্ত্তনীয়। তাঁহাতে দিবা নাই, রাত্রি নাই, বর্ষা নাই, বসন্ত নাই; যৌবন নাই, বার্দ্ধক্য নাই, পুরুষের ভাব নাই, স্ত্রীর ভাব নাই; তিনি এক ছিলেন, এক আছেন, এক থাকিবেন। অনন্তে বিকার নাই, অনন্তের এক স্বভাব। তাঁহার বাহিরের লক্ষণের দিকে ফিরিলে তাঁহার কার্য্য প্রকারান্তর হইবে, বর্ণের পরিবর্ত্তন হইবে, ভিন্নতা হইবে, ভাবান্তর হইবে। এ সকল বাহিরে হয়। দেখ এই কয়েক দিন পূর্ব্বে বঙ্গবাসিগণ দুর্গাকে নমস্কার করিল, পূজা করিল। তাঁহার সুন্দর মূর্ত্তি সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিল, প্রাণকে মোহিত করিল, তাঁহার রূপে হিন্দুর ঘর আলোকিত হইল; তাঁহার কাছে বসিয়া তাহার চিত্তের ভাবান্তর হইল। সকলে প্রণত হইয়া তাঁহাকে অঞ্জলি দিল। কিন্তু অল্প কয়েক দিনের মধ্যে সিংহবাহিনীকে অন্যবর্ণে রঞ্জিত করিয়া সকলে জা পূ করিতে লাগিল। এমন সুন্দরবর্ণ

কৃষ্ণবর্ণে পরিবর্ত্তিত হইল। লোকে সুন্দরী দেবীকে পরিবর্জ্জন করিয়া কালী দেবীর পূজা করিতে গেল কেন? কি সেই রুচি যে রুচি দুর্গাকে ছাড়িয়া কালীপদে ভূমিষ্ঠ হয়। এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে অবশ্য কোন নিগূঢ় অর্থ আছে তাহা বুঝা আবশ্যক। মানুষ দুর্গাকে ছাড়িয়া কালীর নিকটে গমন করিল কেন? দুর্গাদাস আপনাকে কালিদাস কেন বলিল? মানুষের প্রকৃতি, মানুষের স্বভাব ও মতি যাঁহারা জানেন তাঁহারা এ পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারেন, বুঝাইতে পারেন। দেবী প্রকৃতি একই। যিনি দুর্গা তিনিই কালী। শক্তি এক। যিনি পূজা করিলেন তিনি দুয়েতেই শক্তি দেখিলেন। কিন্তু যাঁহাতে এত আকর্ষণ ছিল, যাঁহাকে দেখিলে মন মোহিত হইত তাঁহার রূপান্তর দেখিয়া ভয় হয় কেন? আনন্দ হয় ভয় হয়, এ দুই ভাব কোথা হইতে আসিল? এ দুই মনেতেই আছে। কেবল মনের ভাব দেবীকে দুই বর্ণে প্রতিফলিত করিল। যখন ভালবাসাকে লইয়া পূজা নমস্কার করিলে, আশ্রয় গ্রহণ করিলে, অভয়াকে ভক্তি দান করিলে, তখন এক বর্ণ বিশ্বাসী নয়ন দর্শন করিল; কিন্তু যখন ভয়ে ভীত হইয়া দেবীকে দেখিতে প্রবৃত্ত হইলে, সে সময় সেই নয়নই অনন্ত কালের ভিতরে ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি বিরাজমানা দেখিতে পাইল। ভাবে সাদা কাল হয়। দুর্গার সোণার রূপ ছিল, ভয় দুর্গাকে কাল করিল। শক্তি একই রহিল কিন্তু দর্শনভেদে দেবীর ভাব বাহিরে ভিন্ন হইল। প্রকাণ্ড এক শক্তি, তাঁহার এক পার্শ্বে লক্ষ্মী শ্রী, এক পার্শ্বে জ্ঞান বিদ্যা সরস্বতী। এক পার্শ্বে সুন্দর ধীর সন্তান, অপর দিকে মঙ্গল ও বিঘ্নহরণ। দেখিতে দেখিতে চারি মূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান হইল, না আছে সখী না আছে সন্ততি। এক ভয়ঙ্করা কঙ্কালবদনা বাহির হইল। সে শ্রী নাই, সেরূপ নাই, সে প্রেম নাই, সে স্নেহ নাই, সে আমোদ নাই, সে উল্লাস নাই, এমন কাল যে ঘরে আলোক না থাকিলে অন্ধকার মধ্যে এ দেবীকে অন্বেষণ করিয়া বাহির করা কঠিন। অন্ধকারে অন্ধকার মিশাইয়া গিয়া ক্রমে এক হইয়া গেল। যিনি দুর্গা ছিলেন, যিনি সখী ও সন্তান দ্বয় লইয়া দেখা দিয়াছিলেন, তিনিই রূপান্তর হইয়া গেলেন। আবার যখন ইচ্ছা প্রবল হইবে, তখন পুনরায় তাঁহাকে উপাসক দেখিতে পাইবেন। এখন সে মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়া আর এক মূর্ত্তি উপস্থিত। ইহাঁর

গলায় মুণ্ডমালা, হাতে খড়্গ, একটা বিকটাকার ভয়ানক মূর্ত্তি, দেখিয়া মনুষ্যের হৃদয় কম্পিত হয়। যে মূর্ত্তি দেখিয়া পূর্ব্বে ভক্তি উদ্দীপ্ত হইয়াছে, মন মুগ্ধ হইয়াছে, সেই মূর্ত্তির পরিবর্ত্তন দেখিয়া এখন ভয় উপস্থিত। এ মূর্ত্তি কোথায় দেখিবে ভক্তিপূর্ব্বক শুন। একবার হৃদয়ের মধ্যে যাও, সেখানে খুঁজিলে এ মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। ভিতরে আলোক নাই, অন্ধকার তোমাকে পরিবেষ্টন করিবে। অনন্ত আকাশ কাল, সেই অনন্ত আকাশে বিলীন এই শক্তি। এখানে অন্ধকারে অন্ধকারে এক, নিরাকারে সকলই একাকার হইয়া গিয়াছে। আকাশ ও অন্ধকারে কিছুই প্রভেদ করা যায় না। সেই ঘন কাল আকাশের ভিতরে অন্ধকারের ভিতরে ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মজ্ঞান। বাহিরে তাঁহারই কালী মূর্ত্তি, দেবী বাহিরে, অন্তরে ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মজ্ঞান। হৃদয়ে সময়ে সময়ে বিশ্বাস নয়নে অন্ধকার নির্ব্বাণ ও আকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। যখন হৃদয় পাপে আচ্ছন্ন হয়, তখন কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই অশান্তির সময়ে মনে বড় ভয় উপস্থিত হয়। সেই ভয়ের মধ্য হইতে ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি বাহির হইয়া জীবগণকে কম্পিত করে। সেই ভীষণ রূপা দেবী অনন্তকালরূপ অস্ত্র ধারণ করিয়া জীবগণের মস্তক ছেদন করেন। এই কাল অস্ত্রের আঘাতে কত মুণ্ড উচ্ছিন্ন হইল, কত বংশ বিলুপ্ত হইল। কাল অস্ত্র ধারণ করিয়া যিনি ছেদন করেন তিনি কালী। সেই কালীকেই সকলে মা বলে। কাল যাহাদিগকে মারিল তাহাদিগের ছিন্ন মস্তক লইয়া মুণ্ডমালা করিয়া কালীর গলায় পরাইয়া দিল। কি জন্য? জীবকে ভীত করিবার জন্য। শক্তির এরূপ মূর্ত্তির অভিপ্রায় এই জীবকে ভীত করিয়া পরলোকের সম্বল করিয়া দেওয়া। ভীত না হইলে জীবের অর্দ্ধ অংশ পাপে ডুবিয়া যায়, কিছুতেই উন্নত হইতে পারে না। তুমি বলিতেছ কৈ কোথাও ভয় নাই। প্রেমের চন্দ্র আকাশে উদিত, ভয়ের কারণ কোথায়? ভয়ের বস্তু কি কিছুই নাই? ঈশ্বর রাজা ইহা মান? ঈশ্বর রাজা হইয়া দণ্ড দেন, পাপীর বিচার করেন, শাস্তিবিধান করেন, শাস্তি দিয়া পাপীর পাপ নিবৃত্ত করেন। শক্তির এক মূর্ত্তি অতি মনোহরা, আর এক মূর্ত্তি ভয়ঙ্করা। সমস্ত পৃথিবীর অনিত্য বস্তু এই ভীষণ মূর্ত্তি দেবীর তীক্ষ্ণ অস্ত্র সংহার করিতেছে। এই অস্ত্র কত মুণ্ড ছেদন করিতেছে

অন্ত নাই। কাটা মুণ্ডের মালা পরিয়া ভয়ানক হইয়াছে, ছিন্ন মস্তকে ঘোরাল হইয়াছে। জীব অসার অনিত্য সংসারে মত্ত হইয়া আছে, প্রতিদিন অনন্তকাল রূপ তীক্ষ্ণ অসি সুখ সম্পত্তি ধন ঐশ্বর্য্য বিনাশ করিতেছে, সংসারের অনিত্যতা বুঝাইয়া দিতেছে। দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতীকে লইয়া জ্ঞান দেন, সম্পদ দেন। তোমার আমার মা হইয়া ঘরে লক্ষ্মী শ্রী আনিয়া দেন। মা কেবলই ভালবাসেন এইরূপ আলোচনা করিয়া মাকে ছাড়িয়া অনিত্য সম্পদের উপরে লোকে প্রেম স্থাপন করে; সংসারের বিষয়সুখের উপর মায়া স্থাপন করে। ব্রহ্ম শক্তি দুর্গা হইয়া সমুদায় সংসারে মঙ্গল কল্যাণ বিস্তার করিতেছেন। মঙ্গল ও কল্যাণ আর দুর্গা এক। যিনি সরস্বতী তিনিই জ্ঞান বুদ্ধি, যিনি লক্ষ্মী তিনিই শ্রী সম্পত্তি। যাই লোকে দুর্গাকে ভুলিয়া গিয়া পাপে মজিল, সুবুদ্ধি ছাড়িয়া কুবুদ্ধির অনুসরণ করিল, লক্ষ্মীকে ছাড়িয়া অলক্ষ্মীর শরণাপন্ন হইল, তৎক্ষণাৎ মহাদেবী কালী উপস্থিত হইলেন, তাঁহার নয়ন ঘুরিতে লাগিল, বিশাল খড়্গ উত্তোলিত হইল, করাল বদন প্রকাশিত হইল। তাঁহার ভয়ানক মূর্ত্তি দেখিয়া, শাণিত অস্ত্র দেখিয়া হৃৎকম্প উপস্থিত। আজ চারিদিকে ঘোর অন্ধকার, এই অন্ধকারের মধ্যে মুণ্ডমালার ভয়ঙ্কর প্রকাশ। যেমন আপনি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ তেমনি ঘোর অমাবস্যা তাঁহার পূজার সময়। বাহিরে ভয়ানক অন্ধকার। সেই বাহ্যিক অন্ধকারের মধ্যে ঘোর ঘটা করিয়া সকলে কালী পূজা আরম্ভ করিয়াছে। কালীর কৃষ্ণবর্ণে অন্ধকার যেন আরও ঘনীভূত হইয়াছে। কাল সময়ে কাল দেবী আমাদের কাল হৃদয়ের ভিতরে স্বর্গ হইতে অবতরণ করিলেন। কাল কাল কাল, সমুদায়ই কৃষ্ণবর্ণ। সকলই কালতে মিশ্রিত, যেন ভাল কিছুই নাই। মন পাপে কাল হইয়াছে, অবাধ্য হইয়াছে, হৃদয় কলুষিত হইয়াছে, এমন অবস্থায় কালী প্রকাশিত হইলেন। দেহ কম্পিত হইল, মন কম্পিত হইল। অমাবস্যা সময়ে শ্মশানের মধ্যে ছিন্নমস্তক স্মরণ করিলে কার না ভয় হয়? দেখ, সম্মুখে ছিন্নমস্তক হাতে লইয়া, মুণ্ডমালা গলায় পরিয়া, খড়্গ হস্তে দেবী প্রকাশিত হইলেন। পদতলে শম্ভু শবাকার হইয়া পড়িয়া আছেন। জীব আপনার পাপ বুঝিতে পারে না, তাই তাহার পাপ বুঝাইয়া দিবার জন্য ব্রহ্মের শক্তি ভয়ঙ্কর বেশ

ধারণ করিয়াছেন। এ সময় দুখের সময় নহে। যখন সুখের সময় ছিল, পৃথিবী চমৎকার জ্যোৎস্নায় আলোকিত ছিল, তখন লক্ষ্মীর সময় ছিল। সে সময়ের আলোক মলিন হয় না, ম্লান হয় না। চারিদিক দেখ আজ ঘোর অন্ধকারের আবাস হইয়াছে। কাল রাত্রি আসিয়া উপস্থিত, আর জ্যোৎস্না নাই। সকলের মন প্রসন্ন ছিল, মুখ প্রফুল্ল ছিল, এখন ভয়ে ম্লান। সকলকে ঘোর অমাবস্যায় ঘেরিয়াছে। লক্ষ্মী যে শক্তি কালীও সেই শক্তি, কিন্তু সেই সাদা মুর্ত্তি কাল হইল কেন? এ যে ব্রহ্মের রুদ্র মূর্ত্তি! অধর্ম্ম দেখিয়া ধর্ম্মরাজ কালীমূর্ত্তি প্রকাশিত করিলেন। যেখানে পাপ সেখানে ভয় থাকিবে, সেখানে অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার দেখা দিবে। সেখানে ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া অপরাধীকে শাস্তি দিবে। জীব, মনে করিও না তোমার ঈশ্বর সর্ব্বদা তোমায় সুখ দিবেন, তোমার হৃদয়াকাশে সর্ব্বদা চাঁদ বিরাজ করিবে, তুমি একবারও অমাবস্যা দেখিবে না। স্মরণ কর, আকাশে পূর্ণিমার চন্দ্র চিরদিন থাকে না, একদিন অমাবস্যা আসিয়া সমুদায় অন্ধকারে আচ্ছাদন করিয়া ফেলে। যে দেশে দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতীর প্রতি ভক্তি, সেই বঙ্গদেশেই কালীমূর্ত্তির অর্চ্চনা। দুর্গার মুখ দেখিয়াছ বলিয়া কদাপি কালীর মুখ ভুলিও না। কালী মূর্ত্তি যেন সর্ব্বদা পাপ হৃদয়কে কম্পিত করে। যিনি বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম তাঁহারই ভিতরে দুর্গাও আছেন, কালীও আছেন। যিনি অনন্ত মঙ্গলময় ব্রহ্ম, তাঁহারই মধ্যে সেই রুদ্রমূর্ত্তি "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্"। সেই ব্রহ্মই এই প্রকাণ্ড মূর্ত্তি প্রকাশিত করিলেন, যাহা দেখিবামাত্র ভয় উপস্থিত হয়। এ মূর্ত্তি এমনি যে সাধুকেও ভীত করিতে পারে। ভাবুক হিন্দু হৃদয় এই মূর্ত্তিকে বাহিরে কালীরূপে সংস্থাপন করিল। কালের ঘোর কাল রং দিয়া অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারের সঙ্গে উহাকে মিশ্রিত করিল। হিন্দুর উদ্ভাবিত এই মূর্ত্তিকে জ্ঞান চক্ষে অবলোকন কর। দেখিবে এই মূর্ত্তি শাস্তি দিবার জন্য অবতীর্ণ। আমাদিগের মধ্যে ভক্তি শীঘ্র আসিতে পারে না। কিন্তু ভয় শীঘ্র আসিতে পারে। পাপের বিষয় চিন্তা করিলে আমোদ হয় না, সুখ হয় না। এজন্য ঈশ্বরের মাতৃমূর্ত্তি দেখিতে ইচ্ছা হয়, এবং সেই মার মূর্ত্তির ভিতরে সুবর্ণ প্রতিমা দেখিতে বাসনা হয়, অন্ধকারময় দেবীকে মনে স্থান দিতে

প্রবৃত্তি হয় না। অন্ধকারের ভিতরে অন্ধকার বর্ণ দেবী অতি শীঘ্র দেখা যায় না। অন্ধকারের ভিতর হইতে দেবীকে যত টানিবে তত তিনি অন্ধকারের ভিতরে মিশিয়া যাইবেন। হে সাধক, আরো চিন্তা কর, আরো স্মরণ কর, দেখিবে অন্ধকারের ভিতরে দেবী দেখা সহজ নহে; অন্ধকার অন্ধকার মূর্ত্তিকে আপনার ভিতরে টানিয়া লয়। কৃষ্ণবর্ণা দেবীকে কেহই অন্ধকার হইতে সমুৎপন্ন করিতে পারে না। মনে করিলে ঈশ্বর কেবল সেই দেবীকে প্রকাশ করিতে পারেন। ঈশ্বর যখন এই ঘোরা ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি প্রকাশিত করেন, তখন উহা দেখিয়া পাপী ভয়ে ভীত হয়। পাপ ছাড়িতেই হইবে। পাপের উপরে সুতীক্ষ্ণ খড়্গ পড়িবে। কালীর সুতীক্ষ্ণ খড়্গ অসুরকে বিনাশ করিবে। সেই মূর্ত্তি হৃদয়ে স্মরণ কর। ভয়ে ত্রস্ত হইয়া দেবী কালীকে হৃদয়ে দর্শন কর। অসার মৃত্তিকা লইয়া সে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিও না। অকপট হৃদয়ে ব্রহ্মের দিকে নিরীক্ষণ কর, পাপীর প্রতি তাঁহার রুদ্রমূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। নয়নকে আরও স্থির করিয়া রাখ, দেখিবে তিনি শাণিত অস্ত্রে অসুর বধ করিতেছেন। যত নিরীক্ষণ করিবে তত অসুরের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠুর ভাব তোমার নিকটে প্রকাশিত হইবে। ঘোর পাপ অমাবস্যায় আচ্ছন্ন হৃদয়ে সেই ঘোর কাল মূর্ত্তি প্রকাশিত, আর হাসিও না। এত কাল ছিলে ব্রহ্মদাস, তার পরে প্রেমে হইলে হরিদাস, এখন ভয়ের সময়ে আমাদিগকে কালিদাস হইতে হইবে। যখন যে ভাব, তখন সেই ভাবে ধর্ম্ম সাধন করিবে। প্রকৃত ধর্ম্ম সময়োচিত ভাব আনিয়া উপস্থিত করে। তুমি এখন হরির ভাবে প্রমত্ত। হরিকে নমস্কার কর, বন্দনা কর, তাঁহার নাম কীর্ত্তন কর। তোমার জীবনে এখন বসন্তের সময়। এখন তুমি বসন্তোৎসব কর, হরিকে লইয়া প্রেমের মহোৎসব কর। হরির মর্য্যাদা রক্ষা কর, প্রেমে মত্ত হইয়া হরিদাস হইয়া প্রেমের গৌরব বৃদ্ধি কর। কিন্তু মনে করিও না, তুমি এখন হরিদাস আছ, হরিকে ভক্তি করিতেছ, তাঁহার পূজায় আনন্দিত হইতেছ, ইহা বলিয়া হরি তোমাকে কেবলই প্রেমে মাতাইবেন, কখন শাস্তা হইয়া তোমার নিকটে প্রকাশিত হইবেন না। আজ তুমি মিথ্যা কথা বলিলে, অপরের অনিষ্ট করিলে, পরদ্রব্য

অপহরণ করিলে, কামাদি পরতন্ত্র হইয়া হৃদয়কে অপবিত্র করিলে, দেখিবে তোমার হরি তোমার নিকটে বিদায় লইতে চেষ্টা করিতেছেন, আর ভাবিয়া চেষ্টা করিয়া কেবল ভক্তিসাধন করিতে পারিবে না। যত পার পাপ চাপা দাও কিন্তু কিছুতেই আর উহা লুকাইয়া থাকিবে না। শাক্ত না হইয়া ভক্ত হইয়াছি, এখন ভক্ত হইয়া শাক্ত হইব। হরিদাস হইয়া জীবন শেষ করিতে যত্ন করিব, সঙ্কীর্ত্তন করিব, হরিনাম করিব; কিন্তু সময়ে সময়ে শাক্ত হওয়া উচিত; শাক্ত না হইলে হৃদয়ের পবিত্রতা রক্ষা হয় না। কপট ভক্তিতে পাপ চাপা দিবার কৌশল করিলে কি হইবে? পাপ মহিষাসুর যখন হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে, তখন উহা শান্তি ভঙ্গ করিবেই করিবে। ঈশ্বর নিয়মের গতিতে পাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভয় আসিয়া কালীপদে তোমাকে অবনত করিবে। এ সময়ে তোমাকে রক্ষাকালীর শরণাপন্ন হইতে হইবে, কালী কালী কালী কালী উচ্চারণ করিতে হইবে। এখন ধর্ম্মের সুখ প্রাপ্ত হওয়া প্রেমে প্রমত্ত হওয়া অসম্ভব। পাপ করিবে অথচ প্রেমের সুখ কেন পাইবে? খোল করতাল বাজাইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিয়া পাপ ঢাকিবার চেষ্টা বৃথা। এখন মন শাক্ত, শক্তি চাই বল চাই অস্ত্র চাই দেবীর বলে শক্তি পাইয়া পাপাসুরকে চূর্ণ করিব। তাই বলি সকলে ব্রহ্মের রুদ্রমূর্ত্তির পদাশ্রিত হও, দেব বলে স্বর্গীয় বলে বলী হইয়া পরাক্রম অবলম্বন করিয়া মার মার শব্দে পাপ চূর্ণ কর। অমাবস্যা শেষ হইলে আবার আলোকের সমাগম হইবে, পূর্ণলক্ষ্মীর উদয় হইবে। দেবী পূজার সময় আছে, হরি পূজার সময় আছে। সময় অবস্থা ও ভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এক এক সময়ে এক এক পূজা করিতে হইবে। বঙ্গবাসিদের মত বাহিরে মাটীর পুতুল গড়িও না, যখনই দেবীর পূজা করিবে, আধ্যাত্মিক দেবীর পূজা করিবে। বিবেকের অস্ত্র ধরিয়া বিশ্বাসের খড়্গ লইয়া পাপ অসুরকে মার, ঐ তীক্ষ্ণ অস্ত্র পাপাসুরের গলায় পড়িবে। যখনই পাপ হইবে ভয়ের সহিত ঈশ্বরের কাছে যাও, ভয়ে ভজন সাধন কর। ভয়ে অসুর বধ করিয়া নির্ভয় হও। মার অভয়পদে আশ্রয় লইয়া, রামপ্রসাদের শক্তি ভক্তি লাভ কর, শক্তি ও ভক্তি এক করিয়া নূতন প্রকারের ধর্ম্মে মনকে মোহিত কর। হে নববিধানবাদী ব্রাহ্ম, নিরা-

কারা মহাকালীর রূপ স্মরণ কর, দেবীপদে পূজা উপহার অর্পণ কর, অভয়পদ প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা কর। নববিধানের এই মন্ত্র, এই তন্ত্র, এই শাস্ত্র।

সেবকের নিবেদন।

লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মিলন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার, ১২ ই অগ্রহায়ণ, ১৮০৩ শক।

হে ব্রহ্মসাধক, একখানি দুর্গা প্রতিমা বাজার হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়া আপনার সম্মুখে স্থাপন কর। সেই পুঁতুল সম্মুখে রাখিয়া যোগের ঐন্দ্রজালিক দণ্ডে তাহাকে স্পর্শ কর; সেই দণ্ড স্পর্শ মাত্র দেখিবে প্রতিমাতে যাহা কিছু ভৌতিক আকাশে বিলীন হইয়া গেল। উপরে শ্রী মূর্ত্তি, মধ্যে দুর্গা মূর্ত্তি, পার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতী। যোগবলে দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী এই তিন মূর্ত্তিকে দেহশূন্য মৃত্তিকা বিবর্জ্জিত ভৌতিক লক্ষণ বিরহিত করিয়া অধ্যাত্ম চক্ষে ধারণ কর। মাটীর দুর্গা পড়িয়া গেল, পবিত্র অধ্যাত্ম দুর্গা উঠিল। অসার মাটী উড়িয়া গেল, ভিতর হইতে জ্যোতির্ম্ময় সার সত্য বস্তু দেখা দিল। দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী তিন ছিল, মহেশের ভিতর হইতে তিন উত্থিত হইয়া তিন এক হইয়া গেল। যেমন এক তিন হইয়াছিল, তেমনি তিনে এক হইল। দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী এই ত্রিমূর্ত্তি এক হইয়া সাধকের হৃদয়ে নৃত্য করিতে লাগিল। তিন মূর্ত্তিতে তিন ভাব প্রকাশিত হইল। এক মহেশ্বরী দুই সখী কোমল হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া উল্লাসিত করে। তিন ঈশ্বর বা তিন ঈশ্বরী নহে। এক ঈশ্বরীই তিন ভাবে হৃদয়ে অবতীর্ণ হইলেন। যখন দুর্গা আসেন তখন লক্ষ্মী সরস্বতীকে পরিত্যাগ করিয়া কখন একা আইসেন না। দুর্গা পূজা করিলে অথচ লক্ষ্মী সরস্বতীর পূজা করিলে না, ইহা হয় না। তিনকে লও নতুবা কাহাকেও লইও না। যদি সকলকে না লও, অকল্যাণ

আনিবে। পূর্ণ পূজা করিতে হইলে দুর্গাকে তাঁহার সখী দুইজন সহ বরণ করিতে হইবে। তুমি, তোমার স্ত্রী, ভাই ভগিনী, পুত্র কন্যা, সকলে মিলিয়া সখী সহ দুর্গার পূজা কর। তিন মূর্ত্তির তিন ভাবের অর্থ না করিলে কি প্রকারে সার বস্তু পাইবে? কঠোর প্রকৃতি হইয়া পৌত্তলিকগণকে নির্ব্বোধ বলিলে, আধ্যাত্মিক ভাবে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম পূজা না করিয়া তাহারা অকল্যাণ আনয়ন করিল বলিয়া ঘৃণা করিলে, কিন্তু বল তুমি কি করিলে? তুমি তিন ভাবকে স্বতন্ত্র রাখিয়া কি অকল্যাণের কার্য্য করিলে না? প্রতিমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দুই সখীকে বিদায় করিয়া দিলে, মধ্যে যে মঙ্গলের মূর্ত্তি আছে যিনি পাপাসুরকে বিনাশ করিতেছেন, তাহাকে ঘরে আনিলে, ভাবিও না যে তুমি ইহাতে প্রকৃত কল্যাণ লাভ করিবে? তুমি মনে করিলে বিদ্যা এবং বুদ্ধি মহেশ্বরের শক্তি। যে ঘরে ঈশ্বরের এই শক্তি বিরাজ করে সে ঘরে টাকা ধন ধান্য থাকিলে তাহারা চলিয়া যাইবে। যেখানে ঈশ্বরের ধন ধান্য বিধায়িনী শক্তির পূজা হইল সেখানে মূর্খতা ডাকিয়া আনা হইল, বুদ্ধি স্থূল হইল। যেখানে লক্ষ্মীর পূজা সেখানে যদি সরস্বতীর মন্দির নির্ম্মিত কর পণ্ডিত শাস্ত্রের প্রতি বিরক্ত হইয়া সমুদায় শাস্ত্র জলে ফেলিয়া দিবেন। যে ব্যক্তি টাকা উপার্জ্জন করে ধনাঢ্য, তাহার ঈশ্বরের দিকে অনুরাগ কি প্রকারে হইবে? সে ব্যক্তি ধনের অহঙ্কারে বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ কি প্রকারে রক্ষা করিবে? রাস্তার ভিখারী বৈরাগী ইহাদের ঘরে লক্ষ্মী নাই, কিন্তু ঈশ্বর আছেন। সর্ব্বত্র দেখা যায় ধন ধর্ম্মে মিল নাই। পৃথিবীতে সকলের এই সংস্কার, ধনী হইলে সে কখন ধার্ম্মিক হইতে পারে না। তাই ধন উপার্জ্জন করিতে গিয়া পুণ্য যায়, ধনী হইয়া লোকে ঈশ্বরকে ছাড়ে। আবার দেখ সরস্বতী ও লক্ষ্মী ইহাদিগের মধ্যে চির বিবাদ। বিদ্যা ক্রমে যত বাড়িতে থাকে, লক্ষ্মী তত সে স্থান ছাড়িয়া চলিয়া যান। ঘরে ধন অনেক আন, দেখিবে সে গৃহের যুবকগণ মূর্খ হইবে। ঘরে প্রচুর টাকা থাকিলে বিদ্যা উপার্জ্জনের আবশ্যকতা কেহ বুঝিতে পারে না। ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ এ কথার সাক্ষী। যত ধন বাড়ে, তত লোকে ভাবে বিদ্বান হইয়া কি হইবে? যাহার ধন আছে,

তাহার সাহিত্য গণিতে কি হইবে? যে জন্য বিদ্যা উপার্জ্জন, যাহা সঞ্চয়ের জন্য বিদ্যা উপায় সেই ধন যদি ঘরে থাকিল তবে আর বিদ্যাতে প্রয়োজন কি? লক্ষ্য সিদ্ধি হইলে কে আর উপায়ের প্রতি দৃক্‌পাত করে। যে পরিবারে ধনের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে মন্দিরে লক্ষ্মীর অর্চ্চনা হইয়া থাকে, সেখানে সরস্বতীর মন্দির কি প্রকারে স্থাপিত হইবে। সে পরিবারে সরস্বতীর আদর হইবার সম্ভাবনা নাই। ধন সম্পদ যেখানে সমুদায় বাসনা পূর্ণ করিতেছে, যখন যে কামনা উপস্থিত হয়, ধনদ্বারা তখনই তাহা সম্পন্ন হইতেছে, সেখানে আর কামনার বিষয় কিছু রহিল না, পড়াশুনা করিয়া কি হইবে? লোকে বলিয়া থাকে এক দ্বার দিয়া লক্ষ্মী প্রবেশ করিলে আর এক দ্বার দিয়া সরস্বতী পলায়ন করেন। লক্ষ্মী বা সরস্বতী কেহ কাহার মুখাবলোকন করেন না। গরিব দুঃখী যাহাদের অন্ন সংস্থান নাই, বিদ্যা তাহাদের গৃহে প্রতিষ্ঠিত। বিদ্যা উপার্জ্জন করিলে, বহু গ্রন্থ পাঠ করিলে, সে কখন ধনে সুখী হয় না ধনী সন্তানেরা এরূপ ভাবিয়া বিদ্যার পূজায় বিরত হইল। লক্ষ্মীর শিষ্যগণ সরস্বতীকে বিদায় করিয়া দিল। কোন দেশে যদি অধিক ধন সঞ্চয় হয়, সরস্বতীর অনুচরগণ মনে করেন সে দেশ শীঘ্র সরস্বতীর অকৃপার পাত্র হইবে। ধন ক্রমে ক্রমে যত বাড়িবে, দেশ তত বিদ্যাবিহীন হইবে। অন্য দিকে আবার যদি বিদ্যা উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হয়, পাঠাভ্যাসে ক্রমান্বয়ে অনুরাগ বাড়িতে থাকে, কিসে টাকা আইসে সে দিকে আর দৃষ্টি থাকে না। যেখানে বিদ্যার প্রতি এইরূপ অনুরাগ বাড়ে, সেখানে পিতা মাতা সন্তানগণ আর পড়া শুনা না করে তাহার জন্য চেষ্টা করেন। কেন না মনে এই বিশ্বাস সরস্বতীর প্রতি অনুরক্ত হইলে টাকার প্রতি অনুরাগ আসিতে পারে না। অধিক লেখা পড়া করিলে বা জ্ঞান শিক্ষা করিলে সংসারে ধন উপার্জ্জন হয় না, খাওয়া পরা চলে না। যে ছাত্রের মন ক্রমান্বয়ে গ্রন্থের ভিতরে পড়িয়া আছে, যাহার অন্য বিষয়ে আর জ্ঞান চৈতন্য নাই, লেখা পড়া যাহার নেশার মতন হইয়া গিয়াছে, লক্ষ্মী তাহার বাড়ীতে কখন পদার্পণ করেন না, তাহার প্রতি অলক্ষ্মীর দৃষ্টি পড়িয়াছে। এরূপে সাধারণের বিশ্বাস হইয়াছে যেখানে লক্ষ্মী আসেন সেখানে সরস্বতী আসেন না, যেখানে

সরস্বতী আসেন সেখানে লক্ষ্মী সেখানে না। পড়া শুনা করিলে টাকা বাড়িবে, লেখা পড়া বাড়িলে টাকা কমিবে। চিরকাল লক্ষ্মী সরস্বতীর মধ্যে বিরোধ। আবার এ দুই জনেরই ঈশ্বরের সঙ্গে বিরোধ। ঈশ্বরপরায়ণ হও বিদ্যা বুদ্ধির সে পথে কণ্টক হইবে। ভক্তিমান্ হইলে বিদ্যার প্রতি আর আদর থাকিবে না। শ্রীমদ্ভাগবত বুদ্ধিকে অবমাননা করেন। পণ্ডিত হইয়া যদি কেহ ভক্তিমান্ হয় তবে তাহার মানের হানি হয়। কাশীতে ভক্তি প্রচার অসম্ভব, বৃন্দাবনে কখন টোল স্থাপন হইতে পারে না। যোগাভ্যাস করিতে বিচার চাই, কিন্তু তাহাতে ভক্তি হইবে না। জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে গিয়া মন অহঙ্কারে স্ফীত হইল, আর ভক্তি চলিয়া গেল। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ বাড়িলে আর কেহ ভজন সাধন ছাড়িয়া জ্ঞান উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হয় না। ধর্ম্মের পথে জ্ঞান ভক্তির শত্রু। যত মূর্খ হইবে, তত ভক্তি বাড়িবে। যত জ্ঞান বাড়িবে তত নাস্তিকতা প্রবল হইবে। যেখানে ব্যাকরণের অধিক আড়ম্বর সেখানে ধর্ম্মানুষ্ঠান উঠিয়া যাইবে। ভক্ত সমাজে যদি কেহ বলে আমি জ্ঞানী বুদ্ধিমান্, তবে তাঁহাকে অভিমানী জানিয়া নাস্তিক অধম দুরাচার পাষণ্ড শব্দে সকলে ঘৃণা প্রকাশ করিবেন। জ্ঞানের অভিমান পরিত্যাগ কর, শাস্ত্র লইয়া বিচার করিও না, বহু গ্রন্থ অভ্যাস করিও না, পুস্তক সকলকে নির্ব্বাসন করিয়া দাও, চুপ করিয়া সাধন ভজন কর, তাহা হইলে ভক্তিধন উপার্জ্জন করিতে পারিবে। লেখা পড়া কর, ধর্ম্মের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হও, গ্রন্থ স্পর্শ কর, ঈশ্বর পলায়ন করিবেন। ভক্ত টাকা কড়ীর সম্বন্ধ রাখিতে বীতরাগ। ভক্ত টাকা উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হন না, চাকরী করেন না, ব্যবসায় বাণিজ্য ধনার্থ চেষ্টা, উত্তম সামগ্রী আহার, ধনের সহিত সম্বন্ধ ভক্তিপথে কণ্টক। যেখানে ধনের সমাগম সেখানে ঈশ্বর কেন আসিবেন? যেখানে বেশ ভূষার সমধিক আড়ম্বর সেখানে ঈশ্বর নাই। লক্ষ্মীর প্রবেশ, বিবেক ও ঈশ্বরের পলায়ন। হয় সমুদায় ধন ছাড়িয়া ফকির হও, না হয় সংসারী হও। ধর্ম্মে এই প্রকারে তিনের মধ্যে চির-বিবাদ। তিনকে তিন মানিলে এই প্রকার হইবে। যদি ব্রাহ্ম হইয়া এই প্রকারে পৌত্তলিকতার দোষে দোষী হও, তবে ঘোরতর অখ্যাতি হইবে।

দেবী মূর্ত্তি তিন মূর্ত্তিতে প্রকাশিত। যদি এই তিন মূর্ত্তির ভাব খণ্ড খণ্ড করিয়া ত্রিমূর্ত্তি স্থাপন কর, সেই খণ্ড খণ্ড মূর্ত্তির একত্র সংযোগে এক মূর্ত্তি নিষ্পন্ন করিতে না পার, তাহা হইলে সচ্চিদানন্দময়ের পূরণ হইল না। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তিন এক, তিনের মধ্যে বিবাদ তোমার কল্পনা। তোমার দুষ্ট বুদ্ধি তিনের হাতে খাঁড়া দিয়াছে, তিনের মধ্যে সংগ্রামের চেষ্টা তুমি করিয়াছ। ঈশ্বরের তিনভাবের মিল আছে, সৌহার্দ্দ আছে। সহচরী সহ চিরদিন সকলে দুর্গাপূজা করিয়াছে, শক্রতা থাকিলে এরূপ কেন হইবে? আচ্ছা যদি শক্রতাই থাকে, তবে জিজ্ঞাসা করি, তিন এক সময় আসেন, না এক জন আসেন গৃহে থাকিলে আর এক জন আসেন বনবাসী হইলে? এক ঈশ্বরে তিনের মিলন হইয়াছে। যিনি ঈশ্বর তিনিই লক্ষ্মী তিনিই সরস্বতী, ঈশ্বর কখন লক্ষ্মী ছাড়া অলক্ষ্মী নহেন জ্ঞানহীন বুদ্ধিহীন অবিদ্যা নহেন। দুর্গাকে স্থাপন করিতে হইলেই তাঁহার সখী-দিগকেও স্থাপন করিতে হইবে। ভক্ত তিনেরই ভাব একত্র স্থাপন করেন। কৈলাস হইতে যখন দুর্গা নামিলেন, দেখ সহচরী তাঁহার সঙ্গে আছে। তিনের মধ্যে নিত্যকালের যোগ। দুর্গাকে ডাকিলে দুর্গতি নাশ হয়, জ্ঞান হয়, ধনসম্পৎ হয়। বুদ্ধি যেখানে সম্পৎ সেখানে। মনকে আলোকিত করিলে সমস্ত সংসার আলোকিত হয়। সরস্বতীর আগমনে লক্ষ্মীর আগমন, বুদ্ধি কখন লক্ষ্মীর বিরোধী নহে। ভক্তিশাস্ত্র যে বিদ্যা বুদ্ধির প্রতি চটেন, সে বিদ্যা অবিদ্যা, সে বুদ্ধি কুবুদ্ধি। ভক্তিশাস্ত্র অবিদ্যাকে আক্রমণ করে, কুবুদ্ধিকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে যত্ন করে। যে পুস্তকে দুষ্ট বুদ্ধি আছে, তাহা পাঠ করিও না। যাহা স্পর্শ করিলে নাস্তিকতার স্পর্শ হয় সেই ভয়ানক বিষ স্পর্শ করিতে সংসারে সকলেরই ভয় হইবে। এই বিষ পরিহার করিবার জন্যই বুদ্ধি সম্পর্কে এত কথা। দুষ্ট বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সুবুদ্ধি পরবশ সকলকেই হইতে হইবে। সুবুদ্ধি বলিল. কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না, কিন্তু তোমার ভাবনা উপস্থিত—কল্যকার জন্য চিন্তা না করিলে পরিবার সকলে আহার বিনা মরিয়া যাইবে। আমি বলি তোমাতে দুষ্টবুদ্ধির আবির্ভাব হইয়াছে। যখন ধর্ম্মশাস্ত্রের সঙ্গে ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার জ্ঞানের মিলন নাই; জানিবে

তোমাতে কুবুদ্ধি উপস্থিত। ঈশ্বরকে ভক্তি কর, তাঁহার সেবা কর, কিন্তু তাহাতে কল্য কি খাইবে তাহা পাইবে না, যখন এই প্রকার চিৎকার ধ্বনি উপস্থিত হয়, তখনই জানিতে পারি আমার ভিতরে এ সুবুদ্ধি নয় কুবুদ্ধি। সরস্বতী ছাড়াও আবার দুষ্টা সরস্বতী আছে, ইহা জানিয়া ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে। আমাদের বুদ্ধি হইতে কুবুদ্ধিকে দূর করিয়া দিতে হইবে। এক বস্তু চলিয়া গেলে মন কখন শূন্য থাকিবে না। দুষ্টা সরস্বতী চলিয়া গেলে বুদ্ধি বিচার বিবেচনা সমুদায় আর সেরূপ থাকিবে না। এই রূপে ধর্ম্ম করিয়া যত দুঃখ হইতে হয় হউক, যত মানহীন হইতে হয় হউক, যত কষ্ট পাইতে হয় প্রাপ্ত হওয়া যাউক, তথাপি এইরূপে ধর্ম্ম আচরণ করিতে হইবে এরূপ বুদ্ধি শুভ বুদ্ধি। বিদ্যা শিক্ষা করিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি যদি কুতর্কপরায়ণ হয় তবে সে দুরাচারী। সরস্বতী দুই, এক ঈশ্বরের নিত্য সহচরী আর এক ঈশ্বরের শত্রু। জ্ঞান যদি ঈশ্বরের বিরোধী হয়, তবে তাহা অজ্ঞান, অবিদ্যা দুষ্টা সরস্বতী, জ্ঞান বিদ্যা সরস্বতীর ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্য মিল আছে। লক্ষ্মীও দুই, এক ঈশ্বরের সঙ্গে চিরমিলিতা, আর এক ঈশ্বরের বিরোধিনী। ঈশ্বরের বিরোধিনী লক্ষ্মী অলক্ষ্মী। যেখানে টাকা আলস্য বৃদ্ধি করে, নানা প্রকার অসদুপায়ে ধন উপার্জ্জিত হয়, সেখানে ধর্ম্ম নাই। সমুদায় দিন খুব টাকা উপার্জ্জন করিলে সন্ধ্যার সময়ে আসিয়া উপাসনা করিতে পারিলে না, বাড়ীতে আসিয়া সকলের প্রতি বিরক্ত হইতে লাগিলে। যিনি ঈশ্বরের লক্ষ্মীশক্তির অনুসরণ করিয়া ধন উপার্জ্জন করিলেন, তাঁহার এরূপ ভাব কখন হইতে পারে না। যে ব্যক্তি উপার্জ্জন করিতে গিয়া ধর্ম্মবিরোধী হয়, বিরক্ত হয়, ক্রোধ পরবশ হয়, নির্যাতনে প্রবৃত্ত হয়, হিংসার অধীন হয়, কুপ্রবৃত্তির অধীন হয়, সে কখন লক্ষ্মী পূজা করে নাই অলক্ষ্মীর পূজা করিয়াছে। লক্ষ্মী প্রসন্না হইয়াছেন এজন্য গৃহে টাকা আসিল সকলে স্বীকার করে, কিন্তু টাকার সঙ্গে সঙ্গে যে অলক্ষ্মীকে ডাকিয়া আনা হয় ইহা অনেকে বুঝিতে পারে না। যেখানে অধর্ম্ম কুনীতি প্রবল সেখানে লক্ষ্মীর আবির্ভাবের সম্ভাবনা নাই। যখন লক্ষ্মী আইসেন তখন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রকারের ধর্ম্ম সমাগত হয়, সদ্বুদ্ধি খুলিয়া যায়। সমুদায় অসদ্বিষয় ছাড়িলে তবে লক্ষ্মী আগ-

মন করেন। কল্যকার জন্য ভাবিও না কিন্তু ধর্ম্ম ও স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, তোমাদিগকে সকলই প্রদত্ত হইবে, এই কথা ঠিক হইল। কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না এই বিশ্বাসে সকল দিক্ রক্ষা পায়, পৃথিবীর লোকেরা ইহা শুনিয়া হাসিয়া উড়াইবে। এই সকল লোকের বুদ্ধি নয়, গণিত বিদ্যা, ইহারা কেবল গণনা করিয়া জীবনকে ভারগ্রস্ত করে। ঈশ্বরের হস্তে বিশ্বের ভার, ঈশ্বরের হস্তে প্রত্যেক সংসারের ভার। যে সংসারের ভার ঈশ্বরের হস্তে অর্পণ করিল, সেই বৈরাগ্য পালন করিল। তাহার চক্ষু লক্ষ্মী সরস্বতী বিবেক। লক্ষ্মীর আবির্ভাবে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া সে নিশ্চিন্ত হয়। সংসারে যে ব্যক্তি খুব বুদ্ধিমান্, সে ব্যক্তি আগে সঞ্চয় করে। সঞ্চয় না করিলে লোকে তাহাতে অলক্ষ্মী দেখে। কিন্তু হে ব্রাহ্ম তুমি কেবল পূজা কর, পূজা করিলে তোমার মনে সুবুদ্ধি উপস্থিত হইবে। পৃথিবীর ভিতরে টাকার পথ দেখাইতে কেবল ঈশ্বরই পারেন। তিনি যে পথ দেখাইবেন তাহাতে নিশ্চয় লক্ষ্মীসমাগম হইবে। তোমার ঘর লক্ষ্মীর ঘর হইবে। লক্ষ্মীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতী অধিষ্ঠিতা হইবেন। যত ভক্তি বৃদ্ধি ও বিশ্বাস বৃদ্ধি হইবে, তত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান্ হইবে। যত জ্ঞান বুদ্ধি বাড়িবে তত ঈশ্বরে ভক্তি বাড়িবে। কখনও মনে করিও না বিষয়ে ফল নাই। যে গৃহে ঈশ্বরের পূজা হয়, দুর্গাপূজা হয়, সে গৃহে দুর্গার সখীদ্বয় আইসেন, এক জন জ্ঞান দেন, এক জন সম্পদ দেন। সংসারে টাকা যতটুকু হইলে সংসারের কষ্ট মোচন হয়, তৎসমুদায় অবশ্য যোগাইবেন। ঈশ্বর আপনার রাজ্যে সংস্থাপন করিবেন, তাঁহার রাজ্যে দুঃখ দারিদ্র্য কষ্ট কখন থাকিতে পারে না। লক্ষ্মী সর্ব্বদা ভক্তকে সহাস্য রাখিবেন, লক্ষ্মীভক্ত সর্ব্বদা অল্পে সন্তুষ্ট থাকিয়া সমধিক লাভ করিবেন। প্রসন্নমুখ সর্ব্বদা লক্ষ্মীর অনুগ্রহ প্রকাশ করে। লক্ষ্মীর অনুগ্রহ যেমন সম্পদ লাভ করে, তেমনি বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সরস্বতীভক্ত নৃত্য করে। লক্ষ্মী আর সরস্বতী পরস্পর মিলিত হইয়া একত্র পরম মহেশ্বরের সঙ্গে প্রকাশিত হন। যাহারা মহেশ্বরের শরণাপন্ন হয় তাহারা সর্ব্বপরিত্রাতা মুক্তি সঞ্চয় করে। তুমি অধ্যাত্ম নয়নে এই মূর্ত্তি দর্শন কর। চিন্ময়

মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তোমার বিশ্বাস কমিল না আরো বাড়িল। জ্ঞানের আকারে ধন ধান্যের আকারে লক্ষ্মী ও সরস্বতী তোমার নিকটে উপস্থিত হইলেন। চিন্তাতে টাকাতে এখন আর কিছুই নাই, কেবল ঈশ্বরের পবিত্র ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বত্র কেবল হরির ছবি মার ছবি প্রকাশিত। কেমন হরির প্রেম সর্ব্বত্র দেখিতেছি, কেমন প্রেম তিনি দেখাইতেছেন। হরি সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন আর ভয় কি? মা যখন আসিলেন তখন দুঃখ ভাবনা সকলই চলিয়া গেল। লক্ষ্মী আপনি ভক্ত সন্তানগণকে পালন করিতে লাগিলেন। ভক্তে আর অলক্ষ্মী বা অবিদ্যা থাকিবার সম্ভাবনা রহিল না। মা আপনি শত শত বুদ্ধি দিবেন। আমি মূর্খ স্বীকার করি কিন্তু আমার মা বড় বড় দুর্ব্বোধ বিষয় আমাকে অত্যন্ত সহজে বুঝাইয়া দেন। আমার বুদ্ধি আমার মাতা, আমাকে অন্যের নিকটে জ্ঞান শিখিতে হয় না। আমি যদি অন্যের নিকটে পুস্তক না পড়ি আমার মা বিদ্যার জাহাজ, জ্ঞানের সমুদ্র, সেইখান হইতে এক বিন্দু লাভ করিলে আমার যথেষ্ট। আমি সামান্য ধন বা জ্ঞানের জন্য কেন ক্রন্দন করিব সম্মুখে সমুদ্র থাকিতে কে তৃষ্ণায় কাতর হয়? পৃথিবীর নিকটে কোন ধন মানের আকাঙ্ক্ষা রাখি না, বিষয়ীর ন্যায় ধন উপার্জ্জনেও ব্যস্ত নই, যে উপায় ভাল হরি তাহা আপনি করিয়া দিবেন। তিনিই পড়াইবেন তিনিই বুদ্ধি দিবেন। পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করিয়া উপাধি প্রাপ্ত হইতে চাই না তাঁহার বিদ্যালয়ে বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া প্রকৃত বিদ্যায় বিদ্বান্ হইব। ধন সম্পৎ শান্তি সুখ স্বচ্ছন্দতা সকলই আমাদের তাঁহার নিকটে। বাজারের মহাজনদিগের ন্যায় আমরা বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইতে চাই না, কোন ব্যবসায় করিতে চাই না, স্বয়ং হরি আমাদিগের সমুদায় ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। ভক্তের ঘরে খাওয়া দাওয়া সকল বিষয়ের সুশৃঙ্খলা। ভক্ত কেবল হরির কার্য্য করেন, তাঁহার চরণ সেবা করেন, আর আকাশ হইতে তাঁহার গৃহে ঝুপ্ ঝাপ্ করিয়া টাকা পড়িতে থাকে। ভক্ত কেবল জয় হরির জয়, জয় হরির জয় বলিয়া যত নাচেন, যত হরি নামে মত্ত হন তত বিদ্যা ও ধন প্রাপ্ত হন, ঘরে বসিয়া তাঁহার সমুদায় বিষয়ে সুব্যবস্থা হয়। আইস সকলে মিলিয়া কেবল হরিনাম করি, ব্রহ্ম নাম করি, তাঁহার চরণ তলে প্রণিপাত করি, তাঁহাকে ডাকি তাঁহার পূজা করি ধন ধান্য বিদ্যা সকলই আমরা আমাদিগের হৃদয় মধ্যে সফল করিব।

সেবকের নিবেদন।

ভাই অঘোর নাথ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার, ২০শে অগ্রহায়ণ, ১৮০৩ শক।

ঈশ্বরের ইচ্ছা হইল পৃথিবীকে পরিত্রাণ করিবেন। যেমন ইচ্ছা হইল, অমনি এক মূর্ত্তি সাদা এক মূর্ত্তি কাল দেখা দিল। ঈশ্বর গভীর নিনাদে বলিলেন, আমি সাদা ও কালকে ভেদ করিব এবং এই দুটিকে জীবের স্বর্গ-গমনের দুই পথ করিব। অমনি দুই পথ তৎক্ষণাৎ পৃথিবী মধ্যে প্রমুক্ত হইল। একটি সূর্য্যের ন্যায় সাদা, আর একটি কাল ঘোর অন্ধকার। যেমন ঈশ্বর বলিলেন, পৃথিবী, অদ্য হইতে সাদা ও কালর মধ্য দিয়া তোমাকে গমন করিতে হইবে, অমনি সমুদায় জীব সেই সাদা ও কালর মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং তাহার মধ্যে ক্রীড়া করিতে লাগিল। ঈশ্বরের প্রেম হইতে জগতে দুই বস্তু উৎপন্ন হইল, এক লোভ আর এক ভয়; এক সুখ আর এক দুঃখ। ভাবিও না, ব্রহ্মসাধক, ইহার একটির সমাদর করিবে, অপরটিকে ঘৃণা করিবে। অন্ধকার দেখিয়া ভীত হইও না। নববিধান আলোককেও প্রণাম করেন, অন্ধকারকেও প্রণাম করেন। সাদা রংও তোমার পূজনীয় কাল রংও তোমার স্তবনীয়। কাল ভাল বই কখন মন্দ নয়। অর্দ্ধভাগ জ্যোতি, অপরার্দ্ধভাগ অন্ধকার। যেমন দেবীর পূজা করিবে তেমনি কালীরও পূজা করিবে। এক দিকে জীবন ক্রীড়া করিতেছে, আর এক দিকে মৃত্যু খেলা করিতেছে। যখন আমাদিগের ঈশ্বর জীবের পরিত্রাণের জন্য এই দুই বিরুদ্ধ ভাব উৎপন্ন করিলেন, তখন বাহিক রোগ শোক, সুখ দুঃখ, মৃত্যু জীবন দেখিয়া ইহাদিগকে প্রভেদ

করিতে পার না। আমরা একান্ত মূর্খ নই, অবিশ্বাসী নাস্তিক নই যে অর্দ্ধভাগ গ্রহণ করিব, অপরার্দ্ধ পরিত্যাগ করিব। মৃত্যুকে দেখিয়া মূর্খেরাই বিকম্পিত হয়, ভীত হয়। কিন্তু ভয়ানক মৃত্যুই পরিত্রাণের সেতু। ঈশ্বরের সুন্দর মুখ দেখিলে লোভ হয়, অন্ধকার মৃত্যু দেখিলে লোকে ভয় পায়, কিন্তু অন্ধকার আমাদিগের পরম উপকারী। বালক অন্ধকার দেখিলে ভীত হয়, কিন্তু ভীত শিশু মার ক্রোড় আরো আঁকড়াইয়া ধরে। আলো থাকিলে শিশু যে সুন্দর বস্তু দেখিতে পায় তাহা লইয়া ব্যস্ত থাকে, কিন্তু অন্ধকার আসিলে, আলোক হরণ করিলে, আলোক নাই দেখিয়া শিশু মা মা বলিয়া বাহির হইতে দৌড়িয়া মার নিকটে আসে, দুই কোমল হস্তে মার স্তন ধারণ করিয়া কেবল মা মা বলিতে থাকে। শিশুর মা মা বলাতেই সুখ। এ সুখের কারণ ভয়। ভয়ে মার কোলে গিয়া সে আর অন্য নাম করে না; জননীর স্তনের দুগ্ধ ভিন্ন অন্য কিছু চায় না। দয়াময় পৃথিবীর লোককে ভীত করেন। তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিবার জীবন এক দ্বার, মৃত্যু আর এক দ্বার। এক দিক হইতে ভয় তাড়াইয়া মৃত্যুর দ্বারে প্রবিষ্ট করে, আর এক দিক হইতে লোভ জীবনের দ্বারে তাড়াইয়া আনে। দুঃখ আক্রমণ করিলে আমরা ঈশ্বরকেই অন্বেষণ করি, সুখ লাভ করিলে আমরা ঈশ্বরকেই ডাকি। মৃত্যুভয় ভীত করে বলিয়া আমরা অভিযোগ করিতে পারি না। ব্রহ্মো-পাসনার আলোকে আমরা অন্ধকারের ভিতর ব্রহ্মপুরী অবলোকন করিব। অন্ধকারে দেবদর্শন ব্রহ্মসমাধির এই তত্ত্ব। খুব ভয় হয় আর সাধকের পূর্ণ যোগ হয়। দুঃখ পাইয়া মানুষ যোগী হয়, মানহানি ধনহানি সন্তানহানি হইলে আরো যোগী হয়। টাকা আসিল বন্ধু পাইলাম, সুখের পরিসীমা রহিল না, তাহাতেও ঈশ্বরকে পাইলাম। এক হাতে সুখ এক হাতে দুঃখ ধারণ করিব। সুখ দুঃখ দুই মার কাছে লইয়া যায়। দক্ষিণ হস্ত ধরিল জীবন ও সুখ, মৃত্যু ও শোক বামহস্ত ধরিল। ইহারা টানিয়া মার কাছে লইয়া চলিল। এক হস্ত উৎসুক হইয়া সুখের বস্তু ধরিল, আর এক হাত রোগ শোক কলহ বিবাদ প্রভৃতি পৃথিবীর দুঃখ ধরিল। দীনতার কর ধরিয়াও মার নিকটে যাইবে, ধনের কর ধরিয়াও মার নিকটে যাইবে। সুখে আমোদিত হইয়াও মাকে মনে পড়ে, দুঃখে কান্দিতে

কান্দিতেও মাকে মনে পড়ে। আমাদের হৃদয়ের ভাই অন্ধকার করিয়া হঠাৎ অকালে পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। সাধু তিনি, তিনি চলিলেন। হঠাৎ দুর্ঘটনা আসিয়া ঘটিল ইহা আমরা বলিব না, এ কথা আমরা কখন মুখে আনিব না। বন্ধুবিয়োগ বন্ধুবিচ্ছেদ গভীর ঘটনা। ঘটনার পর ঘটনা চলিয়া যাইতেছে আমরা কি কেবল সাগরের ধারে বসিয়া ঢেউ গণনা করিব? বন্ধুর মৃত্যু হইল বলিয়া কি আমরা এমত ভাবে কান্দিব যে কান্দিতে কান্দিতে ভাবিতে ভাবিতে অবসন্ন হইয়া পড়িব? আমাদের বন্ধুকে কে বক্ষ হইতে ছিঁড়িয়া লইয়া গেল এই বলিয়া কি কান্দিব? পাঁচটি ভাই আমরা ছিলাম, যম আসিয়া তাহার একটিকে চুরী করিয়া লইয়া গেল; যাঁহার শরীর সুস্থ, নবীন যৌবন; যিনি অত্যন্ত প্রতাপ ও মহিমা সহ কার্য্যক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়া প্রেরিতজীবন দ্বারা বলপূর্ব্বক সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ দুঃখিত, ব্রাহ্মমণ্ডলী শোক করিতেছে, দুঃখিনী বিধবা ও নিরাশ্রয় সন্তান সন্ততি কাঙ্গালের ন্যায় কাঁদিতেছে। হায় হায় শব্দ পড়িল, কেবল রোদনের ধ্বনি, চারিদিক্ অন্ধকারময়। এখন শোকে সকলকে নিমগ্ন করিয়া ঈশ্বর কি অবিচার করিলেন? এমন বন্ধু আমরা হারাইলাম। ঈশ্বর কি এত অবিচার করিতে পারেন? বাছিয়া বাছিয়া সাধু অঘোরকে টানিয়া উপরে লইয়া গেলেন। এ কেমন কথা? এই কি তাঁহার মনে ছিল যে পরিবার বন্ধুবান্ধব সকল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অকালে অঘোরের জীবন হরণ করিবেন, ভক্তমণ্ডলীর মস্তকের মুকুট কাড়িয়া লইবেন? তিনি স্ত্রীকে এত শীঘ্র বৈধব্য দুঃখে নিঃক্ষেপ করিলেন, সন্তানসন্ততিগণকে পিতৃহীন করিলেন, এতই কি তাঁহার অবিচার? তাঁহার প্রাণের মধ্যে কি এত নিদারুণ অবিচারের ভাব উদিত হইবে? তাঁহাতে কি আমরা 'নিষ্ঠুর' শব্দ প্রয়োগ করিব? আমাদের বিশ্বাস হয় না আমাদের যিনি আনন্দময়ী মাতা, প্রেমময়ী যাঁহার নাম, তিনি কখন নিষ্ঠুর হইতে পারেন, তিনি কখন স্বর্গের সিংহাসনে বসিয়া অবিচার করিতে পারেন। আমাদের মা মঙ্গলময়ী, আমরা সর্ব্বত্র মঙ্গল অন্বেষণ করি, আমরা যে আমাদিগের মাকে ভাল বাসি। এই গুরুতর ঘটনা কেন হইল আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। ব্রহ্ম মন্দিরের নিকট অমঙ্গল নাই, বুঝিতে

হইবে বন্ধু কেন গেলেন ? বিদেশে লক্ষ্ণৌ নগরীতে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন আর দেশে ফিরিয়া আসিলেন না। দেশে আসিয়া তাঁহার মনের কথা কাহারও নিকটে বলিতে পারিলেন না। আর পৃথিবীতে কেহ তাঁহাকে দেখিবে না। ১১ই মাঘের উৎসব আসিতেছে, আর উৎসব করিবার জন্য তিনি ফিরিয়া আসিবেন না। সকলেই উৎসবে আসিবেন, আমরা কেবল তাঁহাকেই তাঁহাদিগের মধ্যে দেখিতে পাইব না। আর তাঁহাকে পৃথিবীতে কাছে বসাইব না। আর সেই ভাইয়ের সঙ্গে একত্র বসিয়া এখানে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিব না। আর তাঁহার সঙ্গে পৃথিবীর সম্বন্ধ রহিল না। সকলের স্থান ও আসন পূর্ণ, কেবল অঘোরের স্থান ও আসন খালি থাকিল। হায়, ব্রাহ্মসমাজ এই প্রথম নিদারুণ শোকের সংবাদ শুনিল। ভ্রাতৃবিয়োগ কি এত দিনে বুঝা গেল। এমন মনে ছিল না যে অঘোর আমাদিগকে এত শীঘ্র ছাড়িয়া যাইবে। আমরা এ বিষয় কিছু মাত্র তো প্রস্তুত ছিলাম না। ভ্রাতৃবিচ্ছেদের দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা আসিয়া হঠাৎ আঘাত করিল। এ সকল দুঃখের কথা লইয়া বন্ধুর সঙ্গে যে আলাপ করিব তাহারও উপায় নাই। যাউক, এ সকল দুঃখের কথাতো সংসারের কথা। দুঃখের কথা বলিয়া ফল কি ? যাঁর নামকেতো নিরপরাধ রাখিতে হইবে, এই চিন্তাই এখন প্রবল। এরূপ ব্যাপারতো অকস্মাৎ ঘটে না। আমরা শোকের গরল পান করিয়া আত্মাকে নাস্তিক করিব না। ইহার মধ্যে ঈশ্বরের অভিপ্রায় আছে, শোক পরিত্যাগ কর, স্থির হও, কান্দিও না। সকলকে দুঃখী করিয়া ভাই কোথায় গেলেন জান ? ভাবিয়া দেখ, এক জন আগে না গেলে সেখানকার ঘর পরিষ্কার করিবে কে ? অবশেষে তোমাদিগের সকলকে যাইতে হইবে। তোমাদিগের যাইবার পূর্ব্বে এক জন জানা শুনা লোকের যাওয়া অসঙ্গত নহে। আমাদিগের মধ্যে এক জন আয়োজন করিবার জন্য অগ্রে গেলেন। কেমন লোক গেলেন ? যিনি যোগ ধর্ম্ম সাধন করিয়াছিলেন। নির্জ্জনে যোগধর্ম্ম সাধন করিতে প্রিয় অঘোর যেমন জানিতেন তুমি আমি কেমন জানি না। তাঁহার জীবন যোগপ্রধান ছিল, কিন্তু মধুর ভক্তির পথই তাঁহার মতন আর কে জানে ? তাঁহার মতন কে আর আমাদিগের মধ্যে স্বর্গে অগ্রগামী হইবার উপযুক্ত ? প্রাচীন

ধর্ম্ম শাস্ত্রে কথিত আছে, মহর্ষি ঈশা মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, আমি পিতার বাড়ী যাইতেছি, তোমাদিগের সকলের জন্য বাড়ী প্রস্তুত করিয়া রাখিব। আমাদিগের অগ্রগামী সাধু হরিনাম করিতে করিতে দৌড়িয়া মার নিকটে গেলেন। গিয়া বলিলেন, "মা আমি আমার পৃথিবীর কার্য্য করিয়া আসিলাম। আমি আসিলাম, আরো তোমার সন্তানেরা আসিতেছে, তাহাদিগের জন্য অমৃতপাত্র প্রস্তুত কর। কলস কলস অমৃত রাখিয়া দাও। তাহারা ভারি অমৃত প্রিয়, তাহাদিগের অল্পে হয় না। ১১ই মাঘ আসিতেছে তুমি জান মা তাহারা উৎসবে কেমন মাতে। ঐ ঘরে দলে দলে সহস্র সহস্র লোক আসিয়া যাহাতে বাস করিতে পারে তেমন করিতে হইবে। লোকগুলি আর কাহাকেও চায় না কেবল তোমাকেই চায়। তাহারা তোমা ছাড়া মধ্যবর্ত্তী চায় না, তারা দুটি বেলা তোমার নাম কীর্ত্তন করে। তোমার ছেলে গুলি কলিকাতায় ভারি কীর্ত্তন করে।" অঘোরের সোজা সোজা ছেলে মানুষের কথা এখনও আমাদের স্মরণ আছে। সেই প্রকার সুমিষ্ট কথায় সে মাকে সকল কথা বলিতেছে। অগ্রগামী ভাই সেখানে গিয়া আমাদিগের জন্য ঘর প্রস্তুত করিবার সমুদায় যোগাড় করিতেছেন। যাঁহারা এখানে আছেন, তাঁহারা সেখানে গিয়া বাস করিবেন। পিতার নিকটে বলিয়া তিনি সুখের সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিবেন। তাঁহার সমুদায় দেখা রহিল। আমাদিগকে যখন যাইতে হইবে তখন তিনি সেখান হইতে আসিয়া আমাদিগকে লইয়া যাইবেন। তিনি দেখিয়া শুনিয়া গিয়াছেন, তিনি পথ চিনিয়াছেন, তিনি সেখান হইতে আবার আমাদিগের মধ্যে আসিবেন, আসিয়াছেন। স্বর্গে যে সকল অশরীরী আত্মা আছেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে বসিয়া তিনি তাঁহাদিগের ভ্রাতা হইয়াছেন। আর আমরা তাঁহার হাত ধরিতে পারিব না, এখানে তাঁহার সঙ্গে সুখে আলাপ করিবার সম্ভাবনা নাই, আর তিনি আমাদিগের বক্তৃতা উপাসনার সঙ্গী হইবেন না, এ সমুদায় ঠিক। কিন্তু ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে আমাদিগের অন্তরের যোগ জন্মেও শেষ হইবার নহে। তাঁহার শরীর ছিল, এখন তিনি অশরীরী হইয়াছেন, কিন্তু সেই ভালবাসা আছে। সেই অঘোর আজও আমাদিগের বক্ষে আছেন। বাহিরে যে বন্ধু ছিলেন, ঘরে

যে বন্ধুকে আমরা দেখিতাম, সেই বাহিরের বন্ধু বুকের ভিতরে আসিলেন, সেখানে চিরস্থায়ী হইলেন, শরীরহীন আত্মা প্রাণের ভিতরে আশ্রম করিলেন। এখান হইতে স্বর্গে পত্র পাঠাইতে হইলে, স্বর্গের পথ চেনা আছে, অঘোর স্বর্গে চিঠী পঁহুছাইয়া দিবেন। ভাইয়ের ভিতর দিয়া, তাঁহার চরিত্র স্বভাবের ভিতর দিয়া, আমাদিগের আবেদন স্বর্গে পঁহুছিবে। সে লোকটির চরিত্র আমাদিগের সমুদায় কথা বহন করিবে। এ সুন্দর চরিত্র ছবি নয়, কল্পনা নয়, ইহা যথার্থ এবং স্থায়ী। ইহা সময়ে লীন হয় না, শরীরের সঙ্গে ধ্বংস হয় না। তিনি এখনও আমাদিগের বুকে চরিত্ররূপে নিবিষ্ট। তিনি পৃথিবীতে যোগ শিক্ষা করিতেন। হিমালয়, তিনি তোমার মুসুরী মরী পর্ব্বতকে আবাস স্থান করিয়া ছিলেন, তিনি তোমার অতি প্রিয় বন্ধু ছিলেন। হিমালয়, একালে অঘোর যেমন তোমার বন্ধু, তেমন বন্ধু বোধ হয় আর আধুনিকদিগের মধ্যে কেহ নাই। সোমবার মঙ্গলবার বুধবার সমুদায় সপ্তাহ ভাই অঘোর হিমালয়ের বুকের ভিতরে গর্ত্তের মধ্যে, যেখানে মনুষ্যের চক্ষু কর্ণ যায় না, সেখানে যোগ ধ্যানে সময় কাটাইতেন। নিভৃত হিমালয়ে প্রশান্ত ভাবে ঈশ্বরেতে তিনি নিমগ্ন থাকিতেন। আজও দেখিতেছি আমার জ্যেষ্ঠ আমার পিতা অঘোর সেখানে বসিয়া আছেন। বর্ত্তমান কালের ঋষিজীবন তাঁহারই। টাকার আকর্ষণ পৃথিবীর পরিবার বন্ধুবান্ধবের আকর্ষণ তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া রাখে নাই। বাজারে খুঁজিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না, তাঁহাকে দেখ গিয়া হিমালয়ের ক্রোড়ে মরী পর্ব্বতে। খুঁজিতে হইলে তাঁহাকে সেই সকল স্থানে খুজিতে হইবে। সেখানে তিনি ঠিক ঋষির ন্যায় ধ্যানস্থ হইয়া বসিতেন। চক্ষু নিমীলিত, প্রশান্ত মুখমণ্ডল, স্থির আসন, ঋষিসম গাম্ভীর্য্য এ দিকে শিশুর ন্যায় সরল বিনীত ঈশ্বরের পদানত। তখনি তাঁহার শরীর ছিল না, তিনি তখনি মরিয়াছিলেন। এ মৃত্যুর অনেক দিন আগে তিনি শরীর মুক্ত হইয়াছিলেন, ঈশ্বরে আনন্দ সম্ভোগ করিতেন। বাহ্য শরীর ছিল বটে কিন্তু তিনি পৃথিবীতে বিচরণ করিতেন না। নিয়ত হিমালয় কৈলাসে ভ্রমণ করিতেন। এত নির্জ্জনপ্রিয় আর কে আছে, আমাদের মধ্যে যাকে কেইবা এত ভাল বাসে? তিনি তাঁহার চিরসখাকে চিনিয়াছিলেন। শরীর ছাড়িয়া

যাইতে হইবে এজন্য, শীঘ্র শীঘ্র তিনি দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শীঘ্র স্বর্গে যাইবার সম্বল করিবার জন্যই তিনি বস্তু সামগ্রীর আয়োজন উদ্দেশে হিমালয়ে গিয়াছিলেন। অঘোর, তুমি ঋষি। নববিধান তোমাকে ঋষি বলিয়া সম্বোধন করিবে। অঘোর কি কেবল পাহাড়েই থাকিত? যখন কীর্ত্তন হইত, অঘোর তাহার সর্ব্বাগ্রে যাইত। পাশে দাঁড়াইয়া যখন সে কর্ত্তাল বাজাইত, তখন কি অপূর্ব্ব শ্রী প্রকাশ পাইত। অঘোর কাঁন্দিত, হরি হরি বলিয়া সে মুগ্ধ হইত কিন্তু কখন তাহার চৈতন্য যায় নাই। তাহার হাতে আমরা ভিক্ষার ঝুলি দিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম, ভাই তুমি পয়সা জড় কর। প্রচার যাত্রার খরচ তিনিই সংগ্রহ করিতেন। হরিসঙ্কীর্ত্তনে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। হরির প্রিয় তিনি সাধু ভক্ত। যে ধ্রুব প্রহ্লাদের বহিখানি। তিনি লিখিয়াছেন, তিনি পৃথিবীতে নিজেই সেই ধ্রুব প্রহ্লাদ ছিলেন। ছেলে মানুষের মতন তিনি, এই ছেলে দুটির সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ ছিল, তিনি বুকের ভিতরে তাঁহাদিগের সঙ্গে কথোপকথন করিতেন। সেই আদর্শে তাঁহার চরিত্র সংগঠিত হইয়াছিল। এ জন্য তিনি ভক্ত ছিলেন, আমাদিগের মধ্যে ভক্তশ্রেষ্ঠ ছিলেন। সর্ব্বদা তিনি হরির সঙ্গে থাকিতেন। পঞ্জাবে তাঁহাকে এই বেদী হইতে প্রেরণ করা গিয়াছিল। পঞ্জাবে হরিকীর্ত্তন করিবার জন্য তিনি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি কি করিলেন? পঞ্জাবের যাহারা গরীব লোক তাহাদিগের প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া সর্ব্বাগ্রে তাহাদিগের মধ্যে গেলেন। ধনী মানী বিদ্বান্ বড় মানুষ অঘোরকে কেহ আকর্ষণ করিতে পারিল না। প্রবলভাবে গরিবেরা তাঁহাকে টানিল। বৃদ্ধেরা শিশুর ন্যায় তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল, তাঁহাকে সকলে গুরু বলিল। তিনি উত্তর ভারতের গরিব বৃদ্ধগণকে শিক্ষা দিতেন, উপদেশ দিতেন। দেশ হরিনাম কেন লইল না ইহা বলিয়া এমনি কান্দিতেন যে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। ভক্ত ভিন্ন এরূপ কে কান্দিতে পারে? তোমরা আমরা এমন কান্দিতে পারি না, পর দুঃখে দুঃখী হইতে পারি না। ভক্তশ্রেষ্ঠ কান্দিলেন, হরিনাম লইয়া প্রাণের ভিতরে আকুল হইলেন। তাঁহাকে ভক্ত বলিব কি যোগী বলিব? নববিধানে দুই মিশা-

ইয়া তিনি দুই সুধা একত্র পান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ এই সাধুকে সাধু বলিয়া আদর করিলেন। আর তিনি কনিষ্ঠ রহিলেন না, সকল অপেক্ষা তিনি জ্যেষ্ঠ হইলেন, জগজ্জনে তাঁহাকে শ্রদ্ধা ফুল অর্পণ করিবে। আর আমরা তাঁহাকে স্নেহসম্ভাষণ করিব না, তিনি তাহার অতীত। ধর্ম্মসম্বন্ধে তিনি অগ্রগণ্য হইলেন। নববিধানবাদিগণের নিকটে তিনি ভক্তি ও যোগের পথ প্রকাশ করিলেন। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ প্রেরিত সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়া আমাদিগের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিলেন। অবিলম্বে আমরা তাঁহার নাম স্বর্গীয় সাধুগণের মধ্যে নিবিষ্ট করিয়া তাঁহাকে অগ্রগামীর সম্মান অর্পণ করিব। তিনি সাধু। কি নির্ব্বিকার চিত্ত, কি বালকস্বভাব! কলিকাতায় তাঁহার শত্রু নাই, বিদেশে তাঁহার শত্রু দেখিতে পাওয়া যায় না এ প্রকার লোকের মৃত্যু কি অমঙ্গল? সে লোক সকলের অগ্রগণ্য; নিরদিন তাহাকে প্রেমের সঙ্গে সেবা করিব। সকলের শ্রদ্ধেয় শত্রু শূন্য এমন কে আছে? তাঁর নাম সকলের প্রিয়। তাঁর সুখ্যাতিতে আমাদিগের বিশেষ সুখ। অঘোরকে, ব্রাহ্মগণ, তোমরা কখন ভুলিতে পার না। যার সম্বন্ধে তিনি আমাদিগের বিশেষ শ্রদ্ধেয়। আমরা সকলে তাঁহাকে আমাদের উপরে স্থান দিব। আমাদের কার্য্য আমরা করিব। আমরা কাঁদিব না। শরীরের দুঃখ, শরীরের শোক, শরীরের নিয়মে কমিয়া যাইবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধুগণ যেমন, তেমনি এই অশরীরী সাধু ভারতের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সকল স্থানে আদৃত হই-বেন। কালক্রমে সকলে সেই অশরীরী আত্মাকে সাধু সাধু বলিয়া সাধুবাদ করিবেন, সহায় বলিয়া সম্মান দিবেন, শ্রদ্ধা করিবেন। অঘোর তোমাদের বন্ধু, তোমাদের শুভ ইচ্ছা প্রার্থনা তিনি গ্রহণ করিবেন। বাড়ীতে যখন আত্মোন্নতির জন্য প্রার্থনা করিবে, তখন তাঁহার জন্য ভক্তির সহিত প্রার্থনা করিবে। হৃদয় মধ্যে অঘোর চরিত্র, তাঁহার শান্তভাব, তাঁহার ক্ষমাশীলতা, তাঁহার সরল ভক্তি, বালকস্বভাব, এবং দীনতা, পোষণ করিয়া ঈশ্বরের পথে স্বর্গের পথে অগ্রসর হও। আমাদের প্রাণের বন্ধু ঈশ্বরের ক্রোড়ে পুণ্য শান্তিতে বর্দ্ধিত হইতে থাকুন। সকলে বল "শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।"

সেবকের নিবেদন।

সৎসঙ্গ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার, ৪ পৌষ, ১৮০৩ শক।

হে ব্রাহ্মসমাজ শ্রবণ কর। অদ্য শুভদিনে ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে স্বর্গবাসী সাধু যোগিগণের মধ্যে অঘোরনাথ সাধুনামে আখ্যাত হইলেন। ঈশ্বর সম্মতিতে ভক্তগণের অনুমোদনে তিনি সাধুরনাম সাধুর আদর সাধুর গৌরব ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। নববিধান এই কথা প্রচার করিলেন, স্বর্গ সায় দিলেন। জীবিতগণ মৃতের সাধুনাম অনুমোদন করিলেন। পৃথিবী এই সংবাদ প্রচার করিল, দেশের লোক সকল ইহা শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল। এত দিন জীবিত ব্যক্তি লইয়া ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মবিধান সাধন করিয়াছেন। পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইয়া গেল, এখনও আমাদিগের মধ্যে পরলোকের তত্ত্ব সাধন আরম্ভ হয় নাই। ব্রাহ্মগণ এতদিন জীবনের আদর করিয়াছেন, বিধানের আজ্ঞায় মরণ আদরণীয় হইতে লাগিল। ব্রাহ্মেরা আবির্ভাবে উৎসাহ ও প্রীতি লাভ করিতেন, তিরোভাবে অনেক ভাল ভাল কথা শিখিতে লাগিলেন। ইহলোকের তত্ত্বসম্বন্ধে অনেক উক্তি আছে, কিন্তু পরলোকের তত্ত্ব কি, পরলোক কি প্রকার, তাহার ভাব ভঙ্গী কি তদ্বিষয়ে সৎপ্রসঙ্গ অধিক হয় নাই। এত দিন আমাদিগের মধ্যে ইহ লোকের কথা ছিল, পরলোকের কথা ছিল না। এখন ইহলোক পরলোক দুইয়ের যোগ হইল। ইহলোকের শাস্ত্রের সঙ্গে পরলোকের শাস্ত্রের মিলন হইল। সাধকেরা জীবন থাকিতে পরলোকের কথা হয় না। পারলৌকিক মতের কথা কি

এক জন ভক্তের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়? কাহার সম্বন্ধে এরূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে? যেই ব্যক্তি সম্বন্ধে যে ঈশ্বরের ধর্ম্ম সাধন করে, সাধুনামের গৌরব প্রকাশ করিতে পারে। ইতিপূর্ব্বে আমরা কাহাকেও সাধু করি নাই, আমাদিগের মধ্যে কেহ কাহাকেও করে নাই, আমরা একথা শুনি নাই বা প্রচার করি নাই। এখন প্রকৃত পথ প্রকাশ পাইল, সর্ব্ববাদী সম্মতিতে সংঘটিত হইল, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এক জন সাধু হইলেন, সাধুদিগের সঙ্গে মিশিলেন। সাধুর প্রতি সম্মান দেখান, সাধুর প্রতি ভক্তি সাধন, এ সমুদায় একজন লোকের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য হইল। অতএব ব্রহ্মতত্ত্ব সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয় করিয়া জীবতত্ত্বকে পবিত্র করিবার জন্য ঈশ্বরবিশ্বাসী মাত্রেরই সাধ্যমত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। উপাসনা, আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা প্রভৃতি যেমন কর্ত্তব্য, হে পরলোকের যাত্রিগণ, তেমনি পরলোক সম্বন্ধেও অপর কর্ত্তব্য। এখন বিশেষ সময় উপস্থিত। আমাদিগের মধ্য হইতে এক জন গেলেন, এখন তাঁহারই ভিতর দিয়া আমাদিগের সকলকে পরলোকে যাইতে হইবে। অতএব সাধু সম্মানের মত তোমাদিগের ধর্ম্মসমাজের মধ্যে বিধানমণ্ডলী মধ্যে জীবিত থাকুক। সাধুগণ আলোচনার বিষয়, স্মরণের বিষয়, তাঁহাদিগের মৃত্যু বিষাদেরবিষয় নয়। মৃত্যু তাঁহাদিগের সম্বন্ধে জীবনপ্রদ হইল। মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সদালাপ সৎপ্রসঙ্গ প্রয়োজন। সকল ভাই পৃথিবীতে রহিল, এখন আর বাহিক আকার দেখিবার সম্ভাবনা নাই। এখন সৎপ্রসঙ্গে জীবিতগণ মৃতের দলভুক্ত। নববিধান জীবিত ও মৃতকে এক দলভুক্ত করিলেন। যিনি ইহলোকে রহিলেন না তিনি আমাদিগের দলভুক্ত হইয়া রহিলেন। দল ভাঙ্গিল বলিয়া, আমাদিগের মধ্যে অমুক নাই বলিয়া যে দুঃখ হয়, সে অবিশ্বাসী। আমাদিগের এক জন পরলোকে যাওয়াতে ইহলোক পরলোক এক হইল, সাধুগণের সঙ্গে আমাদিগের সম্বন্ধ স্থায়ী হইল, এই নূতন সম্বন্ধ জন্য নূতন কর্ত্তব্য উপস্থিত হইল। পরলোকে সকলে বন্ধুকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। এখন সকল প্রকারের পত্র পৃথিবীর ডাকে আর পাঠাইতে হইবে না। এখন আমাদিগের পত্র সহজে স্বর্গে পাঠাইতে পারিব। আমাদিগের

মৃত্যুর মধ্য দিয়া পত্র স্বর্গে যাইবে। আমাদিগের মধ্যে এক নূতন বিধান খুলিল। এক পার্থিব সম্বন্ধ ছিল, এখন ইহলোক পরলোকের সম্বন্ধ খুলিল। ইহলোকের ভক্ততাই আর শেষ নয়, কত সংপ্রসঙ্গ সদালাপ পরলোকের সাধুগণের সঙ্গে হইবে। এই নূতন সম্বন্ধ আমাদিগকে সাধন করিতে হইবে। কি প্রকারে সাধন করিব ? আমাদিগের এক নূতন রাজ্য স্থাপিত হইল। আমাদিগের এক জন সাধুনামে কীর্ত্তিত হইলেন, আমরা তাঁহাকে সাধুনাম দিলাম, পরলোকে আমাদিগের বাড়ী সংস্থাপিত হইল, আমাদিগের এক ঘর জ্ঞাতি স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত হইল। আত্মীয় স্বজনকে বসাইতে পারেন এজন্য একখণ্ড বিস্তৃত ভূমি তিনি পাইলেন। এক-জন বণিককে স্বর্গে পাঠান হইল যিনি বাণিজ্য ভাল বুঝেন। একজন বিষয়ী লোককে পাঠান হইল, যিনি বিষয়কার্য্যে বিলক্ষণ সুপটু। এই সকল আলোচনা করিয়া দেখ এখন কিরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে। নূতন কর্ত্তব্য উপস্থিত। নূতন ঘর ভবসাগরের পরপারে বান্ধা হইল। সে ঘরের শোভা কি যোগপক্ষের নিকট প্রকাশ পায় নাই ? সাধুদিগের মত স্থির করিয়া লও। এ সম্বন্ধে কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইও না। সাধুর শরীর লইয়া আমরা কি করিব ? সাধুদর্শন সাধুপাঠ সাধু আলোচনা সাধু-সাধনে সার। সাধুর সঙ্গে বাহ্যিক কথোপকথন আলাপ এ পৃথিবীর, পরলোকের নয়। পরলোকের সম্বন্ধ আধ্যাত্মিক। আত্মার ভিতর দিয়া পরলোকের বিষয় দেখিতে হইবে। বাহিরের চক্ষে পরলোকের সাধু-গণকে দর্শন কুসংস্কার, বাহিরের হস্তে যে তাঁহাদিগকে ধরিতে যায় সে পাগল। পৃথিবীর প্রণালীতে তাঁহাদিগকে ধরিতে গেলে অপরাধী হইতে হয়, তাঁহারা তদ্দ্বারা অপমানিত হন। ভক্তকে ভক্তি বাহিরে নহে আত্মা দ্বারা ভক্তি করিতে হইবে। পৃথিবী ও স্বর্গ এ দুয়ের ভিতরে সেতু নির্ম্মাণ করিতে হইবে, ভিতরের পথ দিয়া করিতে হইবে, তথায় যাইতে হইলে মনের ভিতর দিয়া রাস্তা। সেখানে বাহির দিয়া যাইবার যো নাই। এখানে ইচ্ছা হইলে হইবে না। যিনি সম্প্রতি সেখানে গিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিতে হইলে কি তাঁহার শরীর দেখিব ? বিধান বলিতেছেন এরূপ করিতে হইবে না। তাঁহাকে মনোমধ্যে দেখিতে হইবে। তাঁহাকে দেখিতে হইলে এখন তাঁহার

রাজ্যকে যাইতে হইবে। সমুদায় ঈশ্বর বিশ্বাসিগণকে মনের ভিতর দিয়া গমন করিতে হইবে। সাধু ভুলিব না, কিন্তু সাধুর শরীরের সম্বন্ধ যোগ করিব না, শরীরের সম্বন্ধ যোগ করিলে পাপ হয়। মনের মধ্যে দেখিব মনের মধ্যে কথা বলিব হরির ভিতর দিয়া হরির মধ্য দিয়া। হরিকে ছাড়িয়া সাধুজ্ঞান ভ্রান্তি। হরিকে অতিক্রম করিয়া স্বর্গরাজ্য দেখিতে গেলে আলোক নির্ব্বাণ করিয়া বস্তু দর্শন করিবার ন্যায় হইবে। হরির আলোক পড়িলে তবে দেখিতে পাইবে। খ্রীষ্টকে কে জানিতে পারে, গৌরাঙ্গকে কে গ্রহণ করিতে পারে? ঈশ্বরের আলোক না পড়িলে কেহ তাঁহাদিগকে জানিতে পারে না। ঈশ্বরের আলোক যতটুকু পড়িবে ততটুকু তাঁহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যাইবে। আলোক হইলে সমুদায় ভাল দেখিতে পাইবে। অঘোর তোমাদিগের সঙ্গে ছিলেন, এখন যদি ঈশ্বরের আলোক না পাও, ফল এই হইবে তাঁহাকে আর দেখিতে পাইবে না বাহিরের বস্তু গুলি যেমন, এমনি উজ্জ্বল বস্তু কাছে রাখ, আদর কর, ভক্তি কর, চেষ্টা যত্ন কর, দেখিবে, প্রভেদ কিছুই বুঝিতে পারিবে না। ঈশ্বরের নিকট উপায় প্রার্থনা কর, অঘোরভাবসম্পন্ন হইতে যত্ন কর, হরির আলোক পড়িয়া জ্যোতিষ্মান্ হইলে তবে তাঁহার সঙ্গে তোমার প্রসঙ্গ হইবে। হরির প্রতিভা না হইলে কিছুই প্রতিভাত হয় না। এই নিয়মে ঈশ্বরকে ডাক, তিনি আপনি ছেলেকে ডাকিয়া আনিয়া তোমাকে দেখাইবেন। রাস্তায় বসিয়া সাধুকে ডাকিলে কেহ সাক্ষাৎ পায় না। যিনি যত আমাদিগের নিকটে, তিনি তত আমাদিগের নিকট হইতে দূরে। ঈশ্বর অনুগ্রহ না করিলে কখন নিকটের সাধুকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। মন বিশুদ্ধ কর, পরলোকের বিশ্বাস উজ্জ্বল কর, ঈশ্বরের ভক্তিতে উন্নত হও, ব্যাকুল হৃদয়ে মনের ভিতরে প্রার্থনা কর, ঈশ্বর তোমার বন্ধুকে দেখাইবেন, তোমার বন্ধুকে তুমি ঈশ্বরের ক্রোড়ে দেখিতে পাইবে। ঈশ্বরের ক্রোড়ে সাধুগণ দাঁড়াইয়া আছেন, ঈশ্বর না দেখাইলে দেখিতে পাইবে না। উৎকৃষ্ট সাধু, মধ্যম সাধু, কনিষ্ট সাধু সকলকে ঈশ্বর মধ্যে দর্শন করিতে হইবে, সাধু দর্শনে এই নিয়ম। অতএব ঈশ্বরের মধ্যে সাধুকে দর্শন কর, ঈশ্বরের মুখের আলোক না পড়িলে কখন

দর্শন হইবে না। দর্শন হইলে আর কি? দেখিলে এখন বরণ কর, সাধন কর। তাঁহাদিগকে হৃদয়ে রাখিয়া সৎপ্রসঙ্গ কর। ঠিক যেমন মনুষ্যের সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গ করিয়া থাক, তেমনি করিতে হইবে। এখান হইতে তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে সম্বন্ধ চলিয়া গিয়াছে, এরূপ মনে করিও না। পার্থিব সম্বন্ধ তাঁহাদিগের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে, এখন আর তাঁহাদিগের সঙ্গে মিলন হইতে পারে না, স্বর্গে গিয়া তবে তাঁহাদিগের সঙ্গে সম্মিলন হইবে, এরূপ মনে করিও না। সংসারের পরপারে গিয়া পৃথিবীর পিতা আরো নিকট হইলেন, বন্ধুর বন্ধুতা আরো নিকট হইল, প্রত্যেক সাধুর সঙ্গে আমাদিগের আরো নিকট সম্বন্ধ হইল। মরিলেই সম্বন্ধ গেল, ইহা হইতে পারে পারে না। এখানে জীবন থাকিতে এক শ্রেণীভুক্ত, চলিয়া গেলে অপর শ্রেণীভুক্ত, ইহা মনে করিতে পার না। এক সময়ে যাঁহাকে দেখিয়াছি, সর্ব্বদা তাঁহাকে দেখিব। যখন এখানে নাই, তখন ক্রমান্বয়ে ভাবিব, চক্ষের আড় হইলে সব আড় হইল, এ পাগলের কথা অবিশ্বাসীর কথা। সাধু যিনি তিনি আছেন। পাঁচ জনের সঙ্গে যেমন সম্বন্ধ ছিল তেমনই রহিল, মরিয়াছেন বলিয়া তিনি অগ্রাহ্য হইলেন, আজ শ্রাদ্ধ কর্ম্ম করিয়া সমুদায় সম্বন্ধ শেষ হইল এরূপ কখন মনে করিব না। শ্রাদ্ধে পার্থিব সম্বন্ধ শেষ হইল বলিয়া স্বর্গীয় সম্বন্ধের শেষ হইল তাহা নহে। শ্রাদ্ধে পার্থিব সম্বন্ধের শেষ স্বর্গীয় সম্বন্ধের আরম্ভ। আর যাঁহার শ্রাদ্ধ করিলাম, স্বর্গে তিনি জীবিত হইলেন এই কথা ভাবিব। এখানে সম্বন্ধ পূর্ব্বাপেক্ষা আরো স্পষ্টতর। মুখে বলিলে হয় না। সকলে দেখিলেন বন্ধু মরিয়া গেলেন; কিরূপে তাঁহাকে নিকটে করিবে। এই দশ দিন তাঁহাকে যত্ন করিয়া স্মরণ রাখিলে, এখন তাঁহাকে কিরূপে ভাবিবে, পুনঃ বলি শ্রবণ কর। সাধু সম্বন্ধে এই মত সাধন কর, বাহির দিয়া সাধুকে পাওয়া যায় না, হরির মধ্য দিয়া সাধুকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, হরিতে সাধুকে জাজ্জল্যমানরূপে দেখিতে পাওয়া যায় এই বিধি। চরিত্রের নৈকট্যে স্বভাবের নৈকট্যে সাধু নিকটতর হন। হৃদয় সাধুকে আত্মীয় করে, পরিবার করে। চরিত্রে নিকট না হইয়া সাধুর চরণ চুম্বন করিলে বন্ধুর ছবির সমাদর করিলে নৈকট্য হয় না। স্বর্গের

বন্ধু আপনি কি আমাদিগের হইতে পারেন? কখনই না। হাতে ধরিয়া তাঁহার স্বর্গের বন্ধুকে আনিয়া মিলিত করেন। ক্ষমাশীল যোগীর নিকটতর হইতে হইলে ক্ষমাশীল যোগী হইতে হইবে। যদি তুমি ক্ষমাশীল না হও, যোগী না হও, তিনি তোমার বাড়ীতে পা দিবেন না, কথাও বলিবেন না, তোমার মুখও দেখিবেন না। তুমি যদি শঠ ধূর্ত্ত রাগী যোগবিহীন হও, সাধু অঘোরের সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। তোমার সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ ঘুচিয়া যাইবে। পাপপরায়ণ ব্রহ্মজ্ঞানী যদি সাধু হইতে চাও, হইতে পারিবে না। তোমার মনে কোন গুণ থাকিলে, সেই গুণে যত সাধুর নিকটবর্ত্তী হইবে, বুকের ভিতরে রক্তের ভিতরে আহারের মধ্যে বিপৎপাতের মধ্যে সকল অবস্থার মধ্যে চরিত্রের সম্মিলন করিলে সাধুর নিকটবর্ত্তী হইবে। নৈকট্যে চরিত্রে চরিত্রে ঠেকিবে, গায়ে গায়ে ঠেকিবে, স্বভাবে স্বভাবে ঠেকিবে। প্রাণে প্রাণে মিলন না হইলে সাধু ভক্ত হয় না, গুরু ভক্ত হয় না, সাধুর উপযুক্ত সমাদর হয় না। অঘোরের পরলোকের ছবি দেখ। এখন তাঁহার শরীর কল্পনা, বাহিরের চক্ষু আর তাঁহাকে দেখিবে না। সাধুর নৈকট্য চরিত্রের নৈকট্যে। ঈশা গৌরাঙ্গ প্রভৃতি সহ সম্বন্ধের যে নিয়ম, তাঁহাদের গুণ সম্পন্ন না হইলে যেমন তাঁহাদিগের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না প্রত্যেক ভাই প্রত্যেক মানুষ সম্বন্ধে এই কথা। কিসে দুজনে নৈকট্য হয়। আমি হরিভক্ত তুমিও সেইরূপ, বন্ধুতা আত্মীয়তা এইরূপ সম্বন্ধ। ছোট বড় সকল লোকের সম্বন্ধই এইরূপ। যতটুকু সাধুর গুণ আমাতে আছে, ততটুকু আমার সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ। গুণের ঐক্য না থাকিলে সাধুর সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না। যদি আমি সে অবস্থায় ভক্তি করি তবে সে কপট ভক্তি। কেবল বাহিরে ভক্তি দেখাইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া এখানে পার পাইব না। সাধুকে ভক্তি করিতে হইলে বাস্তবিক চরিত্রের নৈকট্য চাই, স্বভাবের মিলন চাই। তাঁহারা নিজ নিজ চরিত্রের দ্বারা ভক্তি যোগ সাধুতা পরিপুষ্ট করেন। কি জন্য অঘোর আসিয়াছিলেন ঈশ্বর জানেন, তবে ইহা তুমিও জান আমিও জানি যে তিনি সাধু জীবন দেখাইবার জন্য আসিয়াছিলেন। অঘোরের পিতা এক জন

ছিলু যোগী ছিলেন। অঘোর বাল্যকাল হইতে যোগপ্রিয়। যোগের ভাব প্রস্ফুটিত করিবার জন্য, ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে যোগীর বিধি প্রদর্শন করিবার জন্য তিনি যোগ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি এই সাধন অবলম্বন করিয়া যোগীর আদর্শ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই ঘটনা ইতিহাসে চিরকাল থাকিবে। তাঁহার ছবি চিরদিন পৃথিবীতে থাকিবে তাহার নিগূঢ় হেতু এই যে তিনি যোগী ছিলেন। তিনি যোগী বলিয়া আদৃত হইবেন, যোগী বলিয়া তাঁহাকে সকলে বরণ করিবে। তিনি কোন্ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন? যোগে। একাগ্রতা তাঁহার ভূষণ ছিল। সাধু বলিয়া তাঁহাকে স্মরণ করিব, কিন্তু যখন কেহ জিজ্ঞাসা করিবে কি জন্য তিনি বড়? তিনি সত্য কথা বলিতেন, কিংবা তাঁহার অনেক সদ্গুণ ছিল তজ্জন্য তিনি বড়? তাহা অপরেরও আছে, তবে কি তাঁহাতে ছিল যাহার জন্য তিনি ব্রাহ্মমণ্ডলীতে উচ্চতম স্থান প্রাপ্ত হইলেন? ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে তিনি যোগী ছিলেন। তিনি যোগী এই তাঁহার বিশেষ লক্ষণ ছিল। ঈশ্বর তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, মানুষ তাঁহাকে সাধু বলিয়া বরণ করিল, ঈশ্বর ও মানুষে মিলিল। আমরা তাঁহাকে নমস্কার করিয়া যোগী বলিব। ব্রহ্মপ্রেম তাঁহাকে যোগী করিল, মাতৃ-গর্ভে তিনি যোগভাব পাইলেন। বয়ঃসহকারে তিনি যোগ সাধন করি-লেন, সকলে তাঁহাকে যোগী বলিয়া স্বীকার করিল। যোগভাব তাঁহাতে প্রবল ছিল, তাঁহার জীবন যোগপ্রধান। তাঁহাতে ভক্তি ছিল, সদ্গুণ ছিল, কিন্তু এই যোগেতে তিনি উচ্চ। সকল চিন্তা ছাড়িয়া এক ঘণ্টা অবিচ্ছেদে আমরা ঈশ্বরে তেমন মনস্থির করিয়া রাখিতে পারি না, তিনি যেরূপ পারিতেন। আমাদের চেষ্টা করিতে হয়, যত্ন করিতে হয়, বসিবা-মাত্রই তাঁহার মন প্রস্তুত। তাঁহার একচিত্ততা সহজ ছিল। তিনি স্বভাবতঃ নির্জ্জন স্থান অন্বেষণ করিতেন। তিনি মনুষ্যের কোলাহলে বিরক্ত ছিলেন। তিনি সংসারে ছিলেন, সংসারের মধ্যে থাকিয়া যোগী হইলেন। তিনি বিষয় কার্য্য করেন নাই তাহা নহে। তিনি প্রতিদিন ১০।১২ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতেন। তিনি স্বয়ং শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, কার্য্য কর্ম্ম দেখিতেন, লেখা পড়া করিতেন, স্ত্রীলোকদিগকে ধর্ম্মজ্ঞান

উপদেশ দিতেন, সংপ্রসঙ্গ করিতেন, যে সকল বিষয় পরিশ্রম সাধ্য তাঁহাতে দিবা নিশি ব্যস্ত ছিলেন। তিনি পরিশ্রমী ছিলেন, আলস্যকে বিষবৎ একান্ত ঘৃণা করিতেন। এই জন্য বলি তিনি যোগী ছিলেন। সংসারে গুরু তিনি, উনবিংশ শতাব্দীর যোগী তিনি। আমাদিগের যোগী, জ্ঞান-ভক্তি, সংসার ধর্ম্ম, বিষয় কর্ম্ম সকল লইয়া যোগ সাধন করিতেন। এত পরিশ্রম চেষ্টার মধ্যে যখন তিনি যোগে বসিতেন কোন দিকে তাঁহার মন যাইত না, এক দিকে তিনি ব্রহ্মচরণ সেবা করিতেন, আর এক দিকে যোগে তাঁহাকে চিন্তা করিতেন, ব্রহ্মে মগ্ন থাকিতেন। ঈশ্বরে বিলীন হইয়া গিয়া এ সংসারে সকল ভুলিয়া যাওয়া সে এক যোগ সাধন, এ একযোগ সাধন, এ দুই যোগ সাধনে কত প্রভেদ। আমরা যখন উপাসনা করি, দুষ্ট অশ্বের ন্যায় আমাদিগের মন কত দিকে ধাবিত হয়, কত বার ধ্যান ভঙ্গ হয়। সাধু যোগী আমাদিগের বন্ধু ব্রহ্মমন্দিরে নিজ যোগ-জীবন উৎসর্গ করিয়া ছিলেন, এই দান সকলে গ্রহণ কর। শ্রদ্ধেয়। ঈশ্বরানুগত ঈশ্বরদাস আমাদিগের বন্ধুর নামে আমাদিগের মন পবিত্র হইবে, উচ্চ যোগচরিত্র আমাদিগের আদরের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদিগকে আমাদের জীবন বন্ধুত্বের পরিচয় দিতে হইবে। উপাসনার সময়ে মন এ দিকে ও দিকে না যায়, হৃদয়ের শান্তি ও স্থৈর্য্য থাকে, একবারও মন বিক্ষিপ্ত না হয় এই ব্রত সকলকে গ্রহণ করিতে হইবে। এ সময়ে এক মনে এক স্থানে যোগ সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অঘোর চরিত্র হৃদয়ে নিবিষ্ট করিয়া দিন দিন যেন যোগের পথে শান্তির পথে অগ্রসর হই।

সেবকের নিবেদন।

ভক্তমুখে ব্রহ্মের লক্ষণ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ৩ শ্রাবণ ১৭৯১ শক।

মনুষ্য মাত্রেই ভ্রাতা ভগিনী, এটী সম্বন্ধ জন্য। উপাসনাতে যে ভ্রাতা ভগিনী ভাব হয়, তাহা তদপেক্ষা গূঢ়তর। কারণ ইহাতে মুখের আকারের সাদৃশ্য হয়। সমস্ত পৃথিবীর লোক পরস্পর ভাই ভগিনী, তন্মধ্যে যাহারা এক পিতা এক মাতার পুত্র কন্যা তাহারা আরো বিশেষ সম্বন্ধে ভ্রাতা ভগিনী। কেননা তাহাদিগের উভয়ের মুখে পিতা মাতার মুখের সাদৃশ্য আছে এবং তাহাদিগকে দেখিলেই চিনিতে পারা যায়। ভক্তবৃন্দ মধ্যেও ভ্রাতা ভগিনীভাব, কিন্তু তাঁহাদিগের মূর্ত্তিতে একটী বিশেষ সুন্দর বস্তু আছে, তাহা এই ভক্তবৃন্দের মুখের প্রস্ফুটিত স্বর্গীয় বর্ণ। তাঁহাদিগের হৃদয় ও মুখ স্বর্গীয় প্রফুল্লতা অনুরাগে অনুরঞ্জিত এবং তাঁহারা পরস্পর অতিমাত্র প্রিয় হন। এক ঈশ্বরের পুত্র কন্যা এই সম্বন্ধ ধরিয়া তাঁহাদিগের ঘনিষ্ঠতা স্থির করিলে তাঁহাদিগের অবমাননা করা হয়। যথার্থ কথা বলিতে হইলে বলিতে হয় তাঁহাদিগের প্রাণ আকৃষ্ট হইয়া পরস্পরের মধ্যে এক হইয়া গিয়াছে তাই তাঁহাদিগের সকলের মুখে এক আকার এক বর্ণ প্রকাশিত রহিয়াছে। সে রং দেখিলে, সে মুখ দেখিলে, সে নয়ন দেখিলে আর পর ভাব থাকিতে পারে না। দেখিয়া ভালবাসা হইবেই। ঈশ্বরের মুখের শোভা ভক্তে প্রতিবিম্বিত হইলে ভক্তের মুখের বিশেষ লাবণ্য হয়। উপাসনা করিতে করিতে মুখের ভাব নিশ্চয় পরিবর্ত্তন হইবে। ঈশ্বর দর্শনে যেমন মুখ ছিল, তেমনি রহিয়া গেল, ইহা হইতে পারে না। ঈশ্বরের

ঘরে গিয়া নূতন আকার, নূতন প্রভা, নূতন আলোক নূতন শোভা হয়। সে আকার, সে জ্যোতি ভাবান্তর করিয়া দেয়। ক্রমে গূঢ় সাধনে নিযুক্ত হইয়া সাধক যতই ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিবেন, প্রেমময়ের সন্নিকর্ষ বশতঃ ততই তাঁহার মুখ পরম আনন্দের গূঢ় জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হইবে। ঈশ্বরগৃহ সাধকে প্রতিষ্ঠিত সেই ভাব রক্ষা করিবে, এক জন নয় দুজন নয় শত সহস্র লোক সেখানে গিয়া সাধন ভজন করিয়া পরিবর্ত্তিত মুখের ভাব লইয়া ফিরিয়া যাইবে। ধর্ম্ম রাজ্যের এটী প্রাচীন কথা। সেখানে গিয়া ভাবান্তর হইবেই।

উপাসনা করিয়া মুখ জ্যোতি বিহীন রহিয়া গেল, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। ইহাতে উপাসনা অস্বীকার করিতে হয়। ফল অস্বীকার করিতে হয়। উপাসনা বীজ হইতে যে বৃক্ষ উৎপন্ন হয় তাহার ফল নিশ্চয় ফলিবে। অগ্নির উত্তাপ জলের শীতলতা ইহার কোন কালে অন্যথা হয় না। ভৌতিক জগতের নিয়ম যেমন নিত্য ধর্ম্মরাজ্যের নিয়ম ও সেইরূপ নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয়। উপাসনা সময়ে নূতন ভাবের সঞ্চার হইবে, সেই স্বর্গীয় জ্যোৎস্না হৃদয়ের মধ্যদিয়া মুখে আসিয়া পড়িবে, চক্ষে প্রকাশিত হইবে। অন্য ভক্তের সঙ্গে কথা কহিতেছ উহা চক্ষু পথ দিয়া সেই ভক্তের হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইবে, চক্ষু হইতে ঈশ্বরের ভাব আসিবে। ভক্ত হৃদয়ে যাহা লুকাইয়া রাখিবেন চক্ষু তাহা প্রকাশ করিয়া দিবে। ঈশ্বরের সন্তান পরস্পর পরস্পরকে চিনিবে। ব্রহ্মসন্তান অপর ব্রহ্মসন্তানকে বুঝিতে পারে। ব্রহ্মসন্তানের বাহ্যিক উপবীত কি? তিনি যে দ্বিজ তাহা জানিবার উপায় কি? ঈশ্বরের ভক্তি প্রেমে তাঁহার নূতন সংগঠন হইয়াছে চক্ষু বলুক মুখ পরিচয় দিক্। অভিধান কি শব্দ নির্ম্মাণ করে? অভিধান উহা বলে না, মুখ বলিয়া দেয়। আকৃতি প্রকৃতি ভঙ্গী ভাব দেখিয়া দ্বিজকে জানা যায়। তাঁহাকে দেখিলেই দ্বিজ হওয়া মনে হওয়া নিশ্চয় ব্যাপার। সকল দেশেই ভক্তগণ পরস্পরের নিকট প্রিয়। ভক্ত কথা কহিলেন না উপাসনার পর তাঁহাকে দর্শন করিলে চক্ষু কথা কহিবে, রসনা শব্দ উচ্চারণ করুক আর না করুক তাহাতে ক্ষতি কি? তিনি অশব্দ কথায় কথা কহিলেন। সে উপবীত কি? নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব বলিয়া দিবে। উপাসনার সময়

সেই ভাব সেই লক্ষণ প্রবেশ করিবে। কারণ যদি থাকে কার্য্য অবশ্য হইবে। ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হইবার বিনয় ভাব মুখের নূতন রং করিয়া দিবে। সে রং পৃথিবীর বাজারে ক্রয় করা যায় না। পৃথিবীর নিম্নশ্রেণীর সামান্য লোকে তোমাদিগকে বিনয়ী বলিবে, লোকমণ্ডলীর মধ্যে তোমরা বিনয়ী বলিয়া প্রশংসিত হইবে সে বিনয়ের প্রশংসা করি না। ধর্ম্ম রাজ্যে সে বিনয়ও অহঙ্কার। বিনয় আছে এই মনে উপাসনা গৃহে প্রবেশ করিয়া যথার্থ উপাসনা করিলে আপনার জঘন্যতা বুঝিতে পারা যায়। জ্ঞানী ধনী মানী এ বলিয়া অহঙ্কারী হইলে আর তখন চলে না। উপাসনার প্রথম অক্ষরে বিনয়। সে সময়ে আর মস্তক উপরে রাখিতে পারা যায় না। যাই ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিবার পর সেই মহান্ পুরুষের জ্যোতি আসিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করে অমনি দুর্ব্বিনীত ভাব পলায়ন করে। কার কাছে গিয়া উপস্থিত? কাঙ্গাল দরিদ্র কলঙ্কে জর্জ্জরিত ঈশ্বরের নিকটে দাঁড়াইতে পারে না। সেখানে প্রবেশ করিবা মাত্র মন বিনীত ভাব ধারণ করে, ক্রমে অহঙ্কার গিয়া বিনয় শোভা প্রকাশ করে। যন্ত্রণা দুঃখ অন্ধকার মুক্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিবে। ঈশ্বরমুখের আনন্দ ছটা ভক্ত মুখে পতিত হইয়া ভক্তের পাপ শরীর দগ্ধ হইয়া আনন্দ জ্যোতিতে বিবর্ণ মুখ উজ্জ্বল এবং নূতন বর্ণে অনুরঞ্জিত হয়। দুঃখের দিন মুহূর্ত্ত মধ্যে চলিয়া গিয়া সাধক সুখী হয়েন। হৃদয় ভগ্ন, অনেক পাপ করিয়াছি স্মরণ করিয়া তিনি ক্রন্দন করেন। সেই অশ্রু প্রবাহিত হইয়া তাহা হইতে এমনি এক আনন্দজ্যোতি বিনিঃসৃত হয়, ভক্তি জল প্রেম জল চক্ষু বহিয়া পড়িতে থাকে, উহাতে ঈশ্বরের মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইয়া বিষাদের মধ্যে প্রসন্নতা আসিয়া উপস্থিত হয়। ঈশ্বরের মুখ জ্যোতি তোমার মুখে প্রকাশিত হইবে, ঈশ্বরের আনন্দে হৃদয় মন নিমগ্ন হইবে, ঈশ্বরের প্রেমরস পানে উন্মত্ত হইবে, তাঁহার পবিত্র জ্যোতিতে আত্মার অন্ধকার ঘুচিয়া যাইবে। ঈশ্বরের মুখ পানে তাকাইয়া থাকিলে যে ভাব হয় সে ভাব তোমার মুখে নাই। দুঃখের সঙ্গে সেই মধুর জ্যোতি লাভ করিবার জন্য কাঁদিয়া নয়ন ভাসাইয়া দাও, দেখিবে বিষাদে আনন্দ তরী ভাসিবে। অন্ধকারের মধ্যে প্রাণের ভিতরে এমন এক জ্যোতি

প্রকাশ পাইবে লোকে বলিবে যে, ইহার দুঃখের উপরে দুঃখ, সমুদায়ই ইহার সম্বন্ধে বিষাদের ব্যাপার। অথচ সমুদায় দুঃখ বিষাদ ভেদ করিয়া কেমন ইহার প্রসন্নতা প্রকাশ পাইতেছে। ফলতঃ দুঃখ দুর্ব্বলতা তখন চলিয়া যাইবে, বীরের ন্যায় উপাসনা করিবে, পাপ প্রবৃত্তিকে যত্ন পূর্ব্বক পরিহার করিতে হইবে না তাহারা তোমার পদানত ভৃত্য হইয়া পড়িবে। দেখিতে পাইবে, অদ্য ভক্ত হইয়া উপাসনা ঘরে সর্ব্বশক্তিমানের মুখের দিকে তাকাইলাম, এমনি বল আসিয়া প্রবেশ করিল, এমনি স্ফূর্ত্তি এমনি উৎসাহ হইল যে ধর্ম্ম বীরের সেই মুখ দর্শন করিয়া পাপ প্রবৃত্তি সে দিক দিয়া যাইতে পারিল না। সে বীরকে চিনিতে পারিল এবং তাঁহার নিকটে তাহার মস্তক চূর্ণ হইল। সংসার তাঁহার নিকটে আসিতে পারিল না। তিনি পূর্ব্বে ভীরু দুর্ব্বল ছিলেন, উপাসনা গৃহ হইতে সবল নির্ভীক হইয়া ফিরিলেন, শত শত সহস্র সহস্র রিপু তাঁহাকে দেখিয়া ভীত হইল, পাপ এবং পাপীরা কম্পিত হইল, জানিল ইনি আর এখন সেই দুর্ব্বল ভীরু নহেন। দু একবার তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য অল্প চেষ্টা করিয়াই পলায়ন করিল। পাপের প্রতি এক শক্ত বাক্য উচ্চারণ করিলেন, দল শুদ্ধ সকলের গা কাঁপিয়া উঠিল। দেখিতে যোগীর বেশ তপস্বীর বেশ। চক্ষু স্ফূর্ত্তিমন্ত, যেখানে দৃষ্টি পড়িল, সে স্থান শুকাইয়া গেল, এমনি তেজ যাহার উপরে দৃষ্টি পড়িল, সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। তেজে যিনি পরিপূর্ণ, সেখানে ঈশ্বরের তেজ প্রবিষ্ট হইয়াছে, পৃথিবীর বল সেখানে তিষ্ঠিতে পারে না। যাঁহার মুখ সর্ব্বদা ঊর্দ্ধে পরমেশ্বরের দিকে নিবদ্ধ আছে তিনি আর সংসারের দিকে তাকাইবেন কিরূপে? পাপ, দুর্ব্বলতা, অহঙ্কার, বিষাদ সমুদায় চলিয়া গেল। নূতন বেশ পরিধান করিয়া, সুন্দর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঈশ্বরের গৃহ হইতে তিনি অবতীর্ণ হইলেন।

ভক্তবৎসলের চক্ষুর সঙ্গে মিলন হইলে, ভক্তের মুখে তাঁহার মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইলে, ভক্তের মুখ পবিত্র হয়। আর নারকীর মূর্ত্তি দেখা যায় না। পূর্ব্বে লোকে তোমাদিগকে পাপী বলিত, তোমরা কোন কথা কহিলে না, উপাসনা হইতে ফিরিয়া যাইবার সময় সকলে তোমাদিগকে যোগী বলিয়া জানিল, অনেকের তোমাদিগের সঙ্গে থাকিবার ইচ্ছা জন্মিল। ভক্ত যিনি

তাঁহার সঙ্গে থাকিবার প্রথমতঃ উপযুক্ত হওয়া চাই। তাঁহার বিনয়পূর্ণ সাহাস্য প্রসন্ন মুখ আমাদিগের চিত্তকে নূতন ভাবে গঠন করে। এই জন্য পুণ্যাত্মার সঙ্গে মিলিত হইয়া সকলে সুখী হন। একত্রে সকলে ঈশ্বরের গৃহে মিলিত হন, সকলের মুখে তাঁহার প্রতিবিম্ব প্রতিভাত হয়। পরস্পরের চক্ষু পাঠ করিয়া তাঁহারা দর্শন সুধা পান করেন, যত পরস্পরকে দেখেন ঈশ্বর দর্শন হয়, দর্শন সুধাপানে মত্ত হন। তাঁহাদিগের চক্ষুর পানে তাকাইয়া ঈশ্বরের মুখের প্রতি দৃষ্টি পড়ে, সাধকের সঙ্গে থাকিয়া ভক্তের মুখশ্রী দেখিয়া প্রেমমত্ততা বাড়িতে থাকে। যাই সঞ্চিত প্রেমমত্ততা একটু কমিতে আরম্ভ করে অমনি তাঁহাদিগকে দেখিয়া পুরণ করিয়া লন। হৃদয়ের ভিতরে গিয়া দেখিলেন পুরাতন ভাব আসিতেছে, সাধুগণের মুখের দিকে তাকাইলেন, তাহার মধ্যে পরমেশ্বরের মুখ দেখিয়া মোহিত হইলেন, আর সে পুরাতন ভাব কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গেল। তাঁহাদিগের সৌন্দর্য্য এবং সৌভাগ্য দেখিয়া জগৎ মুগ্ধ হইল। বলিও না ভ্রাতা বলিতে চেষ্টা করিব, প্রেম পরিবার আপাতত হইতে পারে না। তোমাদের ভালবাসা নাই, এই জন্য তোমাদের মুখশ্রী তেমন হয় না। যথার্থ ভাবে উপাসনা করিতে পারিলে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রেম পরিবার গঠন হইতে পারে। আমি বলিয়া দিতে পারি, তুমিও বলিয়া দিতে পার, ভ্রাতঃ! আজ তোমার উপাসনা ঠিক হয় নাই। তোমার মুখ চক্ষু দেখিয়া বুঝা যাইতেছে, আজ তুমি আরাধনা ধ্যান প্রার্থনা ও নব নব সঙ্গীত করিয়াছ বটে কিন্তু প্রকৃত উপাসনা হয় নাই। সেই প্রফুল্ল মুখশ্রী তোমাতে আইসে নাই। তাঁহার রূপ তোমার মুখে প্রতিফলিত দেখিতেছি না। একটী জলবিন্দু দ্বারা যে দিক প্রক্ষালিত কর নাই, সেই দিক বিবর্ণ রহিয়া গিয়াছে। যে ভাগ প্রক্ষালিত করিলে তাহাতে তাঁহার প্রতিবিম্ব পড়িবে, যাহা প্রক্ষালিত কর নাই, সেই টুকুতে তাঁহার প্রতিবিম্ব পড়িল না। ঈশ্বরের জ্যোৎস্না পাপান্ধ মুখে প্রতিফলিত হইল না, তাই সেই মুখ লইয়া ফিরিয়া আসিলে। যাও ফিরিয়া যাও, ঈশ্বরের নিকটে যাও, সংসারে ফিরিয়া যাইও না। মুখের রং পরিবর্ত্তন করিয়া আইস। যাহার উপাসনা হয় নাই তাহাকে ঈশ্বরের গৃহের দ্বারে বসিয়া স্নেহাশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া

বলিব, আবার যাও তোমার জন্য আমি বসিয়া থাকিলাম। যাহার উপাসনা হয় নাই কনিষ্ঠ জানিয়া সকলে তাঁহাকে ঈশ্বরের ঘরে প্রেরণ করুণ। নিজে প্রমত্ত হইব, উপাসনা করিয়া আসিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিব, বিশ্বাস বাড়িয়াছে কি না, হৃদয় প্রফুল্ল হইয়াছে কি না? কে সম্পূর্ণরূপে উপাসনায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন দেখিব। দেখিতে পাইব, এক দিন তোমার উপাসনা ভাল হইয়াছে, একদিন আমার উপাসনা ভাল হইবে। আজ উপাসনা ভাল হয় নাই, তাই আজ পরস্পরকে তেমন ভাল বাসিতে পারিতেছি না, আজ উপাসনা ভাল হইয়াছে তাই আজ দিন ভাল গেল অনুরাগ বর্দ্ধিত হইল, পরস্পর এই সকল বিষয়েই কেবল আলাপ করিব। উপাসনা ততক্ষণ হয় নাই, যতক্ষণ মুখশ্রী উজ্জ্বল না হয়। এই সংস্কারটী উপাসনা সম্বন্ধে দৃঢ়রূপে সংস্থাপন কর, আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা, প্রভৃতি সাধনের অঙ্গ সকলের মধ্যে এই ভাবটী রক্ষা কর। ইহাতে সকল অঙ্গ সুমিষ্ট হইয়া আসিবে। উপাসনা ধ্যান আরাধনা সঙ্গীতে যতবার আমরা নিমগ্ন হইব, আমাদিগের মুখ ঈশ্বরের দিকে ফিরিবে, দ্বিজত্ব লাভ হইবে। ইহা যদি না হয়, তাহা হইলে আমরা আকাশ, নিজ নিজ কল্পনা বা কোন দানবের আরাধনা করিতেছি; তাই আমাদিগের মুখ সুন্দর হইল না। যে ঈশ্বরের গৃহে যায়, সে শ্রীপূর্ণ মুখ লইয়া দেবগৃহ হইতে ফিরিয়া আইসে। পরস্পরকে এ সম্বন্ধে শাসন কর, ১ মাসের মধ্যে প্রার্থনা আরাধনার সৌন্দর্য্য সৃজন করিবে। নূতন প্রভা দেবভাবে মুখের লাবণ্য বর্দ্ধিত করিবে। ভক্তিপূর্ব্বক প্রেমময়ের পূজায় প্রবৃত্ত হও, যতক্ষণ মুখ সুন্দর না হয়, ম্লান বিবর্ণভাব না যায়, মন শান্ত, হৃদয় পবিত্র, নূতন জ্যোতিতে পূর্ণ না হয়, ততক্ষণ চরণ ধরিয়া পড়িয়া থাক; সমুদায় ভক্তবৃন্দকে আলিঙ্গন কর, উপাসনা করিয়া কেমন আনন্দ সুখশান্তি লাভ করিলে এই সংবাদ প্রচার করিয়া জগতে বিশ্বাসের রাজ্য বিস্তার কর।

আচার্য্যের উপদেশ।

প্রেমাগ্নি।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ১১ই ফাল্গুন ১৭৯৬ শক।

সমুদয় জড় জগৎ যেমন আকর্ষণে বদ্ধ হইয়া সুন্দর নিয়মে চলিতেছে, সমুদয় ধর্ম্মরাজ্যও সেইরূপ প্রেমের আকর্ষণে সম্বদ্ধ রহিয়াছে। জড়রাজ্যে যেমন এক বস্তু অন্য বস্তুকে আকর্ষণ করিতেছে, সেইরূপ ধর্ম্মজগতেও আমাদের আত্মা পরস্পরের প্রতি প্রেম, প্রণয় এবং অনুরাগের আকর্ষণ প্রকাশ করিতেছে। দূরস্থ বস্তুকে একত্র করে কে? বিচ্ছিন্ন বস্তুকে সংযুক্ত করে কে? বিরোধী ব্যক্তিদিগের মধ্যে শান্তি সংস্থাপন করিতে কে পারে? এ সমুদয় প্রশ্নের উত্তর, প্রীতি। প্রীতির আকর্ষণে দূরস্থ নিকট হয়, বিচ্ছিন্ন সংযুক্ত হয়, শত্রু মিত্র হয়, এবং অপরিচিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রণয় সংস্থাপিত হয়। ঈশ্বর যখন ভৌতিক জগৎ সৃজন করিলেন, তখন ইহার যাবতীয় বস্তুকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দিলেন, এই জন্যই ইহার মধ্যে কোন বিশৃঙ্খলা নাই। তিনি অসংখ্য আত্মা সকল সৃজন করিলেন, সকলেই স্বতন্ত্র ও পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন, তাহাদিগকে সংযুক্ত করে কে? প্রেম! আকর্ষণযোগ আছে বলিয়াই যেমন এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড প্রলয় হইতে রক্ষা পাইতেছে, সেইরূপ মনুষ্যের আত্মার মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিগূঢ় প্রেমের আকর্ষণ আছে বলিয়াই সমস্ত মনুষ্যজগৎ সুরক্ষিত হইতেছে। বাহিরে বিরোধ বিবাদের অসংখ্য কারণ; কিন্তু অন্তরে পরস্পরের সঙ্গে একটি নিগূঢ় স্বাভাবিক যোগ রহিয়াছে। সকলেই জ্ঞাতসারে কিম্বা অজ্ঞাতসারে ঈশ্বরের কার্য্য করিতেছে। সেই ধর্ম্মরাজ্যের রাজা সকলকে পরস্পরের সঙ্গে প্রীতিশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া পরিবার-

এবং জনসমাজ স্থাপন করিতেছেন। মনুষ্যের মনে প্রীতি না থাকিলে কোথায় থাকিত সমাজ। এই স্বাভাবিক প্রীতি যখন পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গীয় ভাব ধারণ করে, তখন ইহাই সকলকে পরিত্রাণের পথে ঈশ্বরের দিকে লইয়া যায়। সভ্য অসভ্য সমুদয় জাতিদিগের মধ্যেই এই প্রেমের নিদর্শন পাওয়া যায়; কিন্তু ইহা যখন ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত হয় তখন ইহার আকর্ষণী শক্তি এত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, যে তখন ইহা ভয়ানক শত্রুদিগের মধ্যেও সন্ধি করিয়া দেয়। এই প্রেম আমাদের হৃদয়ের গভীরতম স্থানে থাকে। ইহার প্রভাবেই মনুষ্য সকল প্রকার পার্থিব এবং নীচ কামনা পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গীয় পিতাকে চিনিতে পারে। এই প্রেম থাকাতেই ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্মার, এবং জীবাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার যোগ সংস্থাপিত হয়। এই ভালবাসা যদি মনুষ্য হৃদয়ে রোপিত না হইত, কেবা ঈশ্বরের পূজা করিত, কেবা নর নারীর সেবা করিত? স্বর্গেরদিকে যে আমরা আকৃষ্ট হই, এবং পরস্পরের যে আমরা সেবা করি উভয়েরই মূল কারণ এই প্রেম। কোন একটী বস্তুকে এক স্থানে রাখ যদি অন্য বস্তুর সঙ্গে উহার টান না থাকে চিরকালই তাহা সেই স্থানে থাকিবে। সেইরূপ একটী বিচ্ছিন্ন আত্মাকে এক স্থানে রাখ, যদি উহার প্রতি অন্য কোন আত্মার প্রেমের আকর্ষণ না থাকে চিরকালই তাহা সেই স্থানে থাকিবে। এই প্রেমের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াই সমস্ত মনুষ্য জাতি ঈশ্বরের পূজা এবং পরস্পরের সেবাতে নিযুক্ত হয়। বন্ধুতা, প্রণয়, মিলন, এ সমুদায়ের আদি কারণ প্রেম। প্রেমেরই অনুবর্ত্তী হইয়া মনুষ্য মনুষ্যকে এবং ঈশ্বরকে বন্ধু বলিয়া তাপিত হৃদয়কে শীতল করে। যাঁহাদিগকে আমরা ভালবাসি তাঁহাদের সহবাসে থাকিয়া গভীর মনোবেদনা দূর করি এবং সংসারে যত প্রকার কষ্ট দুঃখ পাই তাহা নির্ব্বাণ করি। প্রেম দুঃখ-নিবারক। এই জন্য প্রেমের সহিত শীতল সলিলের উপমা হইয়া থাকে। প্রেম জলে দুঃখের অনল নির্ব্বাণ হয় বলিয়া আমরা প্রেম বারি বলিয়া থাকি। কিন্তু প্রেমের সঙ্গে অগ্নিরও তুলনা হইতে পারে। ইহাতে যেমন জলের গুণ তেমনি অগ্নিরও গুণ আছে। অগ্নি কঠোর পদার্থকে দ্রব করে; তদ্রূপ প্রেমের উত্তাপে কঠোর হৃদয় সকল দ্রবীভূত হইয়া এক হইয়া যায়।

প্রেম যদি কেবল আমাদের প্রাণকে শীতল করে তাহা প্রেম নহে, প্রেম যদি কেবল আমাদের দুঃখ বিনাশ করে তাহাও প্রেম নহে; কিন্তু যথার্থ প্রেম একেবারে আমাদের স্বার্থপরতা ও স্বতন্ত্রতা বদ্ধ করিয়া শত সহস্র আত্মাকে বিগলিত করিয়া তন্মধ্যে ঐক্য এবং অভিন্নতা স্থাপন করে। আট প্রকার আটটী ধাতুকে অনন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ কর, কণকাল পরে ঐ সমুদয় ভিন্ন প্রকার ধাতু বিগলিত হইয়া জলের ন্যায় তরল হইয়া পরস্পরের মধ্যে এরূপ অনুপ্রবিষ্ট হইবে, যে আর তাহাদের স্বতন্ত্রতার চিহ্ন মাত্র থাকিবে না। এমন যে কঠিন ধাতু সকল সমুদয় গলিয়া এক হইয়া গেল। দেখ অগ্নি যে কেবল বিগলিত করে তাহা নহে; ইহা বস্তুর ভিন্নতা পর্য্যন্ত বিনাশ করে। প্রেমাগ্নিও এইরূপ। স্বার্থপরতা মনুষ্যদিগকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে। ইহারই অধীন হইয়া এক জন মনুষ্য আর এক জনকে চিনিতে পারে না, ইহার অনুরোধে মনুষ্য কেবল আপনার কার্য্যেই আপনি ব্যস্ত থাকে। চারিদিকে সকলে হাহাকার করিতেছে, জগৎ মরিল তাহাতে আমার কি এই বলিয়া স্বার্থপর ব্যক্তিরা নিশ্চিন্ত থাকে। স্বার্থপর ব্যক্তিরা সমুদয় জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র ভাবে স্থিতি করে। তাহাদের মধ্যে কিছু মাত্র যোগ নাই। কিন্তু একবার যদি তাহাদের অন্তরে প্রেমাগ্নি জ্বলিয়া উঠে ঈশ্বর-প্রসাদে নিমেষের মধ্যে সেই সমুদয় আত্মা দ্রব হইয়া পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া যায়। তখন এক জনের সুখে সকলেই সুখী এবং এক জনের দুঃখে সকলেই দুঃখী হয়। এক জনের দুঃখ কিরূপে সকলের হয়? কারণ প্রেমেতে সকলেই এক। সুতরাং যাঁহাদের রোগ বিপদ নাই; তাঁহারা বন্ধুর রোগ বিপদ অনুভব করিয়া অভিন্ন হৃদয়ে কাঁদিতে লাগিলেন। যখন পৃথিবীর বন্ধুতার মধ্যেই আমরা এই সহানুভূতি দেখিতেছি, তখন স্বর্গরাজ্যে ইহা আরও কত অধিক পরিমাণে দেখিতে পাইব! ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা জগতে এই প্রেম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে আমরা এই আশা করিতেছি। যেখানে এই প্রেম নাই, সেখানে এক জন রোগ দুঃখে, শোক তাপে কাঁদিতেছে দেখিয়া চারি দিকে শত শত ভাই ভগ্নী উদাসীন, ও নিশ্চিন্ত থাকিয়া আপন আপন সুখৈশ্বর্য্য সম্ভোগ করেন। জগৎ মরিতেছে

দেখিয়াও তাঁহাদের দয়া হয় না, কেননা জগতের প্রতি তাঁহাদের প্রেম নাই, আকর্ষণ নাই, সকলকে পর ভাবিয়া উপেক্ষা করেন। যখন সেই সকল কঠোর হৃদয়ে স্বর্গ হইতে প্রেম আইসে, তখন তাঁহারা জগতের সঙ্গে সম্পর্ক বুঝিতে পারেন এবং আত্মপর অভিন্ন স্বীকার করেন। ক্ষণকালের জন্য সাময়িক প্রণয়ে মিলিত হইয়া ঐক্য স্থাপন করাকে বাস্তবিক বন্ধুতা কিম্বা প্রেম বলা যায় না। সামান্য মমতা কিম্বা মতের মিলের জন্য যে প্রণয় তাহা ক্ষণস্থায়ী, উহাতে সর্ব্বদা বিবাদ বিচ্ছেদের আশঙ্কা থাকে এবং একটু ত্রুটি হইলেই ঐ প্রণয় বিনষ্ট হয়। যথার্থভালবাসা সেই যাহা একেবারে স্বতন্ত্রতা বিনাশ করে। ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্মার যে যোগ তাহা কিরূপে হয় তোমরা উপাসনা এবং ধ্যানের সময় দেখিয়াছ। ঈশ্বরের সঙ্গে একতা কি যদি এ পাপ জীবনে এক নিমিষের জন্যেও অনুভব করিয়া থাকি তাহা হইলে অবশ্য আমরা স্বীকার করিব যে যখন তাঁহার সঙ্গে যোগ হয় তখন ইহা বলিতে পারি না, হে ঈশ্বর আমার এই, তোমার এই। তখন দেখি যে আমার যাহা কিছু বল, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য কিম্বা আনন্দ সকলই তাঁর। এ সকল দেবভাব সম্বন্ধে তাঁহার এবং আমার কোন স্বতন্ত্রতা নাই। প্রেম যদি এক করিয়া না দেয় তাহা প্রেম নহে। মনুষ্যের শরীরগত, মনোগত, এবং হৃদয়গত স্বতন্ত্রতা থাকিবেই; কিন্তু তাঁহার গূঢ়তম দেবভাবের সঙ্গে চিরকালই ঈশ্বরের একতা থাকিবে। ঈশ্বর ছাড়া আমাদের মধ্যে দেবভাব থাকিতে পারে না। পূর্ণ প্রেম যোগে ঈশ্বরের সঙ্গে যেমন মনুষ্যের দেব জীবনের স্বতন্ত্রতা থাকে না সেইরূপ আমাদের পরস্পরের মধ্যেও যখন পূর্ণ প্রেমাগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তখন আর আমাদের স্বতন্ত্রতা ভিন্নতা থাকে না। যেখানে স্বতন্ত্রতা সেখানে ভালবাসা নাই, কিম্বা যদিও থাকে তাহা অতি নিকৃষ্ট ও সামান্য ভালবাসা। প্রেমের স্বর্গীয় গভীরতা ও ব্যাপ্তি তখন বুঝিতে পারিব, যখন "আমি" "তুমি" এ সকল ভিন্নতার কথা থাকিবে না; অহঙ্কার, অহংজ্ঞান চলিয়া যাইবে; আমার হৃদয়ের প্রেম সকলের হৃদয়ে দেখিব এবং সকলের হৃদয়ের প্রেম আমার হৃদয়ে প্রতিভাত দেখিব। তখন আমার এক ইচ্ছা তোমার এক ইচ্ছা এরূপ বিভিন্নতা অসম্ভব হইবে। যাহারা আমার তোমার বলিয়া

বিবাদ করে, তাহাদের মধ্যে স্বতন্ত্রতা আছে তাহারা স্বার্থপর অপ্রেমিক; এবং তাহারা প্রেমরাজ্য হইতে বহুদূরে। যাঁহাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রেমাগ্নি জলিয়াছে, তাঁহাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই; কিন্তু তাঁহাদের সকল ইচ্ছা দ্রবীভূত হইয়া এক ইচ্ছা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে এইটুকু আমার, এইটুকু ঈশ্বরের কেহই এরূপ মনে করিতে পারেন না; কিন্তু তাঁহারা জানেন তাঁহাদের মধ্যে যাহা কিছু সকলই ঈশ্বরের, সুতরাং তাঁহাদের স্বতন্ত্র কিম্বা নিজের বলিবার কিছুই নাই। এইরূপে ঈশ্বর এবং পরস্পরের সঙ্গে আমাদিগকে অভিন্ন আত্মা অথবা একপ্রাণ করাই এই স্বর্গীয় প্রেমাগ্নির কার্য্য। ব্রাহ্মগণ! তোমরা যে এত বৎসর ধর্ম্ম সাধন করিলে, বল তোমরা কত ভালবাসিতে শিখিয়াছ? যদি বল তোমরা কেবল দেশের কতকগুলি ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে ভালবাসিতে পার, তবে এখনও তোমরা যথার্থ ভালবাসা কি জান নাই। যখন দেখিব এই ভারতবর্ষে বসিয়া তোমরা ইংলণ্ড, আমেরিকা, সমস্ত জগৎ এবং পরলোকবাসী সকলকে তোমাদের এই ক্ষুদ্র মনের মধ্যে আনিয়াছ, তখনই জানিব তোমাদের অন্তরে স্বর্গীয় প্রেমের উদয় হইয়াছে। যতদিন তোমরা এই অলৌকিক কার্য্য করিতে না পার, ততদিন তোমরা ব্রাহ্মের আদর্শ অনুসারে প্রেমিক হও নাই। সমস্ত জগৎকে এই সামান্য শর্ষপ কণার মত মনের মধ্যে আনা যায়, ইহা কি তোমরা বিশ্বাস কর না? আর কতদিন আমার, আমার করিয়া দুঃখে কাল হরণ করিবে? আমি আমার জন্য নহি; কিন্তু আমি জগতের জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের এই উচ্চ সত্য ভুলিও না। যখনি অনুভব করিবে আমি আমার জন্য নহি, তখনই দেখি অন্তরে স্বর্গের প্রেম আসিয়া যাহাকে আমি বলি তাহাকে বিদায় করিয়া দিয়াছে এবং সেই আমি সকলের ঘরে গিয়া বসিয়া আছে, সমুদায় মনুষ্যাত্মা মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই প্রেম সামান্য নহে, ইহা দোষগুণের বিচার করে না, কেবল এই জিজ্ঞাসা করে তুমি কি আমার ভাই? তুমি কি আমার ভগ্নী? যদি ভাই ভগ্নী হও, তবে তুমি আমার। স্বর্গের প্রেম এইরূপে দোষগুণ অতিক্রম করিয়া নরনারী মাত্রকেই অভ্যর্থনা করে। ব্রাহ্মগণ! যদি তোমরা এই প্রেমের পরিচয় দিতে পার তবেই তোমরা প্রেমিক? ইহাই স্বর্গের প্রেম। প্রাণের

ভিতর পরমাত্মা জীবাত্মাকে ক্রোড়ে লইয়া এই প্রেম বিতরণ করেন। এই প্রেম ঈশ্বর এবং জীবাত্মাকে যোগ করে, ইহাই আবার আমাদের স্বতন্ত্রতা বিনাশ করে, ইহারই অভাবে মনুষ্য ঈশ্বর এবং জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকে। ইহাই দ্বৈত অদ্বৈতবাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করে। ঈশ্বর কখনই মনুষ্য হইতে পারেন না, এবং মনুষ্যও কখন ঈশ্বর হইতে পারে না; কিন্তু এই আশ্চর্য্য প্রেমযোগে ঈশ্বর এবং মনুষ্যের নিগূঢ় যোগ হয়। এই প্রেমে ঈশ্বর আমার মধ্যে, এবং আমি তাঁহার মধ্যে। আবার এই প্রেমের প্রভাবেই আমার প্রাণ তোমার ভিতরে, এবং তোমার প্রাণ আমার ভিতরে, এবং ইহাই আমাদের উভয়ের আত্মাকে ব্রহ্মরূপ প্রেম সমুদ্রে মগ্ন করে। তুমি আমাতে, আমি তোমাতে এবং আমরা উভয়ে ঈশ্বরেতে। কি আশ্চর্য্য নিগূঢ় প্রেম যোগ! কি সুন্দর সুখদ মিলন! ইহা কি আমাদের সর্ব্বোচ্চ সৌভাগ্য নহে যে ঈশ্বর আমাদিগকে এই প্রেমের অধিকারী করিয়াছেন? অন্য পার্থিব ভালবাসার কথা আর বলিও না। যে প্রেম স্বর্গ হইতে বিশ্বাসী ব্রাহ্ম সাধকের নিকটে আইসে দেখিলেত ইহার প্রতাপে স্বার্থপরতা, অহঙ্কার কোথায় চূর্ণ হইয়া গেল। ঈশ্বর কেমন সকলকে একত্র করিয়া দিলেন। এই প্রেম সাধন কর। ইহাই স্বর্গরাজ্য, ইহাই শান্তিধাম, ইহাই প্রেম পরিবার। দুঃখী দেখিয়া অমৃত মাখিয়া দয়াল পিতা আমাদের নিকট এই প্রেম পাঠাইয়াছেন, ইহা আমাদের প্রাণের ভূষণ হউক। ইহা দ্বারা ধরাতলে তাঁহার সুন্দর পরিবার সংগঠিত হইবে। আর আমরা ভিন্ন ভিন্ন থাকিতে পারি না। এই প্রেমাগ্নি জ্বালিয়া প্রেমময় মুক্তিদাতা আমাদিগকে একহৃদয় ও অভিন্ন প্রাণ করুন।

সৌন্দর্য্যের প্রতি প্রেম।

রবিবার ১৮ ই ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক।

যদি এমন একটি শব্দ থাকে যাহার মধ্যে সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের সার পাওয়া যায় সেই শব্দটি প্রেম। ইহাই সাধন, ইহাই স্বর্গ। সকল ভাল কথার মূল এবং সমুদয় উপদেশের সার ভালবাসা। ইহাই ধর্ম্মজীবনের পূর্ণতা। যদি জিজ্ঞাসা কর কি হইলে আমরা পরিত্রাণ পাইব, যিনি ভক্ত তিনি বারম্বার কেবল এই শব্দ উচ্চারণ করিবেন, প্রেম। ফলতঃ ইহা ভিন্ন মুক্তির অন্য উপায় নাই। ধর্ম্মজীবনের উন্নত অবস্থায় ব্রহ্মঅনুরাগে অনুরাগী এবং ব্রহ্মভক্তিতে ভক্ত হইয়া যে সুখ লাভ করি সেই সুখ ভিন্ন জীবাত্মার আর উচ্চতর, পবিত্রতর তৃপ্তি নাই। তখন সত্য চিন্তা, সত্য বাক্য, সৎকার্য্য সকলই প্রেমের ব্যাপার, সকলই আনন্দ জনক। অতএব সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ সাধন প্রেম। যদি জিজ্ঞাসা কর পৃথিবী কোন্ দিন স্বর্গ হইবে, তাহার উত্তর এই:—যে দিন পৃথিবীর সমস্ত নর নারী পরস্পরকে পবিত্র ভাবে প্রেম দিতে পারিবে। প্রেমই স্বর্গ, প্রেমই সুখ শান্তি, প্রেমানন্দের মত আর আনন্দ নাই। মানিলাম, পরস্পরকে ভাল না বাসিলে পরিত্রাণ নাই, হৃদয় পবিত্র হয় না; কিন্তু সকলের মনে এই প্রেমের উদয় হয় না কেন? কেন এখনই ইচ্ছা করিয়া আমাদের মধ্যে প্রেমকে আনিতে পারি না? আমাদের মত এক দিকে এবং জীবন অপর দিকে গমন করে কেন? এই আমরা বিশ্বাস করিলাম প্রেমই আমাদের স্বর্গ, তবে কেন আমরা অপ্রেমের নরকে পুড়িয়া মরি? আমরা জীবনের পরীক্ষায় দেখিতেছি প্রেম ইচ্ছাধীন নহে। মনোবিজ্ঞানও বলিয়া দিতেছে কি নিকৃষ্ট, কি উচ্চ হৃদয়ের কোন ভাবই আমাদের আদেশ কিম্বা ইচ্ছার অধীন নহে। আমাদের ইচ্ছা হইলেই অন্তরে প্রেম কিম্বা ঘৃণার উদ্রেক হয় না। কিন্তু সুন্দর বস্তু দেখিলেই অন্তরে প্রেম হয় এবং কদাকার বস্তু দেখিলেই তাহার বিপরীত ভাবের উদয় হয়, ইহাই হৃদয়-জগতের অনি-

র্ব্বার্য্য নিয়ম। প্রেম চির দিন সৌন্দর্য্যের প্রতি ধাবিত হয়, সুন্দর বস্তু না দেখিলে প্রেমোদয় হয় না, যাহা কদাকার তাহার প্রতি প্রেম কিরূপে যাইবে? আমরা ঈশ্বরকে প্রথমতঃ প্রেম করিতে শিখি; কিন্তু ঈশ্বরকে প্রেম করা সহজ, কেননা তাঁহার মত পরম সুন্দর আর কে আছে? আমরা মনে মনে যত কেন সৌন্দর্য্য কল্পনা করি না, ঈশ্বরের প্রকৃত সৌন্দর্য্যের নিকট সকলই পরাজিত হয়। তাঁহার সৌন্দর্য্য স্বভাবতঃ আপনা আপনি আমাদের প্রেম আকর্ষণ করে। প্রেম যখন ঈশ্বরের সুন্দর মুখ দেখিতে পায় আর কি তাহা কোন বাধা মানে? তাঁহার সুন্দর মুখ সম্মুখে না দেখিলে আমরা কখনই তাঁহাকে ভাল বাসিতে পারিতাম না। তিনি অতিশয় সুন্দর, এই জন্য যখনই তাঁহাকে দেখি, তখনই হৃদয়ে প্রেম কুসুম প্রস্ফুটিত হয়; কিন্তু তাঁহাকে ছাড়িয়া যখন জগতের নর নারীদিগের প্রতি দৃষ্টি করি তখন দেখি সকলের মুখ কদাকার। মনুষ্য স্বভাব কত কলঙ্কিত হইতে পারে সকলে তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে। নানাপ্রকার পাপানলে সকলের মুখ দগ্ধ, যাহাতে আমাদের প্রেম আকর্ষণ করিতে পারে, তাহাদের মুখে এমন কোন প্রকার সৌন্দর্য্য নাই; তবে সেই সকল লোককে ভাল বাসিব কিরূপে? যাহারা আমাদিগকে ভাল বাসে তাহাদিগকে আমরা সহজেই ভাল বাসিতে পারি, প্রীতির বিনিময়ে প্রীতি দেওয়া কিছুই কঠিন নহে, তাহাতে আমাদের নিজের কোন গুণ কিম্বা বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশ পায় না। পিতা মাতা এবং আত্মীয় বন্ধুর স্নেহ মনে হইলেই তাঁহাদের সৌন্দর্য্য দেখিয়া হৃদয়, মন, আত্মা মোহিত হইবে ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু যাহারা অপরিচিত এবং যাহাদের মনে আমাদের জন্য কিছুমাত্র প্রীতি নাই, অথবা সর্ব্বদাই যাহাদের মন নানাপ্রকার পাপ এবং অপ্রেমে শুষ্ক এবং বিবর্ণ তাহাদিগকে কিরূপে ভাল বাসিব? সৌন্দর্য্য যেখানে নাই সেখানে প্রেম যাইবে কিরূপে? মিত্রের মিত্রতা সকলেই ভাল বাসিতে পারে, কিন্তু শত্রুর শত্রুতা কিরূপে ভাল বাসিব? তোমরা কি দেখ নাই, যাই সৌন্দর্য্য কদাকারে পরিণত হয় তখনই প্রেমের গতি রোধ হয়, এবং পরস্পর পরস্পরের অপ্রিয় এবং বিরাগভাজন হয়। মনুষ্যের মধ্যে অনেক প্রকার কুৎসিত ভাব আছে,

এই জন্যই মনুষ্যকে প্রেম করা অতি কঠিন। যদি আমার বন্ধু প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত সুন্দর থাকিতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে ভাল বাসিতে পারিতাম; কিন্তু যখন দেখিতেছি, এই যিনি অল্পক্ষণ পূর্ব্বে স্বর্গীয় প্রেমে সুন্দর ছিলেন, তিনিই আবার প্রেমের অভাবে কুৎসিত হইলেন। তখন এই প্রতিকূল অবস্থায় তাঁহাকে কিরূপে ভালবাসিব? যখনই দেখিলাম বন্ধু শত্রু হইলেন, তখনই তাঁহার প্রতি আমার প্রেম শুকাইল। এইরূপে প্রেম কিম্বা ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য না দেখিলে কাহারও প্রতি প্রেমোদয় হয় না, সুতরাং যেখানে প্রীতি কিম্বা পুণ্যের সৌন্দর্য্য নাই, সেখানে মনুষ্যের প্রেম যায় না। তবে কি আমরা ঈশ্বরের কদাকার সন্তানদিগকে ভালবাসিতে পারিব না? আমাদের দিকে দেখিলে বাস্তবিক ইহা অসম্ভব বোধ হয়; কিন্তু নিরাশার কারণ নাই; কেননা যখন আমরা দেখি ঈশ্বর কিরূপে কদাকারদিগকে ভালবাসেন, তখন আমরাও পরস্পরকে কিরূপে ভাল বাসিব তাহা বুঝিতে পারি। তিনি আমাদিগকে নরকের জঘন্য কীট জানিয়াও স্নেহ করেন, তাঁহার এই স্বভাব অনুকরণ করিতে হইবে। আমাদের জঘন্যতম অবস্থা দেখিলেও তাঁহার প্রেম শুষ্ক হয় না। আমাদের শত শত পাপ সত্ত্বেও ঈশ্বরের হৃদয় হইতে ক্রমাগত প্রেম আসিতেছে। কদাকারকে প্রেম করিতে কে পারেন? ঈশ্বর। আমরা তাঁহার অনুগত হইলে নিতান্ত কদাকারকেও ভালবাসিতে পারি। তিনি কলঙ্কিত পাতকীকে কিসের জন্য ভালবাসেন? সেই নরকের কীটের মধ্যে কি কোন সৌন্দর্য্য আছে? সৌন্দর্য্য দেখিলেই প্রেমোদয় হয়; ইহাই প্রেমের নিয়ম। তবে ঈশ্বর কিরূপে কদাকারকে ভালবাসেন? বস্তুতঃ প্রেমসিন্ধু পিতা মনুষ্যের মধ্যে যাহা কুৎসিত তাহা ভাল বাসেন না; কিন্তু তিনি সেই জঘন্য কদাকার হইতে সৌন্দর্য্য বাহির করেন,— তাঁহার নিকটে সেই নরকের দুর্গন্ধের মধ্যেও স্বর্গের সৌরভ প্রকাশিত হয়। সেই সৌন্দর্য্য কি? সেই পবিত্র সৌরভ কি? নর নারীর সঙ্গে তাঁহার "সম্বন্ধ"। প্রত্যেক মনুষ্য তাঁহার পুত্র, কিম্বা কন্যা। তিনি জানেন জগদ্বাসী প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁহার এই একটী সম্বন্ধ আছে যাহা চিরস্থায়ী; মৃত্যু যাহা বিনাশ করিতে পারে না, এবং পাপ, পুণ্য, অথবা

অন্য কোন পরিবর্ত্তনেও যাহার বিনাশ নাই। এই সম্পর্ক অবলম্বন করিয়া ঈশ্বর ভক্তের স্বর্গের ভিতরেও গমন করেন, এবং নরকবাসী জঘন্যতম কীটের মধ্যেও প্রবেশ করেন। ইহারই আকর্ষণে নরকের মধ্যে যাহারা বাস করে তাহারাও ঈশ্বরকে স্বর্গ হইতে টানিতেছে। পাপীর পত্র পাইলেই পাপীর বন্ধু ঈশ্বর তাহার নিকটে আসিতে বাধ্য। ঈশ্বর নিজে বলিয়াছেন "পাপী ডাকিলে আসিব আমি"। কিন্তু ইহাতে পাপীর কোন গৌরব নাই, কেননা এই সৌন্দর্য্য তাহার নিজের নহে। নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করিয়া স্বর্গ হইতে ঈশ্বরকে ডাকিয়া আনিয়াছে, পাছে ইহা ভ্রমে করিয়া পাপীর আরও অধোগতি হয়, এই জন্য ঈশ্বর আপনি এই সৌন্দর্য্যের আধার হইয়া রহিয়াছেন। সেই সৌন্দর্য্য কি? আবার বলিতেছি, ঈশ্বরের সঙ্গে মনুষ্যের সম্বন্ধ। ঈশ্বর আমাদের পিতা, আমরা তাঁহার পুত্রকন্যা, মহাপাপীর পক্ষে ইহা কি সামান্য কথা। ইহাতেই স্বর্গের সৌন্দর্য্য। এই "সম্বন্ধ" স্বর্গীয়। ইহাতেই জীবের পরিত্রাণ। ঈশ্বরকে "মা" বলিয়া "পিতা" বলিয়া যে ডাকিতে পারে তাহার কি সামান্য অধিকার? স্বর্গের পিতা, স্বর্গের মাতা, সাধু অসাধু বিচার করেন না; কিন্তু তাঁহার যে কোন পুত্র কিম্বা যে কোন কন্যা কাতর প্রাণে তাঁহাকে ডাকিবে, তৎক্ষণাৎ তিনি তাহার নিকটে আসিবেন। এই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। শিশু কাঁদিলেই যেমন মাতার মনে স্নেহ এবং স্তনে দুগ্ধ উথলিয়া পড়ে সেইরূপ সন্তান ডাকিলেই ঈশ্বরের মনে স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে। ঈশ্বরের সঙ্গে যে মা সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে তাহার কি সামান্য সৌভাগ্য? এই সম্পর্কে দূর নিকট হয়, বিচ্ছিন্ন সংযুক্ত হয়, এবং নরক স্বর্গ হয়। ইহার সৌন্দর্য্যে ঈশ্বর স্বয়ং বিমোহিত হন। এই সৌন্দর্য্যের কিছুতেই হ্রাস নাই, মহাপাপের সাধ্য নাই ইহা কলঙ্কিত করে। ঈশ্বর যত বার আমাদিগকে দেখেন ততবারই আমাদের সঙ্গে তাঁহার এই সম্বন্ধের সৌন্দর্য্য দর্শন করেন। ইনি আমার পুত্র, ইনি আমার কন্যা, এই বলিয়াই তিনি স্নেহে পরিপূর্ণ হইয়া সাধু অসাধু সকলকেই আলিঙ্গন করেন। এই "সম্বন্ধের সৌন্দর্য্য" ব্যতীত আমাদের উপর ঈশ্বরের আরও একপ্রকার সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয়। ইহা তাঁহার সৃষ্টির লাবণ্য। যথ-

নই তিনি আমাদিগকে দেখেন, তখনই আমাদের মুখে তাঁহার চক্ষের লাবণ্য প্রতিভাত হয়। তিনিত নিজের চক্ষে দেখেন। দেবতা দেখেন দেবচক্ষে। দেবচক্ষু যে প্রেমচক্ষু। একদিকে যেমন তিনি আমাদের মধ্যে সেই সম্বন্ধের সৌন্দর্য্য দেখেন, অন্যদিকে আবার যতই আমাদের উপর তাঁহার সেই প্রেমদৃষ্টি পড়িতেছে, ততই আমাদের নিতান্ত কদাকার মুখও ক্রমে ক্রমে সুন্দর হইয়া যাইতেছে। স্নেহেরচক্ষে নিতান্ত কুৎসিত ব্যক্তিও সুন্দর দেখায় ইহাত তোমরা সকলেই জান, আকাশে চন্দ্র রহিয়াছে; কিন্তু তাহার জ্যোৎস্না আসিয়া তোমার আমার মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিল; বায়ু চলিতেছে, কিন্তু যাহার উপর দিয়া যাইতেছে, তাহা যদি নিতান্ত উত্তপ্ত এবং কঠোর বস্তু হয় তাহাও সুশীতল এবং কোমল হইতেছে; এ সকলত তোমরা প্রতিদিন দেখিতেছ। আকাশের চন্দ্র যদি আমাদের মুখ সুন্দর করিতে পারে, এবং বাহিরের শীতল বায়ু যদি উত্তপ্ত বস্তুকে শীতল করে, তবে যিনি স্বর্গের চন্দ্র, এবং যাঁহার প্রেমদৃষ্টি স্বর্গের সমীরণ, তিনি কি আমাদিগকে সুন্দর এবং শীতল করিতে পারেন না? একদিকে তিনি যতই আমাদের সঙ্গে তাঁহার স্বর্গীয় সম্বন্ধের সৌন্দর্য্য দেখেন, ততই তিনি আমাদিগকে ভালবাসেন, অন্য দিকে আবার যতই আমাদিগকে প্রেমচক্ষে দেখেন, ততই অধিক পরিমাণে আমরা তাঁহার প্রেমের পাত্র হই। অধিক পরিমাণে কেন বলিতেছি? স্বর্গীয় পিতার প্রেম যে অনন্ত, তিনি যে পূর্ণ প্রেমের আধার। তিনি যে অনন্ত প্রেমচক্ষে সকলকে দেখিতেছেন। জিজ্ঞাসা করি, তোমরা যখন প্রেমচক্ষে কোন মনুষ্যের প্রতি দৃষ্টি কর, দৃষ্টি করিতে করিতে কি তোমাদের প্রেম বৃদ্ধি হয় না? এবং অর্দ্ধঘণ্টা পরে কি সেই ব্যক্তি নিতান্ত কদাকার হইলেও তোমাদের প্রেমচক্ষু তাহার মধ্যে অধিকতর সৌন্দর্য্য দর্শন করে না? ইহা যদি তোমরা প্রত্যক্ষ না করিয়া থাক, তবে প্রেমশাস্ত্র কি তোমরা জান না। যতই প্রিয় ব্যক্তিকে প্রেমচক্ষে দেখিবে, ততই তোমার নিকটে সে সুন্দরতর হইবে, এবং ক্রমে তোমার চক্ষু মধুময় হইবে, ইহাই প্রেমের ধর্ম্ম। কিন্তু সেই সকল নরনারী যাহাদিগকে তোমার প্রেমচক্ষু সুন্দর দেখাইতেছিল, যাই তাহাদের সঙ্গে

বিবাদ কর আর তাহারা প্রিয় থাকে না, আর তাহাদের মুখে লাবণ্য নাই। অতএব যদি প্রেমরাজ্য স্থাপন করিতে চাও, তবে প্রেমদৃষ্টিতে মানুষকে সুন্দর করিয়া লইতে হইবে। ভালবাসা দিয়া জঘন্য পাপীকেও সুন্দর করিয়া লইতে হইবে। যতক্ষণ কোন ভাই ভগ্নীকে কদাকার দেখিবে ততক্ষণ তাহাকে প্রেম দিতে পার না, অতএব আগে প্রেমময় পিতার অনুগত হইয়া ভালবাসা দিয়া কুৎসিতকে সুন্দর করিয়া লও। "ইনি আমার পিতার পুত্র, ইনি আমার পিতার কন্যা," এইরূপে প্রেম সাধন কর। "ঈশ্বর আছেন ঈশ্বর আছেন" শতবার এইকথা বলিয়া যেমন ধ্যান অভ্যাস কর, তেমনই "ইনি আমার ভাই, ইনি আমার ভগ্নী, এই বলিয়া ঈশ্বরের পবিত্র প্রেমপরিবার সাধন কর। যতই বলিবে ইনি আমার অত্যন্ত আদরের ধন, ততই দেখিবে প্রত্যেক নরনারীর সঙ্গে অতি সুন্দর, "এবং অতি সুমিষ্ট স্বর্গীয় সম্বন্ধ প্রকাশিত হইবে। ক্রমাগত সেই সম্পর্ক ভাবিতে থাক, যতই ভাবিবে ততই দেখিবে তাহার মধ্যে নূতন নূতন লাবণ্য, এবং নূতন নূতন মধুরতা। তখন দেখিবে, যে চক্ষু নীরস ছিল, তাহা সরস হইল, যে হৃদয়ে প্রেম ছিলনা, তাহার পক্ষে ভালবাসা অতি সহজ হইল। তাহার নিকটে আর কাহার মুখ কুৎসিত রহিল না। এক ঘণ্টার মধ্যে তাহার প্রেমচক্ষে সকলের মুখ সুন্দর হইল। যদি এই সম্বন্ধ সাধন কর, যদি এইরূপে প্রেম দৃষ্টিতে তাকাইতে পার, তবে দেখিবে তোমার অত্যন্ত নিকটে সেই স্বর্গধাম, সেই প্রেমধাম। একদিকে যেমন ঈশ্বর দর্শনেই মুক্তি, অন্যদিকে সেইরূপ ভাই ভগ্নী দর্শনেই মুক্তি। এই প্রেমদৃষ্টি আমাদের শাস্ত্র, ইহাই আমাদের স্বর্গ, ইহাতেই আমাদের পরিত্রাণ।

সেবানন্দ।

রবিবার ২০শে মাঘ, ১৭৯৫ শক।

পৃথিবী কি সেই সুখ দিতে পারে মন যাহা চায়? সংসারে যত প্রকারে ধর্ম্ম প্রচার হউক না কেন, আমাদের মনের মধ্যে যে সুখের আশা রহিয়াছে পৃথিবী সেই সুখ দিতে পারে না। আমাদের সুখের আদর্শ

যেরূপ উচ্চ এবং স্বর্গীয় পৃথিবীর বিশুদ্ধতম অবস্থাও সেই সুখ দিতে পারে না। ঈশ্বর মনুষ্যের অন্তরে সুখ শান্তির যেরূপ পূর্ণ আদর্শ দিয়াছেন তদনুসারে এই সংসারে সুখশান্তি লাভ করিবেন আশা করিয়া যিনি কার্য্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন তাঁহাকে নিরাশ হইতেই হইবে। যে ধর্ম্মধন আমরা বাহিরে দেখিতে পাই তাহা ক্ষণকালের জন্য সন্তুষ্ট করিতে পারে; কিন্তু যে আদর্শ ঈশ্বর স্বয়ং ভক্তের নয়নে ধরিয়াছেন তাহার তুলনায় পৃথিবীর পবিত্রতম ধর্ম্মজীবনও কিছুই নহে। এই আদর্শ যে আমরা কল্পনা দ্বারা চিত্র করি তাহা নহে; কিন্তু আমাদের স্বর্গীয় পিতা এমনই প্রেমময় যে তিনি স্বহস্তে আমাদের অন্তরে সেই ছবি আঁকিয়া দিয়াছেন। যেমন বাহিরের সমস্ত জগৎ আমাদের চক্ষুর ক্ষুদ্র একটী বিন্দুতে প্রতিবিম্বিত হয় তেমনই প্রকাণ্ড স্বর্গরাজ্য মনুষ্যের ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রেম-চক্ষে প্রতিভাত হয়। এই আদর্শ ঈশ্বরের সামগ্রী। ইহার মধ্যে কল্পনা আসিতে পারে না। পৃথিবী এই আদর্শের নিকটবর্ত্তী হইতে চেষ্টা করে; কিন্তু যতদিন না সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে, তত দিন কদাচ পৃথিবী স্বর্গ হইতে পারিবে না। এই জন্য যাঁহারা পৃথিবীতে তাঁহাদের বাসনানুরূপ সমস্ত ব্যাপার দেখিতে চান তাঁহারা নিরাশ হন। ঈশ্বরের আজ্ঞায় যাঁহারা জগতের সেবা করেন তাঁহাদের কিছু মাত্র অধিকার নাই যে পৃথিবীতে বাহ্যিক পুরস্কার কিম্বা বেতন আকাঙ্ক্ষা করেন। যাহারা পৃথিবীতে পুরস্কারের জন্য লালায়িত হয় তাহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ। মনুষ্যের সাধুতা তখনই সুমিষ্ট হয় যখন তিনি বেতনের প্রার্থী নহেন। ঈশ্বর কি এই জন্য তোমাদিগকে দাস দাসী হইতে বলিতেছেন যে তোমরা এখানে অবিশ্রান্ত পর সেবাতে নিযুক্ত থাকিয়া সকলকে সহাস্য দেখিয়া পুরস্কার পাইয়া পরলোকে যাইবে? যদি এইরূপ হইত তাহা হইলে পুণ্য সঞ্চয় করা কঠিন হইত। যতবার কামনা অপূর্ণ থাকিত ততবার আশা পূর্ণ হইল না বলিয়া মনে কষ্ট হইত, এবং মন পরসেবায় বিমুখ হইত। অতএব নিষ্কাম হইয়া ভাই ভগ্নীর সেবা কর, স্বর্গের প্রভু তোমাদের দুঃখ দূর করিবেন। দাস দাসী কেবল কার্য্য করিবে, তাহাদের পুরস্কার নিম্নে নহে, কিন্তু ঊর্দ্ধে; মনুষ্যের নিকটে নহে, কিন্তু ঈশ্বরের নিকট। এই পৃথিবী ঈশ্বরের দাস দাসীর

বেতন দিতে পারে না। দাস দাসী কিসের দ্বারা পরসেবায় নিয়োজিত হইবে? কেবল স্বর্গের প্রেম দ্বারা। প্রেমই এক মাত্র উত্তেজক। কি জন্য আমরা পরের সেবা করিব? প্রেমশাস্ত্র অধ্যয়ন কর। প্রত্যেকের হৃদয়ে প্রেম নামে একটী স্বর্গীয় সামগ্রী আছে, তাহারই উত্তেজনায় মনুষ্য ভ্রাতার চক্ষের জল এবং ভগ্নীর দুঃখ মোচন করে। ঈশ্বর-প্রেমিক জগতের প্রতি প্রেমিক হইয়াছেন, বলিয়া জগতের কাছে কিছু পাইব কদাচ এরূপ প্রত্যাশা করেন না। জগৎকে তিনি প্রেম দিতেছেন সেই প্রেমই তাঁহার প্রেমের পুরস্কার। ঈশ্বরের পাদপদ্ম হইতে সেই গভীর প্রেম আপনার স্বর্গীয় স্রোতে বাহির হইয়া প্রেমিকের হৃদয়ের মধ্য দিয়া জগৎকে অভিষিক্ত করিতেছে। এই প্রেমই মনুষ্যকে মনুষ্যের দাস দাসী করে। যদি ব্রাহ্ম কিম্বা ব্রাহ্মিকা পরসেবায় নিযুক্ত না থাকেন তাহার কারণ এই যে তিনি জগতকে ভাল বাসেন না। যথার্থ প্রেম কাহাকে বলে আমরা জানি না, সকল সময় সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। সেই স্বর্গীয় প্রেম ভিন্ন পর সেবার অন্য কোন কারণ নাই। স্বর্গের ভালবাসা এত প্রবল, যে তাহা মনুষ্যকে অস্থির করিয়া রাখে, যতক্ষণ না তিনি জগতের সেবা করিতে পারেন, ততক্ষণ কিছুতেই তাঁহার যন্ত্রণার শেষ নাই, তিনি মনে মনে ভাবেন, এত কষ্ট পাইতে হইত না যদি জগৎকে ভাল না বাসিতাম। যদি অন্তরে ভালবাসা না থাকিত, বিদেশে গিয়া পরের নিকটে গিয়া এত কটূক্তি শুনিতে হইত না, এত যন্ত্রণার আগুণে পুড়িতে হইত না; কিন্তু তিনি কি করিবেন? একবার যাহার মন প্রেমের অগ্নিতে সংস্পৃষ্ট হইয়াছে, আর কি তাহার ক্ষমতা আছে যে সে প্রেমের বেগ সম্বরণ করে? দিবা রাত্রি কেবল পরের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিতেছে। অমুক ভাই কেন বিষণ্ণ রহিল? অমুক ভগ্নী কেন কাঁদিতেছেন? এ সমুদয় প্রশ্ন সর্ব্বদাই তাঁহার প্রাণ অস্থির করিতেছে, কিছুতেই অন্তরের সেই অস্থিরতার শেষ হয় না; যতদিন পৃথিবীর দুঃখ কষ্ট থাকিবে ততদিন ইহা শেষ হইবার নহে। সেই দিন তাঁহার প্রাণ সুস্থির হইবে যে দিন পৃথিবী সুখী হইবে এবং কাহারও মুখ ম্লান থাকিবে না। ব্রাহ্মগণ, এইরূপ অস্থিরতা যদি তোমাদের মধ্যে না আসিয়া থাকে, তোমরা যদি এখনও পরের দুঃখ দেখিয়া সুখে থাকিতে

পার, তবে তোমরাই ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যের কণ্টক। পরের দুঃখ নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতেই হইবে; ঈশ্বরকে না পাইয়া যাহারা দুঃখে কাঁদিতেছে, তাহাদিগকে ঈশ্বরের নিকট আনিতেই হইবে। নিজে উপাসনা করিয়া সুখী হইতে পারিলেই হইল এই জন্য তোমরা প্রচারক এবং ব্রাহ্ম হও নাই; কিন্তু ঈশ্বর তাঁহারপ্রেমের দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন, এই জন্য যে তোমরা সন্ন্যাসীর ন্যায় জগতের দুঃখে উদাসীন থাকিতে পারিবে না। একাকী সুখী হইতে পার এ জন্য তিনি তোমাদের অন্তরে সহস্র সুখের কারণ দিয়াছেন; কিন্তু এই একটী দুঃখের কারণ দিয়াছেন যে তোমরা যে অমৃত পান করিতেছ, তাহা যদি জগৎকে পান না করাও, আপনারা সুখী হইতে পারিবে না। ইহাতেই আমরা বুঝিয়াছি, ঈশ্বরের ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম। এই প্রেমই পরসেবার উত্তেজক, প্রেমই ইহার বেতন। জগৎকে ভালবাসিয়া তোমরা জগতের সেবা করিতেছ ইহাতেই তোমাদের পুরস্কার। কেহ কেহ বলেন যাহারা দুষ্ট তাহাদিগকে কিরূপে ভাল বাসিব? এ কথা ভক্তি শাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। স্বর্গের প্রেম এরূপ বিচার করে না। ঈশ্বর হস্ত দিয়াছেন অন্যের চরণ সেবা করিবার জন্য। এই হস্ত দ্বারা যদি একটী ভ্রাতা কিম্বা একটী ভগ্নীর দুঃখ দূর করিতে পারি, তাহাতেই হস্তের সার্থকতা। চক্ষু যদি একবার প্রেম ভরে কোন ভাই কিম্বা ভগ্নীর দুঃখ দেখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করে, তাহাতেই ইহার গৌরব, এবং তাহাতেই ইহার প্রকৃত ব্যবহার। এইরূপে আমাদের যে কোন শক্তি অন্যের দুঃখ দূর করে এবং সুখ বৃদ্ধি করে, তাহাতেই তাহার মহিমা। যদি প্রেম ভাবে পরস্পরের সেবা না করি তবে কি জন্য আমরা সৃষ্ট হইয়াছি? সর্ব্বস্ব দিয়া জগতের সেবা কর; কিন্তু সাবধান মনুষ্যের নিকট পুরস্কার চাহিও না। কেননা, ঐ দেখ তুমি যাহার পদ সেবা করিতে গিয়াছ—সে শাণিত খড়্গ লইয়া তোমাকে ছেদন করিতে উদ্যত; কিন্তু তুমি ভীত হইও না। ঈশ্বরের মহিমার জন্য সহাস্য বদনে প্রাণ দাও। বন্ধু! ব্রাহ্ম! তুমি মনে করিয়াছ জগতের উপকার করিলে তুমি জগতের প্রিয় হইবে, ইহা তোমার দুরাশা। ঐ দেখ তুমি যাহাদের কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছ, তাহারা তীক্ষ্ণ অস্ত্র সকল লইয়া

তোমাকে বিনাশ করিতে উদ্যত। তবে কেন জগতের প্রশংসা কামনা করিবে? সমস্ত জগৎ তোমাকে দূর করিয়া দিবে, তথাপি তুমি তাহাদের সেবা করিবে এই জন্য প্রস্তুত হও। সেবা না করিলে তুমি বাঁচিতে পার না, ঈশ্বরের জন্য তোমার অন্তরে যে প্রেম উত্তেজিত হইয়াছে তাহাতে তোমাকে দাসত্বে নিযুক্ত করিবেই করিবে। সকলের সেবা করিয়া ঘরে আনিবে কি? কেবল এই বিশ্বাস, "আজ ভাই ভগ্নীর সেবা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।" এই বিশ্বাসে যে সুখ এবং যে মূল্য আছে তাহার সঙ্গে পৃথিবীর কোন পুরস্কারেরই তুলনা হয় না। সহস্র যন্ত্রণায় শরীর মন জর্জ্জরিত হইলেও ক্ষতি নাই যদি ঈশ্বর বলেন, "বৎস, আজ তুমি আমার দাসত্ব করিয়াছ।" যদি পিতার আজ্ঞা শুনিয়া গরিব দুঃখীর সেবা করিতে পারি ইহা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্য আর কি আছে?" সমস্ত দিনের মধ্যে যদি একটি ভাই কিম্বা একটী ভগ্নীকেও পিতার দয়াল নাম শুনাইতে পারি তাহাতেই আমার জীবন কৃতার্থ হইবে। নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে বলিব, "জয় দয়াময়, আজ তোমার একটী সন্তানকে তোমার নাম শুনাইয়াছি।" আমি পাতকী হইয়া ঈশ্বরের সন্তানের সেবা করিয়াছি ইহা কি সামান্য গৌরবের কথা? ভাই ভগ্নী ভয়ানক পাপ অপবিত্রতায় পূর্ণ হইলেও আমি যে তাঁহাদের দাসত্ব করিলাম তাহা যে স্বর্গীয় ব্যাপার। তোমরা কি জাননা পৃথিবীতে সময়ে সময়ে এমন সাধু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন যাঁহাদিগকে জগৎ কত নির্য্যাতন করিয়া অবশেষে বধ করিয়াছে? কিন্তু তাঁহারা জগৎকে কি বলিতেন? তাঁহারা বলিতেন, জগদ্বাসীগণ! তোমরা আমাদিগকে মারিতে চাও মার, কিন্তু সেইজন্য আমরা কি তোমাদের সেবা করিব না? ঈশ্বরকে আমরা চাই না; কিন্তু সেইজন্য যদি তিনি আমাদিগকে তাঁহার প্রেম দিতে কুণ্ঠিত হন তবে আমাদের কি গতি হয়? তাঁহার শিষ্য হইলে তিনি যেরূপ আচরণ করেন তাহাই করিতে হইবে। পর-সেবা করিবার জন্য আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি, পরসেবাতেই আমাদের পরিত্রাণ। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমরা চির কাল পরসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া পুণ্য শান্তি লাভ করি!

আচার্য্যের উপদেশ।

ঈশ্বরের সঙ্গে পৃথিবীর যুদ্ধ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার, ১০ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক।

পৃথিবী একটী চিরস্থায়ী রণক্ষেত্র। মনুষ্যের সৃষ্টি অবধি আজ পর্য্যন্ত ক্রমাগত যুদ্ধ চলিতেছে। যুদ্ধের দুইটী স্থান। একটী মনুষ্যের নিজের হৃদয় মধ্যে, অন্যটী সমস্ত জনসমাজ মধ্যে। প্রত্যেক নর নারীর হৃদয় মধ্যে পাপ কুসংস্কারের সঙ্গে সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে। ঈশ্বরের নিকট স্বাধীনতা লাভ করিয়া মনুষ্য তাঁহারই সঙ্গে বারম্বার যুদ্ধ করিল। যুদ্ধে জয় লাভ করিবার জন্য যত প্রকার অস্ত্র এবং যত প্রকার কৌশলের আবশ্যক মনুষ্যসন্তান সেই সমুদয় অস্ত্র নির্ম্মাণ করিল এবং সকল প্রকার কৌশল প্রয়োগ করিল। পুরাতন অস্ত্র ভগ্ন হইল, আবার নূতন অস্ত্র নির্ম্মিত হইল, পুরাতন কৌশল বিফল হইল, নূতন কৌশল অবলম্বিত হইল, এইরূপে অস্ত্রের পর অস্ত্র এবং কৌশলের পর কৌশল নির্ম্মিত এবং আবিষ্কৃত হইল; কিন্তু ঈশ্বরের দুর্জ্জয় বলে মনুষ্যের সমুদয় অস্ত্র এবং সমুদয় কৌশল পরাস্ত হইল, তথাপি মনুষ্য যুদ্ধ হইতে বিরত হইল না। কিসের জন্য মনুষ্য যুদ্ধ আরম্ভ করিল? যে দিন হইতে মনুষ্য স্বাধীন হইয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা লঙ্ঘন করিল সেই দিন হইতেই এই যুদ্ধের আরম্ভ এবং সেই দিন হইতেই তাহার পতন, অধোগতি এবং সর্ব্বনাশ আরম্ভ হইল। মনুষ্য একাকী যখন ঈশ্বরকে সংগ্রামে আনিয়া পরাস্ত করিতে পারিল না, তখন আবার তাহার পাঁচ জন ভাই ভগ্নীকে ডাকিয়া দলবদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিল, পাঁচ জনের বল যখন পরাস্ত

হইল, পঞ্চাশ জনকে ডাকিল, পঞ্চাশ জনও যখন কিছুই করিতে পারিল না, নগরের সকলকে ডাকিল, এবং একটী নগর যখন পরাস্ত হইল চল্লিশটী নগর একত্র হইল; যে কোন মতে হউক, ঈশ্বরকে হারাতেই হইবে। এই জন্যই পৃথিবী এত কাল পাপ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। এমন যে দুর্জ্জয় ঈশ্বর তাঁহাকে পরাস্ত করিতে হইবে এই জন্য বালক, যুবা, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ সকলে মিলিয়া পৃথিবীর এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে, এবং চারিদিকে দাবানলের ন্যায় এই যুদ্ধের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক জীবনে এবং সমস্ত জনসমাজে আমরা এই যুদ্ধের অনল দেখিতেছি। কিন্তু এক দিকে যেমন প্রত্যেক মনুষ্য এবং সমস্ত জনসমাজ দল বদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত, এবং সামাজিক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি আবার যুদ্ধ নিবারণের জন্য স্বর্গ হইতে ঈশ্বর এক দুর্জ্জয় স্রোত প্রেরণ করিতেছেন। পৃথিবীতে যখন যুদ্ধের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, তখনই স্বর্গ হইতে বারিবাণ সকল নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। মনুষ্য সন্তানগণ যখন ঘোর ঘটা করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল তখনই ঈশ্বর তাহাদের হৃদয়ে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিবার জন্য যত অস্ত্র এবং কৌশলের প্রয়োজন, সমুদয় প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। মনুষ্য যদি ঈশ্বর এবং পরস্পরের শত্রু না হইত, স্বর্গরাজ্যের কথা শুনিতাম না, কেননা তাহা হইলে জন্মাবধি সে স্বর্গরাজ্যে থাকিত। ঈশ্বর দেখিলেন, যে মনুষ্য একাকী এবং দল বদ্ধ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিল এই জন্য তিনি এই দুই প্রকার যুদ্ধ নিবারণ করিবার জন্য প্রত্যেক হৃদয়ে এবং প্রতি জনসমাজে প্রবেশ করিলেন। তিনি দেখিলেন কেবল যে এক জন তাঁহার সঙ্গে সংগ্রাম করিতেছে তাহা নহে; কিন্তু সমস্ত জনসমাজ একত্র হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তি এবং সমস্ত জনসমাজ হইতে কুসংস্কার অপবিত্রতা দূর করিবার জন্য ব্যক্তিগত এবং সামাজিক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। যখন সহস্র সহস্র লোক যুদ্ধ করিতেছে তখন এক একটী মনুষ্যকে পরাস্ত করিলে চলিবে না এই জন্য ঈশ্বর যুগে যুগে দেশে দেশে জন সমাজকে জয় করিয়া সত্য এবং পুণ্যকে রাজা করিবার জন্য স্বর্গ হইতে এক এক

জন ক্ষুদ্র সেনাপতির অধীন করিয়া দলে দলে সৈন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক সেনাপতি আপন আপন সৈন্য দল লইয়া নিজ নিজ আলোক এবং ক্ষমতানুসারে জগতের অসত্য পাপ বিনাশ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের অস্ত্রে যেমন কতকগুলি ভ্রম এবং পাপ দূর হইতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি সত্য এবং পুণ্যের বিনাশ হইল। তাহাদের যুদ্ধে পৃথিবীর পাপ অসত্য একেবারে বিনষ্ট হইল না। এই জন্য আর একটী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রয়োজন হইল, ঈশ্বর তাহাদিগকে দুর্ভেদ্য বর্ম্মে আচ্ছাদিত করিয়া এবং তাহাদিগকে দুর্জ্জয় অস্ত্র সকল দিয়া পৃথিবীতে পাঠাইলেন। তাহাদেরও জয় হইল, তাহাদের যত্নে পৃথিবী হইতে আরও কতকগুলি পাপ অসত্য চলিয়া গেল। কিন্তু তাহাদের দ্বারাও সম্যক্‌রূপে সত্যের জয় হইল না, আবার নূতন দলের আবশ্যক হইল, আবার নূতন দল আসিল, এইরূপে যুগে যুগে দেশে দেশে নানাপ্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায় আসিল, এবং অনেক যুদ্ধ হইল। কখনও সত্যের জয়, কখনও সত্যের বিনাশ হইল। মনুষ্যের দ্বারা ঈশ্বর মনুষ্যকে স্বর্গে লইয়া যাইবেন, এই জন্য মনুষ্যেরই হস্তে যুদ্ধের ভার রাখিলেন, সুতরাং মনুষ্যের অপূর্ণতা ও কুটিল অভিসন্ধি দ্বারা স্বর্গের সত্য এবং স্বর্গের পবিত্রতা অনেক সময় অন্ধকার এবং পাপের মধ্যে জড়িত রহিল। আমরা ব্রাহ্ম হইয়া এক স্থলে দণ্ডায়মান থাকিয়া দেখিতেছি, মনুষ্যের সৃষ্টি অবধি পৃথিবীতে যত দল হইয়াছে সমুদয় দল আমাদিগেরই ধর্ম্ম বিস্তার করিবার জন্য যুদ্ধ করিয়াছে। সমুদয় ধর্ম্ম যুদ্ধের নেতা আমাদেরই, সমুদয় ধর্ম্মবীর আমাদিগেরই জন্য পৃথিবীতে তাঁহাদিগের রক্ত দান করিয়া গিয়াছেন। জগতের সমুদয় বিধান আমাদেরই বিধান। কোন শাস্ত্র, কোন একটী ঋষি, কোন একটী সাধু আমাদের বিধানের বহির্ভূত নহে। সকলে আপনার আপনার ধর্ম্ম শাস্ত্র আনিল, ব্রাহ্মসমাজ সকলকেই গ্রহণ করিলেন। পৃথিবীতে সত্যের জয় হইবেই হইবে। যত সত্য প্রচার হইয়াছে, পৃথিবীতে যত ধর্ম্মাত্মা, এবং মহর্ষি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সকলই আমাদের। ঈশ্বর পরায়ণ ভক্তেরা ঈশ্বরের মহিমা এবং প্রেম প্রচার করিবার জন্য যত রক্ত দিয়াছেন, সমুদয় আমাদের মঙ্গল বিধান করিতেছে। যতই দুষ্ট পৃথিবী তাঁহাদিগকে উৎপীড়ন

করিয়াছে, অগ্নিতে তাঁহাদিগকে দগ্ধ করিয়াছে, তীক্ষ্ণ অস্ত্রে তাঁহাদের শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়াছে, তাঁহাদের রক্ত বিন্দু বিন্দু পড়িয়া ততই পৃথিবীকে উর্ব্বরা করিয়াছে। সেই পৃথিবীজাত শস্য ভোগ করিয়া জগৎ ধর্ম্মজীবন লাভ করিতেছে। ঈশ্বরের আজ্ঞাতে সেই রক্ত হইতেই প্রচুর পরিমাণে ফল ফুল বাহির হইতেছে। যুগে যুগে, দেশে দেশে, ধর্ম্ম যুদ্ধে শত সহস্র লোকের রক্তপাত হইল; কিন্তু তাঁহাদের সকলের রক্ত যখন একটী স্রোতের ন্যায় বাহির হইতে লাগিল, তখন সকলের ভিন্ন ভিন্ন রক্ত একই প্রকৃতি হইয়া গেল, তখন আর কেহ এই কথা বলিতে পারিল না অমুক ব্যক্তির এই রক্ত। সেইরূপ জগতের সমুদয় সাধু মহর্ষিরা ঈশ্বরের যত শক্তি যত জ্ঞান যত প্রেম এবং যত পুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন সমুদয় একত্র হইয়া একটী নদীর ন্যায় চলিয়া যাইতেছে। কোন্ সত্য কোন্ মহর্ষি প্রচার করিয়াছেন তাহার চিহ্ন মাত্র নাই। সমুদয় এক হইয়াছে, দুই জনের, কিম্বা সহস্র জনের, সত্য প্রেম এবং পুণ্য সকলই এক হইয়াছে, পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাঁহারা বিভিন্ন ছিলেন, কিন্তু আজ আমরা দেখিতেছি সকলেই এক হইয়াছেন। তাঁহাদের জীবনের সমস্ত বল, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য একত্র হইয়া একটী রক্তের নদীর ন্যায় আমাদের শরীরে প্রবাহিত হইতেছে, প্রত্যেক ব্রাহ্ম সেই রক্তে পরিপুষ্ট হইতেছেন। সেই নদী হইতে এক ফোটা রক্ত লইয়া অনুবীক্ষণ দিয়া দেখ, তাহার মধ্যে জগতের সমুদয় সত্যপরায়ণ সাধুরা সঞ্জীবিত রহিয়াছেন। প্রত্যেক সত্য বিন্দুর মধ্যে সৃষ্টি অবধি এ পর্য্যন্ত যত সাধু মহর্ষি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন সকলেরই জীবন গ্রথিত রহিয়াছে। আমাদের দয়াময় ঈশ্বর সেনাপতি হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রের উপর দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন, এক এক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে তাঁহার যত সাধু পুত্র মরিতেছে সকলের রক্তে সত্যের জয় হইতেছে। তিনি ব্রাহ্ম নহেন, যিনি বলেন অমুক ধর্ম্ম সম্প্রদায়, অমুক বিধান, অমুক শাস্ত্র আমার নহে। পৃথিবী যত সত্য প্রচার করিয়াছে সমুদয় ব্রাহ্মদিগের। আমাদের নিকট, খৃষ্ট, মহম্মদ, বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক ইত্যাদি ৫ জন কিম্বা ১০ জন সাধু নাই; কিন্তু জগতের সকল সাধুই আমাদের চক্ষে এক। আমাদের নিকট সকল বিধান এক বিধান। সকল বিধানের সমুদয় সত্য, এবং সমুদয় সাধুদিগের

সমস্ত রক্ত একত্র হইয়া এক নদী চলিতেছে। কোথায়ও কলহ বিবাদ নাই। যাঁহারা যে পরিমাণে এক ঈশ্বরের শক্তি এবং প্রেম পুণ্য প্রচার করিয়াছেন তাঁহারা সে পরিমাণে আমাদের। এখন প্রেমরাজ্যের সময়, সমুদয় ধর্ম্ম সম্প্রদায় বিনষ্ট হইয়া এখন এক পরিবার হইবার সময়। এখন আর তোমার এই ধর্ম্ম, আমার এই ধর্ম্ম এ সকল বিবাদের কথা আমাদের মুখে শোভা পায় না। একটী সাধু বাক্য এবং একটী সাধু কার্য্যের মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত সাধুদিগের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। কাহাকে আর তবে শত্রু বলিব? ঈশ্বর ব্রাহ্মসমাজের নিকট সেই পুস্তক খুলিয়া দিয়াছেন, যাহাতে পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্র লিখিত রহিয়াছে। সেই পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদে যুদ্ধ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যুদ্ধ, তৃতীয় পরিচ্ছেদে যুদ্ধ, ক্রমাগত যুদ্ধ। বেদ, বাইবেল, কোরাণ, সমুদয়ই যুদ্ধ শাস্ত্র; কিন্তু সমুদয়ই এক শাস্ত্র। বিশ্বাস চক্ষে পাঠ করিয়া দেখ, শাস্ত্রে শাস্ত্রে বিবাদ নাই। ঈশ্বরের বিশ্বাসী এবং প্রেমিক সন্তানগণ কুশল প্রিয়, প্রেম-প্রিয়। প্রেমের জয় হইবেই হইবে। ঈশ্বরের এই পুস্তক এখনও শেষ হয় নাই। ঈশ্বর ইহাতে আরও পরিচ্ছেদ লিখিবেন অনন্তকাল লিখিবেন, কখনও ভাবিও না, ইহার শেষ হইবে। কিন্তু প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমুদয় পরিচ্ছেদের মিলন আছে। প্রত্যেক সত্যের ভিতরে আবার সমুদয় সত্য সম্মিলিত। খৃষ্ট, চৈতন্য ভিন্ন নহে; কিন্তু প্রত্যেক সাধুর মধ্যে কি মুক্তিশাস্ত্রের রীতি, কি বিশ্বাসের রীতি, কি প্রেম, ক্ষমার রীতি, কি ধ্যানের রীতি সমুদয়ের একতা রহিয়াছে। অনুবীক্ষণ দ্বারা দেখ দেখিবে, সমুদয় সাধু এবং সমুদয় ঋষিদিগের নাম প্রত্যেক সত্যের মধ্যে লিখিত রহিয়াছে। সকলেই সেই একই জ্ঞান, একই প্রেম এবং একই পুণ্য পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। যে সাধু কিম্বা যে সৈন্যের প্রতি দৃষ্টিপাৎ করি দেখি সকলেই আমাদের। সকলেই আমাদের পথ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক বিধান আমাদের বিধানের সহায়তা করিতেছে। কি আশ্চর্য্য ব্রাহ্মসমাজের বিধান!! আমরা পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম্মনেতাদিগকে বলিতে পারি তোমরা আমাদেরই, কেন না তোমরা আমাদেরই পিতার কার্য্য করিয়াছ; আমাদেরই পিতার সত্য প্রচার করিয়া তোমরা ধন্য হইয়াছ।

হে ঈশ্বর! কি আশ্চর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্র তুমি আমাদের চক্ষের কাছে ধরিয়াছ, কিন্তু হতভাগ্য আমরা, ভাল করিয়া তোমার শাস্ত্র পড়িলাম না। জানি না যে আমাদের ধর্ম্ম সমস্ত পৃথিবীর ধর্ম্ম, তাই মনে করি আমরা মরিলে, বুঝি আমাদের ধর্ম্মের চিহ্ন মাত্র থাকিবে না। তুমি সৃষ্টির আরম্ভ হইতে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিতেছ ইহা ভাবিলে যে হৃদয় প্রশস্ত হয়। প্রেমসিন্ধু! দেখিলাম তোমার বলে সমুদয় ধর্ম্মের মীমাংসা হইল, বিবাদ রহিল না, সমুদয় সত্যের মিলন হইল। তোমার সমুদয় সাধুদিগকে যেন হৃদয়ের ভিতরে স্থান দিতে পারি। তুমি যে দয়াময়! আমাদিগকে প্রেমমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছ।

হে প্রেমময় ঈশ্বর! সমুদয় বিধান হাতে লইয়া তুমি আমাদের কাছে আসিয়াছ। তুমি অনন্ত কালের দেবতা। তোমার পদতলে একটী ধর্ম্ম গ্রন্থ নহে; কিন্তু শত শত গ্রন্থ রহিয়াছে। তোমার সমুদয় সাধু সন্তানদিগকে সঙ্গে লইয়া তুমি আসিয়াছ, সকলই আমাদের জন্য করিয়াছ। কৃপাসিন্ধু! তুমি জগতের রাজা হইয়া আমাদের প্রতি বিশেষ দয়া করিতেছ। কেমন করিয়া তোমার দয়া ভুলিব? এত বড় ধর্ম্মশাস্ত্র তুমি আমাদের কাছে ধরিলে। দেশ বিদেশের এবং সকল সময়ের সাধু আত্মাদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া তোমার পূজা করিব। পৃথিবীর সমুদয় সাধুদিগকে আমাদের হৃদয়ে আসিতে দাও। সকলকে এই বর্ত্তমান বিধানের অনুকূল কর।

আচার্য্যের উপদেশ।

ঈশ্বর প্রভু।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার, ২৪শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক।

ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রথমে আমাদের তনয়ত্ব উপলব্ধি করি এবং সেই প্রকারে তাঁহার সঙ্গে আমাদের পিতা পুত্রের যোগ নিবদ্ধ করি, ইহা অপেক্ষা উন্নত অবস্থায় তাঁহার সঙ্গে আমাদের প্রভু দাসের সম্পর্ক অনুভব করি এবং তখন আমরা তাঁহার দাসত্ব গ্রহণ করি। তনয়ত্বের অনিবার্য্য ফল দাসত্ব। একবার তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকিলে তাহার পরে মনের প্রস্ফুটিত অবস্থায় তাঁহাকে প্রভু বলিতেই হইবে। পিতা বলিয়া ঈশ্বরের প্রতি যতই ভক্তি বৃদ্ধি হইবে, ততই স্বভাবতঃ তাঁহার সেবা করিতে ইচ্ছা হইবে এবং ততই আপনাকে ঈশ্বরের দাস বলিয়া স্বীকার করিয়া আত্মা কৃতার্থ হইবে। যেমন ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া ভাল বাসিব, তেমনই তাঁহাকে প্রভু বলিয়া তাঁহার সেবা করিব। ভক্তিভাব প্রস্ফুটিত হইলে স্বভাবতঃই সেবার ভাব স্ফূর্ত্তি পায়। একটী বিকসিত হইলেই অন্যটী আপনা আপনি উদিত হয়, কেননা এই দুটী ভাব মনুষ্যস্বভাবে একত্র রহিয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ মনুষ্য ঈশ্বরকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করিলে পাছে নিজের প্রভুত্ব সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিতে হয় অথবা পাছে বিষয় সুখ ছাড়িতে হয়, এই জন্য পুত্রের সম্বন্ধ এবং দাসের সম্বন্ধ এক সময়ে প্রকাশ হইতে দেয় না। তাহারা ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরের কন্যা বলিয়া সেই সম্বন্ধের মিষ্টতা আস্বাদ করে; কিন্তু তাঁহার দাস দাসী হইলে আপনার সুখ বিসর্জ্জন দিতে হয়, এই ভয়ে ইহা কঠিন ব্রত মনে করিয়া তাহারা ঈশ্ব-

রের দাসত্ব গ্রহণ করে না। আবার চিরক্রীত দাস দাসী হওয়া তাহাদের পক্ষে আরও কঠিন। কিন্তু দাস্য ভাবটী যখনই অঙ্কুরিত হয়, তখনই স্বভাবতঃ মনুষ্যের মনে ঈশ্বরের চিরক্রীত দাস দাসী হইতে ইচ্ছা হয়। যখন ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া তাঁহার পিতৃস্নেহের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইলাম, তখনই ইচ্ছা হইল চিরদিন শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত ঐ চরণ সেবা করিব। এমন দয়াল প্রভু যিনি দুদিন তাঁহার সেবা করিয়া কিরূপে বিরত হইব? তাঁহার সেবা করিতে করিতে মনে এই বাসনা হয় যে চিরদিন ঐ পদসেবা করা হস্তের ভূষণ হউক। এই সত্য শিখাইবার জন্য গুরুর প্রয়োজন নাই। স্বভাবের স্রোতে যে ভাসিতেছে, যে আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করে, সে যথা সময়ে আপনাকে ঈশ্বর-দাস, এবং ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করে, সে যথা সময়ে আপনাকে ঈশ্বরের চির ক্রীত দাস বলিয়া বিশ্বাস করিবেই করিবে। ঈশ্বর নিজে গুরু হইয়া তাঁহার সাধককে এইরূপ উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপান আরোহণ করিতে শিক্ষা দেন। এইরূপে যখন কোন ব্যক্তি চিরকালের জন্য আপনার স্বাধীনতা বিক্রী করিয়া ঈশ্বরের ক্রীত দাস দাসী হয়, তখনই দেখিতে পাই তিনি চিহ্নিত হন। কে ঈশ্বরের চিহ্নিত? যিনি বিবেকের আজ্ঞানুসারে জগতের জন্য জীবন ধারণ করিবেন বলিয়া আপনার স্বাধীনতা এবং সর্ব্বস্ব ঈশ্বরকে সমর্পণ করেন। ঈশ্বরের ক্রীত দাস দাসী হওয়ার নামই ঈশ্বরের চিহ্নিত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সমস্ত জীবন ঈশ্বরের কার্য্যে ব্রতী হয় তত ক্ষণ আমরা চিহ্ন দেখিতে পাই না। ঈশ্বর যে দিকে লইয়া যান, অনন্তকাল সেই দিকে যাইব, যাঁহার অন্তর এতদূর প্রস্তুত হইয়াছে, তিনিই কেবল স্বভাব কর্ত্তৃক সেই চিহ্ন পাইয়াছেন। যিনি স্বর্গীয় প্রভুর নিয়োগ পত্র পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন আমার প্রতি তাঁহার এই আজ্ঞা প্রচার হইয়াছে, আজ হইতে আমি অমুক কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম, আমার আর অন্য কার্য্য নাই, অন্য ব্রত নাই, তিনিই কেবল চিহ্নিত। রাজার আজ্ঞা জীবনে পরিণত করা প্রজার মহোচ্চ অধিকার। ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন না করিয়া কেবল তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকিলে কেহই তাঁহার নিয়োগ পত্র এবং সেই চির ক্রীত দাস দাসীর চিহ্ন পাইতে পারে না।

আমরা সকলেই তাঁহার সেই নিয়োগ পত্র পাইবার অধিকারী। আমরা কাহারা? প্রত্যেক মনুষ্য। কেননা ঈশ্বরের প্রত্যেক সন্তান, যথা সময়ে সেই উন্নত অবস্থা লাভ করিবেন যখন ঈশ্বর সাক্ষাৎ প্রভু হইয়া তাঁহার প্রত্যেক পুত্র কন্যাকে এক একটী বিশেষ কার্য্যের নিয়োগ পত্র দিয়া তাঁহার দাস দাসী বলিয়া "চিহ্নিত" করিয়া লইবেন। এই অবস্থায় না আসিলে পরিত্রাণের সহস্র ব্যাঘাত। নিয়োগপত্র লাভ করিয়া যিনি দাস অথবা দাসী হইলেন তাঁহার সম্বন্ধে যে ঈশ্বর কেবল প্রভু হইলেন তাহা নহে; কিন্তু তিনি গুরু হইলেন। যিনি নিয়োগ পত্র দিলেন তিনিই কিরূপে সেই নিয়োগ পত্র অনুসারে জীবনের বিশেষ ব্রত সাধন করিতে হইবে গুরু হইয়া সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহার উৎকৃষ্ট প্রণালী সকল শিখা-ইতে লাগিলেন। প্রভু পরমেশ্বরের কার্য্য সাধন ভিন্ন কখনও যথার্থ পরিত্রাণ নাই। শরীর মন যদি আলস্য সাগরে নিমগ্ন থাকে, তাহা হইলে আর পরিত্রাণ কোথায়? প্রাতঃকালে উঠিয়া যদি অন্ধকার দেখি, আজ কি করিব, ইহা যদি না জানিতে পারি, তবে আমাদের আর গতি মুক্তি কোথায়? আমি কি করিব? যখন এই সংশয় আসে কে আমাকে তাহা হইতে উদ্ধার করিবে? যখন ব্যাকুল মন জিজ্ঞাসা করে, এখন আমি কি করি, তখন পৃথিবীর গুরু, আচার্য্য, উপাচার্য্য সকলেই নিস্তব্ধ। সন্দিগ্ধ, দুর্ব্বল, অবিশ্বাসী মন, ঈশ্বরের আলোক দেখিল না। পৃথিবীর মনুষ্য গুরু, তুমি তাহাকে বলিলে, অমুক স্থানে প্রচার করিতে যাও; কিন্তু কি ভাবে কাহাদের কাছে প্রচার করিবে সেই ভাবী প্রচারক তাহা জানে না। পৃথিবীর গুরুরা দাম্ভিক হইয়া অনেক সময় উপায় সকলও দেখা-ইয়া দেয়; কিন্তু তাহাতে শিষ্যের অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল হয় না। এই জন্য ঈশ্বর স্বয়ং গুরু হইয়া দাস দাসীরা কিরূপে তাঁহার কার্য্য সাধন করিবে তাহার প্রণালী সকলও বলিয়া দিবার জন্য সর্ব্বদা তাহাদের সঙ্গে রহি-য়াছেন। প্রভুর সাহায্য ভিন্ন একাকী দাস দাসীরা তাঁহার কার্য্য করিতে পারে না, পদে পদে তাহাদের প্রভুর আদেশ এবং উপদেশের প্রয়োজন হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রের একটী টীকা বুঝিতে না পারিলে সেই বিশ্ব গুরুর নিকট তাহা বুঝাইয়া লইতে হয়। প্রভু দাস দাসীদিগকে আজ্ঞা করিলেন,

"তোমরা ঐ সুন্দর প্রেমঘরে যাও।" কিন্তু কেবল ঘরে যাইতে বলিলে হইবে না, পথ দেখাইতে হইবে, কেবল পথ দেখাইলেও হইবে না, বল দিতে হইবে। এইরূপে প্রভুর সহায়তা ভিন্ন দাস দাসীরা এক মুহূর্ত্ত জীবন পথে চলিতে পারে না। সন্তান সময়ে সময়ে দূরে থাকিতে পারে; কিন্তু দাস প্রভুকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। দাস শিষ্য হইয়া দিন দিন জ্ঞান লাভ করিতে থাকে। পুত্র দাস হইলেন, দাস শিষ্য হইলেন, শিষ্য আবার শাস্ত্রী হইলেন। পাছে কোন বিষয়ে ভ্রান্তি হয় এই জন্য ঈশ্বর ভক্তসন্তানের, ভক্তদাসের, ভক্তশিষ্যের হৃদয়াকাশে জ্ঞান সূর্য্যকে উদিতহইতে বলিলেন। এইরূপে সাধক তাঁরার কৃপাতে জ্ঞান, প্রেম ভক্তি, এবং পুণ্য আনন্দে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শিষ্য গুরুর নিকটে যাহা লাভ করিলেন, তাহা তাঁহার চির জীবনের সম্পত্তি হইল। যত দিন পৃথিবীতে বাঁচিবেন তত দিন তাঁহার এই শাস্ত্র। পৃথিবী হইতে চলিয়া যাওয়া তখনই শ্রেয় হইবে যখন তাঁহার কার্য্য সমাপ্ত হইবে। ক্রীত দাসেরা এইরূপে চিহ্নিত হইয়া চির জীবন সেই চিহ্নিত কার্য্য করেন। এই কয় জন চিহ্নিত হইলেন বলিয়া জগতের হিংসা অথবা দুঃখ হইবে না, কেন না জগতের অবশিষ্ট লোককেও সাধন দ্বারা এই অবস্থায় আসিতে হইবে। সকলকেই যে এক সময়ে চিহ্নিত হইতে হইবে তাহা নহে। চিহ্নিত হইয়াছ কি না, নিয়োগ পত্র পাইয়াছ কি না, তাহা অন্যকে বলিয়া দিতে হয় না। চিহ্নিত কার্য্য না করিলে বাঁচিতে পার না এই ব্যাকুলতাই তাহার প্রমাণ। যখনই ভক্ত দাস্য মুক্তি লইলেন তৎক্ষণাৎ তাঁহার উপরে জগতের অধিকার হইল। যিনি ঈশ্বরের দাস হইলেন তিনি জগতের ভৃত্য হইলেন। কিন্তু কেবল চিহ্নিত হইলেই যে পরিত্রাণের অধিকারী অথবা পরিত্রাণ হইল তাহা নহে, চিহ্নিত শব্দের অর্থ এই যে চির জীবনের জন্য এমন একটী বিশেষ কার্য্যভার হইল, যাহা ছাড়িয়া পলায়ন করিবার আর পথ নাই। চন্দ্র সূর্য্যও যদি ভূতলে পতিত হয় তথাপি চিহ্নিত ব্যক্তি পলায়ন করিতে পারে না। চিহ্নিত হইলেই যে মনুষ্য নিষ্পাপ এবং নিষ্কলঙ্ক হইল তাহা নহে। উপধর্ম্মের লোকেরা ইহা মানিতে পারে, ব্রাহ্মেরা ইহা স্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু পরিত্রাণ দিবার

জন্যই ঈশ্বর তাঁহার দাস দাসীদিগকে এক একটী বিশেষ বিশেষ কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। সেই কার্য্য সাধনেই মনুষ্যের পরিত্রাণ। তাঁহার বিশেষ বিধানে, আবার এক ব্যক্তি কদাচ অন্য ব্যক্তির কার্য্য করিয়া পরিত্রাণ পাইতে পারে না। শরীর সম্পর্কে যেমন কর্ণ দেখে না, চক্ষু শুনে না; কিন্তু প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করে, সেই রূপ ঈশ্বরের বিধানের অনুগত লোকদিগের মধ্যেও প্রত্যেকে এক একটী বিশেষ বিশেষ কার্য্য সাধন করে। সে কার্য্য যদি এক দিন কেহ না করে, তাহার মুক্তির দ্বার অবরুদ্ধ হয় এবং সেই ব্রত ছাড়িলেই তাহার জীবনের শেষ হইয়া গেল। যে ব্যক্তি বুঝিতে পারে বিদ্যালয় স্থাপন করা আমার জীবনের বিশেষ কার্য্য, যেহেতু জ্ঞান বিস্তার দ্বারা ধর্ম্ম বিস্তার হয় এবং ধর্ম্ম বিস্তার দ্বারা কল্যাণ বিস্তার হয়, তাহার পরিত্রাণ হইত না ঈশ্বর যদি তাহাকে সেই ব্রত পালন করিতে আদেশ না করিতেন। কাহার আত্মার কি বিশেষ প্রকৃতি মনুষ্য তাহা জানে না; কিন্তু আত্মার স্রষ্টা ঈশ্বর তাঁহার সূক্ষ্ম চক্ষুতে সকলের স্বভাব বুঝিয়া প্রত্যেককে তাহার উপযুক্ত কার্য্যভার অর্পণ করেন। ঈশ্বর আমাদের হস্তে কি ঔষধ বিতরণ অথবা কি জ্ঞান, কি প্রেম, কি ধর্ম্ম, কি কুশল বিস্তার যে কোন কার্য্য ভার দেন, তাহাতেই আমাদের পরিত্রাণ। কে বলিল কার্য্যের মহত্ত্ব নাই? তবে ঈশ্বরের চিরক্রীত দাস দাসীদিগকে কেহই অন্ধ যন্ত্র বলিও না। চিহ্নিত ব্যক্তিরা যদি বিশ্বস্ত ভাবে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করে, নিশ্চয়ই সেই সেই কার্য্যে তাহাদের পরিত্রাণ হইবে। অতএব যদি পরিত্রাণ চাও, তবে চিহ্নিত হও। কিন্তু মনে করিও না যে ব্যক্তি চিহ্নিত হয় নাই সে চিরকাল পরিত্রাণ হইতে বঞ্চিত থাকিবে, অথবা যাহারা চিহ্নিত হইয়াছে তাহারাই পৃথিবীর মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ লোক। চিহ্নিত ব্যক্তির নিজের কোন গৌরব নাই। দুঃখ পাপ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ঈশ্বর এক একটী ব্রত দিয়া যাহাদিগকে চিহ্ন দিয়াছেন, তাহাদের আবার নিজের প্রশংসা কি? প্রচারক, আচার্য্য, উপাচার্য্য এ সকল নাম যাঁহারা লন নাই তাঁহারা অচিহ্নিত এই ভয়ানক মিথ্যা দ্বারা যেন ব্রাহ্মসমাজ কলঙ্কিত না হয়। সকল দেশে এবং সকল যুগে

ঈশ্বরের আদেশ শুনিয়া যাঁহারা ঈশ্বরের কার্য্য করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই চিহ্নিত। ইদানীং দেশ বিদেশে যত গুলি ব্রাহ্ম ঈশ্বরকে প্রভু বলিয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতেছেন তাঁহারা সকলেই চিহ্নিত, যদিও তাঁহারা এখন পরস্পরের নিকট প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন; কিন্তু সময় আসিবে, যখন তাঁহারা পরস্পরকে চিনিয়া লইবেন। ঈশ্বর পৃথিবী, ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ বঙ্গ দেশের কল্যাণের জন্য যত গুলি লোককে তাঁহার ঘর নির্ম্মাণ করিবার জন্য বাছিয়া লইয়াছেন, যুবা হউন, বৃদ্ধ হউন, ধনী হউন, গরিব, হউন, জ্ঞানী হউন মূর্খ হউন, যুবতী হউন, বৃদ্ধা হউন, তাঁহাদের প্রত্যেক ব্যক্তি অট্টালিকার চিহ্নিত ইষ্টকের ন্যায় "চিহ্নিত"। আমরা চিরকাল ঈশ্বরের ক্রীত দাস। আমাদের ব্রত ভঙ্গেই মৃত্যু। আমরা মরিব না, কেন না ঈশ্বর আমাদের চিরকালের প্রভু। ঈশ্বরের দাসত্ব করিলেই আমাদের পরিত্রাণ। ঈশ্বরের চিহ্নিত দাস দাসী হইয়া যখন তোমরা তাঁহার কার্য্য করিবে তখন জগৎ তোমাদিগকে নমস্কার করিবে। তখন ঘরে ঘরে তোমাদের আদর হইবে, এবং সুখ আনন্দ তোমাদের হৃদয়ে ধরিবে না।

হে প্রেমময় প্রভু! বড় ইচ্ছা হয় চিরকাল তোমার দাস হইয়া থাকি। তোমাকে পিতা বলিয়া ডাকিয়াছি। সেই পিতা তুমি এখন প্রভু হইয়া দাঁড়াইয়াছ। ইচ্ছা হয় এই অসাধু জীবন তোমার চরণে উৎসর্গ করিয়া নিশ্চিন্ত হই। এই শরীর কোন্ দিন ভস্ম হইবে জানি না। যদি মৃত্যুর দিন বুঝিতে পারি প্রাণ দিয়া তোমার সেবা করিয়াছিলাম, হাসিতে হাসিতে পরলোকে চলিয়া যাইব। অবশিষ্ট জীবন আর কোন্ প্রভুর দাসত্বে নিক্ষেপ করিব? আমরা যে ব্রাহ্ম নাম ধরিয়া জগতের কাছে অহঙ্কার করিয়া বেড়াই; কিন্তু কেমন করিয়া আমরা আমাদিগকে ব্রাহ্ম বলিব যখন জানি নাই কি কার্য্য করিতে আমরা পৃথিবীতে আসিয়াছি। স্ত্রী পুত্রদিগকে খাওয়াই, কখনও কখনও একটু একটু পরোপকার করি এই জন্য কি আমরা পৃথিবীতে আসিয়াছি? কি জন্য পৃথিবীতে আসিল, দাস দাসীরা জানিল না। কি কার্য্য করিলে আমাদের পরিত্রাণ হয় বলিয়া দাও। যখন পৃথিবীতে আনিয়া দিয়াছ তখন অবশ্যই আমাদের জন্য কোন কার্য্য

স্থির করিয়া রাখিয়াছ। যদি কোন কায না দিবে তবে কেন বাঁচিয়া আছি? তোমার কায করি না অথচ তোমার কাছে ধন ধান্য লই। প্রভু! তাই কাতর প্রাণে নিজের জন্য এবং সমুদয় ভাই ভগ্নীদের জন্য প্রার্থনা করি এক একটী কায সকলের হাতে দাও। নিয়োগপত্র দিয়া সকলকে চিহ্নিত করিয়া লও। ধন্য দয়াময় প্রভু, ধন্য দয়াময় প্রভু বলিয়া, তোমার নাম কীর্ত্তন করিয়া জীবনকে সার্থক করি এই আশীর্ব্বাদ কর। প্রেমময় পিতা বলিয়া প্রেম অনুরাগ যোগে তোমার সঙ্গে বদ্ধ থাকিব, আবার প্রভু বলিয়া, তোমার কার্য্য শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া সমস্ত দিন তোমার মিষ্ট আদেশ শুনিব। এইরূপে তোমার সঙ্গে দুই যোগে আবদ্ধ হইয়া পরিত্রাণ পাইব। তোমার শ্রীচরণ বুকে বাঁধিয়া পিতা বলিয়া ডেকে তোমার তনয়ত্বের মধুরতা আস্বাদ করিব, আবার তোমাকে প্রভু বলিয়া ডেকে তোমার শ্রীমুখের কথা কার্য্যে পরিণত করিয়া দাস দাসী হইয়া সকলে তোমার স্বর্গে থাকিয়া সুখী হইব, এই আশা করিয়া সকল ভাই ভগ্নী মিলে ভক্তির সহিত তোমার ঐ চরণে বার বার প্রণাম করি।

আচার্য্যের প্রার্থনা।

[প্রগাঢ় মত্ততা]

শুক্রবার ২রা আশ্বিন, ১৭৯৭ শক।

দাতা! প্রেমময়, করুণাময় দাতা! কত লোককে কত দিতেছ, গরিব কাঙ্গালদিগকে মুক্তিরত্ন কবে দিবে? হে দাতা! তোমার দানের উপরই একমাত্র নির্ভর, আর উপায় নাই। দাতা হয়ে দান করিতেছ, না তুমি অমৃতরস বিক্রয় করিতেছ? হে দয়াময় পরমেশ্বর! তোমারত খুব ভালবাসা আঁছে শুনিয়াছি। এই যে তোমার কাছে এত পাওয়া যাইতেছে ইহা দান না বিক্রয়? ঐ পাত্রটিতে কি? ঐ আলমারির উপর কি? যেটা দিলে এটা খুব মিষ্ট; কিন্তু দেখ দয়াবান্ ঈশ্বর! এটা থাকে না যে। খুব ঝোঁক, একেবারে দিন রাত নেশা, ভক্তের ভাষা জান তুমি, অবিচ্ছেদে প্রমত্ততা সাধুভাষায় যাকে বলে, এটা খেলে যে তাহা হয় না। এটাও খুব ভাল সামগ্রী। কিন্তু খুব নেশা, মত্ত অবস্থা যে ইহাতে হয় না। অনেক ভাল সামগ্রী এ আলমারিটা থেকে খাওয়ালে; কিন্তু আজও তেমন মাতালত হলেম না, যখন খুব রাত্রে চৌকিদার এসে লাথি মার্‌ছে, আর ধমক্ দিয়া বল্‌ছে, কে তুই চলে যা। আমি বল্‌ছি, আমি মাতাল, না আমি যাব না। লাথি মার্‌ছে, ধম্‌কাচ্ছে, গালাগালি দিচ্ছে, আমি বসেই আছি, কেবলই হাস্‌ছি। সংসার লাথি মারে, আমি বল্‌ছি ঐ লাথি খুব মিষ্ট। আমাদের ভিতর কেহই তেমন হয় নাই। তবে ঐ আলমারিটা খুলে আরও ভাল জীনিস্ দিলে না কেন? এ তোমার কেমন বিচার, যারা তোমাকে পয়সা দেয় তাদের তুমি এ আলমারির জীনিস্ দাও না। তাই তুমি আমাদের বল্‌ছ, পয়সা দিয়েছিস্ কেন? চৈতন্য প্রভুকে যে জীনিস খাওয়ালে তাহা কেন আমা-

দের খাওয়ালে না? বড় বড় মহর্ষি, ঈশা প্রভৃতি যাহা খেতেন, সেই জীনিসটী আমাদের দেও নাই কেন? সেই ভাল জীনিসের এক বিন্দু দেও, তাই একটু খেয়ে খুব মজে যাই। চতুর খুব তুমি। চাইলে যে ফিরায়ে দেবে তা নয়, দেবে তুমি; কিন্তু তোমার দোকানে যে অনেক রকম জীনিস আছে। ঐ মহর্ষি গুলকে এমন কি জীনিস খাওয়াইয়া দিতে যে তোমার দোকানে পড়েই থাক্‌তেন। আমরা তাহা পারি না, কেন না তুমি বল্‌ছ যে আমরা তোমাকে পয়সা দিই। তাঁরা দাম দিতেন না, ফাঁকি দিয়া খেতেন। দোকান্‌দার! তোমার বিচার মন্দ নয়, পয়সা না দেওয়াটা গুণ হল। যে পয়সা দিলে না, ভাল ভাল জীনিসটা তাকে দিলে। চেন কি না, অনেক দিন ব্যবসা কর্‌ছো, চেহারাটা দেখেই বুঝ্‌তে পার কে পয়সা আনে নাই, যখনই দেখ কেহ গরিব হয়ে এসেছে অম্নি ওদিক নিয়ে গিয়ে ভাল জীনিসটা খাওয়াও। ঐ যে আমরা মনে করি, আমরা সাধন করি, গান করি, আরাধনা করি, উপাসনা করি, এই পয়সাই আমাদের সর্ব্বনাশ করে। কিন্তু এখন, এ আমাদের পক্ষে লাক টাকা। কার বাপের সাধ্য এত খায়। কিন্তু লোভটা না কি বড় তাই তোমার কাছে ঐ আলমারিটার জীনিস চাচ্ছি। এ যা দিচ্ছ দাও, তোমার আরাধনাতে কি মজা; কিন্তু তবু যেন দাম দিয়েছি। সে সব পয়সাগুলি ফিরায়ে দাও না। দূর হও পাগল! ফিরায়ে দেব কি? না দিলে হত ভাল। আচ্ছা না দেওয়াটা কি? দয়ার সাগর! এটী শিখায়ে দাও না? সেই ভক্তেরা দাম না দিয়ে কেমন করে ঐ জীনিস খেতেন, তাঁরা নাই, কে আমাদের শেখাবে? তুমি শেখাও না। এই নেও, তোমার যাহা কিছু নেও, আবার নেও, এই দেওয়া রোগ গেল না। কোন মতেই আপনাকে নিঃসম্বল মনে করা হইল না। তুমিত বল্‌ছ, তোর কেন পয়সার রোগ, তোর কি আছে? খুব লজ্জিত কর্ত্তে পার। সব বুদ্ধির ঝক্‌মারি হল। আমি কি হাঁ কব্‌ব? না এখন দিবে না? আমি কাঙ্গাল হয়ে আস্‌ব একবার? তুমি কাঙ্গাল করে নিও। এই রকম উপাসনা দিন কতক চালাও। ইহাতে কি হব জান। চির প্রমত্ত হব। সব ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য ঘুচাইয়া দাও। শুদ্ধ কর, শান্ত কর। তোমার শ্রীচরণে এই গভীর প্রার্থনা। হে দীনবন্ধু

পরমেশ্বর! কি দিয়ে দাও। আজ যদি না দাও, কবে দিবে বলে দাও। আমরাত প্রভেদ বুঝিতে পারিলাম। ঐ ভাল জীনিসটা কি একবার আলমারি থেকে বাহির করে দিবে না? এখনওত সুরা পান করাও; কিন্তু নেশা ভেঙ্গে যায় কেন? আর কি এ নেশায় মানে? একেবারে যে খুব নেশার জন্য, ব্যাকুল হয়েছি তাহা নহে। ব্যাকুলতা কৈ? বুদ্ধির বোঝাই বল আর যাই বল, ও দোকানদার, এর চেয়ে ভাল একটা জীনিস, এর চেয়ে উচ্চ নম্বরের একটা কিছু না দিলে এ নেশা ছুটবে। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, যে এমন করে সুরা পান করে, সে কি সোজা হইয়া সটান্ চলিয়া যেতে পারে। আধ হাত চলতে পারে না, আর গোলদীঘি পর্য্যন্ত চলে যেতে পারে? ভদ্রতা. সভ্যতা সব বজায় রাখছি আর চলছি, এতে কি হয়? ভক্তদেরত কিন্তু এরকম ছিল না। কথা জেয়াদা বলছি কি? কাযে হবে কি? না হয় দুট পাঁচটাকেও ঘরে নিয়ে খাওয়াও না। ও জীনিসটার ধর্ম্মই এম্নি দেখলে আর সকলের হয়। যদি নাই দিবে ভাল জীনিস নিয়ে এলে কেন? এক পয়সা থেকে একশ টাকার পর্য্যন্ত জীনিস আছে। তোমার দোকানে ঢের জীনিস আছে। সকল উপ-সনাইত এক রকম নয়। এ দোকানটা ছাড়ব না। এখন ভাল জীনিস নাই দিলে, দেবেত এক সময়। এত ছোট দোকান নয়, দিন রাত্র কার্ব্বার চলছে। ভয় কি ভাব না কি? এক সময় খাইয়ে দিয়ে খুব মত্ত করো। গাটা অম্নি শুদ্ধ হবে, শুদ্ধতাতে মত্ত, পুণ্যেতে মত্ত, ভাল হচ্ছি বলে মত্ত হব। হে দয়াল! বহুকালের পাতকীদিগের মস্তকের উপর চরণ স্থাপন কর। মত্ত হব আর মত্ত করিব, মাতিব, আর মাতাইব, এই আশা করে তোমার শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি।—"আমরা সবাই প্রেম রসে মগ্ন হয়ে থাকব সদাই।" "প্রেম সাগরে রাখহে আমায়, দিবানিশি ডুবাইয়ে।"

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা।

১০ই মাঘ রবিবার, ১৭৯২ শক।

হিমালয় হইতে উচ্চ পদার্থ কি আছে? মহাসাগর হইতে গভীর পদার্থ কিআছে? যদি এই প্রশ্ন কেহ জিজ্ঞাসা করে, উহার উত্তর এই, ব্রাহ্মধর্ম্ম। হিমালয় হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম উচ্চতর, মহাসাগর হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম গভীরতর। সকল উচ্চতা ও গভীরতার পরিমাণ করা যায়, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের সীমা কোথায়? কোন্ হৃদয় এই ধর্ম্মকে আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছে? কে ইহার পূর্ণতা বুঝিয়াছে? কোথায় ইহার সম্যক সাধন হইয়াছে? আজ ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা এই মহানগরে কেমন উজ্জ্বল রূপে প্রকাশিত হইল! আজ চক্ষে যাহা দেখিলাম তাহা হৃদয়ে ধারণ করা যায় না; কিন্তু ইহা অপেক্ষা ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা আরও কত অধিক আমরা ভবিষ্যতে দেখিব। যে উৎসব দেখিলাম তাহাতে ভক্ত মাত্রেরই চক্ষুঃ শ্রান্ত ও মন পরাস্ত হইল, ইহা অপেক্ষা আর ও কত আনন্দ ও উৎসাহের উৎসব ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে নিহিত আছে যাহা একদিন জগৎকে মাতাইবে। তখন ঘরে ঘরে, গ্রামে গ্রামে দেশে দেশে সত্যের নিশান উড্ডীয়মান হইবে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবে। আহা! ব্রাহ্মধর্ম্মের কেমন স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য! এমন কোমলতা, এমন মধুরতা, এমন হৃদয় প্রফুল্লকর প্রেমের ব্যাপার আর কোথা ও আমরা দেখি নাই! ঈশ্বর স্বহস্তে ইহা রচনা করিয়াছেন, মনুষ্যের সাধ্য কি যে ইহার একটী বিন্দুও রচনা করে? ইহার একটী সত্যের মূল্য বুঝিয়া উঠা ভার, একটী ভাবের গভীরতা কেহ পরিমাণ

করিতে পারে না। যতই ইহার মধ্যে প্রবেশ করা যায় ততই ইহার অমৃত রস আস্বাদন করিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। এই ধর্ম্মের প্রত্যেক অক্ষর যে ঈশ্বর স্বহস্তে রচনা করিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এমন সুন্দর ধন তিনি কাহার হস্তে দিলেন? যাহারা জ্ঞানহীন, দুর্ব্বল দীন হীন ঘৃণিত তাহাদেরই হস্তে তিনি স্বহস্তে এই অমূল্য ধন অর্পণ করিলেন। আমরা এ দানের নিতান্ত অনুপযুক্ত। এক দিকে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মহিমা ও তাহার মধ্যে ঈশ্বরের করুণার অসীমতা, আর এক দিকে আমাদের অশেষ অনুপযুক্ততা। এই জন্যই বলি দয়াময় নামের প্রভাবে জগৎ বিকম্পিত হইবে। মনে করিয়া দেখ আমরা জঘন্য হইয়া কোথায় পড়িয়াছিলাম, কোন পাপকূপে ডুবিয়া ছিলাম, কোথা হইতে ঈশ্বর আমাদিগকে উদ্ধার করিলেন। চন্দ্র সূর্য্যের যিনি নিয়ন্তা, ব্রহ্মাণ্ডের যিনি অধিপতি তিনি আমাদের বিপদের সংবাদ পাইবামাত্র নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং এই অস্পৃশ্য অধার্ম্মিক দিগকে স্বহস্তে রক্ষা করিলেন। ইহার সাক্ষী ব্রাহ্মধর্ম্ম। আশ্রয় বিনা সে অবস্থায় আমরা নিশ্চয়ই মরিতাম; কিন্তু দয়াময়ের মঙ্গল হস্ত যথাসময়ে প্রসারিত হইল এবং পাপিতাপিদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মের অমৃত পান করাইয়া মৃত্যুর মুখ হইতে রক্ষা করিল। তিনি বলিলেন পাপী মরিবে না, মৃত্যু ভয়ে পলায়ন করিল, ব্রহ্মাশ্রিত সন্তানদিগকে স্পর্শ করিতেও সাহস করিলনা। বঙ্গ-দেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের চন্দ্র উদিত হওয়াতে আমাদের ন্যায় কত শত অবিশ্বাসী পাপিদের মুখ প্রফুল্ল হইল, হৃদয় পবিত্র হইল, জন্ম সার্থক হইল। স্বর্গের ধন হস্তে পাইয়া আমরা অবাক্ হইলাম। যে হস্তে, হে ঈশ্বর! তোমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলাম সেই হস্তে তুমি স্বর্গের সামগ্রী দান করিলে! ধন্য দয়াময়! পাপীর ভাগ্যে এত লাভ! এ কথা কি আমরা গোপন করিয়া রাখিব না সহস্র মুখে ইহা প্রচার করিতে হইবে? চারিদিকে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিতেছি! কাল যেখানে কুসংস্কারের অন্ধকার আজ সেখানে সত্যের জ্যোতি, কাল যেখানে পাপের দাসত্ব আজ সেখানে পুণ্যের স্বাধীনতা, কাল যেখানে সংসারের যন্ত্রণা আজ সেখানে ধর্ম্মের শান্তি! যে দেশ পঞ্চাশ বৎসর পুর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি বিরোধী ও খড়্গাহস্ত

ছিল আজ সেই দেশের পথে পথে ব্রহ্মনাম ধ্বনিত হইতেছে। এক শত নয় দুই শত নয়, সহস্র সহস্র লোক পিতার প্রসাদে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় লাভ করিয়াছে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্যের ধর্ম্ম নহে ইহা স্বয়ং ঈশ্বরের সংরচিত, কেন না যাহা কিছু উচ্চ, যাহা কিছু পবিত্র সকলই ইহার মধ্যে সন্নিবেশিত। কেবল ব্রাহ্ম নাম লইলে ব্রাহ্ম হওয়া হয় না। যে ধর্ম্ম আত্মাকে সকল প্রকার ভ্রম ও পাপ হইতে মুক্ত করে এবং সকল প্রকার পুণ্যে বিভূষিত করে সেই ধর্ম্মের প্রকৃত উপাসক যিনি তিনিই ব্রাহ্ম। সমস্ত জগতের উপর আমাদের অধিকার, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত আমাদের সদ্ভাব, সকল উপদেষ্টার নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ। স্বদেশস্থ ও বিদেশস্থ যে সকল মহাত্মা ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে নমস্কার। পূর্ব্বকালে ও বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা ধর্ম্ম জগতে চরিত্রের বিশুদ্ধতা নিবন্ধন দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়াছেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ করিতেছি। সত্য সম্বন্ধে ব্রাহ্মধর্ম্ম দেশ কাল পাত্র ভেদ করেন না, যেখানে যাহার নিকট সত্য পাওয়া যায় উহা ঈশ্বরের সত্য বলিয়া অসঙ্কোচে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হয়। যিনি যথার্থ ব্রাহ্ম তিনি জ্ঞানহীন ও অসাধুর হস্ত হইতেও সত্যরত্ন গ্রহণে কুণ্ঠিত হন না, সামান্য ঘৃণিত লোকের নিকটে ও উদার মনে উপদেশ গ্রহণ করেন। অভিমানী অহঙ্কারী ব্যক্তিরা ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বারে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত নহে। সকল জাতির পদতলে পড়িয়া বিনীত ভাবে কৃতজ্ঞ চিত্তে যিনি সত্য সংকলন করেন তিনিই ব্রাহ্ম। কি আশ্চর্য্য! ব্রাহ্মধর্ম্মের রাজ্য কেমন নির্ব্বিবাদ ও শান্তিপূর্ণ, সকল সম্প্রদায়ের প্রতি ইহার কেমন সদ্ভাব! এ ধর্ম্মে কাহারও প্রতি ঘৃণা নাই বিদ্বেষ নাই। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি আমরা কাহারও বিরোধী নই, অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা আমাদিগকে বিপথগামী ও বিরোধী মনে করিয়া ঘৃণা করিতে পারেন, কিন্তু আমরা কেবল যে ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে ভ্রাতৃ নির্ব্বিশেষে ভাল বাসিতে চেষ্টা করি তাহা নহে, ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহাদের প্রত্যেককে কিয়ৎ পরিমাণে ব্রাহ্ম বলিয়া সমাদর করি। আমরা প্রত্যেকের কাছে গিয়া বলি, তোমার

নিকট যে টুকু সত্য আছে তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম, তাহা আমাদের সাধারণ সম্পত্তি, অতএব আইস উহার সাধন করি এবং উভয়ে মিলিয়া ঐ সত্যের মহিমা কীর্ত্তন করি। যাঁহার কাছে ভক্তি আছে তাঁহাকে বলি ভক্তি ব্রাহ্মধর্ম্ম, আইস সকলে মিলিয়া ভক্তি রস পান করিয়া প্রাণ শীতল করি। যে সমাজে সত্য বচন, ন্যায় ব্যবহার, পরোপকার ও চরিত্রের নির্ম্মলতা সেই সমাজের সহিত যোগ দিয়া আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের ঐ লক্ষণ গুলি সাধন করি। যে সম্প্রদায় বিজ্ঞানের আলোকে সমুজ্জ্বলিত সেই সম্প্রাদায়ের সঙ্গে একত্র হইয়া আমরা ঐ আলোক সম্ভোগ করি। এক্ষণ কি আমরা যেখানে যাই সেখানে ব্রাহ্মধর্ম্মের কিছু কিছু লক্ষণ দেখিতে পাই। আমাদিগের পরম সৌভাগ্য যে, ব্রহ্মনাম লইয়া আমরা যে দেশে যে ঘরে যে শাস্ত্র বা যে সম্প্রদায় মধ্যে প্রবেশ করি সেই খানেই কিয়ৎ পরিমাণে আমাদের অধিকার দেখিতে পাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম কি ? না সত্যের সমষ্টি, ইহা সত্যের সঙ্গে সমব্যাপী, সমুদায় সত্যরাজ্য ইহার অন্তর্গত। হৃদয়ের কোমলতা, জ্ঞানের গভীরতা, ইচ্ছার পবিত্রতা এ সমুদায় ব্রাহ্মধর্ম্মেরই ; ন্যায় ও বিজ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম, ইন্দ্রিয় দমন ও পরোপকার, যোগ ও ধ্যান এ সমুদয় ব্রাহ্মধর্ম্মেরই। যেখানে উহা দেখিতে পাই তাহা আমাদের ভূমি, সেখানে ব্রাহ্মসমাজের অধিকার। দেখ ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতার সীমা নাই। যখন আমরা ব্রাহ্ম হইয়াছি তখন আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা যত দূর সত্যের রাজ্য তত দূর বিস্তৃত হইবেই হইবে। যদি জিজ্ঞাসা কর কেন আমরা বিদেশী বা বিজাতীয় মহাত্মাদিগকে শ্রদ্ধা করি, কেন আমরা অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিদের আচার্য্য ও সাধুদিগকে ভক্তি করি, যাঁহারা বিদ্বেষ পরবশ হইয়া আমাদিগকে উৎপীড়ন করেন তাঁহাদের মধ্যেও ভাল লোকদিগকে আমরা কেন সমাদর করি, তাহার উত্তর এই আমরা সেই উপকারী বন্ধুদের প্রতি এ রূপ ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারি না। তাঁহারা আমাদিগের হৃদয়ের বন্ধু, প্রাণের বন্ধু। যাঁহারা বহু কষ্ট পূর্ব্বক জগতের উপকার করিয়াছেন, উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা জন সমাজের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট আমরা প্রত্যেকে ঋণী। কোন্ প্রাণে আমরা ঘৃণাপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিব

কোন্ প্রাণে কৃতঘ্নতাবাণে আমরা তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিব? কিরূপে অহঙ্কার বিদ্বেষ সহকারে তাঁহাদের অবমাননা করিয়া হৃদয়কে কলঙ্কিত করিব? সেই সকল প্রাণের বন্ধুদিগকে আমরা অবশ্যই শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা উপহার অর্পণ করিব।

এমন স্বর্গীয় উদার ধর্ম্ম ঈশ্বর কৃপা করিয়া আমাদিগকে বিতরণ করিয়াছেন। ইহাই মুক্তির একমাত্র পথ। এই উদার পথ ভিন্ন ব্রহ্ম লাভের আর অন্যপথ নাই। তিনি যেমন এক, তাঁহার পথও তেমনি এক, পরিত্রাণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি মাত্রেরই এই পথে আসিতে হইবে। এই সরল পথে সকলে অগ্রসর হও, দক্ষিণে কিম্বা বামে বিচলিত হইওনা, প্রাণগেলেও তোমরা উদারতাকে বিনাশ করিওনা। চন্দ্র সূর্য্যের আলোক যেমন সর্ব্বত্র সেবন কর, তেমনি প্রশস্ত চিত্তে সর্ব্বত্র সত্য সংগ্রহ করিবে। সত্যকে মধ্যবিন্দু করিয়া সকল জাতিকে প্রেম সূত্রে বাঁধিয়া এক পরিবার করিতে যত্নবান হও। কুসংস্কার ও অধর্ম্মের কারাগার হইতে উদ্ধার করিবার সময় দয়াময় ঈশ্বর আমাদিগকে সাম্প্রদায়িকতা রূপ লৌহ শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়াছেন। আবার কি আমরা আত্মাকে সেই শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিব? দেশ কালের অতীত সত্যরাজ্যে মুক্ত ভাবে বিচরণ করিয়া আবার কি স্বাধীনতা বিনাশ করিব এবং সাম্প্রদায়িক ভাবে বদ্ধ হইব? আমাদের ধর্ম্মের কেমন প্রশস্ত ভাব! ঊর্দ্ধে ঈশ্বর, সম্মুখে মুক্তি, চারি দিকে ভাই ভগ্নী গণ; কোন দিকে বাধা নাই, যে খানে সত্য সেখানে আমাদের অধিকার। আমাদের দেশের পরম সৌভাগ্য যে এই খানেই প্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে। কিন্তু এ ধর্ম্ম যে ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম এবং এখানেই যে ইহা চিরকাল বদ্ধ থাকিবে, একথা আমরা কখনই স্বীকার করিব না। যে সত্য কেবল ভারতনিবাসি দিগের জন্য তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে। আমাদের ধর্ম্ম জগতের ধর্ম্ম, সমস্ত মানব জাতির সঙ্গে আমাদের হৃদয় সমব্যাপী না হইলে উহার উপযুক্ত আধার হইতে পারে না। ব্রাহ্মনাম লইয়া আমরা দেশ কাল জাতি সম্প্রদায় পুস্তকের প্রতি পক্ষপাতী হইতে পারি না, আদরের সহিত সকল দেশীয় নরনারীকে ব্রাহ্মসমাজে গ্রহণ করিতে হইবে। এখানে যে অগ্নি জ্বলিতেছে

তাহা জগতের আর আর স্থানেও উদ্দীপ্ত হইতেছে। মহাসাগর পারে সভ্যতম প্রদেশে উহার শিখা দেখা যাইতেছে। যথাসময়ে এই সমুদয় অগ্নি একত্র হইয়া দাবানলের ন্যায় ধুধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে এবং সমস্ত জগতকে ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোকে উজ্জ্বল করিবে। হে ব্রাহ্মগণ! ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক ভাব পরিহার কর এবং দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে এই প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার কর। যে মহোৎসবে আজ আমরা আনন্দিত হইতেছি সেই মহোৎসবের আনন্দ সুধা সকল দেশের ভাই ভগ্নী দিগকে পান করাও।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

ধর্ম্মগ্রন্থ ও সাধুজীবন।

রবিবার, ২৭শে চৈত্র ১৭৯২ শক।

মুক্তিদাতা পরমেশ্বর যদি ভক্তের নিকট প্রকাশিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন,—বৎস! তুমি কি চাও? তিনি অকুণ্ঠিত হৃদয়ে এই বলিবেন আমি তোমার দর্শন চাই। তিনি পূর্ব্বকালের সাধুদিগের সঙ্গে যোগ দিয়া এই বলিবেন "স্বর্গে তোমা ভিন্ন আমার আর কে আছে? এবং ভূমণ্ডলে, তোমা ভিন্ন আমি আর কিছুই, চাহি না।" পরমেশ্বর যদি ভক্তকে বলেন ধন লও, যশ লও, পুত্র লও, বিষয় সুখ লও, তিনি তৎক্ষণাৎ এই বলিবেন আমি ইহার কিছুই চাহি না। পুনশ্চ যদি বলেন—ধর্ম্মগ্রন্থ গ্রহণ কর, সাধু সহবাস গ্রহণ কর, পৃথিবীর সুন্দর পবিত্র স্থান সকল ভ্রমণ কর, ভক্ত বলিবেন আমি ইহারও কিছু প্রার্থনা করি না, আমি কেবল তোমাকেই চাহি, তোমাকে পাইলেই আমার পরিত্রাণ, আমার পরম লাভ। ভক্ত যিনি তিনি আর কিছুরই জন্য লালায়িত হন না। তিনি ঈশ্বরকে ছাড়িয়া, পরম ধনকে ছাড়িয়া কোন মতেই সংসারের নিকট আপনার প্রেম ও অনুরাগ বিক্রয় করিতে পারেন না। যদি আবশ্যক হয়, পরমেশ্বরের জন্য তিনি সাধুদিগকে এবং সদুপদেশ-পূর্ণ গ্রন্থ সকলও পরিত্যাগ করিবেন। এক দিকে ঈশ্বর অন্যদিকে সংসার, এ স্থলে ভক্তের সংশয় নাই, তিনি সহজেই সংসার পরিত্যাগ করেন। কিন্তু এক দিকে জগতের সাধুগণ এবং সত্য-পূর্ণ গ্রন্থ সকল, অন্য দিকে স্বয়ং ঈশ্বর, এই অবস্থায়

অনেক ধার্ম্মিক ব্যক্তি যথার্থ পথ চিনিতে না পারিয়া ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করেন, এবং পুস্তক ও সাধুগণ হৃদয়ের পুত্তল স্বরূপ হইয়া তাঁহাদের পূজা গ্রহণ করেন। পৃথিবীতে সাধু ব্যক্তি কে? সকলেই বলিবে যাঁহার অনেক সাধুতা আছে, এবং যিনি অনেক সাধু কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যে ইহা সাধুর লক্ষণ নহে। ধর্ম্মজগতের সাধু ব্যক্তি স্বচ্ছ. যাঁহার মধ্য দিয়া পরমেশ্বরকে উজ্জ্বল রূপে দেখা যায়, যিনি গুপ্ত ভাবে থাকিয়া ঈশ্বর দর্শনে আমাদের সহায় হয়েন, তিনিই প্রকৃত সাধু। ধর্ম্ম-গ্রন্থ কি? যে গ্রন্থ ধর্ম্ম-মূলক সত্যে পরিপূর্ণ তাহাই ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া জগতে গৃহীত; কিন্তু ব্রাহ্মদিগের পক্ষে তাহাই ধর্ম্মগ্রন্থ, যাহা স্বচ্ছ, যাহার মধ্য দিয়া ঈশ্বরকে সমধিক উজ্জ্বলতা সহকারে দর্শন করা যায়। যে পুস্তকের মধ্য দিয়া ঈশ্বরকে দর্শন করা যায় না, যে শাস্ত্র স্বচ্ছ নহে, যাহা মধ্যে থাকিলে ঈশ্বরদর্শনে ব্যাঘাত জন্মে; সে গ্রন্থ, সে পুস্তক, সে শাস্ত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের রাজ্যে শাস্ত্র বলিয়া আখ্যাত হইতে পারে না। যাহা সহস্র সত্যবিশিষ্ট হইয়াও পিতার মুখ আবরণ করে, তাহা ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ নহে। কিন্তু যে স্বচ্ছ পুস্তকের মধ্য দিয়া ঈশ্বরের মুখ সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই, যাহা ক্রমশঃই পিতার মুখ উজ্জ্বলতর রূপে প্রকাশ করে তাহাই আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র। সেইরূপ তাঁহাকেই ব্রাহ্মেরা সাধু বলেন, যিনি স্বচ্ছ, যিনি মধ্যবর্ত্তী হইয়া আপনাকে দেখান না, কিন্তু যিনি আপনাকে গোপন করিয়া ঈশ্বরকে প্রকাশ করেন, এবং হৃদয়কে হরণ না করিয়া দেবচরণে অর্পণ করেন, তিনিই স্বয়ং ভক্ত। যাঁহারা ঈশ্বরকে দেখিতে দেন না, তাঁহার প্রেম মুখ আবরণ করেন, এবং আপনাদের প্রতি লোকের চিত্ত অনুরক্ত করেন, সে সকল ব্যক্তি সদ্গুণবিশিষ্ট হইলে পৃথিবীতে সাধু বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে তাঁহাদের সে আদর নাই। এখানে একমেবাদ্বিতীয়ং পরমেশ্বরের উপাসনা হয়। এখানে এক পরমেশ্বর ভিন্ন আর কেহই আমাদের ভক্তি ও পূজা গ্রহণ করিতে পারেন না। যিনি ঈশ্বরকে গোপন করিয়া নিজের জন্য লোকের অনুরাগ ও উপাসনা গ্রহণ করিবেন, তিনি চিত্তাপহারী বলিয়া ঘৃণিত

হইবেন। সত্য, ধর্ম্মপথে আমাদের সহায় চাই, নেতা চাই, উপদেষ্টা চাই, এ সকলই ঈশ্বর আমাদিগকে দিয়াছেন। জগতে কত সাধু ব্যক্তি আপনাদের শোণিত পাত করিয়া ধর্ম্মের ক্ষমতা ও ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিয়াছেন; কত ধর্ম্মবীর সত্যের কবচে আবৃত হইয়া অসংখ্য লোকের আঘাত সহ্য করিয়াও অসত্য এবং অন্ধকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছেন, কত হিতৈষী ব্যক্তি জগতের মঙ্গলের জন্য আপনাদের সুখ সম্পত্তি এবং জীবন পর্য্যন্ত বলিদান করিয়াছেন। তাঁহাদের মুখ দেখিলে, তাঁহাদের নাম করিলে তাঁহাদের কার্য্য স্মরণ করিলে যে আমাদের পুণ্যভাব বৃদ্ধি হয় তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা সহকারে স্বীকার করিয়াও আমরা এই কথা বলিব, যত দিন এবং যে পরিমাণে তাঁহারা স্বচ্ছ, তত দিন এবং সেই পরিমাণে তাঁহারা আমাদের সহায় ও অনুরাগভাজন। যে পরিমাণে তাঁহারা ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিয়াছেন, সেই পরিমাণে আমরা তাঁহাদিগকে সম্মান করিব; কিন্তু তাঁহারা যদি ঈশ্বরের পথে প্রতিবন্ধক হন, তাঁহাদের মধ্য দিয়া যদি ব্রহ্মদর্শন লাভ করিতে না পারি, তবে আর তাঁহাদিগকে সাধু বলিয়া সহায় বলিয়া কিরূপে গ্রহণ করিব? আমরা এ জন্য সৃষ্ট হই নাই যে চিরকাল সংসারে বদ্ধ হইয়া থাকিব, এ জন্যও সৃষ্ট হই নাই যে কোন পুস্তক কিম্বা ব্যক্তি বিশেষের অনুগত হইয়া জীবন ধারণ করিব। কিন্তু ইহাতে এ কথাও বলিতেছি না যে আমরা সকল পুস্তক পরিত্যাগ করিব, সাধুসঙ্গ করিব না, সংসারধর্ম্ম পালন করিব না। এ কথা বলাতে যে পাপ তাহা যেন ব্রাহ্মসমাজকে কলঙ্কিত না করে। সাধু সহবাসের যে উপকার তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। ভাল ভাল পুস্তকের মধ্যে ঈশ্বরের যে সকল জীবন্ত সত্য রহিয়াছে তাহা প্রত্যেক ব্রাহ্ম অবনত মস্তকে গ্রহণ করিবেন। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা বিনীত হৃদয়ে তাঁহার অনুগত সাধুদিগকে চক্ষুর অঞ্জন-স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করি। যদি কাহারও সাহায্যে আমাদের বিশ্বাসচক্ষু উজ্জ্বল হইয়া ঈশ্বরকে স্পষ্টরূপে দেখিতে পায় কিরূপে তাঁহাকে আমরা অগ্রাহ্য করিব? কিন্তু সাধুদিগের বাহিক

স্বতন্ত্র অস্তিত্বের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই; সাধুদিগকে আমাদের অন্তরস্থ করিয়া লইতে হইবে, তাঁহাদের সাহায্যে ব্রহ্ম-সন্নিধানে উপস্থিত হইতে হইবে। ভারতবর্ষে কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে, যাহার লোকেরা সমস্ত শরীরে ভক্তদিগের নাম লিখিয়া আপনাদিগের শরীর মনকে পবিত্র করিতে চেষ্টা করে। আবার পৃথিবীর অন্য অন্য স্থানে এরূপ ধর্ম্মাবলম্বী দৃষ্ট হয় যাঁহারা সাধুকে এত ভক্তি করেন যে তাঁহার রক্ত মাংস আপনাদিগের রক্ত মাংসে পরিণত না হইলে উন্নতি হয় না এরূপ বিশ্বাস করেন এই দুই প্রথা হইতে আমাদিগকে সারসংগ্রহ করিতে হইবে। ভক্তদিগের সমস্ত সদ্গুণ আমাদের শরীরের ভূষণ হইবে। শরীরের প্রত্যেক ভাগে, প্রত্যেক রক্তবিন্দুতে, প্রত্যেক অস্থিতে তাঁহাদের উপদেশ ও দৃষ্টান্ত সন্নিবেশিত হইবে। ব্রাহ্মের দেখা কর্ত্তব্য যে শরীর মধ্যে এমন এক বিন্দু স্থান নাই যেখানে স্বর্ণাক্ষরে ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিদিগের নাম লিখিত হয় নাই। সে সকল মহাত্মা-দের নাম আমাদের শরীর মন হইতে স্বতন্ত্র থাকিবে না, কিন্তু আমাদের জীবনের ভূষণ হইবে। উল্লেখিত দ্বিতীয় প্রথার সার মর্ম্ম এই যে, প্রত্যেক সাধু ব্যক্তির রক্তমাংস আমাদের রক্তমাংসে প্রবেশ করিয়া আমা-দিগকে নব জীবন দান করিবে। ঈশ্বরের নিকট আমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এই যে তাঁহার ভক্ত সন্তানদিগকে আমরা বাহিরে থাকিতে দিব না, কিন্তু অন্তরের অন্তরে প্রাণের মধ্যে তাঁহাদিগকে গাঁথিয়া রাখিব, প্রত্যেক সাধু ব্যক্তিকে আমাদের হৃদয়ের সম্পত্তি করিয়া লইব। সাধুদিগের শরীরের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের কোন প্রকার বাহ্যিক সম্বন্ধ নাই। তাঁহাদের বিনয় বিশ্বাস, তাঁহাদের সাধুতা পবিত্রতা আমাদের হইবে, তাঁহাদের রক্ত মাংস আমাদের রক্তমাংসে পরিণত হইবে। তাঁহাদের যত সাধুগুণ সমস্ত আমাদের শোণিতের মধ্যে প্রবাহিত হইবে এবং জীবনকে পরিপুষ্ট করিবে। ইহা হইলে তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের যথার্থ সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইবে। যদি কেহ আ-মাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন কোথায় সত্য? কোথায় সাধু দৃষ্টান্ত? আমরা কি পুস্তক বিশেষ বা ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ

করিব? প্রকৃত ভক্ত যিনি তিনি আপনার অন্তরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিবেন সে সমস্ত আমার হৃদয় মধ্যে। তিনি বলিবেন সত্য এবং সাধুতা আমি বাহিরে দেখিয়া সুখী হইতে পারি না, সে সকল আমি বুকে বাঁধিয়া রাখিতে চাহি, হৃদয়ের ধন করিতে চাই। ঈশ্বর যদি প্রিয় পাত্র হইলেন, তাঁহাকে যদি প্রাণের মধ্যে রাখিতে হয়, তবে যে সকল উপায়ে তাঁহাকে হৃদয়ের মধ্যে দেখিতে পাই তাহা কিরূপে বাহিরে রাখিয়া সন্তুষ্ট হইব? যে সকল মনুষ্য তাঁহার অনুগত ভৃত্য তাঁহাদিগকে অন্তরে আলিঙ্গন না করিয়া কিরূপে ক্ষান্ত থাকিব? যে জীবনে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই, যে পুস্তকে ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করি তাহা আমাদের করিয়া লইব। পরের সত্যে, পরের সাধু দৃষ্টান্তে আমাদের কি হইবে? এ সমস্ত যখন আমাদের নিজস্ব হইবে, যখন আমাদের জীবনের সঙ্গে গ্রথিত হইবে, তখন উহার প্রকৃত ব্যবহার হইবে। যখন আমি জগৎ পরিত্যাগ করিব তখন জগৎকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে তোমার মধ্যে কি এমন সত্য আছে যাহা আমি ভোগ করি নাই? তোমার মধ্যে কি এমন সাধু দৃষ্টান্ত আছে যাহা আমি আমার জীবনে সংগ্রহ করি নাই? জগৎ যদি বলে হাঁ আমার মধ্যে এমন অনেক সত্য এবং অনেক সাধু দৃষ্টান্ত আছে যাহা তুমি জানিতে পার নাই এবং আপনার করিয়া লও নাই, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে সেই পরিমাণে আমার জীবন অপূর্ণ রহিল। জগতের সকল স্থানে সকল জাতি হইতে সাধু জীবন সঞ্চয় করিয়া আমাদের পরলোকে যাইতে হইবে, সাধ্যানুসারে সত্যধন সংগ্রহ করিয়া পরলোকের সম্বল করিতে হইবে। যত ভাল লোক পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন তাঁহারা সকলেই আমাদের সহায় হিতৈষী বন্ধু, তাঁহাদের মধ্য দিয়া ঈশ্বরের পবিত্র উৎস হইতে পুণ্য স্রোত প্রবাহিত হইয়া জগৎকে শীতল করে ও ইহার মলিনতা পরিহার করে। ঐ স্রোতের যতটুকু জল যাঁহার কাছে পাওয়া যায় আমরা তাহা গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রাণ শীতল করিব এবং হৃদয়মলা প্রক্ষালন করিব। তাঁহাদের সাংসারিক বা শারীরিক ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই, কিন্তু তাঁহাদের

আধ্যাত্মিক জীবনে ঈশ্বরের যে সত্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আমরা প্রাণ পণে হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়া দিব; তাঁহাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের যে সকল পবিত্র ভাব প্রেরিত হইয়াছে তাহা আমাদের করিয়া লইব; এই পিতার আদেশ এই ব্রাহ্মদের কর্ত্তব্য। তাঁহাদের জীবনে যে পরিমাণে ঈশ্বরের হস্ত দর্শন করিব, যে পরিমাণে ঈশ্বরের ভাব উপলব্ধি করিব সেই পরিমাণে তাঁহারা আমাদের সম্বন্ধে সাধু। যদি কোন সাধু ব্যক্তি ঈশ্বরের হস্ত প্রচ্ছন্ন রাখিয়া আপনার কর্তৃত্ব প্রচার করেন তিনি ব্রাহ্মসমাজের শ্রদ্ধা পাইতে পারেন না; কেন না ব্রাহ্মেরা তিনি স্বচ্ছ কি না, তাঁহার মধ্য দিয়া ঈশ্বরের মুখ দেখা যায় কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখেন। যখন দেখেন তাঁহাকে প্রাণ দিলে ঈশ্বরকে প্রাণ দেওয়া হয় না, তাঁহার অধীন হইলে ঈশ্বরের প্রভুত্বের অপলাপ হয়, তখন আর তাঁহাকে সাধু বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু অকুণ্ঠিত মনে ব্রাহ্মেরা সেই সকল ব্যক্তিকে হৃদয় দান করেন যাঁহারা চক্ষুর অঞ্জনস্বরূপ, যাঁহাদিগকে চক্ষু দেখিতে পায় না, কিন্তু যাঁহারা চক্ষুকে উজ্জ্বল করেন। তাঁহাদের সাহায্যে ঈশ্বরের প্রেমমুখ স্পষ্টরূপে দর্শন করা যায়, কিন্তু তাঁহাদের স্বতন্ত্র সত্তা আর উপলব্ধি করা যায় না। ঈশ্বর যখন জিজ্ঞাসা করেন সন্তানগণ! তোমরা কি চাও? আমরা বলি তোমাকেই চাই। তবে আমরা কি সাধুদিগকে চাহি না? আমরা কি ভাই ভগ্নীদিগকে শ্রদ্ধা ও প্রীতি করিব না? তাহা নহে, যাঁহারা ধর্ম্মপথের সহায় কিরূপে বলিব তাঁহাদিগকে আমরা চাহি না? তবে যদি কোন সাধু ব্যক্তি কোন ধার্ম্মিক ভাই কি ভগ্নী ঈশ্বরের মুখ আবরণ করেন, এবং তাঁহার অব্যবহিত সন্নিধানে আমাদিগকে যাইতে না দেন, তাঁহাদিগকে বলিব তোমরা ঈশ্বরের পথে আমাদের প্রতিবন্ধক; তোমাদের যাহা কিছু সাধুতা, যাহা কিছু পবিত্রতা আছে তাহা যে পরিমাণে স্বচ্ছ হইয়া আমাদের নিকট ঈশ্বরের উজ্জ্বল মুখ প্রকাশ করিবে, সেই পরিমাণে তোমরা সাধু এবং আমাদের শ্রদ্ধার আস্পদ। এই ভাবে আমরা সাধুদিগের সঙ্গে আধ্যাত্মিক অদৃশ্য এবং গূঢ় যোগ রাখিয়া অবাধে ঈশ্বরের দর্শন লাভ করিব। কাহাকেও মধ্যবর্ত্তী

হইতে দিব না। আমারা "মধ্যবর্ত্তিত্ব মতে বিশ্বাস করি না। যদি কখনও আমরা ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ দেখিতে না পাই, তখন কোথায় সেই প্রেমময়, কোথায় সেই প্রেমময়! বলিয়া কাতর হৃদয়ে তাঁহাকে ডাকিব। মন যখন সংসারে মুহ্যমান হইয়া পড়িবে তখন পুস্তক পড়িয়া জ্ঞানোজ্জ্বল করিয়া লইব; হৃদয় যখন অবসন্ন হইবে, তখন সাধু ভক্তের সহবাসে তাহা সতেজ এবং সরস করিয়া লইব। কিন্তু যাই হৃদয় জাগ্রৎ হইবে তখন পিতার এবং আমার চক্ষুর মধ্যে আর কেহই স্থান পাইতে পারিবে না। আমি তাঁহার অব্যবহিত সন্নিধানে বসিয়া অনিমেষ নয়নে কেবল তাঁহাকেই দেখিব।

যত দিন পিতাকে দূরস্থ বোধ হয় ততদিন সেই দূরবীক্ষণ অবলম্বন করিব, যে দূরবীক্ষণ দ্বারা ঈশ্বরকে নিকটতর এবং উজ্জ্বলতর দেখা যায়। সেই দূরবীক্ষণ কি? না, সত্যপূর্ণ ধর্ম্ম-শাস্ত্র এবং সাধুজীবন। চক্ষুর অঞ্জনরূপে, দূরবীক্ষণরূপে, সহায়রূপে আমরা কিছুই গ্রহণ করিতে ঘৃণা করিব না। কিন্তু কোন সাধু ব্যক্তিকে মধ্যবর্ত্তী হইতে দিব না; কোন বিশেষ পুস্তককে ব্যবধান হইতে দিব না। যত দিন ধর্ম্ম-গ্রন্থ ঈশ্বরকে প্রকাশ করিবে তত দিন তাহা ব্রাহ্মদিগের দূরবীক্ষণ, যতদিন সাধু আপনাকে গোপন করিয়া ঈশ্বরকে প্রচার করিবেন ততদিন তিনি ব্রাহ্মদিগের সহায়। আমরা কোন পুস্তকে বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারি না, কোন মনুষ্যের দাস বা উপাসক হইয়া তাঁহার নিকট পড়িয়া থাকিতে পারি না। সেই পুস্তক, সেই সাধু আমাদের যাহা আপনাকে অস্বীকার করে, গোপণ করে, আমাদের দৃষ্টির মধ্যে সহায়রূপে লুক্কায়িত থাকে; আপনাকে কখন দেখায় না কেবল ঈশ্বরকে দেখাইয়া দেয়। দুর্ব্বল চক্ষু যেমন স্বচ্ছ কাচের সাহায্যে দূরের বস্তু দেখে, কিন্তু সে কাচকে কখন দেখে না, দেখিতে পায়ও না, এবং দৃষ্টিপথে সহায় হওয়াই কেমন সেই কাচের নিঃস্বার্থ লক্ষ্য ও প্রকৃত গৌরব, ব্রহ্মদর্শন পক্ষে সাধু ব্যক্তিরা সেই রূপ, তাঁহাদিগকে আমরা দেখি না, তাঁহারা নিজে গৌরব চান না বরং আপনাদিগকে অস্বীকার ও গোপন করেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত আমাদের বিশ্বাসচক্ষুর

অঞ্জন হইয়া পিতাকে স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দেয়। ব্রাহ্মদিগের পক্ষে তাঁহারা অলক্ষিত আধ্যাত্মিক উপায় মাত্র। সেই সকল উপায়ের মধ্য দিয়া সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইতে হইবে, ইহাই পিতার উদ্দেশ্য। এই পবিত্র উচ্চ অধিকার দিয়া তিনি সর্ব্বদাই আমাদিগকে তাঁহার কাছে আকর্ষণ করিতেছেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

স্বার্থপরতা।

রবিবার, ২৫শে বৈশাখ, ১৭৯[illegible] শক।

যিনি রাজা তিনি ভূম্যধিকারী। বিশ্বাধিপতি রাজাধিরাজ সমুদয় বিশ্বের অধিকারী। ইহার সমুদয় ভূমি তাঁহারই। তাঁহার আদেশ ভিন্ন কাহারও ইহার এক খণ্ড ভূমির উপর অধিকার স্থাপন করিবার সাধ্য নাই। সেই রাজাকে কর দান না করিলে কেহ তাঁহার রাজ্যে বাস করিতে পারে না। যখন পৃথিবীর সামান্য রাজার অধীন না হইলে তাঁহার এক খণ্ড ভূমিও আপনার বলিয়া ব্যবহার করিতে পারা যায় না, তখন রাজার রাজা মহারাজার অনুগত প্রজা না হইলে কি রূপে তাঁহার রাজ্যে বাস করিবে? প্রত্যেক মনুষ্য ঈশ্বরের প্রজা; তাঁহার রাজ্যে আমরা বাস করি, তাঁহার সামগ্রী সকল আমরা ব্যবহার করি, তজ্জন্য তাঁহাকে আমাদের প্রত্যেকের যথোচিত কর দান করিতে হইবে, তাঁহার শাসনের বশবর্ত্তী হইতে হইবে, এবং তাঁহার সমস্ত রাজনিয়ম পালন করিতে হইবে। আমাদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সাধন হইয়া গেলে আমাদের ব্যবহৃত ভূমি খণ্ড ভূস্বামী ঈশ্বরের হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া আরও উচ্চতর এবং নূতনতর স্থানে গমন করিতে হইবে। কিন্তু যত দিন এই পৃথিবীতে থাকিতে হয় তত দিন তাঁহার আজ্ঞাকারী ও অনুগত হইয়া থাকিতে হইবে এবং তাঁহার যাহা প্রাপ্য তাহা অর্পণ করিতে হইবে; নতুবা পৃথিবীতে বাস করিবার আমাদের কিঞ্চিন্মাত্র অধিকার নাই। সকল প্রজার প্রতি যেমন তাঁহার সাধারণ আদেশ, তেমনি প্রত্যেক প্রজার প্রতি অধিকার

ও সঙ্গতি অনুসারে বিশেষ বিশেষ আদেশ আছে। এই দুই প্রকার আদেশ পালনের জন্য আমরা ঈশ্বরের নিকট দায়ী। যদি তাঁহার রাজ্যে আমরা অনেক ভূমি গ্রহণ করি, যদি আমাদের ধন মান, বিদ্যা বুদ্ধি বা ধর্ম্মভাব অনেক থাকে তবে সেই পরিমাণে আমাদিগকে তাঁহার রাজ্যের কল্যাণ সাধন করিতে হইবে। যে সন্তানকে তিনি অধিক দেন, তাহার নিকট তিনি অধিক চান। যে পরিমাণে তিনি আমাদিগকে সক্ষম ও উপযুক্ত করিয়াছেন, ঠিক সেই পরিমাণে আমাদের দেহ মন প্রাণ তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবার সময় তাঁহার নিকটে আমরা এই রূপ অঙ্গীকার করিয়াছি। বাস্তবিক ব্রাহ্ম হওয়ার আর কোন অর্থ নাই। ভূম্যধিকারী রাজরাজেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বন্ধু ভ্রাতাদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া যখন কোন ব্যক্তি সাধ্যানুসারে রাজাজ্ঞা পালন করিবে এবং রাজ্যের সম্যক্ কল্যাণ সাধন করিবে এই বলিয়া অঙ্গীকার করে, তখনি তাহার ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করা হয়। ঐ অঙ্গীকার পালন ব্রাহ্মের চির জীবনের কার্য্য, উহার অন্যথা হইলে মহা অপরাধ হয়। ঈশ্বরও সেই অঙ্গীকারী ব্রাহ্মের নিকট যাহা প্রাপ্য সমুদয় আদায় করিবার জন্য চেষ্টা করেন এবং যথোচিত সাহায্য বিধান করেন। ব্রাহ্মেরা তাঁহার নিকট ভূমি গ্রহণ করিয়া উহার উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য অঙ্গীকারী ও দায়ী হইয়াও যদি তাঁহাকে কর না দেয়, কেবল আত্মসুখে সদা মত্ত থাকে তাহা হইলে তিনি এই রূপ ব্যবহারের প্রতি কখনই উদাসীন হইবেন না, ইহার সম্যক্ দণ্ড তিনি অবশ্যই বিধান করিবেন।

হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা কাহার রাজ্যে বাস করিতেছ? তোমরা কাহার জল বায়ু সেবন করিতেছ? কাহার হস্ত হইতে আহার পাইয়া প্রাণ রক্ষা করিতেছ? কাহার ভাণ্ডার হইতে রাশি রাশি সুখ সম্পদ প্রতিনিয়ত সঞ্চয় ও সম্ভোগ করিতেছ? কে তিনি? তোমরা তাঁহার প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পার না। কেবল আপনার সুখ হইলেই হইল, ইহা মনে করিয়া তাঁহার জগতে বাস করিতে পার না। কেবল আপনি খাইবে, আপনি পরিবে, এবং আপনার

পরিবারের ঐহিক সুখ সম্পাদন করিবে, এজন্য ঈশ্বর তোমাদিগকে এখানে স্থান দেন নাই। তোমাদের যাহা কিছু আছে তৎসমুদয় অঙ্গীকার পত্র স্বাক্ষর করিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছ, এখন আর তাহার উপর স্বেচ্ছাচারিতার অধিকার নাই। স্বার্থপরতা সমূলে বিনাশ করিয়া তাঁহার মহিমাকে মহীয়ান কর এবং তাঁহার প্রজাদিগের সুখ বর্দ্ধন কর।

হে ব্রাহ্ম! নিজের জন্য তুমি নও, পরের জন্য তুমি, এইটী বিশ্বাস কর। অন্য লোকে যাহা করুক, তুমি জগতের জন্য প্রাণ সমর্পণ করিবে। জগৎ ব্রাহ্মদের নিকট নিঃস্বার্থ জীবন প্রত্যাশা করিতেছে, এবং পরম গুরু বিবেক অন্তরে স্বার্থ নাশ করিবার জন্য নিয়ত উপদেশ দিতেছেন। তোমরা কি জান না যে ভ্রাতা ভগ্নীদের সেবা করিবার জন্য তোমরা এখানে প্রেরিত হইয়াছ? অত্যন্ত নীচ স্বার্থপর ব্যক্তিগণ এরূপ কথা বলিতে পারে,—সমস্ত জগৎ জলপ্লাবনে প্লাবিত হইল, দুর্ভিক্ষে দেশ উৎসন্ন হইল, জ্ঞানের অভাবে ধর্ম্মের অভাবে জনসমাজ কুসংস্কার এবং ব্যভিচার স্রোতে ভাসিয়া গেল, ইহাতে আমার ক্ষতি কি, আমার শরীর মন ভাল থাকিলেই হইল। এরূপ স্বার্থপরতা যে কেবল সংসারী লোকদিগের মধ্যে দৃষ্ট হয় তাহা নহে। কিন্তু ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও ইহা প্রকারান্তরে এবং অল্প পরিমাণে আধিপত্য করে। আমরা সর্ব্বদা স্মরণ করি না যে, আমরা যাহা কিছু ঈশ্বরের নিকট লাভ করিয়াছি, দেহ, বল, ধন, মান, জ্ঞান, বুদ্ধি, এবং ধর্ম্ম, এ সমুদয় জগতের হিতের জন্য আমরা ধারণ করিতেছি। শরীর যতক্ষণ না একেবারে শীর্ণ হয়, ততক্ষণ ইহার প্রত্যেক রক্ত বিন্দু জগতের শ্রীবৃদ্ধির জন্য নিয়োগ করিতে হইবে; যতক্ষণ অন্তরে জ্ঞানের লেশ মাত্র থাকিবে, ততক্ষণ উহা অকাতরে বিতরণ করিতে হইবে; যতক্ষণ আত্মাতে বিন্দু মাত্র বিশ্বাস ভক্তি থাকিবে, ততক্ষণ উহা অধার্ম্মিক ভ্রাতা ভগ্নীদের সঙ্গে অংশ করিয়া লইতে হইবে। আমাদের মধ্যে কোন্ ব্রাহ্ম এই ভাবে পরোপকার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, এবং গ্রহণ করিয়া পালন করিয়াছেন? ব্রাহ্মগণ! প্রতিদিন তোমরা কয় ঘন্টা আপনার এবং স্বীয় পরিবারের

জন্য চিন্তা কর, এবং কয় ঘণ্টা জগতের জন্য চিন্তা কর ? মায়ার বশবর্ত্তী হইয়া নিজের স্ত্রীপুত্রের দুঃখে যতবার দুঃখিত হও, অপরের জন্য কি ততবার তোমাদের দুঃখ হয় ? বাস্তবিক আমাদের অনুরাগ প্রীতি এবং উদ্যম নিজ নিজ কার্য্যে সমধিক পরিমাণে নিয়োজিত হয়, কেবল সময়ে সময়ে কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমরা পরোপকার করিয়া থাকি এবং ধন সম্পাত্তির অতি সামান্য অংশ অপরকে দান করি। এরূপ আংশিক পরোপকার ব্রাহ্মোচিত নহে। আপনাকে জগতের অঙ্গ বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে এবং সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে নিঃস্বার্থ হইতে হইবে। ধনহীন, জ্ঞানহীন, ধর্ম্মহীন শত সহস্র ভ্রাতা ভগ্নী উচ্চৈঃস্বরে 'প্রাণ যায়' বলিয়া নিরন্তর হাহাকার করিতেছে এবং বিনম্রভাবে আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। দুঃখ পাপ বিদগ্ধ জগৎ চারিদিক্ হইতে আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। আমরা এ অবস্থাতে নিজের জন্য কিছুই রাখিতে পারি না। সকলই অপরের প্রাপ্য। সে ঋণ সম্পূর্ণ রূপে পরিশোধ করিতেই হইবে। যদি ব্রাহ্ম নামের উপযুক্ত হইতে চাও আত্মপর বিচার না করিয়া আপনার এবং জগতের অধিকার একীভূত কর।

সাংসারিক স্বার্থপরতা এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় স্বার্থপরতা উভয়ই পরিহার্য্য। কিসে আমার শারীরিক সুখ হইবে, ধনমান বৃদ্ধি হইবে, কিসে ঘরে বসিয়া সপরিবারে সুখ স্বচ্ছন্দতার সহিত দিন যাপন করিব, জগতের যত দুর্গতি হউক না কেন, কিসে আমার ঐহিক শ্রীবৃদ্ধি হইবে ; এই রূপ চিন্তা ও কার্য্য অতিনিকৃষ্ট সাংসারিক স্বার্থপরতা, ইহা পরিত্যাগ করিতে যেমন সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিবে, সেইরূপ ধর্ম্মের স্বার্থপরতা বিদায় করিতে হইবে। আমি ভাল হইলেই হইল, বিরলে বসিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিলে, নির্জনে শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত ঈশ্বরকে ডাকিলেই আত্মার পরিত্রাণ হয় ; অপরের ধর্ম্মোন্নতির সঙ্গে আমার কোন সংস্রব নাই এবং তজ্জন্য আমি দায়ী নহি, যিনি এইরূপ মনে করেন তিনি ভয়ানক স্বার্থপর।

অন্য বিষয়ে আমরা যত ধার্ম্মিক হই না কেন যে পরিমাণে আমরা

এই রূপে নিজ হিত চেষ্টায় মগ্ন হইয়া পরহিতে উদাসীন হইব সেই পরিমাণে আমরা ঈশ্বর সন্নিধানে অপরাধী হইব। কাম ক্রোধাদি রিপু প্রকাশ্য রূপে বলপূর্ব্বক আত্মাকে আক্রমণ ও অধিকার করে, কিন্তু যে স্বার্থপরতা ধর্ম্মের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করে তাহা গুপ্তভাবে তস্করের ন্যায় পুণ্য ধন অপহরণ করে। এই উভয়বিধ স্বার্থপরতা বিনাশ করিয়া নিঃস্বার্থ প্রেম সহকারে মানবমণ্ডলীর ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল কায়মনোবাক্যে সাধন করা কর্ত্তব্য। সকল ধর্ম্মে নিঃস্বার্থ পরোপকারের বিধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ক্ষুধিতকে আহার, তৃষ্ণার্ত্তকে জল, রোগীকে ঔষধ, দরিদ্রকে ধন, মূর্খকে জ্ঞান, অসাধুকে হিতোপদেশ প্রদান করা সর্ব্ববাদী সম্মত বিশুদ্ধ ধর্ম্ম। কিন্তু এই ব্রতের আদর্শ কি? পরোপকারের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কি? অতি প্রাচীন এবং আধুনিক প্রায় তাবৎ ধর্ম্মশাস্ত্রে এই আদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যে আপনাকে যেমন প্রীতি কর সেই আদর্শ অনুসারে অপরকে প্রীতি করিবে; যে পরিমাণে আপনার ঐহিক ও পারত্রিক হিত সাধন কর, ঠিক সেই পরিমাণে অন্যের উপকার করিবে। "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" "প্রতিবাসীকে আত্মবৎ ভাল বাসিবে" "অপরের নিকট যেরূপ প্রত্যাশা কর, অপরের প্রতি সেরূপ ব্যবহার কর," এই রূপ ভূরি ভূরি উপদেশ ইহার উদাহরণ। পরোপকারের এই বিধি সাধারণের পক্ষে নিতান্ত উপযোগী এবং আবশ্যক সন্দেহ নাই, ইহা পালন করিলে অন্যের প্রতি যাবতীয় কর্ত্তব্য সাধন হয়। এমন কি ইহা সাধারণ সম্বন্ধে পরোপকারের অতি উৎকৃষ্ট নিয়ম। কিন্তু গভীর রূপে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে এরূপ উপদেশ ধর্ম্মজগতের নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের পক্ষে উপযোগী, উচ্চ শ্রেণীর পক্ষে নহে। যাহারা কেবল আমার আমার করে, এবং সর্ব্বাপেক্ষা আপনাকে ভাল বাসে তাহাদিগকে অবশ্য এই উপদেশ দেওয়া উচিত যে তোমরা যেমন নিজের প্রতি প্রীতি কর, অপরের প্রতিও সেই রূপ কর। কিন্তু যাঁহারা জগতের কার্য্যে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন এবং আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি উক্ত নিয়ম কিরূপে সংলগ্ন হইবে? তাঁহারা নিশ্চয়ই উহাকে নিকৃষ্ট উপদেশ মনে করিবেন। তাঁহাদের পক্ষে উচ্চতর ধর্ম্ম নীতির

প্রয়োজন। ধর্ম্মজীবনের প্রথম অবস্থায় মনুষ্য বারবার আপনার স্বার্থপরতা পরাজয় করিয়া পরোপকার করে এবং আপনার হিত-চেষ্টাকে আদর্শ করিয়া জগতের দুঃখ মোচন এবং সুখ বর্দ্ধন করে। ক্রমে আপনার ধনহানি, মানহানি, সুখহানি, এবং নানা প্রকার বৈষয়িক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও পরের উপকার করে। আরো উন্নতি হইলে ভক্তেরা আত্মবিস্মৃত হইয়া দয়াবৃত্তি চরিতার্থ করেন এবং হিতৈষণার হ্রদে আপনাদিগকে হারাইয়া ফেলেন। সেই উচ্চ অবস্থাতে আত্মপর এরূপ কোন প্রভেদ থাকে না, ঈশ্বরের পরিবার হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয় না। এরূপ উন্নত আত্মবিস্মৃত ব্রাহ্ম যখন আপনাকে অসুখী করিয়া অন্যকে সুখী করেন তখন তিনি কিরূপে আত্মবৎ অপরকে প্রীতি করিবেন? তাঁহার জীবন নিঃস্বার্থ দয়া স্রোতে নিরন্তর ভাসমান। জগতের কল্যাণ সাধনে তিনি উন্মাদপ্রায়, নিজের বিষয় চিন্তা করিবার অবকাশ নাই, নিজের প্রতি মমতা নাই; সুতরাং তিনি "আপনার ন্যায় অপরকে প্রীতি কর," উপদেশের অতীত। এই উচ্চ শ্রেণীর লোকের পক্ষে ইহার বিপরীত উপদেশ উপযোগী বলিতে হইবে, অর্থাৎ—"অপরকে যেমন প্রীতিকর সেই রূপ আপনাকে প্রীতি করিবে।" সাধারণ লোকে এ কথার মূল্য বুঝিতে পারে না, বরং এই উচ্চ শাস্ত্র লইয়া উপহাস করে। উন্নত সর্ব্বত্যাগী ব্রাহ্মদের পক্ষে এই শ্রেষ্ঠ বিধির বিশেষ প্রয়োজন। প্রথম অবস্থাতে যেমন আত্মপ্রেম মধ্যবিন্দু এবং পরোপ-কারের সমস্ত ব্রত উহার পরিধি, উচ্চ শ্রেণীতে সেই রূপ হিতৈষণার উন্মত্ততা মধ্যবিন্দু, এবং নিজের হিতসাধন উহার অনুগামী। এই দুই ধর্ম্মবিধি এবং আধ্যাত্মিক অবস্থার ঐক্য হইলে সম্পূর্ণ রূপে স্বার্থ নাশ হয়। নিকৃষ্ট উপদেশের সমুদয় অভাব উৎকৃষ্ট বিধিতে পূরণ হয় এবং আমাদের ধর্ম্মজীবন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়। তখন আত্মপর ইহার মধ্যে কলহ বিবাদ অসম্ভব হইয়া পবিত্র সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হয়। যাহা কিছু আপনার তাহা পরের, যাহা কিছু পরের তাহা আপ-নার। যাহা আপনার পক্ষে হিতকর তাহা জগতের পক্ষে কল্যাণ, যাহাতে

জনসমাজের মঙ্গল তাহাতে নিজের মঙ্গল। আপনার ভাল করিতে গেলে জগতের অনিষ্ট হয়, অথবা পরোপকার করিতে গেলে নিজের অনিষ্ট হয়, এ রূপ আর সম্ভাবনা থাকে না। এই সুন্দর সামঞ্জস্যের অবস্থা আমাদের সকলের পক্ষে প্রার্থনীয়। ব্রাহ্মগণ! তোমরা কেবল কতকগুলি সামান্য দয়ার কার্য্য সম্পাদন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিও না, এই উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইবার জন্য যত্নবান হও। কাম, ক্রোধ, লোভ সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে হইলে যেমন উহাদের বিপরীত সাধুভাব হৃদয়ে স্থাপন করা আবশ্যক, সেই রূপ স্বার্থপরতার উপর জয় লাভ করিতে হইলে আপনাকে অপরের সঙ্গে একীভূত করা বিধেয়। জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আপনার মুক্তি সাধন করিতে যাহারা চেষ্টা করে তাহারা নিতান্ত ভ্রমান্ধ, এবং তাহাদের চেষ্টা নিষ্ফল হইবেই হইবে। পরম পিতা তাঁহার সন্তানদিগকে এক সূত্রে এমনি গ্রথিত করিয়াছেন যে অপরকে ছাড়িয়া আপনাকে ভাল করা নিতান্ত অসম্ভব। ধর্ম্মজগতের এমনি আশ্চর্য্য গঠন যে তথায় কাহারও বিচ্ছিন্ন, নির্জন স্বতন্ত্র সত্তা নাই, সকলে এক শরীর, এক মন, এক প্রাণ। অন্যের সুখ দুঃখে নিজের সুখ দুঃখ, এক ভ্রাতা যদি অন্যকে আঘাত করেন, সেই আঘাতের শব্দ সকলের অন্তরে প্রতিধ্বনিত হয়; এক ভ্রাতার প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ হইলে, সেই কটূক্তিবাণ সকলের হৃদয়কে ব্যথিত করে; এক জনের অধর্ম্ম যন্ত্রণা দেখিয়া সমস্ত পরিবার শোকগ্রস্ত হন। ধর্ম্মরাজ্যে ভ্রাতা ভ্রাতায়, ভগ্নী ভগ্নীতে এমনি প্রাণগত যোগ, এমনি নিগূঢ় রক্তের টান; ঐ রাজ্যে প্রত্যেকে বিশ্বাস করেন যে আমি জগতের এবং জগৎ আমার, জগতের মঙ্গলে আমার মঙ্গল এবং আমার মঙ্গলে জগতের মঙ্গল। এই অভিন্ন-হৃদয়, অভিন্ন-প্রাণ পরিবার মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ নাই, পরোপকারের কঠোর সাধন নাই, আত্মপ্রেম এবং হিতৈষণা একই পদার্থ। প্রত্যেকের জীবন এক শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের ন্যায় সাধারণের হিত সাধক, এবং সাধারণের জীবন প্রত্যেকের কল্যাণের হেতু। হে ভ্রাতৃগণ! এই ধর্ম্মরাজ্য প্রেমরাজ্য তোমাদিগের মধ্যে স্থাপন কর, ব্রাহ্মধর্ম্মের নিঃস্বার্থ প্রীতি দিন দিন সাধন

কর। প্রার্থনার সময় ভ্রাতা ভগ্নীদিগকে স্মরণ করিও। তাঁহাদের নের জন্য আত্ম সমর্পণ কর, দেহ মন প্রাণ কিছুই আপনা রাখিও না। জগতের জন্য জীবন দান কর, নব জীবন পাইবে। মরুক আমি বাঁচি এই কথা যে বলে সে প্রাণ হারায়; জগৎ বাঁচুক মরি যে বলে সেই বাঁচে।